লেখকের অন্য বই

নতুন বাংলা বানান (ধ্বনিভিত্তিক সহজ বানান)

লেখকের কথা

চাকরি শুরু করার কয়েক বছর পর থেকে প্রায় অবসর নেওয়া অবধি - প্রায় ২৫ বছরে সাময়িক পত্রে আমার ১৭টি লেখা ছাপা হয়। তাদের একটি ফরাশি থেকে অনুবাদ-করা গল্প : অন্যগুলি প্রবন্ধ। তিনটি প্রবন্ধ লিখে, খুঁজে, আয়াসে সাময়িক পত্র মিলেছিল। কয়েকটিতে আমার ও সাময়িক পত্রের আগ্রহ ছিল যৌথ। কয়েকটি অনুরোধে লেখা, বা ছাপতে দেওয়া। তা কখনো সম্পাদকের, প্রতিষ্ঠানের, অথবা বন্ধুর।

কাগজগুলির ভড়ঙ থাকে। আমার কথা চলতি হাওয়ার পক্ষে নয়। লেখা দেওয়া কঠিন : পরে যেতাম না। এদেশে বাঙলায় গবেষণা ছাপার কাগজ বা প্রতিষ্ঠান নেই। হয় ব্যবশা, নয় রাজনীতি, বা দলবাজি করার কাগজ আছে। পরে লেখাব বলার-জানানোর কথা জমেছে। কাগজের অভাবে জানাতে পারিনি। দিন গেছে। চর্চা বেড়েছে। আমার লেখার বানান ও ভাষার ধরন বদলেছে। তা কাগজগুলির মর্জিমাফিক নয়। লেখা দেওয়া কঠিন : ছাপানো অশুবিধা। গত দশ বছরে সাময়িক পত্রে কিছু লিখিনি। আগে-পরে প্রতিষ্ঠিত কাগজ বিশেষ পাইনি। গত বছর আমার 'নতুন বাঙলা বানান' বই প্রকাশিত হয়েছে। তার পর পুরানো বানানে লেখা চলে না। এখানে সঙ্কলিত শেষ লেখাটি সম্পাদক চেয়ে নিয়ে নতুন বানান থেকে পুরানো বানানে বদলে ছেপেছিলেন। সাময়িক পত্র ছেড়েছি।

রচনাগুলি চলতি বানান ও ভাষারীতিতে লেখা। দুটি বিষয়ে আমার ধারনা ক্রমে বদলেছে। পাণ্ডুলিপিতে আমার লেখা ছিল। সম্পাদক ও ছাপাখানার হাত ঘুরে কখনো তার কলি ফিরেছে। ফল বিচিত্র। যেমন ছাপা হয়েছিল, প্রায় তেমন রইল। কেবল ক্রমিক ১, ৯, ১১, ১৫ সঙখ্যার রচনাগুলি অঙশত বদলেছে, বা মার্জিত হয়েছে।

কোলন (:) ব্যবহার করেছি, তবে কখনো একত্রে কোলন ও ড্যাশ (:--) দিইনি। উদ্ধারচিহ্ন একসঙ্গে দুটি নয়, — একটি (') লিখেছি। কোন শব্দ দু লাইনে ভাঙ্গা হলে একটি হাইফেন (-) থাকে। এখানে শব্দ ভাঙ্গার জায়গায় আগে থেকে হাইফেন থাকলে, দু লাইনে পর পর দুটি হাইফেন আছে,--আগের হাইফেন ও ভাঙ্গা বোঝানোর জন্য। নইলে--বাঙলায় চলতি পদ্ধতিতে গোলমাল হয়। টানা সঙ্খ্যা বোঝাতে বাঁয়ে অন্তত দুটি সঙ্খ্যা এক না থাকলে সঙক্ষেপ করিনি। ৫২-৫৮, ১২৩-১৩৮, ২৩৪-২৩৮ হয়েছে যথাক্রমে ৫২-৫৮, ১২৩-১৩৮, ২৩৪-৮। দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠাঙ্ক, তুলনীয়—এই শব্দগুলি চলতি রীতিতে সঙক্ষেপে দ্রঃ, পৃঃ, তুঃ না লিখে দ., প., তু. লিখেছি। পঁয়ত্রিশ বছর আগে op cit. এবঙ ditto বোঝাতে 'পূর্বোক্ত' এবঙ 'তদেব' লিখেছিলাম। বজায় আছে।

এক বর্ণের দুটি চেহারা অর্থহীন বলে ৎ ং লিখিনি। ত, ঙ আছে। উচ্চারণে নেই বলে শব্দশেষে বিসর্গ লিখিনি : মাঝখানে বজায় আছে। বাঙলায় লাইনো টাইপ ব্যবহারের সময় যুক্তব্যঞ্জনের বিভাজ্য সরল রূপ চালু হয়েছে। এখন যন্ত্রের উন্নতির ফলে ছাপা সহজ হওয়ায় কখনো পুরানো জটিল রূপ অনর্থক ফিরে আসে। তা অনুচিত। সহজে বোঝা যায়, মুখস্ত করতে হয় না--এমন থাকা ভালো। তাই ঙ্গ ক্ত নেই : সর্বত্র

হয়েছে ভ ন্দু। বর্ণে উ যোগ করে ু হয়েছে সর্বদা--গু রু শু সু হু। এক রকম। বোঝা, মনে রাখা সহজ। একই কারণে ব-ফলার চেহারা সর্বদা এক রকম রাখতে চেয়েছি। ক্র, ভ্র বদলে লিখেছি ক্র ভ্র। একক ত-এ প্রতিরোধের আশঙ্কায় কেবল যুক্তবর্ণে ত-এ উপরের মত ্ ্র যোগ করেছি, যেমন--ত্তু স্ত্র। ঋ ৃ তুলে দিয়ে উচ্চারণের মত সহজ করে ব-ফলা ও ই-কার দেওয়া ভালো। কখনো--প্রায় বিদেশি শব্দে তা করেছি। খৃষ্ট হয়েছে খ্রিস্ট।

ঙ একক ব্যবহারে সর্বদা হসন্ত বলে তাতে হল্ চিহ্ন বসানো অনুচিত। তবু কখনো বসেছে। বই প্রকাশে অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়। স্বরান্ত ঙ-এর সঙ্গে অন্য ধ্বনি না থাকলে, ছোট্ট গ ধ্বনি থাকে। তাই বাঙালি, আঙুর ভুল। আমি লিখেছি বাঙ্গালি, আঙ্গুর। ঐ, ঔ এককভাবে হয়েছে ওই, ওউ। ঐ (ৈ) চিহ্নে যখন একটি যথেষ্ট, তখন ঔ-এর জন্য দুটির দরকার কি? শুধু ৌ চিহ্ন লিখেছি : বৌ না লিখে বৌ। চেষ্টা করেছি ঞ-ণ, য-স কমিয়ে ন, শ লিখতে। প্রথম চারটি বলি না, — মুখে বলি শেষের দুটি। প্রতিরোধের ভয়ে সর্বত্র নয়,--কখন কখন তা করেছি, যেমন—ধরন, হিশাব। মনে রাখা ভালো, ভাষার ইতিহাসে সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙলার সম্পর্ক নেই। এখন হিন্দুয়ানির আরোপ হচ্ছে। ইচ্ছা থাকলেও, ভয়ে য় তুলে দিয়ে য লিখিনি। তা লেখা উচিত।

দুঃখে বুঝেছি, শিক্ষিতে অশিক্ষিতে পার্থক্য নেই। মাথাতেও! 'বিজ্ঞান' শব্দটি মুখে আছে, চিন্তায় নেই। সমাজে ভাষা বিজ্ঞান নয়,—ব্যবহার মাত্র। তা অক্ষয় করতে শিক্ষিতেরা সহায়। সংস্কারে প্রতিরোধ প্রবল। এ বইয়ের কিছু লেখা প্রথম প্রকাশের পরে -বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে, অন্যের ক্রোধ দেখেছি।

নানা সময়, নানা প্রসঙ্গে লেখা হলেও কখনো বিষয়গুলি সম্পর্কিত। কখনো পুনরুক্তি হয়েছে। উপায় ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের বহরমপুর জীবন, সামাজিক উপন্যাস লেখা শুরু, তাঁকে ঘিরে বিতর্ক, এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রসঙ্গে তা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও ফরাশি সাহিত্যের প্রসঙ্গে দুটি আলাদা রচনা আছে। তাতেও ছবি এক রকম। মূল রচনা বদলাতে চাইনি। যদিও পরে কোন ধারনা কিছু বদলেছে। তথ্য জানানোর, এবং কখনো অন্য কথা জানানোর জন্য লেখাগুলি বোধহয় এখনো প্রাসঙ্গিক। তাই সঙ্কলিত হল। বিষয় অনুসারে লেখাগুলি সাজানো হয়েছে,—কালানুসারে নয়।

এই সঙ্কলন ও প্রকাশনায় পরামর্শ দেওয়া ও সাহায্য করার জন্য আমি দু জনের কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁরা অধ্যাপক ড. অলোক রায়, এবং গ্রন্থপ্রেমী দেবপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি অশোক উপাধ্যায় ছদ্মনামে বেশি পরিচিত। যাঁর সহায়তা ছাড়া বইটি প্রকাশিত হত না, সেই স্ত্রী প্রকাশ্য কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশী নন। প্রকাশক নারায়ণ ঘোষ আমার ধন্যবাদভাজন।

সূচি

বঙ্কিমচন্দ্র

১

বঙ্কিমচন্দ্র ফরাশি ভাষা জানতেন, এই তথ্য তাঁর কোনো জীবনীতে[১] পাওয়া যায় না। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র যে ফরাশি জানতেন তা মনে করার কারণ আছে। সেজন্য কতকগুলি তথ্যের উল্লেখ করা দরকার।

১। তাঁর রচনায় অন্তত তিন জায়গায় ফরাশি কথা পাওয়া যায়।

(ক) বঙ্গদর্শন, ১২৮০ আষাঢ় সঙ্খ্যায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে Rousseau-র *Le Contrat social* বইটির উল্লেখ একাধিকবার করা হয়েছে। উল্লেখগুলিতে সর্বত্র মূল ফরাশি নামটি রয়েছে, কখনো ইঙরাজিতে Social Contract লেখা হয়নি। এই প্রবন্ধটি পরে 'সাম্য' পুস্তিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

(খ) বঙ্গদর্শন, ১২৮০ শ্রাবণ সঙ্খ্যায় প্রকাশিত রসরচনা 'গর্দভ'-এর শেষ অনুচ্ছেদে আছে--'তুমি কি Grand Etre ছাড়া?' 'লোকরহস্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় সঙস্করণে (১৮৮৮) এই অঙশটুকু বর্জিত হয়েছে।

(গ) ১২৯৩ শনে 'প্রচার' পত্রিকায় প্রকাশিত 'শ্রীমদ্ভবদগীতা'র ১/১ শ্লোকের ব্যাখ্যায় কুরুক্ষেত্রই যে ধর্মক্ষেত্র তার স্বপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র পাদটীকায় লিখেছেন--'M. Stanislaus Julien অনুবাদে লিখিয়াছেন, 'Le champ du bonheur' অর্থাত্ ধর্মক্ষেত্র।'[২]

২। Calcutta Review, 1871, no 106-এ ১৯১-২০৩ পৃষ্ঠায় বঙ্কিমচন্দ্র *Buddhism and the Sankhya Philosophy* নামে একটি বড় প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধের শুরুতে চারটি বইয়ের নাম আছে : প্রথম তিনটি ইঙরাজিতে লেখা, এবঙ চতুর্থটি ফরাশিতে--*Le Buddha et sa Religion.* Par J. Barthélemy St. Hilaire, Membre de l'Institut. Paris, 1860. বইগুলি প্রবন্ধের আকরগ্রন্থ বা প্রমাণগ্রন্থ হিশাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবঙ প্রবন্ধের একাধিক জায়গায় Hilaire-এর কথা আছে।[৩]

উপরের প্রথম দুটি বাঙলা প্রবন্ধে ফরাশি বইয়ের নাম বা দুটি ফরাশি শব্দ ঐ ভাষা না জেনেও লেখা চলে। এ থেকে লেখকের ফরাশি ভাষাজ্ঞান সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা চলে না,--বিষয়টি সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে মাত্র। তৃতীয় প্রবন্ধ থেকে প্রায় নিশ্চিত হওয়া সম্ভব, যে লেখক ফরাশি জানেন : নইলে, দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়া কঠিন। ইঙরাজি প্রবন্ধ থেকে বোঝা যায়, যে লেখক ফরাশি বইটি পড়েছেন। অনুবাদ পড়লে তিনি অনূদিত গ্রন্থ এবঙ অনুবাদকের নাম লিখতেন।[৪] তৃতীয় ও চতুর্থ প্রবন্ধের ইঙ্গিত স্পষ্ট।

উপরের তথ্য থেকে এই সিদ্ধান্ত করা চলে, যে বঙ্কিমচন্দ্র ফরাশি ভাষা জানতেন এবঙ ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের আগেই তা আয়ত্ত করেছিলেন।

এই তথ্য বহুজ্ঞাত, যে বঙ্কিমচন্দ্র একদা ফরাশি দার্শনিক ওগুস্ত্ কঁত্ (Auguste Comte) প্রচারিত ধ্রুবদর্শনের (Positivism) চর্চা করেছিলেন। বাঙলাদেশে যাঁরা এ মতবাদ নিয়ে আলোচনা করতেন তাঁদের মধ্যে বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র (১৮৩৪-১৮৭৪) এবঙ আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (১৮৪০-১৯৩২) ফরাশি ভাষা জানতেন এবঙ বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু ছিলেন। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক বন্ধুদের মধ্যে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫-১৮৮৬) ও চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯২২) ফরাশি জানতেন। এসব থেকে মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে ফরাশি শেখা কঠিন ছিল না।

বঙ্গদর্শন, (প্রথম বর্ষ) ১২৭৯ শ্রাবণ সঙ্খ্যায় 'কোমত্ দর্শন' নামে একটি ছোট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটির ভাগ এই—'১। ওগুস্ত কোমত্ ২। বহির্বিষয়ক জ্ঞান ৩। কারণ জ্ঞান ৪। দৈববলে বিশ্বাস ৫। কোমত্ নাস্তিক কি না? ৬। কোমত্ দর্শনের দোষ ৭। কোমত্ কপিল ৮। পুরুষার্থ ৯। পরমসত্ ১০। প্রেম ১১। বিবাহ ১২। শ্রাদ্ধ ১৩। বৈরাগ্য'। প্রবন্ধলেখক সাঙ্খ্যদর্শনের সঙ্গে পরিচিত, কারণ প্রবন্ধের '৭' অঙশে তিনি Comte-এর নিরীশ্বরতার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। Grand Etre-এর বাঙলা 'পরমসত্' না হয়ে কেন 'মহাসত্' হওয়া উচিত, তা প্রবন্ধটির 'পরমসত্' অঙশে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রবন্ধের শেষে একটি পাদটীকায় Comte-এর *Système de politique positive,* tome IV, p. 68 থেকে Si l'appareil masculin ne contribue à notre generation que ইত্যাদি দীর্ঘ ফরাশি উদ্ধৃতি দিয়ে লেখক মন্তব্য করেছেন—'পজিটিভ্ পলিটিক গ্রন্থের ইঙরাজি অনুবাদ সমাপ্ত হইয়াছে ; কিন্তু ঐ অনুবাদ অদ্যাপি প্রচারিত হয় নাই। অতএব, আমরা মূল গ্রন্থ হইতে তাঁহার রচনা উদ্ধৃত করিতে বাধিত হইলাম।'

প্রবন্ধটির আরম্ভ, শেষ বা পত্রের সূচিপত্রে লেখকের নাম, নামের আদ্যক্ষর অথবা তার কোনো সূত্র নেই। 'বঙ্গদর্শনে' সাধারণত তা লেখা হত না। প্রবন্ধটির লেখক সম্বন্ধে দুটি কথা মনে রাখা দরকার।

১। লেখক ভালোভাবে ফরাশি ভাষা শিখেছেন।

২। তিনি কঁতের ধ্রুবদর্শনের চর্চা করেছেন, এবঙ তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। রচনায় ধ্রুববাদের ত্রুটি দেখানোর সঙ্গে গুণ-নির্দেশ আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদক। বঙ্গদর্শনের লেখকের সঙ্খ্যা বেশি ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচিত বা সমকালীন যেসব (ফরাশি-জানা) বাঙ্গালির পক্ষে 'কোমত্ দর্শন' প্রবন্ধ লেখার সম্ভাবনা ছিল, তাঁরা দ্বারকানাথ মিত্র, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক হিসাবে এঁদের সম্ভাবনা একে একে বিচার করা চলে।

দ্বারকানাথ মিত্রের কোনো জীবনীতে[৫] তাঁর বাঙলা রচনার কথা নেই। তাছাড়া

'বঙ্গাদর্শনে'র প্রথম বছরের 'সূচনা' (১২৭৯ বৈশাখ) বা চতুর্থ বছরের 'বঙ্গাদর্শনের বিদায় গ্রহণ'-এ (১২৮২ চৈত্র) নামের তালিকায় তাঁর নাম নেই।[৬]

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধেও একই কথা। তাছাড়া, তিনি ধ্রুবদর্শনে অনুরাগী ছিলেন না, এবঙ বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গাদর্শনে কিছু লেখেননি।[৭]

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন, 'আমি positivist ; আমি নাস্তিক।'[৮] সেজন্য তাঁর পক্ষে আলোচ্য প্রবন্ধের ষষ্ঠ অঙশে নিরীশ্বরতাকে ধ্রুবদর্শনের দোষ বলা সম্ভব নয়। তাছাড়া--(ক) স্মৃতিকথায়[৯] তিনি নিজের বাঙলা রচনাগুলির যে তালিকা দিয়েছেন তাতে এই প্রবন্ধ বা বঙগদর্শনে মুদ্রিত কোনো প্রবন্ধের কথা নেই। (খ) বঙ্গাদর্শনের 'সূচনা'য় তাঁর নাম বিজ্ঞাপিত হয়েছিল বটে, তবে তিনি কখনো বঙ্গাদর্শনে কিছু লেখেননি।[১০] সেজন্য 'বঙ্গাদর্শনের বিদায় গ্রহণে' তাঁর নাম নেই।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বঙ্গাদর্শনে প্রকাশিত রচনাগুলি তাঁর 'নানা প্রবন্ধ' (১৮৮৫) বইতে সঙ্কলিত হয়েছে। তাতে এই প্রবন্ধ নেই। বইতে 'কোমত্ দর্শন' নামে যে প্রবন্ধ আছে তা বঙগদর্শন, ১২৮১ পৌষ সঙ্খ্যায় প্রকাশিত। তাতে আলোচ্য প্রবন্ধের প্রসঙ্গা নেই। মন্মথনাথ ঘোষ তাঁর রচনাগুলির যে তালিকা দিয়েছেন,[১১] তাতে এই প্রবন্ধ নেই। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত জীবনীগ্রন্থেও তা অনুপস্থিত।

যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা স্মরণীয়। (ক) তিনি স্বরচিত *Brahmanism and the Sudra* (১৯০১) গ্রন্থের ১২৫-৬ পৃষ্ঠায় নিজের রচনাগুলির যে তালিকা দিয়েছেন, তাতে আলোচ্য প্রবন্ধের নাম নেই। (খ) তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত গোঁড়া ধ্রুববাদী ও নাস্তিক ছিলেন[১২] বলে নিরীশ্বরতাকে Comte প্রচারিত দর্শনের দোষ বলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। (গ) তিনি ফরাশি ভাষা জানতেন না। (ঘ) বঙ্গাদর্শনে প্রকাশিত তাঁর রচনাগুলির শেষে সাধারণত তাঁর পুরো নাম বা নামের আদ্যাক্ষর ছাপা হত।[১৩] এখানে কিছু নেই।

এঁরা কেউ আলোচ্য প্রবন্ধ লেখেননি। এই পাঁচজন বর্জিত হলে বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া কোনো সম্ভাব্য লেখক থাকেন না। তাঁর পক্ষে তথ্য ও যুক্তি লেখা হল।

১।। (ক) বঙ্গাদর্শনে সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাগুলির সঙ্গো কখনো তাঁর নাম ছাপা হত না। আলোচ্য প্রবন্ধের সঙ্গে কারো নাম ছাপা হয়নি। এটি কোন সিদ্ধান্ত নয়, ইঙ্গিতবাহী তথ্য মাত্র। (খ) বঙ্গাদর্শনে প্রকাশিত অধিকাঙ্শ প্রবন্ধের লেখক যে বঙ্কিমচন্দ্র, তা একাধিক সূত্র থেকে জানা যায়।[১৪] (গ) 'প্রবন্ধ পুস্তকে'র (১৮৭৯) ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, 'এই জাতীয় আরও কয়েকটি মত্প্রণীত প্রবন্ধ 'বঙ্গাদর্শনে' প্রকাশিত হইয়াছিল। নানা কারণে সেগুলি এক্ষণে পুনর্মুদ্রাঙ্কণের অযোগ্য বিবেচনা করিলাম।' আলোচ্য প্রবন্ধ নানা কারণে পুনর্মুদ্রাঙ্কণের অযোগ্য বিবেচিত হয়ে থাকতে পারে।

২।। (ক) এই প্রবন্ধের এক বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র ইঙরাজিতে সাঙ্খ্য দর্শন সম্বন্ধে নিজের একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন।[১৫] (খ) ছয় মাস পরে বঙ্গাদর্শনে

বঙ্কিমচন্দ্র সাঙ্খ্য দর্শন সম্বন্ধে আবার ধারাবাহিক প্রবন্ধ রচনা করেন।[১৬] তা প্রথমে 'প্রবন্ধ পুস্তক' (১৮৭৯) এবঙ পরে 'বিবিধ প্রবন্ধে' (১৮৮৭) গ্রন্থিত হয়েছে। এখানে নিরীশ্বরতা সম্বন্ধে ধারাবাহিক আলোচনা আছে। (গ) ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন--'...and the Sankhya is the only system which I have made anything like a study'.[১৭] সেজন্য তাঁর পক্ষে বিভিন্ন রচনায় সাঙ্খ্যদর্শনের আলোচনা স্বাভাবিক। (ঘ) যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষকে লেখা একটি পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র কঁত্ আলোচনার প্রসঙ্গে সাঙ্খ্যদর্শনের সঙ্গে ধ্রুবদর্শনের তুলনা করেছেন।[১৮] সাঙ্খ্য দর্শন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয় বিষয় ছিল। আলোচ্য প্রবন্ধে তা স্পষ্ট।

৩॥ (ক) প্রথমে দেখেছি, যে বঙ্কিমচন্দ্র ফরাশি ভাষা জানতেন। এই প্রবন্ধকার ফরাশি জানেন। (খ) বঙ্কিমচন্দ্র কঁতের ধ্রুবদর্শনের অনুরাগী ছিলেন।[১৯] এই প্রবন্ধকার ধ্রুববাদ জানেন।

অতএব, বঙ্কিমচন্দ্র আলোচ্য 'কোমত্ দর্শন' প্রবন্ধের লেখক। প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থিত করেননি, এবঙ পরে তা কোনো বঙ্কিম গ্রন্থাবলীতে স্থান পায়নি।

৩

'কোমত্ দর্শন' প্রবন্ধের লেখক অপেক্ষাকৃত সহজপ্রাপ্য, সঙ্ক্ষিপ্ত, প্রামাণিক ইঙরাজি বই[২০] বাদ দিয়ে কঁতের মূল রচনা পড়েছেন। তিনি প্রকাশের পূর্বেই ইঙরাজ ধ্রুববাদীদের করা অনুবাদের খোঁজ রাখেন।[২১] এই অনুবাদটি ইঙলণ্ডে ধ্রুববাদের আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। অর্থাত্ বঙ্কিমচন্দ্র ধ্রুববাদের আন্দোলনের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন। কেবল দর্শন নয়, কঁত্-প্রচারিত মানবধর্ম (Religion of Humanity) সম্বন্ধেও তাঁর আগ্রহ ছিল যথেষ্ট। ধ্রুবদর্শনের প্রধান বই *Cours de philosophie positive* (১৮৩০-১৮৪২), এবঙ মানবধর্মের প্রধান গ্রন্থ *Système de politique positive* (১৮৫১-১৮৫৪)। বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয় বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, এবঙ 'কোমত্ দর্শন' প্রবন্ধের ১০-১৩ সঙ্খ্যক অঙশে এই ধর্ম সম্বন্ধেই আলোচনা করেছেন।

প্রবন্ধের ৫ ও ৬ সঙ্খ্যক অঙশে লেখক কঁতের দর্শনে নিরীশ্বরতাকে দোষ মনে করেছেন, অথচ দর্শনের যুক্তি পর্যায়ে ত্রুটি দেখেননি। ধ্রুবদর্শনের যুক্তিপ্রণালীর সঙ্গে ঈশ্বরবিশ্বাসের আপোস সম্ভব নয়, এবঙ ধ্রুবদর্শনকে ভিত্তি করে মানবধর্মের পত্তন। অতএব, ধ্রুববাদী ও মানবধর্মাবলম্বীর পক্ষে এমন উক্তি অস্বাভাবিক। নিরীশ্বরতার বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্র কোনো বক্তব্য বা যুক্তি দাঁড় করাতে পারেননি, বিশ্বাসকে দাঁড় করিয়েছেন। সম্ভবত ভারতীয় দর্শন ও ঈশ্বরবিশ্বাসের প্রভাব তার কারণ। বোঝা যায়, ধ্রুবদর্শনের প্রভাবমুক্ত না হলেও প্রবন্ধলেখক এই দর্শনে তাঁর বিশ্বাস হারিয়েছেন। প্রবন্ধের ১-৩ অঙশ নির্দেশ করে, যে ধ্রুবদর্শনের প্রভাব সম্পূর্ণ মুছে যায়নি।

সিদ্ধান্ত করা চলে, যে বঙ্কিমচন্দ্র যৌবনে কঁতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন : ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ বা তারো আগে থেকে প্রভাবমুক্ত হতে থাকেন।[২২] অনেকের মনে হয়,[২৩] বঙ্কিমচন্দ্র আমৃত্যু ধ্রুববাদী ছিলেন। এই আলোচনা তার বিপক্ষতা করে।

---

১ যেমন (ক) শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্কিমজীবনী। (কলকাতা, ১৩৩৮, III) (খ) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। (কলকাতা, ১৩৪৯, I)

২ Stanislaus Julien-এর *Histoire de la Vie de Hiouen-thsang et de ses Voyages dans l'Inde* (traduite du Chinois) গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি সঙ্কলিত হয়েছে। অক্ষয়কুমার দত্ত বহুবার এই গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। দ. ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, দ্বিতীয় খণ্ড, প. ২১৪, ২২৪। (কলকাতা, II)

৩ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পুস্তক সংগ্রহে এই বইটি ছিল। দ. 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সংগ্রহ', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, কলকাতা। গ্রন্থটি কি এদেশে জনপ্রিয় ছিল?

৪ কোনো বই অনুবাদে পড়লে বঙ্কিমচন্দ্র মূল বই নয়--অনুবাদের নাম লিখতেন। *Letters on Hinduism* গ্রন্থের দ্বিতীয় পত্রে তিনি *'Catechism of the Positive Religion*, p. 384, Congreve's Translation, 1st edition.' গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন, মূল ফরাশি বইয়ের নাম লেখেননি।

৫ (ক) Dinabandhu Sanyal—*Life of Justice Dwarakanath Mitter* (Kolkata, 1883) (খ) কালীপ্রসন্ন দত্ত- বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনী। (কলকাতা, ১২৯৯)

৬ বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের সম্ভাব্য লেখকদের একটি তালিকা লিখেছিলেন। দ. 'সূচনা', বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৭৯। প্রথম চার বছরের লেখকদের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। দ 'বিদায় গ্রহণ' বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৮০। এই দুটি তালিকা বঙ্গদর্শনের লেখকগোষ্ঠি নির্ণয়ের সহায়ক।

৭ দ. হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ--'স্মৃতিকথা', সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩১৪, প: ৫৭৩-৫৮০।

৮ বিপিনবিহারী গুপ্ত (সঙ্ক.)- 'কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের স্মৃতিকথা', পুরাতন প্রসঙ্গ, প. ১৩২। (কলকাতা, ১৩৭৩, II)

৯ তদেব, প. ১১৫-৭।

১০ দ মন্মথনাথ ঘোষ--'আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য', ভারতবর্ষ, মাঘ ১৩৪৫। তাতে কৃষ্ণকমলের এই উক্তি তুলে ধরা হয়েছে, যে তিনি কখনো 'বঙ্গদর্শনে' কিছু লেখেননি।

১১ মন্মথনাথ ঘোষ মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, প. ৬৫ ৬৬। (কলকাতা, ১৩৪০, I)

১২ (ক) বিপিনবিহারী গুপ্ত (সঙ্ক.) -পুরাতন প্রসঙ্গ, প. ১০২। (কলকাতা, ১৩৭৩, II) (খ) হীরেন্দ্রনাথ দত্ত--দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র, প. ৩৫ পাদটীকা। (কলকাতা, ১৩৪৭, I)

১৩ দ. (ক) শ্রীয:--'জাতিভেদ', বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১২৮০। (খ) যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ--'উপাসনাবিষয়ক তুলনা', বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১২৮৭। (গ) শ্রীযো- 'নারায়ণ', বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১২৯০।

১৪ (ক) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্গদর্শন', বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৮৪। (খ) অক্ষয়চন্দ্র সরকার--'পত্রপুত্র', দ. হরিমোহন মুখোপাধ্যায় (সঙ্ক)--বঙ্গভাষার লেখক। (কলকাতা, ১৩১১, I)

১৫ [B C. Chattopadhyay]—*Buddhism and the Sankhya Philosophy*, Calcutta Review, 1871, no 106. এই অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধটির লেখক যে বঙ্কিমচন্দ্র, তা তাঁর 'সাঙ্খ্যদর্শন' প্রবন্ধের তৃতীয় অনুচ্ছেদে লেখা রয়েছে।

১৬ পাঁচ পরিচ্ছেদে লেখা প্রবন্ধটির প্রতি পরিচ্ছেদ বঙ্গদর্শনের আলাদা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশের বিবরণ—পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ১২৭৯; বৈশাখ, আষাঢ় ১২৮০। বৈশাখে প্রকাশিত চতুর্থ পরিচ্ছেদের নাম 'নিরীশ্বরতা'। ১২.৪.১৮৭৩ তারিখে তা প্রকাশিত হয়। ধ্রুববাদও নিরীশ্বর।

১৭ The Secretary's Notes, *Bengal Past and Present,* vol. VIII, April-June 1914, p. 283. সেক্রেটরি সঞ্জীবচন্দ্র সান্যালের প্রতি কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ চিঠিগুলি ছেপে দিয়েছেন সঞ্জীবচন্দ্রের লেখা ইংরাজি টীকা সহ, যেন তিনি ওগুলি লিখেছিলেন। দ. Bankimchandra Chatterjee.–*Essays and Letters.* (Centenary edition.)

১৮ প্রথম প্রকাশ ঃ বিমলচন্দ্র সিংহ (সম্পা.)--বঙ্কিম প্রতিভা (কলকাতা, ১৩৪৫)। পুনর্মুদ্রণ ঃ Bankimchandra Chatterjee–*Letters on Hisduism,* pp. 51-52. (Centenary edition.)

১৯ দ. (ক) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়--'অনুশীলন', নবজীবন, আশ্বিন ১২৯১। পরে তা 'ধর্মতত্ত্ব' (১৮৯৪) গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় হয়েছে। (খ) শ্রীশচন্দ্র মজুমদার--'বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ', সাধনা, শ্রাবণ ১৩০১।

২০ লন্ডন থেকে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে Harriet Martineau দু খণ্ডে *The Positive Philosophy of Auguste Comte* গ্রন্থ প্রকাশ করেন। Dr. Richard Congreve তা মুদ্রিত করেন। এমন আরো অনেক ইংরাজি বই প্রকাশিত হয়েছিল।

২১ Comte-এর *Système de politique positif* গ্রন্থের চার খণ্ডে প্রথম ইংরাজি অনুবাদ *System of Positive Polity* লন্ডন থেকে ১৮৫৭-৮ খ্রিস্টাব্দে Dr. Richard Congreve, Frederic Harrison, J. H. Bridges প্রভৃতি ব্যক্তিদের দ্বারা নিষ্পন্ন ও প্রকাশিত হয়। Congreve ছিলেন লন্ডনে Church of Humanity-র High Priest; Harrison ও Bridges ধ্রুববাদীদের নেতা ছিলেন। ধ্রুববাদ সম্বন্ধে এঁদের প্রত্যেকের একাধিক ইংরাজি রচনা আছে। উল্লিখিত অনুবাদ প্রকাশের জন্য দ্বারকানাথ মিত্র চাঁদা পাঠিয়েছিলেন। দ. *Life of Justice Dwarkanath Mitter* গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্থ পত্র।

২২ বঙ্গদর্শনে ১২৭৯ শ্রাবণ সঙ্খ্যায় 'কোমত্ দর্শন' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তার ইংরাজি তারিখ (B.L.C. অনুসারে) ছিল ১৫.৭.১৮৭২।

২৩ যেমন--(ক) হরিদাস মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি (সম্পা.)--বিনয় সরকারের বৈঠকে, দ্বিতীয় ভাগ, প. ৬৩-৬৪। (কলকাতা, ১৯৪৫) (খ) সাহিত্য সঙ্সদ প্রকাশিত 'বঙ্কিম রচনাবলী', ২য় ভাগ, ২য় মুদ্রণে যোগেশচন্দ্র বাগল লিখিত 'সাহিত্য-প্রসঙ্গ', প. দ/. .

• প্রভাত : (বর্ষ ২৯, সঙ্খ্যা ২), জ্যৈষ্ঠ ১৩৭ , প ১০৭-১১২।

[সামান্য সঙ্শোধিত।

ইঙ্গিতে ঋণ-স্বীকার। দ. রবীন্দ্র গুপ্ত (সম্পা)-'ভূমিকা', বঙ্গদর্শন : নির্বাচিত রচনাসঙ্গ্রহ, প. ১২,

বহরমপুরে বঙ্কিমচন্দ্র

কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে তিন বছর আইন পড়ার দু বছরের শেষে বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি নিয়ে যশোরে যান। নানা জায়গা ঘুরে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে বেতন নির্ধারণ কমিশনের কাজে আলিপুরে এলে তিনি গোলদিঘির দক্ষিণে মির্জাপুর স্ট্রিটে বর্তমান সিটি কলেজের পাশে একটি ভাড়াবাসায় থাকতেন। তখন বিকালে কলেজে আইনের বাকি পড়া শেষ করে ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের শেষে পরীক্ষা দিয়ে বি. এল. উপাধি পান। আইন পড়ার কারণ—(ক) ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরিতে উন্নতির সীমা, এবঙ (খ) ওকালতিতে স্বাধীনতা ও আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা। তাঁর বন্ধু ও পরিচিতদের মধ্যে ছিলেন ব্যারিস্টার মধুসূদন দত্ত, বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, অ্যাটর্নি রাধামাধব বসু, সহপাঠী (মুন্সেফি ছেড়ে) উকিল (পরে বিচারপতি) চন্দ্রমাধব ঘোষ, (মুন্সেফি ছেড়ে) সরকারি উকিল হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (পরে বিচারপতি) রমেশচন্দ্র মিত্র। তখন উপাধি ছাড়াও কখনও ওকালতির সনদ পাওয়া যেত। বঙ্কিমচন্দ্র দু বছর আইন পড়েছিলেন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরিতে আইন সহ দুটি পরীক্ষা পাশ করেছিলেন, এবঙ বিচার করতেন। হাইকোর্টে ওকালতি করার জন্য বার্ষিক ৫০ টাকা ফি দিয়ে তিনি ১৭.৩.১৮৬৮ তারিখে সনদ পান। ওকালতিতে চাকরির নিরাপত্তা নেই। প্রথম ওকালতির সময় আর্থিক অনটনের সম্ভাবনা থাকায়, তিনি অভ্যস্ত শৌখিন বিলাতি জামা, জুতো ছেড়ে দেশি শস্তা জিনিস ব্যবহারের চেষ্টা করেন। পারেননি। পরের বছরও সনদ নেন। ওকালতি করার জন্য প্রস্তুত হতে, চাকরির জন্য পরিশ্রম করেছেন কম। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের প্রথমে কমিশনার R. B. Chapman তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেন—"The Babu is undoubtedly a first class officer. But he has been unsettled this year upon the point of remaining in the service, & has consequently not quite Maintained his former high character"। সঙসার বেড়েছে—তৃতীয় মেয়ে হয়েছে। বেহিশেবি বাবাকে টাকা পাঠাতে হয়। ছোট ভাই বেকার,--নির্ভরশীল। সঞ্চিত অর্থ নেই,--কখনও ধার হয়। বই লেখা থেকে উল্লেখযোগ্য আয় হতে তখনও দেরি। তিনি বারুইপুরে। ওকালতির ইচ্ছা ছেড়ে দিলেন।

বৌবাজারে হিন্দু হোস্টেলে তখন একটা আড্ডা বসত। থাকতেন শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। আইন পড়ার সময় মাঝে মাঝে বঙ্কিমচন্দ্র যেতেন। আলোচ্য ইঙরেজি সাহিত্য, দর্শন ও সমাজবিজ্ঞান। ফল প্রবন্ধরচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের আগ্রহ। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে নবপ্রতিষ্ঠিত Bengal Social Science Association-এর তিনি সদস্য ছিলেন। ২০.১.১৮৬৯ তারিখের অধিবেশনে *On the Origin of Hindu Festivals* নামে প্রবন্ধ পড়েন।

'মৃণালিনী' লেখা হয়েছিল। বারুইপুরে তা সঙশোধন করে ছ মাস ছুটির জন্য দরখাস্ত করেন। ২১.৫.১৮৬৯ তারিখে ছুটি মঞ্জুর হয়, বঙ্কিমচন্দ্র বই ছাপতে দেন, ৫.৭.১৮৬৯ তারিখে হেমচন্দ্র কর তাঁর কাছে কর্মভার নেন, এবঙ সেদিন বিকাল থেকে

তাঁর ছুটি আরম্ভ হয়। তাঁর জীবনীলেখক ভাইপো শচীশচন্দ্র লিখেছেন, যে তিনি ছুটি নিয়ে পশ্চিমে যান, কিছুদিন কাশীতে থাকেন, এবঙ 'মৃণালিনী'র প্রুফ সঙশোধন ও বিশ্রাম করেন। কথাটি বিচার্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙস্কৃতচর্চা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয়নি। শুধু কলেজ-জীবনে শ্রীরাম ন্যায়বাগীশ/শিরোমণির টোলে নয়, প্রৌঢ় বয়সে তিনি ভাটপাড়ার জয়রাম ন্যায়ভূষণের টোলে পড়েছেন। বাল্যে সতীর্থ নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু, প্রৌঢ়ত্বে পঞ্চানন তর্করত্ন। প্রমথনাথ তর্কভূষণের বাবা তারাচরণ বিদ্যারত্ন, এবঙ তাঁর অগ্রজ, গত শতকের বাঙলার শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রীতিভাজন, ভাটপাড়ার রাখালদাস ন্যায়রত্ন কাঁটালপাড়ায় তাঁর বাড়িতে প্রায় যেতেন। আরও যেতেন চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, (তাঁর ছেলে) হৃষীকেশ শাস্ত্রী, হরিহর শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, (বাল্যকালে) শিবচন্দ্র সার্বভৌম। এঁদের অধিকাঙশের বাড়ি ভাটপাড়ায় বা কাছাকাছি অঞ্চলে। তাঁর ইঙরেজি-শিক্ষিত বন্ধুদের সঙেগ ব্যবহারের মতো এঁদের প্রতি আচরণে বঙ্কিমচন্দ্র সশ্রদ্ধ ছিলেন। পরে বাইরের সঙস্কৃতজ্ঞ অনেক ব্যক্তির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা হয়, যেমন গোপালচন্দ্র গুপ্ত, রামগতি ন্যায়রত্ন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, কালীবর বেদান্তবাগীশ, তারাকুমার কবিরত্ন, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন, শশধর তর্কচূড়ামণি, সত্যব্রত সামশ্রমী, রাখালদাস কাব্যানন্দ, লোহারাম শিরোরত্ন, লালমোহন বিদ্যানিধি। বাল্যে যিনি হলধর তর্কচূড়ামণির কাছে উত্সাহ পেয়েছিলেন, তিনি যৌবনে--বহরমপুরে যাবার আগে তাঁর মাতামহ ভবানীচরণ বিদ্যাভূষণের সমস্ত পুথি উপহার পেয়েছিলেন। তাঁর অনুজ পূর্ণচন্দ্র লিখেছেন--'আমাদের মাতামহ সেকালে সঙস্কৃত শাস্ত্রে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বহুব্যয়ে ও বহুযত্নে অনেক সঙস্কৃত গ্রন্থাদি সঙগ্রহ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থগুলি সেকালে দুষ্প্রাপ্য ছিল, এখন ত বটেই। বঙ্কিম বাবুর সঙস্কৃতের দিকে বড় ঝোঁক দেখিয়া আমাদের মাতুল ঐ সমুদয় গ্রন্থগুলি তাঁহাকে দিয়াছিলেন। উহা পাইয়া তিনি প্রত্যেক গ্রন্থখানি নূতন খেরুয়া কাপড়ে বাঁধিয়া একটি আলমারী সাজাইলেন, আলমারী ভরিয়া গেল। ..এই গ্রন্থগুলি পড়িয়াই বঙ্কিম বাবুর সঙস্কৃত শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য জন্মে। এই সময় হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র ইঙরাজী গ্রন্থের পঠন ত্যাগ করিয়া কেবল সঙস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তার পর যখন হুগলিতে বদ্‌লি হইয়া আসিলেন, তখন কয় বত্সর পিতৃদেবের নিকটে থাকিয়া ধর্মসম্বন্ধে শিক্ষা পাইতে লাগিলেন।' অতএব, বঙ্কিমচন্দ্র হুগলির আগে—বহরমপুরে গভীর সঙস্কৃতচর্চা আরম্ভ করেন। তার আগে বারুইপুরে ছুটি নেওয়ার আগে এই সঙগ্রহ তাঁর অধিকারে আসে।

অতএব, মাতামহের পুথির উপর নির্ভর করে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙস্কৃতচর্চা আরম্ভ হয় কাশীতে। এখানে তিনি কোনো পন্ডিতের সাহায্যও নিয়ে থাকতে পারেন। তা ছাড়া, তিনি কাশী ছাড়া মথুরা, বৃন্দাবন, প্রয়াগ ও দিল্লিতে যান। ৯.২.১৮৯৪ তারিখে পড়া তাঁর বেদ সম্বন্ধে প্রবন্ধের শেষ দিকে আছে—'In early life I stood at the foot

of the Kutub Minar, ..Nearly thirty years later, I find myself lost' ইত্যাদি।

এই সময় তাঁর বেদচর্চার সূত্রপাত হয়। অনেক বছর পরে তার ফল ফলতে শুরু করেছিল। ১৮৬৯ নভেম্বরে 'মৃণালিনী' প্রকাশিত এবঙ বহরমপুরে তাঁর বদলির আদেশ বিজ্ঞাপিত হয়। দুটোই ছুটির মধ্যে।

বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরি সম্বন্ধে প্রকাশিত রচনাগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট তথ্যের অভাব, বর্ণনার বিকৃতি, এবঙ ভুল ব্যাখ্যা। তখনকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি সম্বন্ধে কিছু সাধারণ ধারণা থাকা দরকার।

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার অ্যাক্ট অনুসারে ভারতীয়দের জন্য তৈরি ডেপুটি কালেক্টরের পদগুলিতে পরে নানা পরিবর্তন হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের বাবা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম যুগের শেষ দিকের একজন ডেপুটি (ম্যাজিস্ট্রেট নয়-) কালেক্টর ছিলেন। কাজ রাজস্ব বিভাগের,—কোনো বিচারক্ষমতা ছিল না। পরে নতুন পদ তৈরি হয়। জেলার দায়িত্বে ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর ; তাঁর অধীনে মহকুমার দায়িত্বে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর। শাসন ও বিচারের দুটি অতিরিক্ত দায়িত্ব একত্রে যুক্ত হল। মহকুমার দায়িত্বে পদাধিকারবলে অনেক ক্ষমতা বর্তায় বলে, ওই পদে অভিজ্ঞ ব্যক্তি থাকতেন। সাধারণত নতুন কর্মচারীর শিক্ষানবিশি হত জেলার সদরে আরও কয়েকজনের সঙ্গে। সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বিশেষ স্থানে বিশেষ ব্যক্তিকে বিশেষ দায়িত্ব ও ক্ষমতা দেওয়া হত, যেমন—ফৌজদারি বিচার, সঙক্ষেপে বিচার, পুলিশ, শিক্ষা, স্বায়ত্তশাসন, রোড-সেস্, জমি অধিগ্রহণ। নতুন কর্মস্থলের জন্য নতুন বিজ্ঞপ্তি দরকার। একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের জন্য বার বার বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হত। অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ছোটখাট ফৌজদারি মামলার বিচারক্ষমতা দেওয়া হত। বড় মামলার একতিয়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা সেসন জজের আদালতের। বাকি খাজনা আদায়, অল্প মুল্যের জমির বিভাজন, বা স্বত্বনির্ণয় প্রভৃতি কিছু ছোট দেওয়ানি মামলাও তখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হত। শতকের শেষ দিকে এই একতিয়ার বজায় ছিল না। এরপর সমস্ত দেওয়ানি মামলা মুন্সেফের আদালতে যেত। ফৌজদারি বিচারক্ষমতা স্বাধীনতার পরেও অনেকদিন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের হাতে ছিল।

এই চাকরিতে ষষ্ঠ থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ প্রথম পর্যন্ত ছয়টি শ্রেণী (grade) ছিল। চাকরিতে ঢুকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে Lower grade ও Higher grade পরীক্ষায় পৃথকভাবে পাশ না করলে চাকরি থাকত না। প্রথম ও দ্বিতীয় পরীক্ষায় পাশ করলে যথাক্রমে পঞ্চম ও চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নয়ন (promotion) হত। ষষ্ঠ শ্রেণী 'অতিরিক্ত' (supernumerary), পঞ্চম শ্রেণী 'অস্থায়ী' (temporary) এবঙ চতুর্থ শ্রেণী 'পাকা' (permanent) ছিল। তখন প্রতিবছর হিশাব বিভাগ প্রকাশিত History of Services of Gazetted Officers গ্রন্থে অধস্তন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের নাম থাকত না। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী ঊর্ধ্বতন; সেই চাকরির পুরো ইতিহাস

থাকত। চতুর্থ থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নয়নে প্রাচীনতার (seniority) প্রাধান্য, কিন্তু তার পরের উন্নয়নে প্রধান বিচার্য বিষয় দক্ষতা (efficiency)। তখন কোনো বেতনক্রম (scale of pay) ছিল না,—প্রতি শ্রেণীর জন্য আলাদা মাইনে। কোনো ভাতা (allowance) ছিল না,—বদলির সময় ও চাকরির জন্য ভ্রমণভাতা ছাড়া। কখনো অস্থায়ীভাবে কোনো অতিরিক্ত বিভাগের দায়িত্ব (যেমন-ট্রেজারি, লবণ, আবগারি) পালন করলে অস্থায়ী ভাতা দেওয়া হত। পরের শ্রেণীতে উন্নয়ন পর্যন্ত মাইনে স্থির থাকত।

প্রথমে চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার নির্দিষ্ট বয়স ছিল না। পরে ক্রমশ তা ৫৫ বছর করা হয়। তবে তখনও আবেদন করলে দক্ষ ব্যক্তির চাকরির মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হত। অবসরের পর কেবল প্রাক্তন কর্মচারী পেনশন পেতেন, তাঁর পরিবারের অন্য কেউ নন। পেনশন পাওয়ার জন্য কমপক্ষে ৩৩ বছরের স্থায়ী চাকরির প্রয়োজন হত।

Class ও grade শব্দের ভিন্ন অর্থ এক প্রতিশব্দ 'শ্রেণী' দিয়ে বোঝানো কঠিন। Grade চাকরিতে বিশেষ অবস্থান বোঝায়। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরিতে ছয়টি উঁচু-নিচু গ্রেডে বেতন ও মর্যাদার হেরফের হত। Class বোঝায় কোনো কর্মচারীর বিশেষ একতিয়ার ও ক্ষমতা। বিচারকার্যে ম্যাজিস্ট্রেটের class তাঁর একতিয়ার, এবঙ বিশেষভাবে দণ্ডদানক্ষমতার সীমা নির্দেশ করে। বিভিন্ন আইনে (Act) অধিকার বোঝাতে (ডেপুটি নয়-) Magistrate বা Collector শব্দ, এবঙ তার পরিধি বোঝাতে তিনটি class উল্লিখিত হত। তৃতীয় শ্রেণীর (grade) কোনো ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বিচারকার্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর (class) (ডেপুটি নয়-) ম্যাজিস্ট্রেটের এবঙ রোড-সেস্ বিভাগে প্রথম শ্রেণীর (class) (ডেপুটি নয়-) কালেক্টরের ক্ষমতার অধিকারী হতে পারতেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শব্দগুলি পদ (designation) বোঝায়, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট অথবা কালেক্টর শব্দ ক্ষমতা ও একতিয়ার (power and jurisdiction) বোঝায়। সরকার কোনো আইনের কোনো ধারা (section) অনুসারে সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে কোনো ব্যক্তিকে কোনো বিশেষ ক্ষমতা বিশেষ স্থানের জন্য দিতেন। চাকরিতে বদলি হলে, আইনের প্রাসঙ্গিক পরিবর্তন হলে, আগের বিজ্ঞপ্তি আপনা থেকে বাতিল হওয়ায়, নতুন বিজ্ঞপ্তির প্রয়োজন হত। বিজ্ঞপ্তি জারি করে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাতে কর্মচারীদের কার্যভেদ হয়। নতুন গ্রেডের বিজ্ঞপ্তি একবার, class-এর জন্য বারবার।

অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা থাকলেই তখন চাকরিতে উন্নতি হত না। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের ছয়টি গ্রেডের প্রতিটিতে পদের সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল। অবশ্য বঙ্গীয় সরকার শাসনকার্যের প্রয়োজন ও টাকার জোগান অনুসারে গ্রেডে পদের সংখ্যাবৃদ্ধির পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতিক্রমে, কখনও বিলাতে Secretary of State-এর অনুমোদনের জন্য পেশ করেছেন। কখনও পার্থক্য হয়েছে। কিন্তু কর্মচারীদের পক্ষে নির্দিষ্ট সময়ে তা সর্বদা স্থির। অবসর গ্রহণ, পদত্যাগ, বিতাড়ন, মৃত্যু, পদাবনতি প্রভৃতি

কারণে কোনো শ্রেণীতে পদ খালি না হলে নিচের শ্রেণীর কর্মচারীকে খালি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত। ষষ্ঠ ও পঞ্চম শ্রেণীতে কড়াকড়ি ছিল না, তার উপরে ছিল। তার ফলে, কোনো গ্রেডে একটি পদ খালি হলে একই সময়ে তার নিচের প্রতি গ্রেড থেকে একজনের গ্রেডে উন্নতি হত,—চাকরিতে নয়। প্রসঙ্গাত পদমর্যাদা বোঝা দরকার। সরকারি চাকুরিতে উচ্চতম পদ সেক্রেটারি, তার নিচে ডেপুটি সেক্রেটারি, তার নিচে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রে টারি। বর্তমান রচনায় সূক্ষ্মতর বিভাগ অপ্রয়োজনীয়। এটা পদমর্যাদা। পদের নাম ভিন্ন হতে পারে। রেভিনিউ বোর্ডের চেয়ারম্যান, অথবা বিভাগীয় কমিশনার পদমর্যাদায় সেক্রেটারি, এবঙ জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ডেপুটি সেক্রেটারি। কোনো ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রাইটার্স বিল্ডিঙস অথবা তখনকার বেঙ্গল অফিসে কাজ করলে তাঁর পদ আপনা থেকে হত কোনো বিভাগের এসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি। তা চাকরিতে উন্নতি বা অবনতি নয়। পদাধিকারবলে তখন প্রত্যেক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট 'রায় বাহাদুর' ছিলেন,—কেউ লিখতেন, কেউ লিখতেন না। অবসর গ্রহণের পর এই উপাধি থাকত না। সরকার কখনও কোনো ব্যক্তিকে তা দিতেন।

রাজস্ব বিভাগের কাজের জন্য কালেক্টর এবঙ শাসনকার্যের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট। তখন শাসনকার্যের অন্তর্গত ছিল কিছু বিচারক্ষমতা। দুই ক্ষমতাবিশিষ্ট অধস্তন গেজেটেড কর্মচারী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর। তাঁদের নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রাচীনতা, ছুটি, বদলি, একতিয়ার, ক্ষমতা প্রভৃতি বিষয়ে সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি খুঁজে চাকরির ইতিহাস তৈরি করা সম্ভব। তা খুঁটিনাটি বিষয়ে ঠিক হবে না। যেমন, কোনো বিজ্ঞপ্তি কর্মভারগ্রহণ বোঝায় না। বদলির জায়গায় যাওয়ার সময় ছুটি নয়,—চাকরি। বিজ্ঞপ্তি বা আদেশনামা প্রকাশিত হলে কর্মচারীকে চার্জ দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। ততদিন তিনি পুরনো কর্মস্থলে চাকরি করেন। চার্জ বা কর্মভার দিয়ে যাওয়ার জন্য কয়েকদিন সময় লাগে। তার হেরফের হয়। বিজ্ঞপ্তি এবঙ নতুন কর্মভার নেওয়ার তারিখ ভিন্ন হয়। ছুটিও তেমন। মঞ্জুরির আদেশ থেকে তা এক মাস কার্যকর থাকলেও আবেদন করে ছুটি আরম্ভ করার সময় পিছিয়ে দেওয়া যেত। তার বিজ্ঞপ্তি হত না। ছুটি বাতিলের বিজ্ঞপ্তি সর্বদা প্রকাশিত হত না। কখনও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ছুটি মঞ্জুর হবে জেনে, জরুরি প্রয়োজনে কোনো ডেপুটিকে ছুটিতে যেতে দিলে ছুটির পরবর্তী বিজ্ঞপ্তিতে 'from the day he has availed of' লেখা হত। তাতে তারিখ মেলে না। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জরুরি প্রয়োজনে একই জেলায় কখনও অন্যত্র অস্থায়ী কর্মভার দিলে সর্বদা তার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হত না। গেজেটে মাইনে অনুক্ত থাকত। অন্য তথ্যসূত্র সরকারি হিশাব বিভাগের তৈরি চাকরির ইতিহাস। অবসর গ্রহণের পরে তা বর্জিত হত। তার আগে একাধিক বছরের চাকরির ইতিহাস মেলালে নানা ছোটখাট পার্থক্য চোখে পড়ে। অবসর নেওয়ার বছরের ইতিহাসের ভিত্তিতে পেনশন ঠিক হত, এবঙ তা তৈরি করার জন্য সঙশ্লিষ্ট কর্মচারীর সাহায্য চাওয়া হত। খুঁটিয়ে দেখলে ইতিহাসে কিছু গোলমাল ধরা পড়ে—বিজ্ঞপ্তি ও কর্মভার নেওয়ার দুটি তারিখের মধ্যে

একটি নির্বাচনের পদ্ধতি সর্বদা অভিন্ন নয়, অসম্পূর্তা আছে, মাইনে নেই, ক্ষমতার বিবরণ নেই, পরীক্ষাসঙক্রান্ত তথ্য নেই। তখনকার Quarterly Civil List-এ এগুলি মেলে, কিন্তু তারিখের খুঁটিনাটি মেলে না। প্রতিটি বিবরণ অসম্পূর্ণ। সচিবালয়ে (Secretariat) বিভাগীয় তথ্য নির্ভুল ও বেশি থাকত, যা এখন লেখ্যাগারে (Archives) সঙরক্ষিত আছে। এগুলি দীর্ঘ অনুসন্ধানের বস্তু। তার দুটি প্রধান অসুবিধা --(ক) জেলার সব কাজের কথা সচিবের দপ্তর পর্যন্ত আসে না, এবঙ (খ) তা বিভিন্ন সচিবের দপ্তরে যায়। হিশাব বিভাগের দপ্তরে পেনশন নেওয়ার শেষ তারিখের ৪০ বছর পরে পুরনো কাগজপত্র রক্ষিত হয় না। কর্মস্থলের জেলা সদরের রেকর্ডরুমে পুরনো কাগজপত্র কখনও মেলে। 'কখনও', কারণ তা সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত নয়। অতএব, History of Services of Gazetted Officers, Calcutta Gazette, Quarterly Civil List থেকে সঙ্গৃহীত তথ্যের সঙ্গে State Archives এবঙ District Record Room-এ প্রাপ্ত তথ্য মেলানো দরকার। তার সঙ্গে গোপন রিপোর্ট, এবঙ কোনো ডেপুটি যখন যে বিভাগগুলির কাজ করতেন সেই বিভাগের সেই বছরগুলিতে প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন দেখা দরকার। তার জন্য যেমন রাজ্যের Judicial, Police, Municipal প্রভৃতি বিভাগ, তেমনই কখনও কেন্দ্রীয় সরকারের আয়কর, (কখনও ধার-নেওয়া সাময়িক চাকরির ক্ষেত্রে) রেলওয়ে প্রভৃতি বিভাগের পুরনো কাগজ অনুসন্ধেয়। বিভাগীয় কাগজপত্রে নৈর্ব্যক্তিকভাবে যেসব আদেশ, মন্তব্য, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি লেখা হয়, অনেক সময় তার পিছনে কোনো ব্যক্তি/গোষ্ঠীর হাত, বিশেষ ক্ষমতা, স্বার্থ বা উদ্দেশ্য থাকে। সমকালীন সঙবাদপত্রগুলি এসব বুঝতে সাহায্য করে। তার পরে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরির ইতিহাস তৈরি করা সম্ভব। এখন পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরির কোনো পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা হয়নি।

মুন্সেফের তুলনায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্খ্যা বেশি। শাসনের, শাস্তিদানের, জেলে পাঠানোর ক্ষমতা ডেপুটির ছিল,--মুন্সেফের নয়। এজন্য সাধারণের কাছে ডেপুটির দবদবা বেশি। এই চাকরির প্রলোভনও বেশি। মুন্সেফির জন্য আইনের উপাধি থাকা দরকার। তখন কোনো উপাধি ছাড়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হওয়া যেত। প্রথমে এটা শুবিধা। পরে অশুবিধা উন্নতিতে। মুন্সেফ ক্রমে সাবর্ডিনেট, অ্যাডিশনাল, জেলা ও সেসন্স্ জজ অবধি হতে পারতেন। পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও মাইনে বাড়ত। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরিতে তখন উন্নতি নেই। যখন উন্নতির ব্যবস্থা হয় তার আগেই বঙ্কিমচন্দ্র অবসর নিয়েছিলেন। এই চাকরিতে তাঁর মোহ ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র ছয় মাসের ছুটির মধ্যে ২৯.১১.১৮৬৯ তারিখের আদেশে মুর্শিদাবাদ জেলার সদরে--বহরমপুরে বদলি হলেন। বহরমপুরে তাঁর কাজে যোগ দেওয়ার তারিখ অজ্ঞাত। দীর্ঘ ছুটির মধ্যে বদলি হওয়ায় নতুন কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য তিনি অতিরিক্ত সময় (transit leave) পাননি। ৬.৭.১৮৬৯ তারিখ থেকে তিনি ছুটি নিয়েছেন। তার অঙশও বাতিল হয়নি। অনুমেয়, তিনি ৬.১.১৮৭০ তারিখে বহরমপুরে কাজে যোগ দেন।

সরকারি বাসার অভাবে ভাড়াবাসায় থাকতে হত। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচিত কোনো লোক তখন বহরমপুরে ছিলেন না। তিনি প্রথমে মুন্সেফ গঙ্গাচরণ সরকারের বাসায় উঠলেন। গঙ্গাচরণের ছেলে সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্রের ভাষায়—

'৬০/৬১ সালে পিতা যখন জাহানাবাদে মুন্‌সেফ, বঙ্কিম বাবুর মেজদাদা সঞ্জীবচন্দ্র, তখন জাহানাবাদে সব রেজিষ্ট্রার হইয়া গেলেন। সেই অবধি তাঁহাদের দুইজনে বন্ধুত্ব হয়। বঙ্কিম বাবু বহরমপুরে যাইতেছেন, বলিয়া সঞ্জীব বাবু পিতাকে পত্র লেখেন, আমাদের বাসায় উঠিবেন বলিয়া জানাইয়া রাখেন এবঙ কাছারির নিকট বঙ্কিম বাবুর জন্য একটি বাড়ী ভাড়া করিবার জন্য অনুরোধ করেন। আমি অবশ্য পাঁচটা বাড়ী দেখিয়া শুনিয়া, একটি বাড়ী ঠিক করিয়া ঝাড়াইয়া ঝুড়াইয়া রাখিলাম ; জল তুলাইয়া রাখিলাম ; একটি ঠিকা চাকরও রাখিয়া দিলাম। ..যথাকালে বঙ্কিমবাবু আসিলেন, আহারাদি করিলেন, ..আহারের পর বিশ্রাম করিলেন ; বিশ্রামের পর বৈকালে আমরা পিতাপুত্রে গাড়ী করিয়া তাঁহাকে তাঁহার বাড়ী দেখাইতে লইয়া গেলাম। বাড়ী দেখিলেন, পছন্দ করিলেন, ..বঙ্কিম বাবু সে রাত্রি আমাদের বাসাতেই যাপন করিলেন। পরদিন প্রাতে তাঁহার জিনিষপত্র চাকর ব্রাহ্মণ লইয়া, গাড়ী করিয়া তিনি নিজ বাসায় গেলেন।'

উপরের শেষ বাক্যের সূত্রে আর একটি তথ্য এখন জানিয়ে রাখলে বর্তমান রচনার শেষে একটি ভিন্ন আলোচনা করা সুবিধা হতে পারে। একই রচনায় (১৩১১ শনে) 'পঞ্চাশ বত্‌সর পূর্বের' (১২৬১ শনের) কথায় অক্ষয়চন্দ্র লিখেছেন—'তখন ভাল চাকর, অল্প বেতনে যথেষ্ট পাওয়া যাইত। পাচক ব্রাহ্মণ অল্প বা অধিক বেতনে, একেবারেই পাওয়া যাইত না। কৃষ্ণনগরের বা বর্ধমানের রাজবাড়ীতে বেতনভুক্‌ পাচক ছিল না, এমন কথা বলিতেছি না, বা বাঙ্গালার কোনো বড় মানুষের বাড়ীতে বেতনভুক্‌ পাচক ছিল না, তাহাও বলিতেছি না, তবে সাধারণত যে বড় বড় উকীল, মোক্তার বা হাকিমের বাসায় যেরূপ ঘটিত তাহাই বলিতেছি। আসল কথা ভদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান বেতন লইয়া পাচকতা করা অত্যন্ত হীনবৃত্তি মনে করিতেন। সুতরাঙ সে বৃত্তি সহজেই গ্রহণ করিতেন না।'

অক্ষয়চন্দ্র রেখেছিলেন ঠিকে চাকর। বঙ্কিমচন্দ্র নতুন কর্মস্থলে সঙ্গে নিয়ে গেলেন পুরো সময়ের চাকর। এবঙ, তখন ব্যয়সাধ্য, পাচক ব্রাহ্মণ।

গঙ্গাচরণ-অক্ষয়চন্দ্র চুঁচুড়ার লোক। তাঁদের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বপরিচয় ছিল না। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে যখন বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকদিন বসিরহাটে চাকরি করেন, তখন সেখানে মুন্সেফ চুঁচুড়ার ব্রজেন্দ্রকুমার শীলের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়। ব্রজেন্দ্রকুমার হুগলি কলেজে বঙ্কিমচন্দ্রের ছোট ভাই পূর্ণচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন। তিনি বসিরহাটে বঙ্কিমচন্দ্রের বড় দাদা ডেপুটি শ্যামাচরণের সহকর্মী ও স্নেহভাজন ছিলেন। সেই সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ। বন্ধুত্ব আমৃত্যু ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকদিন পরে ব্রজেন্দ্রকুমার শীল বহরমপুরে বদলি হন, এবঙ প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রের বাসায় ওঠেন।

তাঁর অপ্রকাশিত আত্মজীবনীতে আছে--

On arriving at Berhampore I went to see the house of Babu Bankim Chandra Chatterjee whom I used to call dada brother. Bankim Babu wished me to occupy his house for three months as he would be on tour during that time. I did take a house viz. the house next to Bankim Babu's but went on occupying Bankim Babu's house...After the tour season was over Bankim Babu went to Gorabazar to the Burdwan Raja's house near Babu Ganapati Ghosal's. The said Ganapati was a pleader of the second grade practising in my court...I took a two storied house on the river side. The house belonged to Babu Pulin Behari Sen the uncle of Babu Ram Das Sen.

(pp. 146-7)

ব্রজেন্দ্রকুমার ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বহরমপুরে ছিলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আরও কথা লিখেছেন, কিন্তু তাঁর বাসাবদল সম্বন্ধে আর কিছু নয়। যে অক্ষয়চন্দ্র ঠিকে চাকর রেখেছিলেন, তিনি মধ্যবিত্তের থাকার মতো বাসা ভাড়া করেছিলেন। ভদ্রতার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে তা পছন্দ করতে হয়েছিল, কিন্তু পরে বিলাসী জীবনযাত্রার পক্ষে উপযুক্ত বড় বাসা ভাড়া করেছিলেন। অনুমেয়, বহরমপুরের দিনগুলি বঙ্কিমচন্দ্র এই বাড়িতে কাটিয়েছেন। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে আনুমানিক চার মাস আদালতের কাছাকাছি যে বাসা বঙ্কিমচন্দ্র ভাড়া করেছিলেন তাতে বাস করেছিলেন মাত্র কয়েকদিন,--একা। বর্ধমানরাজের বাসায় তিনি সপরিবারে প্রায় সাড়ে তিন বছর ছিলেন।

এই ঘটনার প্রায় ৫৫ বছর পর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বহরমপুরে যখন বঙ্কিমচন্দ্রের বাসগৃহকে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রক্ষা করার কথা বলেন, তখন--১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে--যে বাড়িকে নির্দেশ করা হয় তা ভাগীরথীর পুবপাড়ে সরকারি হাসপাতালের উত্তরে লরেটো হাউসের উত্তরে Strand Road-এর পুবদিকে একটি পশ্চিমমুখো বাড়ি, যার সামনে রাস্তার পশ্চিমে একটি সিঁড়িওয়ালা ঘাট, এবং তার দুদিকে দুটি শিবমন্দির ছিল। কিভাবে তথ্যসন্ধান হয়েছিল, তা অজানা। সিদ্ধান্ত অপ্রমাণিত।

১২৫ বছর আগে কোনো ব্যক্তি কোনো বাসায় ভাড়া থাকতেন কি না, উপযুক্ত দলিলের অভাবে তা প্রমাণিত হয় না। বহরমপুর থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক সংবাদপত্র 'গণকণ্ঠে'র ৩০.৫.১৮৭৩ তারিখের সংখ্যার সম্পাদকের প্রবন্ধে (প. ২-৩) স্থানীয় কোনো বৃদ্ধের সাক্ষ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বাসাবাড়ির নির্দেশ করা হয়েছে। আগে এদেশে বর্তমানের তুলনায় কম বয়সে লোকের বিয়ে ও সন্তানাদি হত। ২৫ বছরে এক প্রজন্ম হলে, ওই ঘটনার পর পাঁচটি প্রজন্ম কেটে গেছে। ব্যক্তির স্মৃতিতে তার রেশ থাকে না। বর্তমানে যাঁর বয়স ৮০ বছর, আলোচ্য ঘটনার সময় তাঁর ঠাকুরদা হামাগুড়ি দিতেন। স্মৃতিভ্রম ও উদ্দেশ্যমূলকতা অস্বীকার করলেও, বিশ্বাস করা কঠিন, যে কোনো বৃদ্ধ তাঁর প্রপিতামহের প্রতিবেশীর গৃহস্থালীর খবর জানেন। এমন সাক্ষ্য অগ্রাহ্য।

অথবা, এমন স্মৃতিচারণা মূল্যবান। কারণ, প্রসারিত করলে এভাবে সম্রাট বিক্রমাদিত্যের সভায় কালিদাসের নিয়োগপত্রের তারিখ, সম্রাট অশোকের গুরুমশায়ের নাম, বুদ্ধদেবের মামাবাড়ির ঠিকানা প্রভৃতি মিলতে পারে। ডাফিনের মামলার প্রসঙ্গে পরে দেখা যাবে, যে প্রায় ৫০ বছর আগে প্রায় ৯০ বছর বয়সের গণ্যমান্য বৃদ্ধের আত্মস্মৃতি কিভাবে তাঁকে প্রতারিত করেছিল।

সাধারণের চোখে এবঙ সরকারি মূল্যায়নে বঙ্কিমচন্দ্র চিরদিন সুনামের সঙ্গে চাকরি করেছেন। তাঁর দাপট ছিল। বিচারকার্যে তিনি সর্বদা নয়--কখনও শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি পেয়েছেন, বিশেষত শেষজীবনে। নিন্দিত হননি। রাজস্ব বিভাগে তাঁর কৃতিত্ব আগাগোড়া স্বীকৃত। বহরমপুরে যাওয়ার আগের বছর ১৮৬৯-৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে তাঁর বহরমপুর ত্যাগ, অর্থাত্ ১৮৭৩-৭৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বছর তাঁকে ওই বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদনে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ('special commendation') কর্মচারীর তালিকায় রাখা হয়েছে। এমন অবিচ্ছিন্ন কৃতিত্ব দুর্লভ ছিল। তিনি ঝুঁকলেন আইনের দিকে। বহরমপুর যাওয়ার পর ওকালতির সনদ নতুন করেননি। শাসনবিভাগ থেকে বিচারবিভাগে উন্নতির সম্ভাবনা বুঝেছিলেন। আগে কয়েকজনের বিভাগ বদলের আবেদন গ্রাহ্য হয়েছিল।

সরকারের সুদৃষ্টির আশায় বঙ্কিমচন্দ্র কাজে মন দিলেন,--বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ছুটি নিতেন না। ২৮.২.১৮৭০ তারিখে কলকাতায় বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভার অধিবেশনে পড়ার জন্য তাঁর আগে-জমা-দেওয়া প্রবন্ধ *A Popular Literature of Bengal* নির্বাচিত হয়েছিল। তিনি যাননি, প্রবন্ধটি অন্যে পড়েছিলেন। তিনি বিচারবিভাগে Subordinate Judge পদে নিয়োগ চেয়ে আবেদন করলেন। ইতিমধ্যে ১২ বছর চাকরি করেছেন। এক ধাপ পদোন্নতি প্রত্যাশিত ছিল। ২৩.৩.১৮৭০ তারিখের আদেশে তাঁকে জানানো হল, যে তিনি চাইলে মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হতে পারেন,--কোনো ব্যক্তিকে প্রথমে Subordinate Judge পদে নিয়োগ করা হয় না। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ব্যাহত হল। বিচারবিভাগে ঢোকার আশা ত্যাগ করলেন।

এই সময় কলকাতা থেকে 'কপালকুণ্ডলা'র দ্বিতীয় সঙস্করণ প্রকাশিত হয়। তা প্রথম সঙস্করণের পুনর্মুদ্রণ।

চাকরির কাজে বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিক আঘাতের দৃশ্যমান প্রতিফলন ঘটেনি। তিনি সুষ্ঠুভাবে কাজ করেছেন, এবঙ তার অবসরে নিয়মিত পড়াশুনা। বারুইপুর ও আলিপুরে থাকার সময় কলকাতা কাছে। ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ ছিল। বাড়িও বেশি দূরে নয়। বহরমপুর তখন অনেক দূরের পথ। বহরমপুর থেকে ১২ মাইল উত্তরে জিয়াগঞ্জ। সেখানে ভাগীরথী পেরিয়ে আজিমগঞ্জ। সেখান থেকে রেলগাড়িতে নলহাটি। সেখানে কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করে কলকাতার ট্রেন ধরা। রামদাস সেনের সঙগ্রহ ছাড়া ভালো লাইব্রেরি নেই। কলকাতায় পাবলিক লাইব্রেরি থেকে নিয়ে, এবঙ দোকান থেকে কিনে প্রচুর ইঙরেজি বই পড়তেন। এখানে অসুবিধা হতে থাকল। প্রধান অবলম্বন মাতামহের গ্রন্থসঙগ্রহ। ফলে বহরমপুর থেকে পড়াশুনার ঝোঁক অনেক বদলে গেল।

ইঙরেজি সাহিত্য ও ইতিহাসের বদলে বেদ ও ভারতীয় দর্শনের চর্চা আরম্ভ হল। সঙ্গে থাকল বহরমপুর থেকে চলে যাওয়ার চেষ্টা।

সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে সন্ধ্যার পরে বঙ্কিমচন্দ্র লেখাপড়ায় বসতেন। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত চলত। সাধারণে ফল দেখে,—আড়ালে-চলা সাধনা বোঝে না। বঙ্কিমচন্দ্র লোকপ্রিয় ছিলেন বটে, কিন্তু বাজে আড্ডা দিতেন না। প্রসঙ্গত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের একটি বক্তব্য উদ্ধারযোগ্য--'প্রতিভা দুই ভাবে বুঝা যায়,—(১) 'নবনবোম্মেষশালিনী বুদ্ধিঃ প্রতিভা উচ্যতে।' Inventive genius (২) আর এক কার্লাইলের মতে,— 'Indefatigable exertion in pursuit of an object'। আমি যত দূর জানি, তাহাতে বুঝি, এই দ্বিতীয় প্রকার প্রতিভাতেই বঙ্কিম বাবু আমাদের মধ্যে মহিমান্বিত হইয়াছেন।' তাঁর বাড়িতে অন্যের দেওয়া বাজে আড্ডা তাঁকে কখনও বিপদে ফেলেছে। নবীনচন্দ্র সেন ও অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সঙ্গে নৈহাটিতে ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে এই বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনা হয়। নবীনচন্দ্র 'আমার জীবন'-এ লিখেছেন—

'অক্ষয়বাবু বলিলেন--'চাটুজ্যেদের অহঙ্কার দেশে একটা প্রবাদের মত দাঁড়াইতেছে।' আমিও হাসিতে হাসিতে বর্ধমানে সঞ্জীব বাবুর সম্বন্ধে সে ধারণার কথা বলিলাম। বঙ্কিম বাবু বলিলেন--'নবীন! কথাটা ঠিক। এই অহঙ্কারটুকু না থাকিলে মরিয়া যাইতাম। দুইটা গল্প শুন। বহরমপুরে বদলি হইয়া গেলাম। একেত রোডসেস্ ইত্যাদি একরাশি কার্যের ভার কালেক্টর বেটা জিদ করিয়া 'বঙ্গদর্শন' ও আমার লেখা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে maliciously আমার ঘাড়ে চাপাইল। তাহাতে দর্শকের জ্বালায় অস্থির হইলাম। যে আসে সে যে হুকা লইয়া বসে, আর উঠে না। আমি দেখিলাম আমার লেখা পড়া বন্ধ হইল। তখন আমার গৃহদ্বারে এক নোটিস দিলাম যে কেহ আমার সাক্ষাত্ পাইবেন না। তাহার পর দিন সমস্ত বহরমপুর রাষ্ট্র হইল--'বটে! বেটার এমন দেমাক্! থাক্, তার বাড়ীর আশে পাশে কেহ যাইব না।' আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম।'

বহরমপুরে অনেকের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের আলাপ ও সখ্য হয়। বিখ্যাত ব্যক্তিদের অধিকাঙশ বহিরাগত। স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর প্রীতিপূর্ণ যোগাযোগ শেষ বয়সেও বজায় ছিল। সকলেই সাহিত্যিক বা খ্যাতনামা ছিলেন না। স্থানীয় খ্যাতিমানদের মধ্যে ছিলেন জমিদার ও ঐতিহাসিক রামদাস সেন, মহারানী স্বর্ণময়ীর দেওয়ান রাজীবলোচন রায়, খাগড়ার যুবক 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক' চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। তা ছাড়া ছিলেন ওখানে পড়াশুনার সূত্রে রাজশাহি থেকে আসা, চন্দ্রশেখরের বন্ধু ও 'জ্ঞানাঙ্কুরে'র সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ দাস। বহিরাগতদের মধ্যে উপরে-বলা গঙ্গাচরণ--অক্ষয়চন্দ্রের সখ্য স্থায়ী হয়েছিল। বহরমপুরে গঙ্গাচরণ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয়ের পরে মাত্র কয়েক মাস, এবঙ অক্ষয়চন্দ্র ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। Subordinate Judge দিগম্বর বিশ্বাস (১৮২৩-১৮৭৭) আগে থেকে বহরমপুরে ছিলেন। এখানে তাঁদের ১১ মাসের পরিচয় দীর্ঘকালের পারিবারিক সখ্য গড়ে দিয়েছিল।

তাঁর ছেলে ঔপন্যাসিক তারকনাথ বিশ্বাস (১৮৫৮-১৯৩৭) আমৃত্যু সে সুখস্মৃতি লালন করেছিলেন। তখন বহরমপুরবাসী পন্ডিত, দাতা, অধ্যাপক প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর (১৮২৫-১৮৮৬) সঙ্গে পরিচয় ছিল সশ্রদ্ধ, এবং পরে পরিবারে ব্যাপ্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহভাজন সুরেশপ্রসাদের বাল্যস্মৃতি এবং বন্ধু রাজকুমারের উচ্ছ্বাসে তা পরে ধরা পড়েছে। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বহরমপুরে যান ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে, কলকাতায় ফেরেন ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে। তাঁদের পারস্পরিক শ্রদ্ধা অতুল। মাঝখানে তাঁর ছুটির সময় ১৮৭১ জানুয়ারি-জুন তাঁর পদে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় অস্থায়ীভাবে কাজ করেন। এখানে প্রথম পরিচয় ছ মাসের। তা এত গভীর বন্ধুত্বের সৃষ্টি করেছিল যে পরে কলকাতায় তাঁদের দীর্ঘ সহাবস্থান, গ্রন্থ উত্‌সর্গ, পারিবারিক প্রীতিবিস্তার, এমনকি বৈবাহিক সম্পর্কসৃষ্টি পর্যন্ত গড়িয়েছিল। বহরমপুরে কর্মরত দুজন সংস্কৃত পন্ডিত কৃষ্ণনগরের লোহারাম শিরোরত্ন ও চুঁচুড়ার রামগতি ন্যায়রত্নের সঙ্গে প্রথম পরিচয় এখানে। উভয়ত্র এই প্রীতি শেষজীবন পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। খ্যাতিমান, দেশসেবী উকিল বৈকুণ্ঠনাথ সেন নিজের জেলা বর্ধমান থেকে বহরমপুরে কাটিয়েছেন বেশি বছর। বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে তাঁর গাঢ় শ্রদ্ধা-প্রীতির ছাপ ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরে বহরমপুরে শোকসভায় তাঁর ভাষণে। মুন্সেফ ব্রজেন্দ্রকুমারের কথা উপরে আছে। বন্ধু ডেপুটি তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রীতিভাজন এডিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট রমেশচন্দ্র দত্ত অদূরে জঙ্গিপুরে কর্মরত। মুন্সেফ নফরচন্দ্র ভট্টের সঙ্গে একটি তর্কের ফলে বন্ধুত্বের অবসান হয়ে লেখালেখি পর্যন্ত গড়িয়েছিল। আলোচনায় পরে ঠিক হয়ে যায়। একটি গ্রন্থসমালোচনা নিয়ে রামগতি ন্যায়রত্নের সঙ্গে একবার ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। পরে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় তার অবসান হয়।[১] ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও দীনবন্ধু মিত্র যথাক্রমে বিদ্যালয় ও ডাকঘর পরিদর্শন করতে বহরমপুরে যেতেন। তাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ব্যতিক্রম কেবল রেভারেন্ড লালবিহারী দে। বাড়ি ফেরার পথে নলহাটি স্টেশনে কয়েক ঘণ্টা পাশাপাশি কাটাবার সময় একবার বঙ্কিমচন্দ্র অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করেন। ক্রমশ তা থেকে প্রীতি। অন্য সময় অনুরূপ অবস্থায় লালবিহারী চেষ্টা করেও বিশেষ আলাপ করতে পারেননি। অথচ দুজনে এক প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল মার্জিত বিরূপতা, লালবিহারীর ঈর্ষা।

তাঁর নতুন বন্ধুদের সঙ্গে সংস্কৃতিচর্চায় বঙ্কিমচন্দ্রের আগ্রহ ছিল। দিগম্বর বিশ্বাসের জীবনচরিতে অম্বিকাচরণ গুপ্ত লিখেছেন—'বহরমপুরের Grant Hall দিগম্বরের অক্ষয়কীর্তি। তিনি বহু চেষ্টায় বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া সাধারণের জন্য উহা ক্রয় করেন। তাহার পর তাহার সংস্কার কার্যেও বহু অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল। প্রতি রবিবারে সেখানে গণ্যমান্য লোকের সমাবেশ হইত এবং সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ের চর্চা হইত। দিগম্বর সেই সকল সভা-সমিতির প্রেসিডেন্ট এবং স্বনামখ্যাত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন।' সংবাদপত্রে এই সমিতির প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়।

'গত মঙ্গলবার রাত্রি ৭টার পরে বহরমপুরে গ্রান্ট্‌স হলে সাধারণের উন্নতির জন্য

একটী সভা হইয়াছিল। সেই দিবসই ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। ইহাতে অত্রত্য অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, ইহারা সকলে এঁকৈক্য হইয়া স্থির করিয়াছেন প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় সোমবার এই সভার অধিবেশন হইবে। এই সভা ধর্মকার্য ব্যতীত সকল কার্যেরই উন্নতির জন্য হস্তক্ষেপ করিবে। সভা হইতে প্রতি মাসে একখানি করিয়া 'প্যামফেলেট' বাহির হইবে। সকল একত্রিত হইয়া অত্রস্থ সাবরডিনেট জজ শ্রীযুক্ত দিগম্বর বিশ্বাস মহাশয়কে সভার প্রেসিডেন্ট পদ অর্পণ করিলেন। এবঙ অত্রস্থ ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ মহাশয়ের প্রতি ভাইস প্রেসিডেন্ট পদ অর্পিত হইল। বহরমপুর কালেজের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত রেভারেন্ড লালবিহারী দে মহাশয়কে সেক্রেটারীর কার্যের ভার অর্পণ করিয়া সভা ভঙ্গ হইল। আমরা এক্ষণে একাগ্রচিত্তে ঈশ্বর সন্নিধানে নব সভার দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করিতেছি।'

ঢাকা প্রকাশ : ৫.১.১২৭৭ রবিবার

১২৭৬ শনের চৈত্র সঙক্রান্তিতে (মধ্য-এপ্রিল ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে) প্রতিষ্ঠিত সমিতিটি সম্বন্ধে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বলেছেন--'বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি জ্ঞানচর্চার জন্য বহরমপুরে একটি সমিতিও সঙস্থাপিত করেন। সে সমিতিতে সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি প্রবন্ধ পাঠ করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'রত্নাবলী' নাটক সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। লালবিহারী বাবু বঙ্কিম বাবুকে বিদ্রূপ করেন, বঙ্কিম বাবুও জবাব দেন। উভয়ের বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। চন্দ্রশেখর বাবু সে সমিতিতে প্রবন্ধ শুনিতে যাইতেন। সভা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই।'

এই প্রসঙ্গে বৈকুণ্ঠনাথ সেন বলেছেন--'বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধে বাকলের সভ্যতার ইতিহাস হইতে একাঙশ উদ্ধৃত করেন। লালবিহারী বাবু বিদ্রূপ করিয়া বলেন, তিনি বাকলের কথা আপনার বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।' তা ছাড়া, বঙ্কিমচন্দ্রের ইঙরেজি পড়ায় স্বরের উত্থান-পতন শোনা যেত। লালবিহারী সাধারণের কাছে তার ব্যঙ্গ-অনুকরণ করতেন।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতিচারণায় বলেছেন--'*Bengal Peasant Life*-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ লালবিহারী দে এই সময়ে (১৮৭০-৭১) বহরমপুর কলেজে ইঙরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। Grant Hall Club নামক নব-প্রতিষ্ঠিত সভার তিনি সম্পাদক ও প্রধান কর্মী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র উঁহার সহকারী সভাপতি এবঙ তত্‌কালীন সবজজ দিগম্বর বিশ্বাস উঁহার সভাপতি ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সভায় Indian Civilisation সম্বন্ধে, সার গুরুদাস *Abused India Vindicated* সম্বন্ধে এবঙ [উকিল মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়] মতিবাবু *Polygamy* সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধের একস্থলে সার গুরুদাস লিখিয়াছিলেন, 'If the tailor be the high-priest of the regeneration ceremony of India, far be such regeneration for me and my countrymen.' দিগম্বর বিশ্বাস বদলি হইয়া গেলে, সার গুরুদাস প্রস্তাব করেন যে, সহকারী সভাপতি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার স্থলে সভাপতি হউন। ইহাতে

লালবিহারী অত্যন্ত বিরক্ত হন। তাঁহার ধারণা ছিল যে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষা ঢের ভাল ইঙরাজী জানেন এবঙ প্রেসিডেন্ট পদে তাঁহার পূর্ণমাত্রায় অধিকার। লালবিহারীর মনোভাব বঙ্কিম বুঝিলেন। সার গুরুদাস বঙ্কিমকে সভাপতি করিবাব প্রস্তাব করিলে, বঙ্কিম তাঁহাকে বলেন, 'করলেন কি?' ইহার পরে লালবিহারী ক্লাবে আসা বন্ধ করিলে উহা উঠিয়া যায়। অল্পদিন পরে লালবিহারী হুগলি কলেজে বদলি হন।'

গুরুদাসের প্রবন্ধ তাঁর *Reminiscences, Speeches and Writings* গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে আছে। ১৯.৯.১৮৭০ তারিখে পড়া রামদাস সেনের প্রবন্ধ *A Lecture on Modern Buddhist Researches* দুবার ১৬.৬.১৮৭১ ও ১৭.১.১৮৭৪ তারিখে কলকাতায় মুদ্রিত ও বিনামূল্যে প্রচারিত। তাঁর গ্রন্থাবলির তৃতীয় খন্ডে পুনর্মুদ্রিত এই প্রবন্ধের সামান্য পরিবর্তিত বাঙলা অনুবাদ 'ঐতিহাসিক রহস্য', দ্বিতীয় খন্ডের (১৮৭৬) 'বৌদ্ধধর্ম' প্রবন্ধে আছে। সমিতির প্রস্তাবিত প্যামফ্লেট বোধ হয় কখনও প্রকাশিত হয়নি, --কোনো কোনো লেখক প্রবন্ধ লিখে প্রকাশ করতেন। বিমলচন্দ্র সিঙহ সম্পাদিত 'বঙ্কিম কণিকা' (১৩৪৮) গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের *The most important and the first idea of the uncivilised Hindu* প্রবন্ধটি এই প্রতিষ্ঠানের পড়া কোনো রচনা নয়,--তা 'বঙ্গবাসী' সঙবাদপত্রে প্রকাশিত একটি বাঙলা প্রবন্ধের ইঙরেজি অনুবাদ। বোধ হয় সমিতির নাম ঠিক হয়নি। রামদাস একে Berhampur Literary Society এবঙ গুরুদাস Grant Hall Club বলেন। ইঙরেজি প্রবন্ধ পড়া হত।

দিগম্বর বিশ্বাস ১০.১২.১৮৭০ তারিখ পর্যন্ত বহরমপুরে ছিলেন। আনুমানিক মধ্য-ডিসেম্বরে বঙ্কিমচন্দ্র সভাপতি হন। লালবিহারী স্কুলের চাকরি নিয়ে বহরমপুরে যান ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে, কলেজে চাকরি পান ৮.৭.১৮৭১ তারিখে এবঙ হুগলিতে বদলি হন ১২.১.১৮৭২ তারিখে। অনুমেয় ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের প্রথমার্ধে ক্লাবের কাজ অনিয়মিত ও শেষার্ধে বন্ধ হয়। তার আয়ু ছিল এক বছরের মতো।

'মৃণালিনী' উপন্যাস লেখার পর থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ লেখার ঝোঁক বেড়ে গেল,--বিষয় দেশি, ভাষা বিদেশি। বাঙলা সাহিত্যচর্চা এবঙ নতুন উদ্যমে সঙস্কৃতচর্চা এমন বিষয় নির্বাচনের কারণ। উপযুক্ত বাঙলা সাময়িকপত্রের অভাব ইঙরেজিতে লেখার কারণ। পরে বাঙলা প্রকাশমাধ্যম পেলে তিনি ইঙরেজি ছেড়েছেন। পরে *Calcutta Review, Transactions of Bengal Social Science Association, Journal of the Asiatic Society, Concord, National Magazine* প্রভৃতি কোনো কাগজে লেখেননি। *Mookerjee's Magazine*-এ দুটি ছোট রচনা লেখেন--স্বেচ্ছায় নয়, উপরোধে। 'মিত্রপ্রকাশ' বা 'অবোধবন্ধু' তখনকার তুলনায় ভালো কাগজ হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনা প্রকাশের পক্ষে তাদের মান (standard) নিচু ছিল। তাই ১২৭৭ শন থেকে তিনি বাঙলা সাময়িকপত্রে আগ্রহী হয়ে ওঠেন, যার প্রধান উপজীব্য ভালো প্রবন্ধ। ১২৭৭-এ নতুন কর্মস্থলে সুবিধা হল না বটে, কিন্তু বহরমপুরের সাহিত্য সমিতি ধরে লেখক তৈরির কাজে মন দিলেন। ১২৭৮-এ কর্মব্যস্ত থাকায়, 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের জন্য

তাঁকে ১২৭৯ শন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

Chaitanya's Ethics (১৮৮৪) গ্রন্থে যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের বক্তব্য থেকে জানা যায়, যে তখন Calcutta Review পত্রে প্রকাশের জন্য রচনা নির্বাচিত হওয়ার পরেও দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হত। সমস্ত পূর্ব ও উত্তর ভারতে তখন আভিজাত্য ও গুরুত্বে এই ত্রৈমাসিক পত্রটি সেরা। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে ১০৪ সংখ্যক পত্রে ৩.৪ ১৮৭১ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্রের দীর্ঘ বেনামি রচনা *Bengali Literature* প্রকাশিত হয়। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ছুটিতে এটি লেখার পরিকল্পনা করেন, এবঙ পরের বছর প্রথমার্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখে পাঠান। এই বিষয়ে লেখায় তিনি পথপ্রদর্শক।

'কলকাতা রিভিউ' পত্রে পূর্বপ্রকাশিত কিছু প্রবন্ধের সঙকলন কয়েক খণ্ডে *Selections from Calcutta Review* নামে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। তখন এদেশে সাময়িকপত্র হিশাবে এর অতিরিক্ত গুরুত্ব পাওয়ার একটি পরোক্ষ কারণ হল ইঙল্যান্ড থেকে ইঙরেজি সাময়িকপত্র জাহাজে আফ্রিকা ঘুরে এদেশে আসতে প্রায় তিন মাস লাগত। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের পরে সুয়েজ খাল দিয়ে এক মাসের মধ্যে তারা ভারতের মাটিতে পৌঁছে যাওয়ায় বিলিতি সাময়িকপত্রগুলি নতুনত্ব না হারিয়ে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে। 'কলকাতা রিভিউ' পিছু হঠার মুখে *Selections* (New Series) নাম দিয়ে ১০০টি নির্বাচিত প্রবন্ধের তালিকা গ্রাহকদের জন্য প্রকাশ করে। তার মুদ্রাকর ও প্রকাশক বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের সিটি প্রেস এই মর্মে বিজ্ঞাপন প্রচার করে। এই বিজ্ঞাপন ছাড়াও অনেকে জানতেন, যে প্রবন্ধকারের নাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। যেমন--হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। প্রবন্ধগুলি কালানুক্রমে সাজানো হত। সমাদরের অভাবে দ্বিতীয় *Selections* প্রকাশ অসমাপ্ত থাকে। তাব চতুর্থ সংখ্যায় (প্রকাশকাল ৩.৫.১৮৯৪) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার কথা, কিন্তু তা হয়নি। অন্যান্য রচনা সঙ্কলিত হয়েছিল। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্রের আপত্তি। বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় খণ্ডের (২৫.৫.১৮৯২) 'বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন--'অনেকে পরামর্শ দেন যে, বঙ্গাদর্শন পুনর্মুদ্রিত কর। কিন্তু বঙ্গাদর্শনের আমি একমাত্র লেখক ছিলাম না। অন্যের রচনা আমি কি প্রকারে পুনর্মুদ্রিত করিব?' এই যুক্তি তাঁর আপত্তির কারণ।

আপত্তি করায়, তাঁর স্বাক্ষরে রচনাটি পুনর্মুদ্রিত হয়নি, কিন্তু তাঁর বন্ধুরা তথ্যটি জানতেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু জগদীশনাথ রায় তখন বালেশ্বর জেলা পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট John Beames তখন *A Comparative Grammar of Modern Aryan Languages of India* (১৮৭১) গ্রন্থে প্রতি ভাষা ও সাহিত্যের সঙক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখছেন। বাঙলার প্রসঙ্গে জগদীশনাথের সাহায্য এবঙ এই প্রবন্ধের ঋণ স্বীকার করা হয়েছে। বিমসের গ্রন্থে প্রবন্ধটির সঙক্ষিপ্তসার আছে। এই ঘটনা বিমস ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে দীর্ঘজীবী শ্রদ্ধার জন্ম দেয়। তার কয়েকটি ফলাফল উল্লেখযোগ্য। প্রথম, বিমসের ইঙরেজি রচনার জগদীশনাথকৃত অনুবাদ 'বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ। অনুষ্ঠান পত্র' নামে বঙ্গাদর্শন পত্রে ১২৭৯ আষাঢ় সংখ্যায় (১৬.৬.১৮৭২)

তারিখে প্রকাশিত হয়। বাঙলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার পক্ষে লেখা এই রচনার শেষে বঙ্কিমচন্দ্রের সহানুভূতিশীল বক্তব্য ছাপা হয়। দ্বিতীয়, হাওড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে একটি মামলা নিয়ে যখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বাকল্যান্ড সাহেবের বিবাদ হয়, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃত সহায় ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার বিমস। (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কেরানি-জীবনীকার শচীশচন্দ্র-লিখিত কাহিনী অবিশ্বাস করেন। অথচ হাওড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের সহকর্মী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, যে ঘটনাটি সত্য।)

একাডেমি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তখন শিক্ষিত বাঙ্গালিরা একমত ছিলেন না। মনোমোহন বসু প্রস্তাবের বিপক্ষতা করেছিলেন। (মধ্যস্থ : ৩০.৫.১২৭৯)। রাজনারায়ণ বসু সভায় বক্তৃতা করে মতপার্থক্য জানান। (National Paper : 14.8.1872) বিরোধিতা না থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্রের মতপার্থক্য ছিল। তিনি লিখেছেন--'বালেশ্বরের ক্যানাল কোম্পানির ন্যায় খাল কাটিয়া বাঙ্গালা ভাষার জল পল্‌তার ঘাটের ফিল্‌টরের ন্যায় ছাঁকনি দিয়া পরিষ্কার করিয়া বেশ আস্তে আস্তে খালের ভিতর দিয়া এক দিকে লইয়া যায়। (জিজ্ঞাসা করি, কোন দিকে?)' ('বাঙ্গালা ভাষা', বঙ্গদর্শন : অগ্রহায়ণ ১২৭৯।)

Bengali Literature বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম প্রবন্ধ নয়। এর আগে 'কলকাতা রিভিউ' পত্রে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের (জানুয়ারিতে প্রকাশিত) ৯৯ সঙ্খ্যায় প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' উপন্যাসের বিস্তৃত সমালোচনা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর প্রবন্ধ দ্বিতীয় রচনা। তার পরে Calcutta Review, 1871, no. 106 (৭.১০.১৮৭১ তারিখে প্রকাশিত) সঙ্খ্যায় তাঁর বেনামি প্রবন্ধ *Buddhism and the Sankhya Philosophy* প্রকাশিত হয়। 'বিবিধ প্রবন্ধে' গ্রন্থিত 'সাঙখ্য দর্শন' প্রবন্ধের প্রথম পরিচ্ছেদের তৃতীয় অনুচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র এই কথা লিখেছেন।

ইঙরেজি প্রবন্ধ লেখা চলছে, সঙ্গে চাকরির দায়িত্ব পালন। যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে তা করছিলেন। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে খবরের কাগজ কথা ছড়াল, যে সরকার কয়েকজন দক্ষ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে পরবর্তী উচ্চতর চাকরিতে পদোন্নতি দেবেন। কয়েকজনের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম ছিল। তবে এটি গুজব। বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিক প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল, জানা নেই।

১৮৭০ সালের ১৬ নম্বর বা ভারতীয় আয়কর আইন অনুসারে ১১.৭.১৮৭০ তারিখে তাঁকে জেলা কালেক্টরের ক্ষমতা দেওয়া হয়। তখন এই আইন প্রতি বছর এক বছরের জন্য চালু করা হত। কালানুক্রমে পৃথিবীতে ইঙল্যান্ডের পরে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় দেশ যেখানে আয়কর চালু হয়েছিল। এখানে জেলা কালেক্টরের ক্ষমতার অর্থ জেলা সদরে 'assessor of income tax'-এর কর্মভার। তিনি লিখেছেন, 'ইনকাম ট্যাক্স ইঙরাজের কলঙ্ক'। ব্যক্তিগতভাবে তার বিরোধী, অথচ চাকরিতে তাঁর দায়িত্ব পালন করছেন।

কখনও সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি হতে দেরি হয়। পরে জারি হওয়ার আশায় আগে

কাজ শুরু হয়। এখানে তা হয়েছিল। রামলালবাবুর অভিযোগসঙক্রান্ত একটি অভিযোগ ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে দরখাস্ত জমা পড়ে, কারণ তিনি বিভাগীয় অফিসার। অনুসন্ধানে শেষপর্যন্ত জানা যায়, যে এতে বঙ্কিমচন্দ্রের দোষ ছিল না, কারণ তিনি assessor রামলালবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগের সম্পূর্ণ তথ্য আগেই কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন। ১৪.৬.১৮৭০ তারিখে স্থানীয় পত্র 'মাধুকরী' লিখেছে, যে রামলালবাবুর সম্বন্ধে ম্যাজিস্ট্রেটের নীরবতা সন্দেহজনক, এবঙ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কিছু জানানোর দরকার নেই। অনেক বাঙালি মিলে বঙ্কিমবাবুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিষয়টি অনুসন্ধানের জন্য Sir Mordant Wells-এর কাছে স্মারকপত্র জমা দিয়েছেন। ১৬.৮.১৮৭০ তারিখে 'মাধুকরী' জানায়, যে assessment-সঙ্ক্রান্ত কাজের জন্য জেলার লোকেরা বঙ্কিমচন্দ্রের উপর খুব সন্তুষ্ট।

২৫.১১.১৮৭০ তারিখে দ্বিতীয় শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্রের পদোন্নতি হল। মাইনে মাসিক ৬০০ টাকা। তাঁর পরে চাকরিতে-ঢোকা রাসবিহারী বসুর নিচে তাঁর নাম থাকায়, বঙ্কিমচন্দ্র প্রবীণত্বের জন্য প্রতিবাদ জানালেন। ১৪.১২.১৮৭০ তারিখে উত্তর পেলেন, যে তালিকা ঠিক, কারণ রাসবিহারীর পদোন্নতি তাঁর আগে হয়।

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮টি ফৌজদারি মামলার নিষ্পত্তি করেন। ১২টি মামলায় অভিযুক্তেরা শাস্তি পায়, ৬টি মামলায় খালাস। সরকার অসন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু তাঁর সামগ্রিক কাজের বিচার অন্যরকম। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের কাজের মূল্যায়নে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর সম্বন্ধে গোপন রিপোর্টে লিখলেন—'Is however decidedly the ablest officer. I have much pleasure in recording the high opinion I entertain of his abilities'। বিভাগীয় কমিশনার E. V. Molony লিখলেন—'Is a good officer and very favourably reported by the Magistrate'।

বহরমপুরে সাবর্ডিনেট জজ দিগম্বর বিশ্বাস দক্ষ কর্মচারী, সাধু ও লোকপ্রিয় ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম বহরমপুরে এগারো মাসের পরিচয় দুজনের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন, এবঙ দুটি পরিবারের মধ্যে যে প্রীতিসম্পর্ক গড়ে তোলে তা দীর্ঘকাল বজায় ছিল। দিগম্বর যখন বর্ধমানে, তখন সঞ্জীবচন্দ্র বর্ধমানে সাব-রেজিস্ট্রার। তখন দু ভাই প্রায় দিগম্বরের বাড়ি যেতেন। কাঁটালপাড়ায় পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে দিগম্বর এলে যাদবচন্দ্র তাঁর সঙ্গে ছেলের মতো ব্যবহার করতেন। দিগম্বরের ছেলেরা—অমৃতলাল, তারকনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহভাজন ছিলেন। দিগম্বরের মৃত্যুর পর একবার (তাঁদের বাড়ি) হুগলিতে জমিদারের সঙ্গে মারামারির মামলায় অমৃতলালকে মুক্ত করতে বঙ্কিমচন্দ্র সাহায্য করেছিলেন। তেমনি বন্ধুপুত্র তারকনাথের চাকরি পাওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের সাহায্য ছিল। তারকনাথ আমৃত্যু বঙ্কিম-স্মৃতি লালন করেছিলেন।

এক ছেলের মৃত্যুতে শোকাহত দিগম্বর বিশ্বাস স্বেচ্ছায় বহরমপুর ছেড়ে বর্ধমানে বদলি হন। বঙ্কিমচন্দ্রের আগ্রহে ২২.১১.১৮৭০ তারিখে তাঁর বাসায় সন্ধ্যায় মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বৈকুণ্ঠনাথ নাগ ও শ্যামাচরণ ভট্ট মিলিত হন,

এবঙ তাঁরা পাঁচজন মিলে বিদায়-সম্বর্ধনার কমিটি তৈরি করেন। চাঁদা তোলা হয়। ২৮.১১.১৮৭০ তারিখে সৈদাবাদে প্রেমনাথ চৌধুরির বৈঠকখানা ও বিস্তৃত প্রাঙ্গণে রাত্রে কয়েক শ লোকের সমাবেশে মহাসমারোহে দিগম্বরের বিদায়-সভা হয়। অন্যান্য উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন রাজীবলোচন রায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুচরণ দাস, গঙ্গাদাস রায়, দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। (দ্রষ্টব্য—সোমপ্রকাশ, ১৪.৮.১৮৭৭ : Hindoo Patriot, 28.11.1870) ১১.১২.১৮৭০ তারিখে দিগম্বর কার্যভার বুঝিয়ে দিয়ে নতুন কর্মস্থলের দিকে রওনা হলেন।

১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের কর্মভার বাড়তে শুরু করল। গত বছরের মতো এবারও মাসিকপত্র প্রকাশ কল্পনাতে রইল। ২০.২.১৮৭১ তারিখের আদেশে বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে রামদাস সেন, নফরচন্দ্র ভট্ট প্রমুখের সঙ্গে Local Committee of Public Instruction-এর সদস্য হলেন। স্থানীয় বিদ্যালয়গুলি পরিচালনার আঙশিক দায়িত্ব ঘাড়ে পড়ল। এই অভিজ্ঞতার পরিচয় তাঁর বাঙলা প্রবন্ধে আছে, যেখানে এদেশে সরকারি শিক্ষানীতিতে বিখ্যাত Adam's Report-এর filtration theory মেনে নেওয়ার বিপক্ষে তিনি মন্তব্য করেন।

বহরমপুরে রাজশাহি বিভাগের কমিশনারের Personal Assistant গোবিন্দমোহন ঘোষ ছুটি চাইলেন। অস্থায়ীভাবে বঙ্কিমচন্দ্রকে সেই পদে নিয়োগ করা হল। ২৪.৪.১৮৭১ তারিখ বিকালে তিনি নতুন কার্যভার নেন। ইতিমধ্যে তিনি এক মাস ছুটির জন্য দরখাস্ত করেছিলেন। ১.৫.১৮৭১ তারিখে তাঁর আবেদন 'with effect from the date on which he may be relieved' মঞ্জুর হয়। কমিশনার E. V. Molony তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন। ভবিষ্যতের সাময়িকপত্রের কথায় মনে হল—এবার প্রকাশ করতে হবে, ছুটি দরকার। তাছাড়া উপন্যাসটা শেষ করা দরকার। ১০.৮.১৮৭১ তারিখে ওই ছুটি 'is cancelled at his own request' হল। ২৮.৫.১৮৭১ তারিখে তিনি নিজ পদে ফিরে এলেন।

১০.৬.১৮৭১ তারিখে তাঁকে ১৮৭১ সালের ১২ নম্বর আইনের section 1, para 3 অনুসারে বহরমপুরে কালেক্টরের ক্ষমতা দেওয়া হয়। এটি ১.৪.১৮৭১ থেকে ৩১.৩.১৮৭২ পর্যন্ত ভারতীয় আয়কর আইন। তার দায়িত্ব আগের মতো। গত বছরের কৃতিত্বের ফল পরের বছরের অনাকাঙ্ক্ষিত দায়িত্ব।

এত কর্মভারে ১২৭৮ শালেও সাময়িকপত্র শুরু হল না। লেখাপড়ার ব্যাঘাত হচ্ছে। বহরমপুরে লোকপ্রিয়, কর্মস্থলে খ্যাতি, এবঙ শহরে যশস্বী বন্ধু। তবু বহরমপুর ছেড়ে যেতে চাইছেন। ইতিমধ্যে Inspector of Registration-এর পদ খালি হল। পদ সমমর্যাদার। শুবিধা এই, যে কাজে নানা ঝামেলা নেই, এবঙ বহরমপুর ছাড়া সম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র ওই পদে নিযুক্তি চেয়ে ১১ আগস্ট আবেদন করলেন, কিন্তু কলকাতায় গিয়ে তদ্‌বির করতে পারলেন না। ২২.৮.১৮৭১ তারিখে উত্তর পেলেন, যে ওই পদে অন্য

ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়েছে।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দেখলেন, যে বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুর ছেড়ে যেতে চাইছেন। প্রথমে ওকালতি করার ইচ্ছা, পরে বিচারবিভাগে ঢোকার চেষ্টা, শেষে রেজিস্ট্রেশন, বিভাগে আবেদন। হাতে এত দক্ষ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আর নেই। বঙ্কিমচন্দ্র সাহেবের সঙ্গে খাতির রাখেন না ; তবু তাঁকে দরকার। কমিশনার এক মতের। Revenue work-এ তখন বঙ্কিমচন্দ্র দক্ষতম। এই সময় District Road Cess Act X of 1871 পাশ হয়েছে। সরকারি কর্মচারীদের উপর নতুন দায়িত্ব আরোপ সাধারণত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সুপারিশ ও বিভাগীয় কমিশনারের অনুমোদনে করা হত। আইনটি বাঙলার বিভিন্ন জেলায় ক্রমশ চালু করা হয়েছিল। ১৫.৮.১৮৭১ তারিখে মুর্শিদাবাদ জেলায় নতুন আইন কার্যকর করা হয়। জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে পরামর্শ করে ৯.৯.১৮৭১ তারিখে বিভাগীয় কমিশনার E. V. Molony সরকারকে জানালেন, যে পুরো জেলায় নতুন কাজটির দায়িত্ব নেওয়ার পক্ষে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্র। ১০.১০.১৮৭১ তারিখে তাঁকে ওই আইনের ধারাবলে কালেক্টরের ক্ষমতা দেওয়া হয়। নভেম্বরের প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র নতুন দায়িত্ব নেন।

ইতিমধ্যে সেপ্টেম্বরের প্রথমে মুর্শিদাবাদ জেলায় বন্যা হয়েছে। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের শেষে ঝড় ও বন্যায় যখন দক্ষিণবঙ্গ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন চব্বিশ পরগনা জেলায় ত্রাণের কাজে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব সরকার ভোলেননি। তার দু বছর পরে Salary Commission-এর সেক্রেটারি হিশেবে কাজের যোগ্যতাও। এবঙ আগের বছর মুর্শিদাবাদে কর্মদক্ষতা। এবার তাঁর উপরে ত্রাণের দায়িত্ব এসে পড়ল। পুরো সেপ্টেম্বর মাস বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুর শহর ছেড়ে বন্যাবিধ্বস্ত এলাকাগুলিতে ঘুরে ঘুরে কাজ করলেন। এই প্রসঙ্গে লালগোলায় গিয়েছিলেন। ওই মাসের ১৮ এবঙ ২৭ তারিখে বন্যা সম্বন্ধে দুটি রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টে একটি আপাত-অসঙ্গতি লক্ষ্য করার মতো।

সাধারণের মতো বঙ্কিমচন্দ্রের অভিযোগ, যে সরকার কর আদায় করেন, অথচ প্রজাদের দুর্দশা লাঘবে অর্থব্যয় করতে চান না। সরকারের উদ্দেশ্য রাজস্ববৃদ্ধি। 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে' এই বক্তব্য স্পষ্ট। সরকারের ইচ্ছা, জমিদারেরা পীড়িত প্রজাদের সাহায্য এবঙ সরকার দাতাদের উপাধি বিতরণ করবেন। সরকারি কর্মচারী বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিবেদনে এই মনোভাব থেকে দানশীল জমিদারদের প্রশঙসা করেছেন। লিখেছেন, ভালো সাহায্য হয়েছে। পরে 'বঙ্গদর্শনে' উল্টো কথা।—এটা স্ববিরোধিতা নয়। সরকারি কর্মচারীর একতিয়ার ও ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তায় বিরোধ।

তাঁর শরীরের গঠন দুর্বল। স্বাস্থ্য ভালো নয়। বন্যাত্রাণে মফস্বলে অনিয়মিত জীবনযাত্রা,—খাটুনি বেশি। বহরমপুর ফিরে বিশ্রামলালসার সময় উপহার পেলেন রোড-সেসের নতুন কাজ। আইন নতুন, প্রকরণ অজানা, পদ্ধতি তৈরি হওয়ার অপেক্ষায়। প্রথম প্রয়োগে দায়িত্ব বেশি। পরে যান্ত্রিক। অক্টোবরে বাড়ি ফিরলেন। নভেম্বরে নতুন কাজ।

ইতিমধ্যে কলকাতায় 'দুর্গেশনন্দিনী'র চতুর্থ এবঙ 'মৃণালিনী'র দ্বিতীয় সঙস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ১২.১.১৮৭২ তারিখে লালবিহারী হুগলিতে বদলি হলেন। সাহিত্যসভা উঠে গেল। বঙ্কিমচন্দ্র রোড-সেসের কাজ করছেন। ১৮৭১-৭২ খ্রিস্টাব্দে ভালো কাজের স্বীকৃতি পেলেন নতুন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট W. Wavel-এর কথায়--'Was employed at the head quarters throughout the year. He continues to deserve the favourable opinion which my predecessor recorded of him He works quickly and his work is good.' কমিশনার E. V. Molony মন্তব্য করলেন--'A very good, experienced and clever officer.' রাজস্ব বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদনে 'commendable revenue work'-এর জন্য প্রশঙসিত হলেন।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ তুলনায় ভালো গেছে। ১৮৭০ অথবা ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে সাময়িকপত্র প্রকাশের যে ইচ্ছা কর্মব্যস্ততার ফলে মনে থেকে গিয়েছিল, তা 'বঙ্গাদর্শনে' রূপ পেল। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের শেষে তিনি অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সহকারিত্বে দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয়যোগ্য সঙশোধন করেন। ৩০.৩.১৮৭২ তারিখে চুঁচুড়ায় অভিনয় হয়। ছুটির অভাবে বঙ্কিমচন্দ্র যেতে পারেননি। দীনবন্ধু খুশি, কিন্তু পরে ন্যাশনাল থিয়েটারে অপরিবর্তিত 'লীলাবতী'র অভিনয়ে আপ্লুত হয়েছিলেন। বঙ্কিম-সঙশোধিত নাটকের অভিনয়ে এব ি মজা হয়েছিল। চুঁচুড়ার যুবক (পরে উকিল ও সাহিত্যিক) দীননাথ ধর এতে ভালো অভিনয় করায় স্থানীয় একজন অভিজাত ব্যক্তি তাঁকে জামাই করেন।

চাকরির সূত্রে জনজীবনের অভিজ্ঞতা বাড়ে। সমাজবিজ্ঞান সভার সদস্য হিশেবে তিনি এই বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। নৃতত্ত্বে তাঁর আগ্রহের পরিচয় এই বছর থেকে পাওয়া যায়। ইতিহাসের আশ্রয় ছেড়ে সামাজিক পটভূমিতে উপন্যাস লেখা আরম্ভ হল। ভবিষ্যতে সাময়িকপত্রে প্রয়োজন হবে। গল্প গ্রাহকদের আগ্রহ জাগাবে। গ্রাম্য জমিদারদের নিয়ে উপন্যাস লিখলেন--'উভয়েরই দোষ'। এই বছরের প্রথমে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাঙলার গ্রামসমাজ নিয়ে কাহিনী রচনার জন্য একটি পুরস্কার ঘোষণা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র বই পাঠান, কিন্তু প্যারীচাঁদ মিত্রের পরামর্শে--পুরস্কার পাবেন না জেনে, বইটি প্রত্যাহার করে নেন, এবঙ নতুন করে লেখেন। নাম 'বিষবৃক্ষ'।[২] এমন আর-একটি প্রত্যাখ্যাত রচনা হরচন্দ্র ঘোষের 'সপত্নী সরো'। পুরস্কার পায় লালবিহারী দে লিখিত 'গোবিন্দ সামন্ত'। তারকনাথ গাঙ্গুলি একই উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন 'স্বর্ণলতা'। পুরস্কার মূল্য-নির্দেশক নয়,--সর্বদা দল-জ্ঞাপক।

সরকারি কাজের সুবাদে ওই জেলার ভূমিব্যবস্থা ও ভূমি-রাজস্ব সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের যথেষ্ট জ্ঞান জন্মেছিল। সরকার চাইলে তিনি সেই বিষয়ে একটি বিস্তৃত প্রতিবেদন পেশ করেন। W. W. Hunter তাঁর *Statistical Account of Bengal*, Vol. IX (1876) গ্রন্থে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রসঙ্গে এই বিষয়ের আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা ছেপে দিয়েছেন। তা দীর্ঘ, কিন্তু মূল রচনার সারাঙশ মাত্র।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বাঙলাদেশের প্রথম লোকগণনা হয়। মুর্শিদাবাদ জেলায় এই কাজের দায়িত্বে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন না বটে, কিন্তু সাহায্যকারী ছিলেন। তখন কলকাতায় এই অফিসের অস্থায়ী সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতার লোকগণনা অফিসে এসে বাঙলার কয়েকটি জাতি সম্বন্ধে একটি নৃতাত্ত্বিক আলোচনা জমা দেন। তাঁর চাকরির ইতিহাসে এখানে ছুটি নেই, কারণ তিনি সরকারি কর্মচারী হিসেবে প্রতিবেদন জমা দিতে গিয়েছিলেন। তখন ওই অফিসের অস্থায়ী কেরানি, পরে সাহিত্যিক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রকে অফিসে প্রথম দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের বাঙলার সেন্সাস রিপোর্টে বঙ্কিমচন্দ্রের নৃতাত্ত্বিক প্রতিবেদনের অংশবিশেষ ছাপা হয়। তার সঙ্গে সেন্সাস কমিশনার Bourduillon-এর মন্তব্য ছিল। মন্তব্যে যে মতপার্থক্য ছিল, তাতে বঙ্কিমচন্দ্র বিরক্ত হয়েছিলেন, কারণ তাঁর ধারণা—মন্তব্যকর্তা বক্তব্য বুঝতে পারেননি। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রসঙ্গ অনুসারে একটি প্রতিবাদমূলক রচনায় নিজের বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে থাকেন, কিন্তু রচনাটি অসমাপ্ত থাকে। অসমাপ্ত রচনাটির পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হলে তা ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের *Man in India* পত্রে বিকৃতপাঠে ছাপা হয়। সম্পাদকীয় মন্তব্যে জানানো হয়, যে প্রবন্ধটি মেদিনীপুরে লেখা! ১৫ বছর পরে প্রতিবাদ লেখা?

এই সময়, এদেশে বেশ্যাদের সম্বন্ধে সরকার নানা তথ্য সংগ্রহ করতে থাকেন। কোনো পরিকল্পনা অনুসারে উন্নতির প্রয়াস সরকার করেননি। বিভিন্ন জেলার অনেক পদস্থ সরকারি কর্মচারী এবং কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তথ্যাদি জানান। বঙ্কিমচন্দ্র একটি অনতিদীর্ঘ প্রতিবেদন পাঠান। তাতে অনেক তথ্যসন্নিবেশ আছে, কিন্তু এই অতি সুলিখিত রচনাটিতে বেশ্যাদের উত্পত্তির কারণ, সামাজিক ব্যবহারযোগ্যতার বৈচিত্র্য. জাত, আর্থিক অবস্থা, ধর্ম, আচার, সঙ্খ্যা, ভৌগোলিক পার্থক্য প্রভৃতি বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ তত্ত্বনির্মাণের প্রয়াস প্রশংসনীয়। রচনাটি এখনও প্রকাশযোগ্য।

১৭.৯.১৮৭২ তারিখে তিনি এদেশের কর-ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি প্রতিবেদন লেখেন। ১.১.১৮৭৩ তারিখে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা লাভ করেন। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র ৭টি ফৌজদারি মামলার বিচার করেন। তার মধ্যে তিনটি অসমাপ্ত ছিল। দুটি মামলায় আসামীর শাস্তি হয়, এবং দুটিতে ছাড়া পায়। এই ফল সরকারের কাছে সন্তোষজনক হয়নি।

সরকারের সন্তোষজনকতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাইপো শচীশচন্দ্রের কাছে বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বলা একটি কাহিনী উদ্ধারযোগ্য।—কয়েকটি বাকি খাজনার মোকদ্দমায় বাদী-প্রতিবাদী ধনশালী জমিদার, এবং উকিল বৈকুণ্ঠনাথ সেন ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরা দুজনে আপস-মীমাংসার আশায় মামলা মুলতুবি রাখার জন্য অনুরোধ করায় বঙ্কিমচন্দ্র তা রাখেন। পরের শুনানির দিন আবার একই প্রার্থনা ও উত্তর শুনে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের কাছে কমিশনারের ভীতিপ্রদর্শনসহ বিরূপ মন্তব্য পড়ে শোনান। আবার মামলা মুলতুবি রেখে বলেন, যে ভালো ফলের স্বার্থে তিনি এমন

মন্তব্য উপেক্ষা করেন।

রাজস্ববিভাগের কাজে ১৮৭২-৭৩ খ্রিস্টাব্দের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চপ্রশংসা লাভ করেন। বিভাগীয় কমিশনার E. V. Molony সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লেখেন--"Very good." কয়েকজন উপরওয়ালা সাহেবের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের খাতিরও হয়। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার 'বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ (তৃতীয় প্রস্তাব)'-এ লিখেছেন--'মাননীয় বোলটন সাহেবের সঙ্গে বহরমপুরে কার্যক্ষেত্রে তাঁহার যে ঘনিষ্ঠতা হয়, বরাবর তাহা অক্ষুণ্ণ ছিল।'

'দুর্গেশনন্দিনী' সম্বন্ধে E. B. Cowell লিখিত প্রবন্ধ *A Bengali Historical Novel* বিলাতে Macmillan's Magazine পত্রে April 1872 সংখ্যায় প্রকাশিত হল। এদেশে খবর পৌঁছাতেই শিক্ষিত লোকের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মান বেড়ে যায়। ১৯.২.১২৭৯ (31.5.1872) তারিখের এডুকেশন গেজেট এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে বঙ্কিম-প্রশংসা করেছিল।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বহরমপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের কাজের চাপ ও দায়িত্ব কমেনি,--ছোটাছুটি কমেছিল। কাজে অনেকটা স্থিতিশীলতা এসেছিল। নতুন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াভেল এবং পুরান বিভাগীয় কমিশনার মলোনি বঙ্কিমচন্দ্রের কাজে সন্তুষ্ট, এবং তাঁর সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ ও সহানুভূতিশীল ছিলেন। সেই সুযোগে ১২৭৯ শনে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্র প্রকাশ করেছিলেন। ১৮৭২ মার্চের প্রথমে বঙ্গদর্শনের অনুষ্ঠানপত্র প্রচারিত হয়। অক্ষয়চন্দ্র সরকার আত্মজীবনী 'পিতা-পুত্রে' এই অনুষ্ঠানপত্রে উল্লিখিত লেখকদের তালিকা দিয়েছেন—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদাস সেন, জগদীশনাথ রায়, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার। এই তালিকা ভুল। অনুষ্ঠানপত্রে জগদীশনাথ ও রামদাসের নাম ছিল না, কিন্তু উপস্থিত ছিলেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। ১২.৪.১৮৭২ তারিখে—১লা বৈশাখ ১২৭৯ শনে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়। বঙ্গদর্শনের প্রথম কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের ছোট ভাই পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কার্যালয় নৈহাটিতে। মুদ্রাকর, প্রকাশক ও অর্ধেক স্বত্বাধিকারী ছিলেন ভবানিপুরে ১ নম্বর পিপুলপট্টি লেনের সাপ্তাহিক সম্বাদ প্রেসের অধিকারী ব্রজমাধব বসু। এই পত্রের প্রকাশকালে সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে ছিলেন, এটুকু ছাড়া এই শহর ও পত্রের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। সাময়িকপত্রের কাজে তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় এ বছর বঙ্কিমচন্দ্র নিজের কোনো বইয়ের জন্য কাজ করতে পারেননি। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো বইয়ের কোনো নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি।

বহরমপুরে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের লেখক তৈরি করার চেষ্টা করেন--প্রথম নজর ইংরেজিশিক্ষিত যুবকদের উপর। একটি দৃষ্টান্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার। দুটি প্রধান উদাহরণ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও রামদাস সেন, এবং অপ্রধান যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, শ্রীকৃষ্ণ দাস, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে। এই প্রসঙ্গে নানা মিথ্যা কথা ও ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। কয়েকটি অপসারণ করা দরকার।

বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি বই তাঁর কয়েকজন প্রিয় ব্যক্তিকে উত্সর্গ করেছেন। তাঁদের তালিকা এই--

দুর্গেশনন্দিনী	১৮৬৫	শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়
কপালকুণ্ডলা	১৮৬৬	সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
মৃণালিনী	১৮৬৯	দীনবন্ধু মিত্র
বিষবৃক্ষ	১৮৭৩	জগদীশনাথ রায়
চন্দ্রশেখর	১৮৭৫	পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কমলাকান্তের দপ্তর	১৮৭৬	রামদাস সেন
দেবী চৌধুরাণী	১৮৮৪	যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সীতারাম	১৮৮৭	রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

রামদাস ও রাজকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় বহরমপুরে। বাঙলা প্রাবন্ধিক হিসেবে দুজনের জন্ম বঙ্গদর্শনে।

বঙ্গদর্শনে নাটক প্রকাশিত হত না, যদিও তখন নাটক লেখার ধুম পড়েছিল। কবিতা থাকত সামান্য, যদিও বাঙ্গালি যুবকমাত্রেই কবি। এক বছর আগে প্রকাশিত *Bengali Literature* প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, যে পুরান যুগে প্রাধান্য ছিল সংস্কৃত পণ্ডিতদের, নবযুগে ইঙরেজিনবিশদের। কথাগুলি মেলালে বঙ্কিমচন্দ্রের কাজ ছিল তিনটি--(ক) প্রাবন্ধিক ও গল্পকার তৈরি, (খ) ইঙরেজিশিক্ষিত লেখককে বাঙলা লেখায় উত্সাহদান, এবঙ (গ) নব্যপন্থী যুবক থেকে লেখক নির্মাণ। বহরমপুরে তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি করেছিলেন।

প্রথম বছরের (১২৭৯ শন) 'বঙ্গদর্শনে' তার ফল ফলেছিল। যেমন--

(ক) কবি ও নাট্যকার যথাক্রমে প্রবন্ধ, এবঙ কবিতা ও গল্প লিখেছেন।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়--'মনুষ্য জাতির মহত্ত্ব কিসে হয়', জ্যৈষ্ঠ (প্রবন্ধ)।

দীনবন্ধু মিত্র--'প্রভাত', আষাঢ় (কবিতা)

ওই--'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ', কার্তিক (কাহিনী)

(খ) যাঁরা আগে বাঙলায় কবিতা ও ইঙরেজিতে প্রবন্ধ লিখতেন, তাঁরা কবিতা লেখা ছেড়ে বাঙলায় প্রবন্ধ লিখেছেন।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়--'জ্ঞান ও নীতি', আশ্বিন

ওই--'ভাষার উত্পত্তি', চৈত্র

রামদাস সেন--'ভারতবর্ষীয় পুরাতত্ত্ব', শ্রাবণ, ভাদ্র

ওই--'কালিদাস', অগ্রহায়ণ

ওই--'বররুচি', মাঘ

ওই--'শ্রীহর্ষ', ফাল্গুন

(গ) ইঙরেজিশিক্ষিত, কৃতী, আধুনিক যুবক থেকে প্রৌঢ় ব্যক্তির বাঙলা গদ্যচর্চা।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার--'উদ্দীপনা', বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ

ওই--'গ্রাবু', আষাঢ়
যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ--'একান্নবর্ত্তী পরিবার', আশ্বিন
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়--'যাত্রা' পৌষ
ওই--'বঙ্গদেশের লোকসঙখ্যা', চৈত্র
জগদীশনাথ রায়--'সঙ্গীত', বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ

রামদাস সেনের মৃত্যুর পরে তাঁর সম্বন্ধে 'মুর্শিদাবাদ হিতৈষী' পত্রে নিখিলনাথ রায় যে জীবনীমূলক প্রবন্ধ লেখেন, তাতে বলা হয়েছিল, যে রামদাসের লাইব্রেরিতে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের পরিকল্পনা হয়। একথা সত্য হতে পারে বটে, কিন্তু অসুবিধা এই, যে অনুষ্ঠানপত্রে তাঁর নামের এবঙ প্রথম তিন সঙ্খ্যায় রচনার অনুপস্থিতির ব্যাখ্যা মেলে না। অবশ্য একথার প্রমাণ আছে, যে বঙ্কিমচন্দ্র রামদাসের গ্রন্থসঙগ্রহ ব্যবহার করেছেন, এবঙ বঙ্কিম-পরিচয়ের ফলে রামদাস কবিতা ছেড়ে প্রবন্ধ ধরেছেন। 'সঙবাদ প্রভাকরে' রামদাসের কাব্যচর্চা বোধহয় বঙ্কিমচন্দ্রকে আকৃষ্ট করেনি, কিন্তু তাঁর উপন্যাস প্রকাশের অল্পকাল পরে--২৬.৮.১২৭৩ (১০.১২.১৮৬৬) তারিখে 'সোমপ্রকাশ' পত্রে (প. ৬২--৬৩) রামদাসের প্রশস্তিমূলক 'কপালকুন্ডলা' কবিতা প্রকাশ এবঙ 'কবিতালহরী' (১৮৬৭) গ্রন্থে তার সঙগ্রহ বঙ্কিমচন্দ্রকে মুগ্ধ করে থাকতে পারে।

'বঙ্গদর্শন' ১৬ পেজি ফর্মার চার ফর্মার মাসিক সাহিত্যপত্র। উপরে পাতলা, রঙিন কাগজের মলাটে কখনও বিজ্ঞাপন থাকত। প্রথম তিন বছর নিয়মিতভাবে বাঙলা মাসের পয়লা তারিখে প্রকাশিত হত। প্রথমে প্রতি সঙ্খ্যা হাজার কপি করে ছাপা হত, এবঙ তা কিছুদিন পরে দু হাজারে ওঠে। পরেও আগ্রহ বেশি থাকায়, কখনও পুরান বঙ্গদর্শন কেনার জন্য তখন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল। 'ভারতী' ছাপা হত কোনো সঙ্খ্যা সর্বাধিক ৬০০ কপি। তবু অবিক্রিত ভারতী বাঁধিয়ে কম দামে বিক্রি করার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। প্রথম বছরের বঙ্গদর্শন কলকাতা থেকে, এবঙ পরের বছর থেকে তা কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন প্রেস থেকে ছাপা হতে থাকে।

ইচ্ছা থাকলেও ১২৭৭ অথবা ১২৭৮ শনে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করতে পারেননি। দু বছর পরে ১২৭৯ শনে প্রকাশিত হয়েও তা বাঙলা সাময়িকপত্রের নতুন আদর্শ তৈরি করেছিল। তার আগে 'অবোধবন্ধু' ও 'মিত্রপ্রকাশে' তার আভাস, এবঙ পরে অনুপ্রাণিত 'জ্ঞানাঙ্কুর', 'আর্যদর্শন', 'বান্ধব' ও 'ভারতী'-তে তার প্রসার হয়েছিল। তখনকার বাঙ্গালি-সম্পাদিত ইঙরেজি সাময়িকপত্র Mookerjee's Magazine ও Bengal Magazine অন্য উদাহরণ। অতএব, এই কাজে বঙ্কিমচন্দ্র একক নন,--অগ্রসর। পারস্পরিক সহায়তার আশায় তিনি বন্ধু শম্ভুচন্দ্রকে পরে দুটি ছোট ইঙরেজি রচনা পাঠান। তাঁর Mookerjee's Magazine-এ এদের প্রকাশের বিবরণ এরূপ--

'The Confessions of a Young Bengal', December 1872. (20.12.1872)
'The Study of Hindu Philosophy', May 1873. (25.7.1873)

এই লেখাগুলির মান সাধারণ। চাকরি ও পত্রসম্পাদনার কর্মব্যস্ততার ফলে তখন

বঙ্কিমচন্দ্র আর কোনো ইঙরেজি বচনা লিখতে পারেননি।

'জ্ঞানাঙ্কুর', ১২৮০ বৈশাখ সঙ্খ্যায় প্রকাশিত খাগড়ার চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাবিড়ম্বনা' প্রবন্ধ পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র খুশি হন। তাঁর সঙ্গে আলাপ এবঙ বঙ্গাদর্শনে লিখতে অনুরোধ করেন। চন্দ্রশেখর এতে উত্‌সাহিত হন, কিন্তু কেন লেখেননি, তা বলেননি। বঙ্গাদর্শন ১২৮২ আশ্বিনে (১৪.১.১৮৭৬) বঙ্কিম-নির্বাচিত তাঁর 'শ্মশানে ভ্রমণ' রচনা, এবঙ সমকালে (১.১.১৮৭৬) 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' গ্রন্থ প্রকাশিত হলে তিনি কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করেন। তখন অনিয়মিত প্রকাশ বঙ্গাদর্শনের দুরবস্থা। ওই বছর চন্দ্রশেখর আরও লেখা দেন। বহরমপুরে দেননি কেন? অথবা, লেখা অমনোনীত হয়েছিল? চন্দ্রশেখরের জবানিতে যে-সব কথা আছে, তা বোধ হয় অর্ধসত্য। 'বঙ্গাদর্শনে' প্রকাশিত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'চন্দ্রালোকে' ও 'মশক' যে কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুগ্রহ পেয়েছিল, পরে--বঙ্গাদর্শনের দুরবস্থার সময় তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র অনুকরণে লেখা চন্দ্রশেখরের প্রথম দুটি বই 'মসলা-বাঁধা কাগজ' ও 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' কি সেই কারণে বঙ্কিমচন্দ্রকে সন্তুষ্ট করে বঙ্গাদর্শনে লেখকের রচনার পথ খুলে দিতে পারে না? নইলে, মধ্যবর্তী কালহরণের ব্যাখ্যা কি? চন্দ্রশেখর বলেছেন যে বঙ্গাদর্শনে গ্রন্থসমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া কারও অধিকার থাকার কথা নয়। অক্ষয়চন্দ্র সরকার যে অনেক গ্রন্থসমালোচনা লিখেছেন তা তিনি জানতেন না। তিনি বলেছেন, যে রামদাস সেনের লাইব্রেরিতে 'বঙ্গাদর্শন' প্রকাশের পরিকল্পনা হয়। এ কি তাঁর শোনা কথা? বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ১২৮০ শনে, এবঙ বর্ণিত ঘটনা ১২৭৮ শনের। তিনি বলেছেন, যে Grant Hall-এর সভায় তিনি প্রবন্ধপাঠ শুনতে যেতেন। অথচ, তিনি তখন কলকাতায় ছাত্র। হঠাত্‌ একটি বক্তৃতা শুনে থাকতে পারেন। তিনি বি.এ. পাশ করে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে যখন বহরমপুরে আসেন, তার আগে সভা উঠে গেছে। পঞ্চাশ বছর পরের স্মৃতি কত অনির্ভরযোগ্য!

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের আমৃত্যু যে গভীর সখ্য ছিল তার সূত্রপাত হয় বহরমপুরে। গুরুদাস বলেন--

'বঙ্কিম বাবু এবঙ আমি, যখন বহরমপুরে অবস্থান করিতাম, তখন অত্রত্য খাগড়া নামক স্থানের প্রতি নির্দেশ করিয়া, একদিন আমি তাঁহাকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম, এই যে রাজবর্ত্মের উপর যে দোকানগুলি রহিয়াছে, ইহার বিষয় লিখিতে হইলে, আপনি 'শ্রেণীবদ্ধ বণিক-বিপণি-সমূহ' বলিবেন, না 'সারি সারি বেণের দোকানগুলি' বলিবেন? তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, যদি কোন অধ্যাপকের মুখ দিয়া বলাইতে হয়, তাহা হইলে 'শ্রেণীবদ্ধ বণিক-বিপণি-সমূহ' লিখিব। কিন্তু যদি অন্য কোন লোকের দ্বারা বলাইতে হয়, তাহা হইলে 'সারি সারি বেণের দোকানগুলি' বলিব। আমাকে বলিতে হইলেও আমি ঐরূপই বলিব। ইহার কারণ জিজ্ঞাসায় তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'সাধারণ লোকে কোন্ ভাষা দ্বারা ঐ ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে? ঐ বস্তু প্রকাশ করিবার জন্য লোকে, কোন্ কথা অধিক বার ব্যবহার করে এবঙ কোন্ কথা বলিলে, বর্ণিত বিষয়টীর

চিত্র মনে সহজে অঙ্কিত হয়?'

'তাঁহার এই কথায় আমি তাঁহার মনের যথার্থ ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলাম এবঙ সেই সময় হইতেই আমি তাঁহার ভাষার বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলাম।'

'মৃণালিনী'তে প্রাচীন কালের হিন্দু যোদ্ধার 'মস্তকে উষ্ণীষ, অঙ্গে কবচ, করে ধনুর্বাণ, পৃষ্ঠে তূণীর, চরণে অনুপদীনা', কিন্তু চটুল মেয়ের 'কাণে কাণে কি কথাটি বলে দিলি ওই'। কিন্তু এতে পাঠকেরা তত মুগ্ধ হননি, যত হয়েছিলেন 'বিষবৃক্ষে'র সরল ভাষার ছন্দে। 'কৃষকে লাঙ্গল চষিতেছে, গোরু ঠেঙ্গাইতেছে, গোরুকে মানুষের অধিক করিয়া গালি দিতেছে, কৃষাণকেও কিছু কিছু ভাগ দিতেছে।' মুগ্ধ অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখেছেন--'বঙ্কিম বাবু বিষবৃক্ষে 'গোরু ঠেঙ্গাইতে' লাগিলেন।' গুরুদাস কি তেমন সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন? কিন্তু তিনি বঙ্গদর্শনে কিছু লেখেননি।

গুরুদাসের স্মৃতিকথা বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ধার করেছে। গুরুদাস জানতে পারেন, যে বহরমপুরে আইন বিভাগের কয়েকজন ছাত্র মদ খায়। তাদের মদ ছাড়তে উপদেশ দেওয়ায় একজন বলে, যে এটা খারাপ নয়, কারণ বঙ্কিম বাবু মদ খান। তখন বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুরোধ করায়, তিনি গুরুদাসকে বলেন, যে তিনি মদ খান বটে, তবে তার ফলে এমন কোনো কাজ করেননি যা অন্যায় বা চরিত্রহীনতা। গুরুদাস বঙ্কিমচন্দ্রের কথা স্বীকার করেন, কিন্তু বলেন, যে বঙ্কিমচন্দ্রের মদ্যপান সাধারণের কাছে কুদৃষ্টান্ত। তা মেনে নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তখন মদ ছাড়ার চেষ্টা করেছিলেন।

এই বর্ণনা থেকে দুটি বিষয় বোঝা যায়। (ক) বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বহরমপুরের লোকেরা সশ্রদ্ধ ছিলেন। (খ) বঙ্কিমচন্দ্র দুশ্চরিত্র ছিলেন, এই মর্মে বহুপ্রচলিত কথার পক্ষে বস্তুগত ভিত্তি নেই।

তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু জগদীশনাথ রায় (১৮২৫-১৮৮৭)-কে ৩.৩.১৮৭২ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন--

'I am delighted to hear you will at least try to write for my magazine. I have written to Radhanath about it, but have not got his reply yet. It will be my delight to train him and his brother in literary pursuits. Tell Khany that he must take a great deal of trouble with his essays, thoroughly studying and reading up a subject before he attempts to write upon it,..

'What gives me particular delight is that you yourself will try to write. Let me once get your hoary self under my editorial birch, and I shall show you no mercy.'

তখন বালেশ্বরবাসী জগদীশনাথ বঙ্গদর্শনে লিখতে আগ্রহী হন। প্রথম চার সঙ্খ্যায় তাঁর 'সঙ্গীত' প্রবন্ধ, এবঙ অনূদিত রচনা 'বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ' প্রকাশিত হয়। তাঁর উচ্চশিক্ষিত বড় ছেলে রাধানাথ ইতিপূর্বে বিপত্নীক হয়ে অত্যন্ত শোকার্ত হন। জগদীশের পরামর্শে শোক ভুলবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বঙ্গদর্শনে লিখতে বলেন।

তিনি বোধ হয় কিছু লেখেননি। কিছুদিন পরে বালেশ্বরবাসী, বাঙলা-জানা, ওড়িয়া শিক্ষক ও কবি রাধানাথ রায় স্বরচিত বাঙলা কাব্যগ্রন্থ 'কবিতাবলী' পাঠালে, বঙ্কিমচন্দ্র তা বন্ধুপুত্র রাধানাথের লেখা বলে মনে করেন, এবঙ আষাঢ় ১২৮০,(১৪.৬.১৮৭৩) সঙ্খ্যায় তার প্রশঙসা করেন। এর ফলে পরে বিদ্যালয়-পরিদর্শক, কবি রাধানাথের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় হয়।

উপরের চিঠির বর্জিত অঙশে বলা হয়েছে, যে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'উদ্দীপনা' প্রবন্ধ ছাড়া কিছু না পাওয়ায়, বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গাদর্শনের প্রথম সঙ্খ্যায় প্রকাশের জন্য নিজের চারটি রচনা রেখেছেন--'পত্রসূচনা', 'ভারত-কলঙ্ক', 'বিষবৃক্ষ', 'ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল'। অথচ আরও তিনটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল--হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা 'কামিনীকুসুম', বঙ্কিমচন্দ্র ও জগদীশনাথের যৌথ রচনা 'সঙ্গীত', এবঙ অজ্ঞাতনামা লেখকেব রচনা 'আমরা বড় লোক'। শেষ রচনাটির সম্ভাব্য লেখক জগদীশনাথের ছেলে 'খনি' বা খগেন্দ্রনাথ রায়। বঙ্কিমচন্দ্রের অত্যন্ত স্নেহভাজন খগেন্দ্রনাথ পরে 'শান্তিদেবী' নামে একটি উপন্যাস লেখেন। (সম্প্রতি পরলোকগত সঙ্গীতশিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ছিলেন খগেন্দ্রনাথের নাত-জামাই।) রচনাটি তখন প্রশঙসিত হয়নি। এই বিষয়ে শম্ভুচন্দ্র মুখাপাধ্যায়কে ১৩.৫.১৮৭২ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন--'Poor Dinabandhu is not responsible for the feeble article on our costume. It was from another celebrity whom I was obliged to humour'.

তাঁর পরিচিত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ঈশানচন্দ্র দত্তের ছেলে, পরে আই. সি. এস. রমেশচন্দ্রকে তাঁব ছেলেবেলা থেকে বঙ্কিমচন্দ্র চিনতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েকদিন পবে রমেশচন্দ্র লিখেছেন--

'আমি বিলাত হইতে ১৮৭১ খ্রি. অব্দে প্রত্যাগত হইয়া আলিপুরের কার্যে ব্রতী হইয়াছি। বঙ্কিমবাবু তখন বঙ্গাদর্শন বাহির করিবার উদ্যোগ করিতেছেন।'

'ভবানীপুরে একটী ছাপাখানা হইতে ঐ কাগজখানি প্রথমে বাহির হয়, তথায় বঙ্কিমবাবু সর্বদা যাইতেন। সেই ছাপাখানার নিকট আমার বাসা ছিল, বলাবাহুল্য বঙ্কিমবাবু আসিলেই আমি সাক্ষাত্ করিতে যাইতাম। একদিন বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের কথা হইল, আমি বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলির প্রশঙসা করিলাম, তাহা বলা বাহুল্য। বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি বাঙ্গালা পুস্তকে তোমার এত ভক্তি ও ভালবাসা, তবে তুমি বাঙ্গালা লিখ না কেন? আমি বিস্মিত হইলাম। বলিলাম,--আমি যে বাঙ্গালা লিখা কিছুই জানি না। "গম্ভীরভাবে বঙ্কিমবাবু উত্তর করিলেন,--রচনা পদ্ধতি আবার কি,--তোমরা শিক্ষিত যুবক, তোমরা যাহা লিখিবে তাহাই রচনা পদ্ধতি হইবে। "এই মহত্ কথা আমার মনে বরাবর জাগরিত রহিল,--তাহার তিন বত্সর পর আমার বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম উদ্যম 'বঙ্গাবিজেতা' প্রকাশ করিলাম।'

পরের বছর রমেশচন্দ্র লিখলেন--

'It was in 1872, when the *Banga Darsan* was started, that Bankim Chandra suggested to me to write in my native language. ..It was in 1872 when we were talking about the Banga Darsan, that I, happened to express my appreciation of some of the characters of Bankim's novels. 'If you appreciate Bengali literature thus', said the veteran novelist, 'why do you not work for it?' 'I, write in Bengali!' said I with some surprise, 'why, I have never written anything in Bengali. I do not know the Bengali style.' 'Style!' said he, 'why, what a man of your education will write will be the Bengali style, and your cultured feelings will do the rest'. 'You will never live by your writings in English', said he on this or on another occasion, 'look at others.' ..These words created a deep impression in me, and two years after this conversation, my first Bengali work, *Banga Bijeta,* was out in 1874.'

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি চিঠির অংশ এই--

(১) ২৭.৩.১৮৭২ তারিখে--'I don't think of going to Calcutta till the rains, or till at least it is a little cooler and railway travelling becomes possible.'

(২) ১৩.৫.১৮৭২ তারিখে--'My publisher has not I find strictly acted up to my wishes.' যাতায়াত কম থাকলে এমন হওয়া সম্ভব।

এই সময় বঙ্কিমচন্দ্র ছুটি নেননি। কখনও অফিস ২/১ দিন ছুটি থাকলে, তার সঙ্গে ২/১ দিন ক্যাজুয়াল লিভ নিয়ে রবিবার মিলিয়ে কয়েকদিনের জন্য বহরমপুর থেকে কলকাতায় বা নৈহাটিতে যেতেন। কাজ দেখাশুনা করতেন বঙ্গদর্শনের কার্যাধ্যক্ষ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অতএব, রমেশচন্দ্রের ভাষায় যা 'সর্বদা যাইতেন', সাধারণের ভাষায় তার অর্থ--২/৩ মাস পর পর যেতেন।

দুটি বক্তব্যে আরও পার্থক্য আছে। বাঙলা বক্তব্যে ঘটনাটি ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের, উপন্যাস তার তিন বছর পরে লেখা, এবঙ তিনি উপন্যাসের প্রশঙসা করেছেন। ইঙরেজি বক্তব্যে ঘটনা ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের, উপন্যাস তার দু-বছর পরে লেখা, এবঙ তিনি চরিত্রের প্রশঙসা করেছেন।

রমেশচন্দ্রের জীবনের কয়েকটি ঘটনার কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হল।

২৮.৯.১৮৭১	আলিপুরে চাকরি, ভবানিপুরে বাস
২৭.৬.১৮৭২	*Three Years in Europe* গ্রন্থ প্রকাশ
২০.৯.১৮৭২	*Essays and Poems* মৌলিক সাহিত্যকর্ম 'private circulation'-এ প্রকাশ
১৬.১০.১৮৭২	বঙ্গদর্শন, ১২৭৯ কার্তিক সঙ্খ্যায় *Three Years*-এর প্রাপ্তিস্বীকার

৭.১১.১৮৭২	জঙ্গিপুরে বদলি
১৬.২.১৮৭৩	বঙ্গাদর্শন, ১২৭৯ ফাল্গুন সংখ্যায় *Three Years*-এর আলোচনা
১৭.২.১৮৭৩	বনগ্রামে (নদিয়া) বদলি
৮.৫.১৮৭৩	মেহেরপুরে (নদিয়া) বদলি
ডিসেম্বর ১৮৭৩	'ইয়োরোপে তিন বত্সর' প্রকাশ
২০.৩.১৮৭৪	ওই--আলোচনা, বঙ্গাদর্শন, চৈত্র ১২৮০
এপ্রিল-নভেম্বর ১৮৭৪	জ্ঞানাঙ্কুর, ১২৮১ বৈশাখ-অগ্রহায়ণে 'বঙ্গাবিজেতা' প্রকাশিত
১০.১১.১৮৭৪	বনগ্রামে (নদিয়া) বদলি।

বোঝা যাচ্ছে, ১৮৭২ জুলাই-সেপ্টেম্বরে রমেশচন্দ্র তাঁকে বই দেন, আবার দেখা করেন, এবঙ জঙ্গিপুরে গিয়ে তাগাদা দিয়ে আলোচনা লেখান। বঙ্কিমচন্দ্র আলোচনায় লেখেন 'পুস্তকে লেখকের নাম প্রকাশিত হয় নাই', অথচ 'এই লেখক বাঙ্গালি জাতির সেই বাসনা পুরাইয়াছেন'। অতএব, লেখকের পরিচয় সমালোচকের জানা। বইতে লেখকের ইঙরেজি কবিতা ছিল। হয়ত তাঁর *Essays and Poems* গ্রন্থও সমালোচক দেখেছেন। তিনি লিখেছেন--'বাঙ্গালি হইয়া যিনি ইঙরাজিতে কবিতা রচনা করেন, আমরা কখন তাঁহার প্রশঙসা করিব না, ইহা আমাদের স্থির প্রতিজ্ঞা'। তবে তিনি বইটির বাঙলা অনুবাদ করার উপদেশ দেন, সে উপদেশ পালিত হয়, এবঙ বঙ্গাদর্শনে প্রশঙসিত হয়।

এই বিষয়ে রমেশচন্দ্র নীরব কেন? এ তো 'বঙ্গাবিজেতা'র আগের কথা। 'বঙ্গাবিজেতা' কেন 'বঙ্গাদর্শনে'র বদলে 'জ্ঞানাঙ্কুরে' প্রকাশিত হল, উপদেষ্টা যখন বঙ্কিমচন্দ্র নিজে। পরে তাঁর 'প্রচারে' রমেশচন্দ্রর 'সঙসার' উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল। রমেশচন্দ্র অর্ধসত্য বর্ণনা করেছেন।

'বঙ্গাদর্শনে'র প্রকাশকালে সরকারের মনে হয়, যে দেশি রাজভক্তি কমছে। সরকার জানালেন--"No officer in the service of Government is permitted without the previous sanction in writing of the Government under which he immediately serves to become the proprietor either in whole or in part of any newspaper or periodical publication or to edit or manage any such newspaper or publication.' ইত্যাদি। 'বঙ্গাদর্শন' সঙবাদপত্র নয়, এবঙ তা আগে থেকে প্রকাশিত হচ্ছিল। তাতে রাজনীতির আলোচনা থাকত না। তবু চাকরির স্বার্থে বঙ্কিমচন্দ্র কোনো ঝুঁকি নিলেন না। তিনি সরকারের অনুমতি প্রার্থনা করে ২৫.৯.১৮৭৩ তারিখে দরখাস্ত করেন, এবঙ ১২.১১.১৮৭৩ তারিখে অনুমতি পান।[৩]

তখন দক্ষ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিশেবে বঙ্কিমচন্দ্রের খ্যাতি এত বেশি, যে বিভিন্ন সঙবাদপত্রে তাঁর সম্বন্ধে চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়। যেমন--

(ক) ২.১.১৮৭৩ তারিখে 'ভারতসংস্কারকে' একজন লিখলেন, যে জয়নগরের কাছে নদীর পশ্চিম পাড় বাঁধানোর জন্য ফৌজদারি ট্যাক্স থেকে বাঁচিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে ৬০০ টাকা পৃথক রেখেছিলেন, পরবর্তী কর্তৃপক্ষ তা অন্য কাজে ব্যয় করেছেন। বর্তমান পুরসভাও এ বিষয়ে নিরাসক্ত।

(খ) ৬.১.১৮৭৩ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' একজন লেখেন, যে হাওড়ার মহিষরাখাতে একটি মহকুমা হলে এবং আদালতে বিচারক হিশেবে বঙ্কিমচন্দ্র গেলে ভালো হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন বহরমপুরে, তখন তাঁর মা দুর্গাদেবী অসুস্থ হন। তাঁর মৃত্যুর তারিখ অজানা। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনীলেখকেরা ইচ্ছামতো ১৮৭০ অথবা ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ লিখেছেন। তা ভুল।

১৫.১.১২৭৯ (অর্থাৎ ২৬.৪.১৮৭২) তারিখে লেখা যাদবচন্দ্রের আত্মকাহিনীতে দুর্গাদেবীর মৃত্যুপ্রসঙ্গ নেই। বৃদ্ধের স্ত্রীবিয়োগবেদনার প্রকাশ নীরবতা নয়। অনুমেয়, তাঁর মৃত্যু হয় ওই তারিখের পরে--২৭.৪.১৮৭২ থেকে (বঙ্কিমচন্দ্রের বহরমপুর ত্যাগ, বা) ২.২.১৮৭৪ তারিখের মধ্যে।

দুর্গাদেবীর চার ছেলে বিভিন্ন জায়গায় সরকারি কর্মচারী। মায়ের হঠাৎ বা অল্প রোগভোগে মৃত্যু হলে, সকলে মৃত্যুকালে উপস্থিত না থাকলেও শ্রাদ্ধকালে থাকবেন। থাকার প্রয়োজনে কয়েকদিনের ছুটি নেওয়ায় তাঁদের চাকরির ইতিহাসে এমন ছুটির উল্লেখ থাকবে। উক্ত কালসীমায় ভাইদের এমন ছুটি দুর্গাদেবীর অসুস্থতা, মৃত্যু বা শ্রাদ্ধের সময়।

মেজ ছেলে সঞ্জীবচন্দ্র ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে লোকগণনার কাজে অস্থায়ীভাবে কলকাতায় বদলি হয়েছিলেন। কার্যশেষে ১৮৭৩ জানুয়ারিতে তিনি বর্ধমানে বদলি হন। কর্মব্যস্ততার শেষে, নতুন কর্মস্থলে যাওয়ার আগে আয়েশি মানুষ ছয় সপ্তাহের ছুটি নেন। আগে--থেকে-শুরু-হওয়া ছুটি ৫.২.১৮৭৩ তারিখে অনুমোদিত হয়। আবার দরখাস্ত করায় তাঁকে ১১.৩.১৮৭৩ তারিখে ছয় সপ্তাহের বিনা বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা হয়। দ্বিতীয় ছুটির দরকার হল কেন? সেজ ছেলে বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে রোড-সেসের কাজ ৩১ মার্চের মধ্যে শেষ করার জন্য ব্যস্ত। হঠাৎ ছুটি চাইলে ৪.৩.১৮৭৩ তারিখে তাঁকে জানানো হয়, যে রোড-সেসের কাজ শেষ করার আগে ছুটি মিলবে না। ঠিক এমন হয়েছিল যশোরে দক্ষ ও বিখ্যাত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রের। তাঁর বাবার অসুস্থতার সময় ছুটি চেয়ে পাননি। পরে কলকাতা থেকে মৃত্যুসংবাদ গেলে তিনি ছুটি পান বটে, কিন্তু তা বঙ্কিমচন্দ্র স্বেচ্ছায় অস্থায়ীভাবে তাঁর অতিরিক্ত কাজের দায়িত্ব নিতে রাজি হওয়ার ফলে। ৪.৪.১৮৭৩ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্রের দশ দিনের ছুটি মঞ্জুর করা হয়--৭.৪.১৮৭৩ থেকে ১৬.৪.১৮৭৩ তারিখ পর্যন্ত। ১৭ তারিখের বদলে তিনি ১৯ এপ্রিল কাজে যোগ দেন। ১৭ ও ১৮ তারিখের ছুটি মঞ্জুর হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরিতে মঞ্জুর-না-হওয়া এমন ছুটি আর নেই। যাতায়াতের সময় বাদ দিলে, ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের

৮ থেকে ১৭ এপ্রিল সঞ্জীবচন্দ্রের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ছুটি নিয়ে নৈহাটির বাড়িতে ছিলেন। বড় ছেলে শ্যামাচরণ ১৮৭৩ মে মাসে হুগলি থেকে ঝিনাইদহে বদলি হন। ছোট ছেলে পূর্ণচন্দ্র ১৮৭২ জুন থেকে ১৮৭৮ আগস্ট পর্যন্ত হুগলিতে সাব্-রেজিস্ট্রার ছিলেন। দুজনে তখন নৈহাটি থেকে হুগলি নদী পেরিয়ে রোজ কর্মস্থলে যেতেন। অতএব, ৮ থেকে ১৭ এপ্রিল চার ভাই কাঁটালপাড়ায় উপস্থিত। তাঁদের মা দুর্গাদেবীর মৃত্যুসম্ভাবনা এর আগে, কারণ কর্মস্থল থেকে বাড়িতে যাতায়াত, মৃত্যু ও শ্রাদ্ধের (১১ দিনের) জন্য এই সময়ে কুলায় না। বোনপো কৈলাসচন্দ্র লিখেছেন, যে বঙ্কিমচন্দ্র নগ্নপদে বহরমপুরে থেকে রওনা হয়েছিলেন। তা হলে ছুটি আরম্ভের দিন বা ৪ এপ্রিলের আগে তিনি মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিলেন। মায়ের অসুস্থতার সময় সঞ্জীবচন্দ্র এবং শ্রাদ্ধের সময় বঙ্কিমচন্দ্রও থাকায় শ্যামাচরণ ও পূর্ণচন্দ্র ২/৪ দিন করে ক্যাজুয়াল লিভ নিয়ে কাজ করেছেন। তাই তাঁদের চাকরির ইতিহাসে তখন কোনো ছুটির উল্লেখ নেই।

চার ভাই কাঁটালপাড়ায় ছিলেন ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৮ থেকে ১৭ এপ্রিল। মৃত্যুর খবর পেয়ে ছুটির জন্য দরখাস্ত করায় তা ৪ তারিখে মঞ্জুর হয়। বঙ্কিমচন্দ্র নগ্নপদে বাড়ি ফিরেছিলেন। অতএব, এপ্রিলের ১-৩ তারিখের মধ্যে দুর্গাদেবীর মৃত্যু হয়। দুর্গাদেবী ১৮৭৩ মার্চের প্রথমে অসুস্থ হন। সেজন্য বঙ্কিমচন্দ্র মার্চের প্রথমে ছুটি চেয়েছিলেন এবং সঞ্জীবচন্দ্র মার্চের মাঝামাঝি ছুটি বাড়িয়েছিলেন। এপ্রিলের শুরুতে তিনি মারা যান এবং মাঝামাঝি তাঁর শ্রাদ্ধ হয়। তাঁর মৃত্যুকালে তিন এবং শ্রাদ্ধে চার ছেলে উপস্থিত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র মাকে মৃত্যুর আগে দেখতে পাননি। এসব ১২৭৯ শনের চৈত্র মাসের ঘটনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রে মাতৃভক্তি থেকে পিতৃভক্তি বেশি। কিন্তু সদ্য মাতৃবিয়োগ এবং মায়ের মৃত্যুশয্যায় নিজের অনুপস্থিতির দুঃখ মনে বেশি বেজেছিল। লেখায় তার নিদর্শন আছে। তিনি যে বইগুলি উত্সর্গ করেছিলেন, তাদের উত্সর্গপত্রে পিতা, ভ্রাতা, এবং ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধুরা আছেন,--নেই কেবল মা। সাম্প্রতিক দুঃখ তাঁকে মা সম্বন্ধে লেখার আগ্রহ দিয়েছে। চৈত্রের শেষে তখন কাঁটালপাড়ার বাড়িতে নবপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গদর্শন যন্ত্রে ১২৮০ বৈশাখ সঙ্খ্যা ছাপার কাজ প্রায় শেষ। (১৩.৫.১৮৭৩ তারিখে প্রকাশিত) ১২৮০ জ্যৈষ্ঠ সঙ্খ্যার প্রথমে (প. ৪৯-৫৩) তাঁর মায়ের নামে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা নতুন বেনামি রচনা ছাপা হল--'দুর্গা'।

অস্বাক্ষরিত রচনাটি বঙ্কিমচন্দ্র কখনও গ্রন্থিত করেননি। লেখকের নাম অনুমান করার কয়েকটি কারণ আছে, যেমন--

১। Weber-এর পান্ডিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রদ্ধা ছিল না। উদাহরণ--

ক) 'কাকাতুয়া', বঙ্গাদর্শন : কার্তিক ১২৭৯

খ) কৃষ্ণচরিত্র। (প্রথম খন্ডের চতুর্থ ও ষষ্ঠ, এবং চতুর্থ খন্ডের প্রথম পরিচ্ছেদ) বর্তমান প্রবন্ধের সমাপ্তির দুটি অনুচ্ছেদের আগে তার চিহ্ন আছে।

২। J. Muir সম্পাদিত চার খন্ডে *Sanskrit Texts* গ্রন্থ বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক

রচনায় তথ্য সরবরাহ করেছে। যেমন--

ক) 'বাঙ্গালীর ইতিহাস', বঙ্গদর্শন : পৌষ, মাঘ ১২৮৭। (১ম-২য় পরিচ্ছেদ)

খ) কৃষ্ণচরিত্র। (১ম খন্ড, ১৩শ পরিচ্ছেদ)

আলোচ্য প্রবন্ধেও তা করেছে।

৩। দশ বছর পর 'প্রচার' পত্রে বেদ সম্বন্ধে আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র যে পান্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন তা অর্জন করা সময়সাপেক্ষ,--বিশেষত বদলির চাকরি ও পত্রসম্পাদনার পর অতিরিক্ত সময়ে পড়াশুনা করে। বঙ্গাদর্শনের সময় তার প্রস্তুতি চলছিল, দক্ষতা জন্মায়নি। আলোচ্য প্রবন্ধে 'রাত্রি পরিশিষ্ট' উদ্ধারের পরে তার স্বীকারোক্তি আছে।

৪। এই রচনায় প্রশ্ন আছে। উত্তর মেলেনি। 'আমাদের জিজ্ঞাসা'য় প্রবন্ধসমাপ্তি কি সম্পাদক ছাড়া কারও পক্ষে করা সম্ভব?--সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র।

এর আগে বা পরে 'বঙ্গাদর্শন' বঙ্কিমচন্দ্রের এমন কোনো রচনা প্রকাশিত হয়নি। অতএব, এটি লেখার কারণ সাময়িক উত্তেজনা।

তাঁর মেয়ে নন্দরাণীকে যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজের বাড়ির কাছে জমি দিয়েছিলেন। সেখানে বাড়ি তৈরি করে তাঁরা সপরিবারে থাকতেন। নন্দরাণীর ছেলে কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর সে বাড়ি রেল কোম্পানিকে বিক্রি করে চুঁচুড়ায় বাড়ি কেনেন। তাঁর মৃত্যুর পর চুঁচুড়ার বাড়ির হাতবদল হয়। আলোচ্য সময়ে কৈলাসচন্দ্র বাড়িতে থেকে ব্যায়ামচর্চা করতেন। দুর্গাদেবীর মৃত্যুকালে তাঁর সেজ ছেলে বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স ৩৫, এবঙ দৌহিত্র কৈলাসের বয়স ৩০ বছর। এই ঘটনার ৩৫ বছর পরে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কৈলাসচন্দ্র লিখেছেন--

'Once at a time he was coming from Berhampore on the occasion of his mother's death *via* E.I.Railway. At Nalhatty he got up in a hurry in one of the 2nd class compartments. ..The passangers of the compartment were two Europeans severely drunk. He had that scanty and particular mourning rainent on his body...This excited the derision and laughter of the drunkards, who indulged in taunting and using obscene languages at him. Bankim Babu who was very spirited and who could ill put up with their jokes &c only answered in a few choice English words, which more excited the ire of the sons of Bacchus and they tried to do bodily injury to the Babu. At first they tried to eject him from the compartment, telling him to walk on the foot board. But on his refusal to comply with their request, they tried to throw him over into the fields. His activity, adroitness of movements and his extraordinary intelligence saved his life. ..Providentially next station was soon reached; Bankim Babu at once alighted down informing the guard of the catastrophy,..

'He purchased a ticket for the 1st class for the remaining journey down to his house, thence he swore never to travel in a second class,..

* *

'It was on this occasion that he said at home 'had I been as strong as Kailas (meaning myself) I would not have cared a bit to fight with any European.' I fancy he received some kind of assults from the drunkards on this occasion.'

K. C. Mukherjee.—*A Few Sayings and Opinions of late Babu Bankimchandra Chatterjee,* pp. 11-12. (1908)

তখনকার মতো মেনে নিতে বাধ্য হলেও ঘটনাটিতে সাধারণ ইঙরেজের বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত বিরূপ ও উত্তেজিত হয়েছিলেন। তিনি প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ খুঁজছিলেন।

ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনার জন্য সরকারি অনুমতি চেয়েছিলেন। তখন সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ শাসকদের নজরে পড়ে। এই বৃদ্ধির সঙ্গে দেশি সঙবাদপত্রের যোগাযোগের সম্ভাবনা তাঁদের মনে এসেছিল। তা অবাধ সম্পাদনা নিয়ন্ত্রণের কারণ। জন-অসন্তোষ বৃদ্ধির কারণ, এবঙ তার সঙ্গে দেশি সঙবাদপত্রের সম্পর্ক সম্বন্ধে সরকার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কাছে জানতে চাইলেন। অনেকেই কিছু লিখে জানালেন না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র অনুমতি চেয়েছেন। সরকারের জিজ্ঞাসার উত্তর তাঁকে দিতে হল। দিতে গিয়ে তিনি একটি বিপত্তি ঘটালেন। তা বোঝার জন্য তত্‌কালীন অবস্থা বোঝা দরকার।

আধুনিক বাঙালির মার্জিত রুচি মূলে বাঙলা নয়,—ইঙরেজি। উনিশ শতকের দেশি পত্রে প্রথাগত রুচির যে কদর্য চেহারা প্রকাশ পেত, বঙ্গদর্শনের পৌষ ১২৮০ (১৬.১২.১৮৭৩) সঙ্খ্যায় বেনামি 'অশ্লীলতা' প্রবন্ধে, এবঙ পরে ঈশ্বর গুপ্তের কথায় 'সঙবাদ রসরাজ' প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র তার নিন্দা করেছেন। বই, সাময়িকপত্র ও সামাজিক আচরণ মার্জিত করার জন্য তখন 'অশ্লীলতা নিবারণী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে গ্রন্থ-সমালোচনা এবঙ বিদ্যাসাগর-বিরোধী আলোচনার ফলে অনেক দেশি পত্র বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা নয়--নিন্দা, বিদ্রূপ, বিরুদ্ধতা আরম্ভ করে। সোমপ্রকাশ, অমৃতবাজার, মধ্যস্থ, হালিশহর পত্রিকা প্রভৃতি অনেক কাগজে প্রকাশিত এমন নিন্দা বঙ্কিমচন্দ্রকে মর্মে পীড়িত করেছে। একটি ঘটনার বর্ণনা থেকে আক্রমণের প্রকৃতি এবঙ আক্রান্ত ব্যক্তির মানসিক উত্তাপ বোঝা যেতে পারে।

'হালিসহর পত্রিকা' ১২৭৮ শনে জানকীনাথ গাঙ্গুলির সম্পাদনায় মাসিক, ১২৭৯ শনে মদনমোহন মিত্রের সম্পাদনায় পাক্ষিক, এবঙ ১২৮০ শনে সাপ্তাহিক হওয়ার কিছু পরে লুপ্ত হয়। ২৩.৭.১২৮০ তারিখের পত্রে 'আয় আয় আয় বঙ্গদর্শনের ঘুম' নামে একটি বিদ্রূপ-কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। দীর্ঘকাল পরেও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য এসব অযৌক্তিক, অমার্জিত বঙ্কিম-নিন্দার তীব্রতা ভুলতে পারেননি। বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিতেও

তার প্রসঙ্গ আছে।

বহরমপুর থেকে কলকাতায় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লেখা (প্রচলিত মুদ্রণে xii সঙ্খ্যক) একটি তারিখহীন পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র Mookerjee's Magazine, June 1873 সঙ্খ্যার আলোচনা করেছেন। ওই সঙ্খ্যা প্রকাশের তারিখ ৫.৮.১৮৭৩। ওই চিঠিতে, Hindoo Patriot পত্রে রমেশচন্দ্র দত্ত 'বিষবৃক্ষে'র সমালোচনা করবেন, এমন সম্ভাবনার কথা আছে। ওই সমালোচনা ২২.৯.১৮৭৩ তারিখে প্রকাশিত হয়। অতএব, চিঠিটি ওই দুটি তারিখের মাঝখানে লেখা। তখন পাক্ষিক 'হালিসহর পত্রিকা'র সম্পাদক মদনমোহন মিত্র প্রায়ই বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধতা করতেন। ইতিমধ্যে ১৪.৬.১৮৭৩ তারিখে প্রকাশিত বঙ্গদর্শনের ১২৮০ আষাঢ় সঙ্খ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র অস্বাক্ষরিত 'বহু বিবাহ' প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের সমালোচনা করায় অধিকাঙশ বাঙলা সাময়িকপত্র বঙ্কিমচন্দ্রের নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠে। টেক্কা দেয় 'হালিসহর পত্রিকা'। ওই চিঠিতে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—

'The story about my illness was a pure fiction. The gentlemen who gave it out in the papers managed also to send news of my death to my house at Kantalpara. The announcement in the *Haleeshahar Patrika* of my illness was intended merely to create belief in the report of my death sent to my relatives, this being supposed an excellent way of punishing a man for his literary opinion.'

এর পরে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি শারীরিক আঘাতের পরিকল্পনা করা হয়। তিনি মানসিকভাবে ক্ষুব্ধ থাকার সময় তাঁকে সরকারি প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। দেশি কাগজের রাজানুগত্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যে বিরোধিতা ছিল না। তাঁর আপত্তি ছিল রুচিতে। প্রতিবেদনে তা ছিল অবান্তর, কিন্তু মানসিক অবস্থায় প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছিল। সঙবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ, বা বক্তব্য নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধেও কোনো কথা ছিল না। কিন্তু সাধারণে এত খুঁটিয়ে বোঝে না।

দেশি সঙবাদপত্রের রুচি প্রসঙ্গে কয়েকটি তথ্য উদ্ধারযোগ্য। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র বিরুদ্ধে মানহানির মামলা হয়েছিল। ('আমাদের লাইবেল মোকর্দমা', অমৃতবাজার পত্রিকা : ২৯.৭.১৮৬৯, প. ১৮৬-৭।) বাঙলা সঙবাদপত্রের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ অনেকে স্বীকার করতেন। ('সমাচারপত্র ও পাঠকমণ্ডলী', এডুকেশন গেজেট : ১৬.১২.১৮৭০।) বারুইপুরের 'আর্যোদয়' পত্রের বিরুদ্ধে মানহানির মামলায় সম্পাদকের জেল-জরিমানা হয়েছিল। (এডুকেশন গেজেট : ১২.৭.১৮৭২, ২৩.৮.১৮৭২।) একই কারণে 'মধ্যস্থে'র জরিমানা হয়। (গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা : ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩, প. ৪।) এই কারণে ইঙরেজরা অমৃতবাজারের বিপক্ষতা করতেন। (এডুকেশন গেজেট : ১৮.১.১৮৭১।) ঢাকার 'হিন্দুহিতৈষিণী'ও অর্থদণ্ড দেয়। (এডুকেশন গেজেট : ১২.৭.১৮৭২।)—ইঙরেজনিন্দা ব্যক্তিগত হলে শিক্ষিত বাঙালিদের অনেকে যে

অমৃতবাজারের খবরে বিশ্বাস করতেন না, তার প্রমাণ বিম্‌সের কেলেঙ্কারি। বিম্‌সের আক্রমণ ও টাকা ধার নেওয়ার প্রকৃত ঘটনা অমৃতবাজার প্রথম এবঙ ঠিকভাবে প্রকাশ করে। Hindoo Patriot প্রভৃতি কাগজ এই খবর প্রথমে বিশ্বাস করেনি,-- অমৃতবাজারি নিন্দা বলে অবিশ্বাস করে। পরে সত্যতা মেনে নিতে সকলে বাধ্য হয় এবঙ বিম্‌সের পদাবনতি ঘটে। অমৃতবাজারে নিন্দাপ্রকাশের সত্যতা সম্বন্ধে সাধারণের অবিশ্বাসের প্রবণতা বোঝাতে একটি ঘটনা যথেষ্ট। অযথা নিন্দার ফলভোগী হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখে লিখেছিলেন--'দেশী সম্বাদপত্র পাঠসুখে আমরা ইচ্ছাক্রমে বঞ্চিত'।

সরকারি বিবরণে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিবেদনের যে অঙশ প্রকাশিত হল, তা এই--'I believe that the influence of the vernacular press is, on the whole, rather for evil than for good. The amount of shallow and erroneous notions which it helps to spread is almost incredible. The wholesome propagation of false mischievous notions must be an unmitigated evil, which more than balances the good done in other respects. Much of the general feeling of distrust towards the Government, which has often been the subject of comment, is due to the action of the native press. Yet, however hostile and hypocritical in its tone, the vernacular press is loyal to the Government in spirit.'

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দেশি খবরের কাগজগুলি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। ১৩.১০.১৮৭৩ তারিখে 'সহচর' লিখল, যে বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ইঙরেজ সরকারের প্রতি জনসাধারণের অশ্রদ্ধা সৃষ্টিতে দেশি খবরের কাগজগুলি তত্পর। এই বক্তব্য প্রতিবাদযোগ্য। ২০.১০.১৮৭৩ তারিখে 'বিশ্বদূত' পত্র একই বক্তব্য প্রকাশ করেছে। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র একটি বিরূপ মন্তব্য এই--

..According to his opinion, 'much of the general feeling of distrust towards the Government which has often been the subject of comment, is due to the action of the native press.' ..We are taken by surprise at the remarks of an educated native like Bankim Babu, who holds no inconsiderable position in our country. Certainly in a free country such remarks from a person of Bankim Babu's position would have brought down upon him universal condemnation, but under the pressure of a foreign government even the truest patriot turns a traitor to his country.

15.10.1873

এক সপ্তাহ পরে আবার--

..This mischievous remark of the Babu, as may be easily supposed, has met with the approval of His Honor...What Bankim babu said was simply silly in the extreme. He might as well have said that the native press seeks the interests of the people. ..If

Babu Bankim and Sir George following mean to insinuate that the native press shows sedition, we can only say that there is a vague and indefinite law on the subject, which might be easily enforced if necessary.

..Babu Bankim Chandra draws but only Rupees 600 per mensem and already his zeal has met with the approbation of His Honor, and it is to be expected that a promotion would increase his zeal tenfold. ..Before concluding this we would make the remark regarding Bankim Babu which the late Mr. Anstey made of Mr. Paul when eulogising Lord mayo. 'I hope my learned colleague will meet his reward in after life as surely as he is to receive the reward here.' 23.10.1873

বঙ্কিমচন্দ্র দেখলেন, তাঁর কথার ভুল অর্থ হয়েছে। তিনি লিখেছেন রুচির কথা, অথচ তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে সঙবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরোধী হিশেবে। কদর্য অঙশ হল তাঁর ব্যক্তিগত আয় ও চাকুরির উন্নতি সম্বন্ধে মিথ্যা ইঙ্গিত। এমনকি এর পরে তিনি শারীরিক নিগ্রহের আশঙ্কাও করেছিলেন। ভেবেচিন্তে এ থেকে মুক্তির দুটি পথ তৈরি করলেন। ক) তাঁর বক্তব্যের ঠিক ব্যাখ্যা করা, এবঙ খ) সাধারণের দৃষ্টিকে ভিন্নমুখী করা। 'ক'-এর জন্য অন্যের কলম ও সঙবাদপত্র দরকার, এবঙ 'খ'-এর জন্য কোনো ইঙরেজ-বিরোধী ঘটনা ঘটানো ও তার প্রচার করা দরকার। তিনি দুটি কাজই করলেন।

তাঁর শাগরেদ অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সাপ্তাহিক সঙবাদপত্র 'সাধারণী' ২য় ভাগ, ১৪শ সঙ্খ্যা, অর্থাত্ ১৯.৭.১৮৭৪ তারিখ পর্যন্ত 'কাঁটালপাড়া বঙ্গাদর্শন যন্ত্রে শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত হইয়া চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সঙখ্যক ভবন হইতে শ্রীপাঁচকড়ি রায় কর্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত' হত। এই মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব অঙশত ক্রিয়াশীল ছিল।

'সাধারণী' সঙবাদপত্রে নিচের চিঠি ছাপা হল—

'দেশীয় সঙবাদপত্র।

'..বাস্তবিক কি ইঙরাজগণ আমাদিগের একটুও ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র নহেন? তাঁহাদের কি কোন গুণ নাই? না কাহারও কথায় দগ্ধ হইয়া আমরা আমাদিগকে শাসনকর্তৃগণের দোষ ভিন্ন গুণ দেখিতে পাইতেছি না? এই শেষোক্ত প্রশ্নটির উত্তর করিবার জন্য বেঙ্গাল গবর্ণমেন্ট কতকগুলি দেশীয় কর্মচারীর নিকট পাঠাইয়াছেন। তন্মধ্যে একজন দেশীয় কর্মচারী উত্তর করেন যে প্রজাদিগের ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর এত অধিক অসন্তুষ্ট হইবার কারণ কতকটা দেশীয় সম্বাদপত্র হইতে পারে। এই উত্তর প্রচার হইবামাত্র দেশীয় সম্বাদপত্র মহলে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। চারি দিক হইতে

তাহার মস্তকে তিরস্কার বৃষ্টি হইতে লাগিল। আমাদের দেশীয় সম্বাদপত্র সম্পাদক মহাশয়দিগের একটা হুজুক পাইলেই হইল। '...দেশীয় কর্মচারী একটা কথা বলিলেন তাহার প্রতিবাদ করিবার জন্য সকলেই তত্পর ; কিন্তু যখন ভারতবর্ষীয় সর্বোত্কৃষ্ট সাময়িক পত্রের দ্বারা সেই কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হইল তখন সকলেই নীরব। কিন্তু বোধ হয় আমাদের এতদূর বলা অন্যায় হইয়াছে কেননা, 'মৌনঙ সম্মতি লক্ষণঙ।'

'কোন ২ দেশীয় সম্বাদপত্রে ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া অনেক কথা কহা হয়। যে পর্যন্ত সেই কথাগুলি উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কোন সাধারণ ক্রিয়াকলাপের উপর প্রযুক্ত হইতে পারে, সে পর্যন্ত কেহই তাহাতে কোন দোষ ধরিতে পারেন না। ...কিন্তু আমি আপন বাটির অন্দরে বসিয়া কি করিলাম এ কথা লইয়া যদি কোন সম্পাদক আপনাব সম্বাদপত্রে আন্দোলন করেন তবে আমাকে অবশ্য বলিতে হইবে যে সম্পাদকটি কখন ভদ্রতা কাহাকে বলে তাহা জানেন না এবঙ তাহা কখন শিখিবারও চেষ্টা করেন নাই।'

'কোন ২ সম্বাদ পত্রে 'উদ্ধৃত' 'প্রাপ্ত' শীর্ষক এক প্রকারের প্রস্তাব অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। সম্পাদকগণ যেন এটি না মনে করেন যে উক্ত শব্দদ্বয়ের মধ্যে কোন একটি তাঁহাদের সম্বাদ পত্রস্থ কোন প্রস্তাবের শিরোদেশে লিখিত থাকিলেই তাহাদের সেই প্রস্তাবের সহিত কোন সম্বন্ধ রহিল না। সম্পাদক তাহার পত্রের প্রত্যেক কথার জন্য দায়ী।..' ৩০.৮.১২৮০, প. ৮৯-৯০। (১৪.১২.১৮৭৩)

বোঝা যায়, এটি রূপান্তরিত সম্পাদকীয় রচনা। তা কিছু ফলপ্রদ হওয়ায় একই শিরোনামে অনুরূপ একটি দীর্ঘতর রচনা পত্রাকারে ২৮.৯.১২৮০ (১১.১.১৮৭৪) এবঙ ৬.১০.১২৮০ (১৮.১.১৮৭৪) তারিখে প্রকাশিত হয়। 'ক' কাজ শেষ হল।

সাহেবের কাছে বিজিত বাঙালির আত্মমর্যাদাবোধ ক্রমশ ফুটে উঠছিল। ঘটনা, ব্যক্তি ও সময়ের উপর ব্যবহারে পার্থক্য হত। কোনো শাহেবের সঙ্গে আচরণে উপযুক্ত সম্মানের হানি হওয়ায় ক্ষুব্ধ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সুযোগ পেলে, চেয়ারে বসে সামনে--দাঁড়ানো সাহেবের দিকে টেবিলের উপর পা তুলে চটি নাচিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে, অনুমতি না নিয়ে 'বঙ্গবাসী' অফিসে শাহেব পুলিশ তাঁর কাছে গেলে, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ বেয়ারা ডেকে অপমান করে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বোনপো কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, যে এমন দুর্ব্যবহার পেলে তিনি সাহেব ধরে পেটাতেন। নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী ফুটবল খেলায় সুযোগ পেলে 'ফাউল' করে বিপক্ষের সাহেব খেলোয়াড়কে জখম করতেন। বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সাহেব মিলিটারির নিষেধ অমান্য করে, জোর করে রেড রোড দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি করে গিয়ে হৈ-চৈ তুলেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র শরীর ও চাকরিতে দুর্বল। মায়ের মৃত্যুর পর মাতাল সাহেবের হাতে শারীরিক নির্যাতন সহ্য করেছিলেন। দেশের লোকের মনে শাহেব-বিরোধিতা ছিল। সেই মনোভাবের প্রশ্রয়ে তিনিও শাহেব-নিগ্রহ করতে চেয়েছেন।

এই 'খ'-এর দুটি অঙ্গ—রচনা ও ঘটনা। সঙবাদপত্রে আক্রান্ত হওয়ার পরেই

বঙ্কিমচন্দ্র 'সাধারণী'র প্রথম সঙ্খ্যায় ২৬.১০.১৮৭৩ (বাঙলা ১১.৭.১২৮০) তারিখে বেনামি প্রবন্ধ লিখলেন 'জাতিবৈর'। তা আক্রমণের জবাব।

তখন ঘটনার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে একটি সুযোগ এসে গেছে। নিচে খবরের কাগজ থেকে একটি ঘটনার বর্ণনা উদ্ধার করা হল।

'প্রাপ্ত পত্র।

ঘোড়া চড়ার ব্যাঘাত।

'মহাশয়!

গত ৬ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার বেলা ৬½ টার সময় আমরা কয়েকজন বন্ধু একত্র অত্রত্য 'ক্যাণ্টনমেণ্ট অভিমুখে' বেড়াইতে যাইতেছিলাম। পথিমধ্য হইতে দেখিতে পাইলাম 'ম্যাগাজিনের' সম্মুখে কয়েক জন সিপাহী বহরমপুর কলেজের সিভিল সার্ভিস ক্লাসের একটী ছাত্র অশ্বারোহণে উক্ত রাস্তা দিয়া গমন করায় তাহাকে যত্পরোনাস্তি অপমান করিল ; ইহা দেখিয়া আমরা দ্রুতপদে তথায় গমন করিলাম। গিয়া শুনি গাড়ি ও অশ্বারোহণে এ রাস্তা দিয়া যাওয়া নিষেধ ; ইহার পর কারণ জিজ্ঞাসা করায় উক্ত সিপাহীগণ কর্তৃক যথেষ্ট অপমানিত হইয়া জ্ঞাত হইলাম যে, কর্ণেল ডাফিন সাহেবের এইরূপ আদেশ, কারণ তিনিই জানেন।

'মহাশয়, নির্দোষী ভ্রাতার কষ্টের শেষ ছিল না। সিপাহীরা তাঁহাকে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ করিয়া ফৌজদারি মোকদ্দমার আসামীর মত হাজতে লইয়া যায়, একি! আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া নিস্তব্ধভাবে কিয়ত্ক্ষণ দণ্ডায়মান রহিলাম। ভদ্র ব্যক্তি অনন্যোপায় হইয়া অতি কাতরভাবে বলিলেন, 'মহাশয় আমি অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছি, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া কালেজের প্রিন্সিপাল সাহেবকে জানাইলে বাধ্য হইব।' আমরা এই কাতরোক্তি শুনিয়া কালেজের প্রিন্সিপাল হ্যান্ড সাহেবের বাসায় গিয়া তাঁহাকে এই সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত করাতে তিনি স্বয়ঙ আসিয়া সিপাহীগণকে অশ্বমুক্তি করণের এবঙ উক্ত ছাত্রটীকে ছাড়িয়া দিবার নিমিত্ত বলেন, কিন্তু তাঁহারা অস্বীকার করায় স্বয়ঙ কর্ণেল সাহেবের নিকট গিয়া মুক্তি সম্পাদন করেন। শুনিতেছি প্রিন্সিপাল সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এতত্সম্বন্ধে লিখিয়াছেন এবঙ উক্ত ছাত্রটীও অভিযোগ করিবেন, দেখা যাউক, কি হয়।

শ্রীঃ

বহরমপুর।'

এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ : ২১.৫.১২৮০। (৫.৯.১৮৭৩)

পরে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কর্নেল ডাফিনের গোলমাল হয়েছিল। তা যে কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়,—এমন ঘটনা ডাফিন আগেও ঘটিয়েছেন, এবঙ এর জন্য শহরের লোকের মনে ডাফিনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ছিল, উপরের বর্ণনা তার প্রমাণ। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াভেল এই বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক করলেন, যে

কাছাকাছি ছদ্মবেশী সাক্ষী রেখে তিনি পালকিতে করে আদালত থেকে ওই পথে বাড়ি ফিরবেন। ঘটনাটি যে পূর্বপরিকল্পিত তা মনে করার পক্ষে কয়েকটি কারণ আছে, যেমন -- (ক) পূর্বের ঘটনা ও সাধারণের ক্ষোভ, (খ) ম্যাজিস্ট্রেটের আগে-জামা বিষয় ও বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষী পাওয়া, (গ) খবরের কাগজে প্রচারিত নিন্দাকে প্রতিহত করার চেষ্টা, এবঙ (ঘ) ঘোড়ার গাড়ির বদলে পাল্‌কি ব্যবহার। পালকির যাত্রী সাধারণত মেয়েরা এবঙ কখনও মফস্বলে ছেলেরা। হাকিম আদালত থেকে পালকিতে বাড়ি ফিরতেন না। ঘোড়ার গাড়ি ভাড়ায় মিলত। পালকি ব্যবহারের কারণ আক্রান্ত ব্যক্তি প্রথমে আত্মপরিচয় গোপন রাখতে ও আক্রমণকারীকে উত্তেজিত হওয়ার সুযোগ দিতে পারতেন।

৫. ১.১৮৭৪ তারিখের 'বিশ্বদূত' সঙবাদপত্রে জনৈক বহরমপুরবাসী লিখেছেন, যে চারজন য়ুরোপীয়--জেলা জজ, জনৈক খ্রিস্টান পাদ্রি, একজন রেশম-ব্যবসায়ী ও কর্নেল ডাফিন মিলিটারি ক্যান্টনমেন্টের মাঠে ক্রিকেট খেলছিলেন। বিকালে মাঠের কোনাকুনি রাস্তায় বঙ্কিমচন্দ্র পালকিতে যাচ্ছিলেন। ডাফিন পালকি থামান এবঙ বঙ্কিমচন্দ্রকে ফিরে যেতে বলেন। বঙ্কিমচন্দ্র পালকির বাইরে এসে জজকে বলেন, এবঙ পরে পাদ্রিকেও বলতে যান। তখন ক্রুদ্ধ ডাফিন তাঁকে হিন্দিতে উচ্চৈঃস্বরে চলে যেতে বলেন, এবঙ হাত ধরে টেনে সরিয়ে দেন। জজ বেনব্রিজকে বঙ্কিমচন্দ্র পরের দিন আদালতে পেশ-করা অভিযোগে সাক্ষী মানেন, যদিও পরে তাঁর অন্যান্য সাক্ষীর কথা থেকে ঘটনা প্রমাণিত হয়েছিল। জজ ছিলেন ডাফিনের বন্ধু। তিনি সঙ্কটে পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে মামলা মিটিয়ে নিতে বলেন। শেষ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের শর্ত অনুসারে কর্নেল ডাফিন আদালতের সামনে জনসমক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ক্ষমা চান। তখন বঙ্কিমচন্দ্র মামলা তুলে নেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মহত্ত্বের ফলে এটা সম্ভব হল।

দুর্বল ছাত্রটি যা পারেনি, ঘটনা অঙশত সাজিয়ে ১৫ ডিসেম্বর বঙ্কিমচন্দ্র তা করেন। ডাফিন তাঁর হাত ধরে সরিয়ে দিলে বঙ্কিমচন্দ্র বেনব্রিজ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে বেনব্রিজের কাছে কিছুদিন আইন পড়েছেন, যশোরে কিছুদিন একত্রে চাকরি করেছেন, এবঙ বহরমপুরে। দুজনের ভালো পরিচয় ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে আরও সাক্ষী ছিলেন।

পরদিন বঙ্কিমচন্দ্র ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে যখন অভিযোগপত্র পেশ করেন, তখন নির্দিষ্ট উকিলের অতিরিক্ত শহরের বাকি সব উকিল এসে বঙ্কিমচন্দ্রের ওকালতনামাতে যেচে সই করেন। স্থানীয় ক্ষোভ এত প্রবল ছিল। ডাফিন প্রথমে উকিল বা সাক্ষী জোগাড় করতে পারেননি। বিপদ বুঝে তিনি বেনব্রিজ শাহেবকে ধরেন। বিপদ বেনব্রিজেরও--দু পক্ষ পরিচিত। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলে ডাফিনকে তাঁর শর্তে রাজি হতে বলেন। জানুয়ারির প্রথমে শুনানির দিন আদালতের সামনে প্রায় এক হাজার ইঙরেজ-বাঙালি জনতার সামনে ডাফিন বাধ্য হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র মামলা প্রত্যাহার করেন। তা

সাধারণ বাঙালির কাছে বিরাট জয় বলে মনে হয়েছিল।

অধ্যাপক সুধাকর চট্টোপাধ্যায় লালগোলারাজ যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়ের (১৮৫৩?-১৯৪৬) দাক্ষিণ্যে লেখা তাঁর 'মহামানব জাতক' (১৩৫৪) নামে জীবনীতে লেখেন, যে যোগীন্দ্রনারায়ণ ১২৭১-৭৪ শনে বহরমপুরে ছাত্র (প. ২৭-২৮), ১২৭৯ থেকে ১২৮১ বৈশাখ পর্যন্ত বহির্বাঙলায় সন্ন্যাসী (প. ৩৩-৪১), এবঙ ১২৭৪ শনে বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে--ডাফিনের বিরুদ্ধে মামলায় সাক্ষী (প. ২৭) ছিলেন। অশুবিধা শুধু এই, যে মামলা ১২৭৪ শন নয়,--১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে (পৌষ ১২৮০ শনে) শেষ হয়, যখন যোগীন্দ্রনারায়ণ বাঙলার বাইরে সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁর সাক্ষী হওয়ার সুযোগ ছিল না। এই বই লেখার প্রায় বিশ বছর আগে শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'লালগোলার মহারাজ বাহাদুরের জীবনচরিতে' (জন্মভূমি : অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন ১৩৩৬) এমন কোনো প্রসঙ্গ নেই। 'মিথ্যার বেসাতি' কি ছাপার ভুলে 'মহামানব জাতক' হয়েছে?

একদা এই মামলা দেশে খুব প্রচারিত হয়েছিল। তখনকার সঙবাদপত্র থেকে তার কিছু সাক্ষ্য তুলে ধরা সম্ভব। যেমন--

We are glad to learn from the *Moorshidabad Patrika* that Babu Bunkim Chunder Chatterjea, the Dy. Magte. while returning home from office on the 15th December last, was asaulted by one Lt. Colonel Duffin of Berhampore Cantonment, and received several violent pushes at his hands. It appears that the Baboo was passing in a palkee across a cricket ground where Mr. Duffin and some Europeans were playing. This was deemed a great *beadubee* on the part of the Babu and Mr. Duffin felt himself fully justified in chastising him with blows. The *Patrika* says that the Babu has brought a criminal case against his oppressor and it has caused as it ought a great sensation in Berhampore..

Amrita Bazar Patrika : 8.1.1874

..It appears that the Colonel and the Babu were perfect strangers to each other, and he did not know who he was when he affronted him. On being informed afterwards of the petition of the Babu, Col. Duffin expressed deep contrition and made a desire to apologise. The apology was made in due form in open court where about a thousand spectators, native and European, were assembled.

Amrita Bazar Patrika : 15.1.1874

বঙ্কিমচন্দ্রের 'খ' কাজ শেষ হল। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র মন্তব্য তিন মাসে বদলে গিয়েছিল। নিচে অন্যান্য কাগজ থেকে খবর সঙ্কলিত হল।

Baboo Bunkim Chatterjee, Editor of the *Bunga Durson*, has charged Lieutenant-Colonel Duffin, with assaulting him.

***Friend of India* : 15.1.1874**

The *Bengalee* states that Lieutenant-Colonel Duffin, who assaulted a native editor, has apologised to the Baboo and that the charge against the former has been withdrawn.

Friend of India : 22.1.1874

We learnt that Lieutenant-Colonel Duffin of Berhampore, who assaulted Baboo Bankim Chunder Chatterjee when the latter was passing in a *palki* across a cricket ground where the former was playing with some friends, has apologised to the Baboo. The criminal case against the Lieutenant-Colonel has therefore been withdrawn.

Bengalee : 17.1 1874

Sometime ago we received a letter stating that Babu Bunkimchunder Chatterjea, Deputy Magistrate, Berhampore, was assaulted by Lieut. Col. Duffin of that city. Soon after we were requested not to publish the letter, which was consequently withheld. It is now stated that the gallant son of Mars has since made an apology to the Babu.

Hindoo Patriot : 19.1.1874

We learn that the Lieutenant-Colonel Duffin, of Berhampore, who assaulted Baboo Bunkim Chunder Chatterjee when the latter was passing in a *palki* across a cricket ground where the former was playing with some friends, has apologised to the Baboo. The criminal case against the Lieutenant-Colonel has therefore been withdrawn.–*Bengal Times.*

Indian Observer : 24.1.1874

গতবারে আমরা বহরমপুর ক্যাণ্টোনমেণ্টের কর্ণেল ডাফিন কর্তৃক বঙ্কিম বাবুর অপমান ও তদ্বিষয়ে যে অভিযোগের কথা লিখিয়াছিলাম, তাহা মিটিয়া গিয়াছে। যেরূপে মিটিয়াছে তাহাতে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ডাফিন বঙ্কিম বাবুকে চিনিতেন না, পরে জানিতে পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হন এবঙ প্রকাশ্য আদালতে প্রায় এক সহস্র দেশীয় ও ইউরোপীয়ের সম্মুখে বঙ্কিম বাবুর নিকট যথারীতি ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

সোমপ্রকাশ : ৭.১০.১২৮০ (১৯.১.১৮৭৪)

বহরমপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একদিন পাল্কী করিয়া সাহেবদের ক্রিকেট খেলার জমির উপর দিয়া যাইতেছিলেন। তাহাতে কর্ণেল ডাফিন নামে একজন সৈনিক পুরুষ তাঁহাকে বিনাদোষে অপমান করে। বঙ্কিম বাবু উক্ত সাহেবের নামে অভিযোগ উপস্থিত করায় সাহেব এখন স্বীয় দোষ স্বীকার পূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। নির্দোষ ভদ্রলোককে এই প্রকার বিনা অপরাধে অপমান করার কথা শুনিয়া আমাদিগের শোণিত এখন ক্রমে শীতল হইয়া আসিতেছে।

সুলভ সমাচার : ৮.১০.১২৮০ (২০.১.১৮৭৪)

বহরমপুরে কর্ণেল ডাফিন নামে এক ব্যক্তি ধাক্কা মারিয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অপমান করেন। তাঁহাদের ক্রীড়াভূমি দিয়া বঙ্কিমবাবু পাল্কিতে গমন করিতেছিলেন। ঐ ব্যক্তি বঙ্কিমবাবুকে না জানিয়াই ঐরূপ ঔদ্ধত্যের কর্ম করিযাছিল। এক্ষণে ঐ কর্ণেল সাহেব প্রকাশ্য আদালতে বঙ্কিম বাবুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন।

এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ : ১১.১০.১২৮০ (২৩.১.১৮৭৪)

হিন্দুরাই মার খায় কেন?

..দুই একজন ইঙরেজের সহিত মুসলমানদিগের যে বিবাদ হয়, তাহাতেও মুসলমানেরাই প্রায় জয়লাভ করে। আমাদিগের সহযোগী হিন্দুহিতৈষিণীর সম্পাদক বঙ্কিম বাবুর অপমানের উল্লেখ করিয়া মুসলমানদিগের বর্তমান সাহসিকতার উল্লেখ করিয়াছেন। ..হিন্দুদিগের বলবীর্য ও সাহস কম, এই জন্যই কি মার খায়? তাহারা শান্ত, এই জন্যই কি মার খায়? তাহারা শত্রু কর্তৃক অপমানিত হইয়া ক্ষমা করিতে জানে, এই জন্যই কি মার খায়? পাঠকগণ ইহার কারণ নির্দেশ করুন। ..এ প্রকার উদাহরণ কত উল্লেখ করিব? ..'এই যে সে দিন বঙ্কিম বাবু যে প্রকারে অপমানিত হইলেন, কোন সাহেব তদ্রূপ অপমানিত হইলে এত দিবস বাঙ্গালির ভাগ্যে কি ঘটিত বলা যায় না। উচ্চশ্রেণীর গণ্যমান্য ইঙরাজি পত্রের সম্পাদকগণ, বাঙ্গালির মৃত্যুশর আনিয়া এত দিন গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করিতেছেন। ..শান্তপ্রকৃতি বাঙ্গালী অপমানিত হইয়াছেন, এ আর অপমান কি? তাঁহারা মৌনব্রত হইয়া আছেন।

বঙ্কিম বাবু ক্ষমা করিয়া কেবল শান্তপ্রকৃতির পরিচয় প্রদান করেন নাই, সময়োচিত নিবেদনঞ্চ বিশেষ পর্যন্ত করিয়াছেন। সুতরাঙ ইহাতে বাঙ্গালি জাতির উদারতা ও সৌজন্য বিলক্ষণ প্রকাশিত হইল। কিন্তু উচ্চাসন শাসনকর্তাগণ কি ক্ষমা প্রার্থনাই যথেষ্ট মনে করিলেন? তাঁহারা কি দেখিতে পাইতেছেন না, বাঙ্গালির সৌজন্যে অনেক ইঙরেজ আমাদিগের প্রতি ক্রুর ব্যবহার করিয়া ইঙরাজ নামের কলঙ্ক করিতেছে?

গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা : ১২.১০.১২৮০ (২৪.১.১৮৭৪)

'গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা'র সম্পাদকীয় প্রবন্ধ থেকে সাধারণের ইঙরেজ-বিরোধী মনোভাব, এবঙ ডাফিনের মামলায় বঙ্কিমের বিজয়ে বিজিতের গ্লানিমুক্তির মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। এখানে ব্যক্তি বঙ্কিম নেই,—একটি জাতীয় অবস্থান আছে মাত্র। ঠিক তখন এর বিরুদ্ধে কথা বলা ঝুঁকি নেওয়া মাত্র। আবেগ কমে এলে একটি বাঙলা সাময়িকপত্রে লেখা হল—

সঙবাদ।

আমরা শুনি যে ডাফিন সাহেব বঙ্কিম বাবুকে যে চপেটাঘাত করেন, তাহাতে সাহেবের হাতে যে বেদনা লাগে এবঙ তিনি মারিবার সময়ে অস্পৃশ্য বাঙ্গালিকে স্পর্শ করিয়া যে গ্লানি সহ্য করেন ও বঙ্কিম বাবু ডাফিন সাহেবের নামে রাজ বিচারালয়ে

অভিযোগ করিয়া যে বেয়াদবী করেন, তন্নিমিত্ত তিনি সহস্র ব্যক্তির সম্মুখে গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া শূন্য পায়ে যোড় হস্তে ডাফিন সাহেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন, কিন্তু বঙ্কিম বাবুর আত্মীয় স্বজন বলেন, তাহা নয়, সাহেব প্রকাশ্যরূপে বঙ্কিমবাবুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। ইহার কোনটী সত্য, তাহা আমরা জানি না।

বসন্তক : ১ম খণ্ড, ১ম সঙ্খ্যা (১৪. ৫. ১৮৭৪)

এই বিবরণ দলাদলির উদাহরণ। এই পত্রের গোষ্ঠী হাটখোলার দত্ত পরিবারের প্রাণনাথ-গিরীন্দ্রকুমার এবঙ তাঁদের সহযোগীদের। পরের উদাহরণ অক্ষয়চন্দ্র সরকার। এসব আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গের বাইরে। এখানে প্রাসঙ্গিক উল্লেখ থাকবে মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে অক্ষয়চন্দ্রের বিরোধ ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে জাত। বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো সদ্ব্যবহার এর অবসান ঘটাতে পারেনি। পরে যে-কোনো বঙ্কিম-বিরোধিতার আভাস পেলে অক্ষয়চন্দ্রের সহমর্মিতা দেখা গেছে। উদাহরণ নবীনচন্দ্র সেন। এমনকি প্রেমবর্ণনা উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য হয়ে ওঠায় শিবনাথ শাস্ত্রী, নবীনচন্দ্র সেন ও অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বঙ্কিম-বিরোধিতায় মিল ও ঐক্য ছিল।[৪]

একথা ঠিক, যে ডাফিনের মামলায় ডাফিনের দোষ বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে। কিন্তু সাধারণেব বিচরণভূমিকে নিজেদের ব্যক্তিগত জমি হিশাবে ব্যবহার করার যে চেষ্টা ডাফিন করেছিলেন, তার বিচার হয়নি। ওই অবস্থায় এই বিরোধের ভিন্ন অর্থ থাকা অস্বাভাবিক ছিল না। অক্ষয়চন্দ্র তা উপেক্ষা করে ভাবলেন, যে ডাফিন এত নিন্দনীয় নন। অথচ তিনি ব্যক্তিগতভাবে ঘটনাটি জানতেন না। তার প্রায় এক বছর আগে তিনি বহরমপুর ছেড়ে চুঁচুড়ায় এসেছেন। তাঁর সম্পাদিত 'সাধারণী' সঙবাদপত্রে এই বিষয়ে কোনো খবর অথবা মন্তব্য প্রকাশ করলেন না। অনেক পরে অক্ষয়চন্দ্রের বঙ্কিম--বিরোধিতা যখন বঙ্কিমচন্দ্রের আমলে প্রায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে সক্রিয়, তখন হুগলির তারকনাথ বিশ্বাস সাহিত্যচর্চায় অক্ষয়চন্দ্রের শিক্ষানবিশ ছিলেন। তারকনাথের বঙ্কিম--সাহচর্য ও ভক্তি ছিল। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহায্য পেয়েছিলেন, এবঙ তা অনেকটা ভুলেছিলেন। একটি কারণ অক্ষয়চন্দ্র। তার পরে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনীকার, ভাইপো শচীশচন্দ্র যখন বঙ্কিমচন্দ্রকে উজ্জ্বল করতে গিয়ে দিগম্বর বিশ্বাসের গায়ে কালি ছেটান, তখন ছাই-চাপা আগুনে ঘি পড়ল। ফলভোগী মৃত বঙ্কিমচন্দ্র। তারকনাথ ৯/১০ বছর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রথম দেখেন। তার তিন বছর পরে যখন ডাফিনের ঘটনা ঘটে, তখন তিনি বর্ধমানে স্কুলে পড়েন। ব্যক্তিগতভাবে তিনিও কিছু জানতেন না। কিন্তু শচীশ--বিপক্ষতার ক্রোধের আগুনে সহায় অক্ষয় হাওয়া বঙ্কিমের গায়েও তাপের হল্কা ছুঁইয়েছে। তারকনাথ লিখলেন—'শচীশ বাবু কর্ণেল সাহেবের দোষ যেরূপ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তত দোষ তাঁহার ছিল না বলিয়াই শুনিয়াছি। কেন না এই বিষয়টি লইয়া সে সময় বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল এবঙ আমারও কিছু স্মরণ আছে। যাহা স্মরণ আছে তাহা উল্লেখ না করিয়া এইমাত্র বলিতে পারি যে এই অঙশটুকু পরিত্যক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।' অক্ষয় প্রতিফলন।

বঙ্গাদর্শন প্রেস ইতিপূর্বে কাঁটালপাড়ায় এসেছিল। ছাপাখানার মালিক সঞ্জীবচন্দ্র বর্ধমানে কর্মরত, এবঙ বঙ্গাদর্শন পত্রের কার্যাধ্যক্ষ পূর্ণচন্দ্র হুগলিতে চাকরি করেন। বাড়ির কাছাকাছি থাকা সুবিধাজনক। ডাফিনের ঘটনায় বাড়াবাড়ি হতে পারে। জেলা শহরে পরে ভয় বেশি। কলকাতায় অথবা দূরে কোথাও থাকা নিরাপদ। বহরমপুর তখন খুব স্বাস্থ্যকর ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছিল না। আগে খারাপ স্বাস্থ্য নিয়ে, ছুটি না নিয়ে তিনি কাজের চাপে হিমসিম খাচ্ছিলেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও বিভাগীয় কমিশনারের হাতে সমান দক্ষ কর্মচারী আর নেই। তাঁরা ছাড়বেন না, বরঙ বেশি ক্যাজুয়াল লিভ দিতে রাজি। নইলে রোড-সেসের কাজ চালানো কঠিন হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপর আবার relief-এর কাজ দিতে হয়েছে। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষুব্ধ। মায়ের মৃত্যু ছাড়া তিনি বহরমপুরে ছুটি নেননি,—এমনকি ১৮৭১ মে মাসে মঞ্জুর-হওয়া এক মাসের ছুটিও নয়। অথচ মাতৃশ্রাদ্ধের পর ফিরতে দু দিন দেরি হওয়ায় ছুটি বাড়ানো হয়নি। মাইনে কেটে নেওয়া হয়েছে। হৃদয়হীন উপরওয়ালার কথা তিনি শুনবেন কেন? চেষ্টা করেও বদলি বা প্রিভিলেজ লিভ পেলেন না। বাধ্য হয়ে ডাক্তারের সার্টিফিকেটে অসুস্থ হয়ে চার মাসের ছুটি পেলেন। অবশ্য ছুটি ফুরোবার আগে তিনি অন্যত্র কাজে যোগ দিয়েছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গো মনোমালিন্য হল। ৩.২.১৮৭৪ তারিখ থেকে তাঁর ছুটি শুরু হয়। ২২.১.১৮৭৪ তারিখে তিনি বহরমপুর থেকে জগদীশনাথ রায়কে চিঠিতে লেখেন—Dwarkanath De relieves me–I came thus on the 4th Feby–I got the famine work here, but I won't stay.

বঙ্কিমচন্দ্রের বহরমপুর ত্যাগ করার একটি বড় কারণ শোক ও ভয়। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের শেষ ৯ মাসে তিনটি মৃত্যু, এবঙ তার ফলে ভবিষ্যতের চিন্তা মাথায় এসেছে। মৃত্যুগুলি এই—মা দুর্গাদেবী (১-৩.৪.১৮৭৩), পরিচিত কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (২৯.৬.১৮৭৩), এবঙ ঘনিষ্ঠ বন্ধু দীনবন্ধু মিত্র (১.১১.১৮৭৩)। মায়ের কথা উপরে আছে। আঘাত ক্রমশ বেড়ে গেছে। মধুসূদনের সঙ্গো তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল, ঘনিষ্ঠতা বেশি ছিল না, তবে রসিকতা চলত। মধুসূদন কপর্দকশূন্য অবস্থায় শিশুসন্তান রেখে মারা যান। তাদের ভরণপোষণ হয় অন্যের বাড়িতে,—সাধারণের অর্থে। তহবিলে বঙ্কিমচন্দ্র দান করেছিলেন। তারকনাথ বিশ্বাস লিখেছেন—'বঙ্কিমবাবু মাইকেলের দুর্দশা দর্শনে একটু মিতব্যয়ী হইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। হিসাব-পত্র রাখায় তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না, যাহা করিত তাঁহার বিশ্বাসী কর্মচারী—উমাচরণ।' মধুসূদনের মতো দীনবন্ধুও কম বয়সে মারা যান। রেখে গেলেন আর্থিক অসচ্ছলতা ও কয়েকটি শিশুসন্তান। তখন কর্মচারী ছাড়া কেউ পেনশন পেতেন না। মন্দের ভালো এই, যে দেশে কিছু জমি ছাড়া কৃষ্ণনগরে বাড়ি এবঙ Hindu Family Annuity Fund থেকে বিধবার প্রতি মাসে ৩০ টাকা আমৃত্যু ভাতা। অল্পদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর বইয়ের বিক্রি বাড়াবার জন্য নিজে ভূমিকা লিখে তাঁর গ্রন্থাবলি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। পরে দ্বিতীয় প্রবন্ধ সহ আর-একটি সঙস্করণ। দুটি রচনার স্বত্ব বন্ধুপুত্রদের দিলেন এবঙ

তাঁদের আলাদাভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধদুটি প্রকাশ করতে পরামর্শ দিলেন। কিছু সাহায্য হল। দীনবন্ধুর ছেলে ললিতচন্দ্র লিখেছেন—'বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ প্রবন্ধ পাঠে মনে হয় তিনি আমার পিতৃদেবের মৃত্যুজনিত শোক নীরবে বহন করিতেছিলেন। কাহারও নিকটে যে কাঁদিয়াছিলেন তাহাও শুনি নাই। শোক তাঁহার হৃদয়ে পুঞ্জীভূত হইতেছিল। কিন্তু যেদিন আমাদের বাড়ীতে প্রথম পদার্পণ করেন, তাঁহার ক্ষত হৃদয়ের শোকরাশি সেতুবন্ধনে জলসঙঘাতের ন্যায় উছলিয়া উঠিয়াছিল। তিনি আমাদিগকে দেখিয়া, আমাদের বালিকা সহোদরাকে ক্রোড়ে করিয়া শিশুর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন। সে ঘটনা প্রায় চল্লিশ বত্সর পূর্বে হইয়াছিল, কিন্তু এখন আমার হৃদয়ে কল্যকার ঘটনার ন্যায় জাগিয়া আছে। সে দৃশ্য জীবনে কখন ভুলিব না।'

এই ঘটনাগুলি দুশ্চিন্তার জনক। তাঁর সঞ্চয় নেই কিছু, বরঙ কিছু ধার আছে। আগে ওকালতি করার ইচ্ছা প্রসঙ্গে তাঁর বিলাসিতা-বর্জনের নিষ্ফল প্রয়াসের কথা আছে। বহরমপুর বাসাভাড়া প্রসঙ্গেও আছে। পরিবারে নির্ভরশীল স্ত্রী ও তিনটি শিশুকন্যা আছে। বড়টির বিয়ে দিতে হবে। টাকার জন্য বিলাসিতা ছাড়তে হবে। বহরমপুরের জীবনযাত্রা একরকম ছিল। তা বদলাতে হলে বহরমপুর ছাড়া দরকার।

বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুর থেকে বদলি হলেন না, ছুটি নিলেন মাত্র। কিন্তু লোকে জানল, তিনি ফিরবেন না। দক্ষ ও সহানুভূতিশীল কর্মচারী, খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক, 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদক এবঙ ডাফিন মামলার বিজয়ী নায়ক বঙ্কিমচন্দ্র জনপ্রিয় হয়েছিলেন। জাঁকজমক করে বিদায়-সম্বর্ধনা জানানো হল। বঙ্গদর্শনের কার্যাধ্যক্ষ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বিজ্ঞাপন' দিয়ে জানালেন—'ভবিষ্যতে বঙ্গদর্শন সম্পাদকের নামে যিনি পত্রাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি বহরমপুরে ঠিকানা দিবেন না। বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে ঠিকানা দিবেন।' (সাধারণী : ১.২.১৮৭৪)

ছুটি নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নৈহাটির বাড়িতে ফিরে এলেন। প্রধান কাজ হল কলকাতায় Strand Road-এর Bengal Office-এ যাতায়াত করে বদলির ব্যবস্থা করা। ৩.২.১৮৭৪ তারিখে ছুটি শুরু হয়, ৪.৫.১৮৭৪ তারিখে তিনি বারাসতে রোড-সেসের কাজে অস্থায়ী বদলি হন। বাকি ছুটি বাতিল হয়।

বহরমপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনকথার সমাপ্তি এখানে। কিন্তু পরে ঘটে থাকলেও অন্তত তিনটি বিষয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁর বহরমপুরবাসের সঙ্গে জড়িত। বিষয়গুলি সম্বন্ধে সাধারণের মনে কখনও ভুল ধারণা প্রচলিত আছে, অথবা আদৌ কোনো ধারণা নেই। এই কারণে, লেখা শেষ করার আগে ওই বিষয়গুলি সম্বন্ধে ছোট বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন।

(ক)

সঙবেদনশীল লেখকের মনে অনেকদিন ধরে ডাফিনের মামলার প্রতিক্রিয়া চলেছে। আগে-বোনা বীজের ফলন যে শস্য, তা পেতে বঙ্গদর্শনের ব্যতিক্রম দেখা দরকার। ধর্ম ও রাজনীতি স্বরূপে এই পত্রে থাকত না। থাকা ব্যতিক্রম। বহরমপুরে শেষের

টানাপোড়েনের পরের বছর বঙ্গদর্শনে এমন লেখা চারটি :
'সর্ উইলিয়ম্ গ্রে ও সর্ জর্জ ক্যাম্বেল', জ্যৈষ্ঠ ১২৮১ (২.৫.১৮৭৪)
'বাঙ্গালির বাহুবল', শ্রাবণ ১২৮১। (১৯.৭.১৮৭৪)
'অধঃপতন সঙ্গীত', অগ্রহায়ণ ১২৮১। (৫.১২.১৮৭৪)
'সেকাল আর একাল', পৌষ ১২৮১। (১১.১.১৮৭৫)

প্রতিটি রচনা রাজনীতি-সম্পর্কিত, শেষটিতে প্রসঙ্গাত। প্রথম ও চতুর্থ রচনা পরে যথাক্রমে 'বাঙ্গালা শাসনের কল' ও 'অনুকরণ' নামে গ্রন্থিত। দ্বিতীয় রচনায় যে বাহুবলের কথা আছে, লেখকের মনে তার সূত্রপাত রেলগাড়ি ও মামলার ঘটনায়। 'অধঃপতন সঙ্গীত' নামে রাজনৈতিক কবিতার ব্যঙ্গের বক্তব্য একই। এগুলি রেলগাড়িতে নিগ্রহ, ডাফিনের মামলা এবঙ দেশি সঙবাদপত্রের নিন্দাবাদের প্রতিক্রিয়ার নৈর্ব্যক্তিক রূপ।

(খ)

কেউ কেউ বলেছেন, যে 'বন্দেমাতরম্' গানটি 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের অনেক আগে লেখা। 'অনেক' শব্দের অর্থ ছয় মাস, কি ষোল বছর, কি অন্য কিছু, তা ওই বক্তাদের প্ল্যানচেটে ডেকে জিজ্ঞাসা না করলে জানার উপায় নেই। এসব কথার জন্ম বঙ্কিমচন্দ্র মারা যাওয়ার অন্তত দশ--অর্থাত্ রচনার অন্তত পঁচিশ বছর পর থেকে। 'পরে' নয়, 'পর থেকে'। সমানে চলেছে। ভুত দেখার মতো, কেউ নিজে লিখতে দেখেনি,—অন্যের কাছে শুনেছে। প্রাথমিক, এমনকি দ্বিতীয়িক তথ্যসূত্রও এর পক্ষে নেই। এসব গুরুত্বহীন। বঙ্কিমচন্দ্র যখন চুঁচুড়ায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, তখন দুটি রচনাই লেখা হয়। একথা বলার পক্ষে একাধিক প্রামাণ্য তথ্য আছে।

এমন কথাও লেখা হয়েছে, যে 'বন্দেমাতরম্' বহরমপুরে লেখা। কারণ, তা 'অনেক' আগে লেখা। কেউ বলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আমার দুর্গোত্সব' (বঙ্গাদর্শন, কার্তিক ১২৮১, প্রকাশের তারিখ ১২.১০.১৮৭৪) বহরমপুরে লেখা। 'বন্দেমাতরমে'র সঙ্গে তার ভাবগত মিল আছে। এর উত্তর দুটি--(ক) প্রমাণ আছে, যে 'আমার দুর্গোত্সব' কাঁটালপাড়ায় লেখা। (খ) ভাবগত মিল কালগত ঐক্য নির্দেশ করলে, 'কৃষ্ণকান্তের উইল' 'বিষবৃক্ষে'র সমকালীন, কারণ দুটি উপন্যাসেই প্রেমাকাঙ্ক্ষী বিধবা মারা গেছে।

(গ)

প্রচারিত হয়েছে, যে 'কপালকুণ্ডলা'র অনুসরণে দামোদর মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩-১৯০৭) 'মৃণ্ময়ী' (১০.৮.১৮৭৪) নামে যে উপন্যাস লেখেন তা কপালকুণ্ডলার তুলনায় বেশি জনপ্রিয় ছিল, এবঙ বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থপ্রচারে উত্সাহী ছিলেন। দুটি বক্তব্যই ভুল। বঙ্কিমচন্দ্র বেঁচে থাকতে—১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কপালকুণ্ডলার প্রচারসঙখ্যা বেশি ছিল। দ্বিতীয় মিথ্যা বঙ্কিমচন্দ্র বেঁচে থাকতেই আত্মপ্রকাশ করেছিল ছদ্মবেশে। ছদ্মবেশে ছিল মৃণ্ময়ী উপন্যাসের আরম্ভে ছাপা লেখকের 'বিজ্ঞাপনে'। নিচে তার অঙশবিশেষ উদ্ধার করছি।

'বিজ্ঞাপন।

আমার এই সামান্য পুস্তকখানি প্রচারিত হওয়াতেই আমি সঙ্কুচিত হইতেছি। অপিচ বঙ্গীয় কাব্য-লেখক-চূড়ামণি শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখনী-প্রসূত সুবিখ্যাত পুস্তক কপালকুন্ডলাকে এতদ্দ্বারা হয় তো বিকৃত দশাপন্ন করিলাম ভাবিয়া আমি আরও সঙ্কুচিত হইতেছি। আমি এই অসমসাহসিকতার নিমিত্ত তাঁহার নিকট সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

* *

'..মৃণ্ময়ী কপালকুন্ডলার উপসঙহারভাগ মাত্র। ইহা মুদ্রিত করিতে হইলে কপালকুন্ডলার গ্রন্থকার বিখ্যাতনামা শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমতি গ্রহণ করা সর্বতোভাবে বিধেয়। বহরমপুর-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন মহাশয় সেই অনুমতি দেওয়াইবার জন্য সবিশেষ যত্ন করিয়াছেন।

* *

শ্রীদামোদর দেবশর্মা।'

অসতর্ক পাঠে মনে হবে, যে বঙ্কিমচন্দ্র অনুমতি দিয়েছিলেন। 'ক্ষমা প্রার্থনা' যে তার সঙ্গে সঙ্গাতিপূর্ণ নয়, মনে থাকবে না। 'যত্ন করিয়াছেন' হলেও অনুমতি না মেলায় 'ক্ষমা প্রার্থনা' করা হয়েছিল। বহরমপুরে তখন দামোদর ছাত্র। তাঁর মামা লোহারাম শিরোরত্ন বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচিত, এবঙ দুজনেই বহরমপুরে কর্মরত। প্রশ্ন, লোহারাম ছেড়ে রামদাস কেন? প্রৌঢ় দামোদরকে বইটির বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি কেন এড়িয়ে গিয়ে মেসের ছেলেদের দোষ দিতেন? কেনই বা বঙ্কিমভক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বইটির নিন্দা করে ও চুরি ধরে সমালোচনা করেছিলেন? যাহোক, 'মৃণ্ময়ী' প্রকাশের পর বঙ্কিমচন্দ্র নিচের বিজ্ঞাপন প্রচার করেছিলেন।

'বিজ্ঞাপন

কোন ব্যক্তি 'মৃণ্ময়ী' নামে গ্রন্থ প্রচার করিয়া বঙ্কিম বাবুর প্রণীত 'কপালকুন্ডলা'র পরিশিষ্ট বা Sequel বলিয়া পরিচিত করিয়া বিক্রয় করিয়াছেন।

জনসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে এই মৃণ্ময়ী গ্রন্থের সঙ্গে বঙ্কিমবাবুর কোন সঙস্রব নাই, এবঙ ইহা বঙ্কিমবাবুর অনুমতি ব্যতীত লিখিত এবঙ প্রচারিত হইয়াছে।'

সাধারণী : ১৮.৪.১২৮১, প. ১৯২। (2.8.1874)

'মৃণ্ময়ী'র সমকালে ১৫.৮.১৮৭৪ তারিখে 'কপালকুন্ডলা'র তৃতীয় সঙস্করণ প্রকাশিত হয়। আগের মতো এই সঙস্করণের শেষে ছিল—'নবকুমারের সঙজ্ঞালাভ হইবামাত্র, নিঃশ্বাস সহকারে বাক্যস্ফূর্তি হইল'। তার একটু আগে—'অনুভবে বুঝিলেন

কপালকুণ্ডলাও জলমগ্না আছেন'। এর সুযোগ নিয়ে দামোদর অন্যত্র তাদের উদ্ধার করে গল্প ফেঁদেছেন। 'বিজ্ঞাপন' তখনকার পাঠকদের জন্য। পরের পাঠকেরা সমাপ্তি থেকে বুঝবেন। বঙ্কিমচন্দ্র চতুর্থ সংস্করণে (১০.৩.১৮৭৮) সমাপ্তিতে আগের তিনটি অনুচ্ছেদ বাদ দিয়ে নতুন করে লিখলেন—

'সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে, বসন্ত বায়ুবিক্ষিপ্ত, বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার প্রাণত্যাগ করিলেন।' 'পঞ্চম সংস্করণও তা-ই। ষষ্ঠে (১৮৮৪) তা ইঙ্গিতবাহী হয়েছে। 'প্রাণত্যাগ করিলেন' হল 'কোথায় গেল?'

পরিবর্তনগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের বহরমপুর ত্যাগের পরে করা হয়, কিন্তু তাদের সূত্রপাত সেখানে।

১. মৃদুলকান্তি বসু—'বঙ্কিম-বিতর্ক', দেশ : সাহিত্যসংখ্যা ১৩৯৫, প. ১৮১-২।
২ মৃদুলকান্তি বসু—'প্রথম বাঙ্লা সামাজিক উপন্যাস', বাঙলাদেশ : শারদীয়া সংখ্যা ১৩৯২, প. ৩৯-৫২।
৩ মৃদুলকান্তি বসু লিখিত টীকাসহ প্রকাশিত 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি', প্রতিক্ষণ : ২.৮.১৯৮৭, প. ১১।
৪. মৃদুলকান্তি বসু—'বঙ্কিমচন্দ্র ও শিবনাথ শাস্ত্রী', সাহিত্য ও সংস্কৃতি : শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৯৫।

• আকাদেমি পত্রিকা : চৈত্র ১৩০১, মার্চ ১৯৯৫, প. ৯৭-১৩৪।

প্রথম বাঙলা সামাজিক উপন্যাস : বিষবৃক্ষ

উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকে কলকাতা-কেন্দ্রিক বাঙ্গালি জীবনযাত্রায় কিছু কিছু পরিবর্তন স্পষ্ট হতে থাকে। ততদিনে বাঙলা গদ্য কিছু অভিজ্ঞ হয়েছে। ফলে তখন থেকে গদ্যে বা পদ্যে পরিবর্তিত জীবন নিয়ে সামাজিক নকসা লেখা আরম্ভ হয়-- কলিকাতা কমলালয় (১২৩০), নববাবুবিলাস (১৮৫৩), নববিবিবিলাস, দূতীবিলাস, কলিকৃতুহল (১৮৫৩), কলিচরিত (১৮৫৫) থেকে অন্তত 'হুতোম প্যাঁচার নকসা' (১৮৬৪) পর্যন্ত। উপাখ্যানের ভাঁড়ারে এতদিন ছিল 'বিজয়বসন্ত' ধরনের দেশি উপকথা, বা 'চাহার দরবেশ' জাতীয় মুসলমানি আখ্যান। পরিবর্তন ও শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে তার সাথে যুক্ত হল বিলিতি কাহিনী। ল্যাম্ব অবলম্বনে সেক্সপিয়রের নাটকের গল্প, রাসেলাস, টেলিমেকস, রবিন্সন ক্রুশো, রোমান্স অব হিস্ট্রি ('ঐতিহাসিক উপন্যাস' বা 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ') থেকে পৌলভর্জিনী পর্যন্ত তার দৃষ্টান্ত। ইঙরাজি থেকে অনুবাদ অগ্রসর হতে থাকল বটে, তবে তখনকার প্রতিপক্ষের পালেও হাওয়া লেগেছিল। ফল নল-দময়ন্তী, কথাসরিত্‌সাগর, বত্রিশ সিঙহাসন, কাদম্বরী প্রভৃতির সহজ অনুবাদ। কিন্তু অনুবাদগুলিতে পরিচিত সমাজের কোনো উপাদান ছিল না, যা ছিল মৌলিক রচনাগুলিতে। এই উপাদান নানা কারণে বর্ণনামূলক আখ্যান থেকে নাট্যজাতীয় লেখায় বেশি ছিল : বাবু নাটক, কুলীনকুলসর্বস্ব (১৮৫৪), নীলদর্পণ (১৮৬০) প্রভৃতি তার উদাহরণ।

গদ্যকাহিনী মনোহর, এবঙ সমাজ-জীবন আকর্ষণীয়। দুয়েরই যে সাহিত্যিক চর্চা আরম্ভ হয়েছিল, উপরে তার নিদর্শন আছে। শতকের মাঝামাঝি মৌলিক গদ্যকাহিনী লেখা শুরু হয়েছিল। ফুলমণি ও করুণার বিবরণ (১৮৫২), আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮), চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান (১৮৫৯), সুশীলার উপাখ্যান (১৮৫৯-৬০) প্রভৃতি কাহিনীর মধ্যে তখনকার বাঙ্গালি সমাজের ছবি কম-বেশি ফুটে উঠেছে, এবঙ উপন্যাসের ভ্রূণ সৃষ্টি হয়েছে। এই লেখকেরা সকলেই ইঙরেজি-নবিশ। এ থেকে বোঝা যায়, দুটি ভিন্ন বিষয়ের বিকাশ ও সঙযোগের ফলে তখন মৌলিক বাঙলা উপন্যাস লেখার অবস্থা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু প্রথম মৌলিক ও পূর্ণাঙ্গ বাঙলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'তে (১৮৬৫) দেশি সামাজিক জীবনযাত্রা কোথায়? রচনারীতিতে তা বিলিতি আদর্শপুষ্ট এবঙ বিষয়ে ইতিহাসনির্ভর।

প্রায় এই সময়ে সমাজবিজ্ঞান শিক্ষিত বাঙ্গালিমহলে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। রেভারেন্ড জেমস্ লঙ (১৮১৪-১৮৮৭) বাঙ্গালি জীবনযাত্রার বর্ণনা করার জন্য ২৬.৪.১৮৬১ তারিখে বেথুন সোসাইটির সামনে *Five Hundred Questions on the subjects requiring investigation in the social condition of the natives of Bengal* নামে একটি রিপোর্ট দেন। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত *Selections from unpublished records of Government for the years* 1748 *to* 1767 গ্রন্থটি বাঙলাদেশের তত্‌কালীন সামাজিক জীবনযাত্রার বর্ণনা। ২৭.৪.১৮৬৬ তারিখে ফ্যামিলি লিটারারি সোসাইটিতে লঙ সাহেব, এবঙ ১৭.১২.১৮৬৬ তারিখে

এশিয়াটিক সোসাইটিতে মেরি কার্পেন্টার সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ২১ ১.১৮৬৭ তারিখে কলকাতার মেটকাফ হলে Bengal Social Science Association প্রতিষ্ঠিত হল। রেভারেন্ড লঙ এবঙ প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩), লালবিহারী দে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) প্রমুখ বহু বিশিষ্ট বাঙ্গালি তার সদস্য হলেন।

মাত্র একটি উপন্যাস থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক প্রয়োজন বোঝা কঠিন। তাঁর প্রথম উপন্যাস *Rajmohan's Wife* (১৮৬৪) সমাজ-নির্ভর। এমনকি তাঁর দ্বিতীয় বাঙলা উপন্যাস 'কপালকুন্ডলা' (১৮৬৬) অনেকটা ইতিহাস-আশ্রিত হলেও অপেক্ষাকৃত নিকটকালবর্তী এবঙ তাতে তীর্থযাত্রা, ঘটকালি, ডাকাতি, কুলীনের বহুবিবাহ, স্বামী বশীকরণ প্রভৃতি বিষয় ঢুকে পড়েছে। বাঙলায় সামাজিক উপন্যাস লেখার বিষয় বঙ্কিমচন্দ্রের মনে সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

অনেকে বলেন, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৪৩-১৮৯১) 'স্বর্ণলতা' প্রথম বাঙলা সামাজিক উপন্যাস। এবঙ তাঁরা বলেন, যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' একটি সামাজিক উপন্যাস। বিষবৃক্ষ 'বঙ্গদর্শনে' ১২৭৯ বৈশাখ-ফাল্গুনে ধারাবাহিক প্রকাশিত ও ১.৬.১৮৭৩ তারিখে গ্রন্থিত হয়। ৭.৭.১৮৭৩ তারিখে 'স্বর্ণলতা' লেখা শেষ হয়।[১] তার কিছুটা 'জ্ঞানাঙ্কুরে' ১২৭৯ আশ্বিন থেকে ১২৮০ ভাদ্র সঙ্খ্যায় ধারাবাহিক, এবঙ সম্পূর্ণ বই ২৮.৪.১৮৭৪ তারিখে প্রকাশিত হয়। অতএব, কালবিচারে বিষবৃক্ষের আগে স্বর্ণলতার দাবি প্রতিষ্ঠিত নয়।

১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন থেকে রেভারেন্ড লালবিহারী দে (১৮২৪-১৮৯৪) রচিত *Govinda Samanta, or Bengal Peasant Life* নামে একটি সামান্য কাহিনী-আশ্রিত বাঙ্গালি গ্রামজীবনের দীর্ঘ বর্ণনা প্রকাশিত হয়। প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত এই তিনটি প্রায় সমধর্মী লেখা বাঙলা সামাজিক উপন্যাস লেখার ভিত্তি তৈরি করেছিল।

এগুলি লেখার কারণ একটি পুরস্কার-প্রতিযোগিতা। উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮০৮-১৮৮৮) ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের প্রথমে ৫০ পাউন্ড বা ৫০০ টাকার একটি পুরস্কার ঘোষণা করেন।[২] তার বিজ্ঞাপন[৩] এই :—

'৫০০ টাকা পুরস্কার।

যাঁহারা বাঙ্গালা বা ইঙরাজী ভাষায় এতদ্দেশীয় জনগণের আচরিত সামাজিক ও গার্হস্থ্য ব্যবহার বিষয়ক প্রস্তাব উপন্যাস লেখার রীত্যনুসারে সবিস্তর বর্ণনা করিতে পারিবেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহার রচনা সর্বোত্কৃষ্ট হইবে, তিনিই ৫০০ টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেন।

আর যদ্যপি লিখিত উপন্যাসের রচনা-প্রণালী ও ভাবার্থ উত্তম ও সুশ্রাব্য না হয়, এবঙ বর্ণিত প্রবন্ধ মুদ্রিত সময়ে ৮ পেজি ফরমার ২০০ পৃষ্ঠা পরিমিত না হয়, তবে উক্ত পুরস্কার দেওয়া হইবেক না।

ঐ উপন্যাসযুক্ত প্রবন্ধ লেখা প্রস্তুত হইলে তাহা সন ১৮৭২ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে মোকাম কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরিতে শ্রীযুক্ত প্যারীচাঁদ মিত্রের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। ঐ রচনার ভাল মন্দ বিচারার্থে নিম্নলিখিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ পরীক্ষক নিযুক্ত হইলেন। যথা--

শ্রীযুক্ত হর্শেল সাহেব, নদীয়া সেশন জজ	১
শ্রীযুক্ত রেবরেন্ড লঙ	১
শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র	১
শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র	১
শ্রীযুক্ত বাবু দিগম্বর মিত্র	১'

প্রথমে ৫ জন বিচারক ছিলেন জন হর্শেল, রেভারেন্ড জেমস্ লঙ, রমানাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, এবঙ রাজেন্দ্রলাল মিত্র। পরে রমানাথ ঠাকুরের বদলে প্যারীচাঁদ মিত্র বিচারক হন।[৪]

২৩.২.১৮৭১ তারিখে 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' সরল ভাষা, সত্য বর্ণনা, সহানুভূতি প্রভৃতি গুণের উপর গুরুত্ব দিয়ে 'অলিভার টুইস্টের' মত রচনার প্রত্যাশা করেছিল। 'হিন্দু প্যাট্রিয়টে' রেভারেন্ড লঙ নতুন বিষয়টিতে লেখার জন্য ভাবী প্রতিযোগিদের কয়েকটি পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাতে ওয়াল্টার স্কট (স্কটল্যান্ড), মারিয়া এজওয়ার্থ (আয়ার্ল্যান্ড), তুর্গেনিভ (রাশিয়া), এবঙ বাঙলাদেশের প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিঙহের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছিল। সম্পাদক যোগ করলেন, যে রচনা আঙ্কল্ টমস্ কেবিনের মত ভাবালু না হওয়া ভালো।[৫] এই বিষয়ে বিলাতে 'টাইম্‌স্' এবঙ 'লন্ডন ডেলি নিউজ' ভালো প্রচার করে।[৬]

অল্পদিন পরে ভারতের বড়লাট লর্ড মেয়ো হিন্দু সামাজিক জীবনযাত্রার বর্ণনা করে বাঙলা গল্প বা উপন্যাস লেখার জন্য ৫০০ টাকার একটি পুরস্কার ঘোষণা করেন।[৭] রচনার পরিমাণ হবে কমপক্ষে ২০০ পৃষ্ঠা, এবঙ তা ১.৩.১৮৭২ তারিখের আগে হোম ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারির কাছে পৌঁছাতে হবে।[৮] এই পুরস্কারের সম্বন্ধে পরে কিছু জানা যায়নি।

দুজন ইঙরাজ বিচারকের বিলাত-প্রবাসের জন্য পুরস্কারের ফলপ্রকাশে দেরি হয়। প্রতিযোগিতায় অনেকগুলি বাঙলা এবঙ তিনটি ইঙরাজি রচনা জমা পড়েছিল। ইঙরাজি রচনাগুলির লেখক ছিলেন রেভারেন্ড লালবিহারী দে, রবার্ট নাইট এবঙ জনৈক ইঙরাজ ভদ্রমহিলা।[৯] ১৮৭৪ মার্চের শেষে প্রকাশিত ফলে লালবিহারী দে-র *Govinda Samanta, or Bengal Peasant Life* পুরস্কার অর্জন করে। বইটিতে কখনো জমিদারদের প্রতি আক্রমণ থাকলেও, লালবিহারী ব্যক্তিগতভাবে জয়কৃষ্ণের গুণগ্রাহী ছিলেন বলে 'হিন্দু প্যাট্রিয়টে' বইটি আলোচিত হয়নি।[১০] অন্য কাগজে তার রচনারীতির ত্রুটি নির্দেশ করা হয়েছিল।[১১] তিনটি নতুন অধ্যায়ে বর্ধিত বইটি কিছুদিন পরে লন্ডনে ম্যাকমিলান কোম্পানি দু খন্ডে প্রকাশ করে। জনপ্রিয় বইটির অনেক পুনর্মুদ্রণ হয়।

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, একই বছরে প্রকাশিত রমেশচন্দ্র দত্তের একটি গ্রন্থের নাম *The Peasantry of Bengal*। বাঙলা সরকারের নির্দেশে জর্জ গ্রিয়ার্সন ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে *Bihar Peasant Life* লিখেছিলেন, যার নাম ও বিষয়-সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

এই প্রতিযোগিতার পিছনে একটি মনোমালিন্যের নেপথ্য-কাহিনীর জন্য একটু পিছিয়ে যাওয়া দরকার।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আলিপুর থেকে ১৫.১২.১২৬৯ তারিখে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটর হিসাবে বহরমপুরে বদলি হন। তখন বহরমপুরে থাকতেন সাহিত্যিক মুন্সেফ গঙ্গাচরণ সরকার (১৮২৩-১৮৮৮), তাঁর ছেলে অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭), ঔপন্যাসিক তারকনাথ বিশ্বাসের পিতা সব-জজ দিগম্বব বিশ্বাস (১৮২৩-১৮৭৭), আইনের অধ্যাপক (পরে বিচারপতি) গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৯১৮), উকিল বৈকুণ্ঠনাথ সেন, সাহিত্যিক জমিদার রামদাস সেন (১৮৪৫-১৮৮৭) এবঙ শিক্ষক রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৩১-১৮৯৪)। স্কুলের পরিদর্শক ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪), পোস্ট অফিসের পরিদর্শক দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩) এবঙ জঙ্গীপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৮৪১-১৮৮৯) প্রায়ই বহরমপুরে যেতেন। তাছাড়া ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ওখানে হেড-মাস্টার ছিলেন রেভারেন্ড লালবিহারী দে।[১২] ওখানে অধ্যাপক হিসাবে তাঁর পদোন্নতি হয় ৮.৭.১৮৭১ তারিখে।[১৩] তাঁদের বন্ধনসূত্র ছিল সাহিত্যপ্রীতি।

বহরমপুর গ্র্যান্ট হল প্রধানত দিগম্বর বিশ্বাসের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত। প্রতি রবিবার সেখানে সাহিত্যসভা বসত। দিগম্বর ও গুরুদাস সেই সাহিত্যসভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন।[১৪] একটি পুরানো সঙবাদপত্র[১৫] থেকে জানা যায় যে—

'গত মঙ্গলবার রাত্রি ৭টার পরে বহরমপুর গ্রান্টস হলে সাধারণের উন্নতির জন্য একটী সভা হইয়াছিল। সেই দিবসই ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। ...সভা হইতে প্রতি মাসে একখানি করিয়া 'প্যামফেলেট' বাহির হইবে। সকলে একত্র হইয়া অত্রস্থ সাবরডিনেট জজ শ্রীযুক্ত দিগম্বর বিশ্বাস মহাশয়কে সভার প্রেসিডেণ্ট পদ অর্পণ করিলেন। এবঙ অত্রস্থ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি. এ. মহোদয়ের প্রতি ভাইস প্রেসিডেণ্ট পদ অর্পিত হইল। বহরমপুর কলেজের হেড মাস্টার শ্রীযুক্ত রেভারেন্ড লালবিহারী দে মহাশয়কে সেক্রেটারীর কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া সভা ভঙ্গ হইল।..'

অর্থাত্‌ ১২৭৬ শনের চৈত্রসঙ্ক্রান্তিতে এই সভার প্রতিষ্ঠা হয়।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শুনে গৌরহরি সেন লিখেছেন[১৬]—

'*Bengal Peasant Life*—প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ লালবিহারী দে এই সময় (১৮৭০-৭১) বহরমপুর কলেজে ইঙরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। Grant Hall Club নামক নব-প্রতিষ্ঠিত সভার তিনি সম্পাদক ও প্রধান কর্মী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র উহার সহকারী সভাপতি এবঙ তত্‌কালীন সবজজ দিগম্বর বিশ্বাস উহার সভাপতি ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সভায় *Indian Civilisation* সম্বন্ধে, স্যার গুরুদাস *Abused India Vindicated*

সম্বন্ধে এবঙ মতিবাবু *Polygamy* সম্বন্ধে, প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন। ..দিগম্বর বিশ্বাস বদলি হইয়া গেলে, স্যার গুরুদাস প্রস্তাব করেন যে, সহকারী সভাপতি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার স্থলে সভাপতি হউন। ইহাতে লালবিহারী অত্যন্ত বিরক্ত হন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষা ঢের ভালো ইঙরাজী জানেন এবঙ প্রেসিডেণ্ট পদে তাঁহাব পূর্ণমাত্রায় অধিকার। লালবিহারীর মনোভাব বঙ্কিম বুঝিতেন। স্যার গুরুদাস বঙ্কিমকে সভাপতি করিবার প্রস্তাব করিলে, বঙ্কিম তাহাকে বলেন 'করলেন কি?' ইহার পরে লালবিহারী ক্লাবে আসা বন্ধ করিলে উহা উঠিয়া যায়। অল্পদিন পরে লালবিহারী হুগলী কলেজে বদলি হন।'

গুরুদাসের জীবনীকার চুনীলাল বসু একই ঘটনার বর্ণনা করেছেন।[১৭]

প্রসঙ্গত জানানো দরকার—(ক) বঙ্কিমচন্দ্রের এই লুপ্তপ্রায় রচনাটি বিমলচন্দ্র সিঙহ উদ্ধার করে প্রকাশ করেছিলেন।[১৮] (খ) লালবিহারী ১২.১.১৮৭২ তারিখে বহরমপুর থেকে হুগলি কলেজে বদলি হন।[১৯] (গ) দিগম্বর বিশ্বাস ১১ নভেম্বর ১৮৭০ তারিখে বহরমপুরে কর্মভার ত্যাগ করেন।[২০] ২৮শে কার্তিক ১২৭৭ তারিখে বহরমপুবে প্রেমলাল চৌধুরির বৈঠকখানায় স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ব্যবস্থাপনায় দিগম্বর বিশ্বাসের বিদায় উপলক্ষে একটি বিরাট সভা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস, অক্ষয়চন্দ্র, তারাপ্রসাদ সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।[২১]

অতএব, বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতি হবার ঘটনা ১৮৭০ নভেম্বর-ডিসেম্বরে ঘটেছিল। পুরস্কার-প্রতিযোগিতার কথা ১৮৭১ ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হয়। তখন থেকে রচনা জমা দেওয়া পর্যন্ত দুজনেই বহরমপুরে : কিন্তু তাঁদের মধ্যে প্রীতির বাঁধন নেই।

লালবিহারী কিছুটা অর্থলোলুপ ছিলেন। ধর্মযাজনার কাজ ছেড়ে শিক্ষকতায় তাঁর যোগদানের কারণ ছিল সেটা। এই কাজে সরকারি বাধা ছিল তাঁর ধর্মযাজকতা। ছোটলাট বিডনের স্তাবকতা করে এবঙ শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা অ্যাটকিন্সন সাহেবকে ধরে তিনি সরকারি শিক্ষাবিভাগে চাকরি যোগাড় করলেন। সঙবাদপত্রে বিরূপ সমালোচনা[২২] ও প্রতিকূল সরকারি আলোচনার শিকার হলেন রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫)।[২৩] একই কারণে তিনি যেমন শিক্ষাবিভাগে থেকেও খ্রিস্টানি বিয়েতে রেজিস্ট্রারের কাজ করে পয়সা রোজগার করেছেন, তেমনি পুরস্কারের লোভে বন্ধু তারকনাথকে প্রতিযোগিতা থেকে নিবৃত্ত করেছেন, এবঙ পুরস্কার পাবার পরে বিচারক হর্শেলের প্রশস্তি গেয়েছেন।[২৪]

লালবিহারী ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে ব্যক্তিগত মনোমালিন্যের সৃষ্টি হল। লালবিহারীর দিক থেকে কারণ ছিল বোধহয় বঙ্কিমচন্দ্রের খ্যাতি ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যে ঈর্ষা। লালবিহারীর সাহিত্যিক বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১) এবঙ অক্ষয়চন্দ্র সরকার। অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল।

জয়কৃষ্ণের দেওয়া পুরস্কারের প্রতিযোগিতার কথা প্রকাশ হবার পরে রেভারেন্ড

হরিহর সান্যাল (১৮২০-১৮৮৭) তাঁর দুই বন্ধু তারকনাথ ও (পরে বেয়াই) লালবিহারীকে লিখতে বলেন। তারপর--

'তত্‌ক্ষণাত্‌ উভয়েই রাজী হন। উভয়েই এই চিত্র ইঙরাজীতে লিখিতে প্রবৃত্ত হন। দুই বন্ধু একত্র মিলিত হইলে লালবিহারী তারকনাথকে অনুরোধ করেন যে, এই উপন্যাস রচনায় তারকনাথ যেন অগ্রসর না হন, এবঙ তাঁহার রচনাও অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। তারকনাথও এই প্রতিযোগিতা রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবঙ তাঁহার রচনাও অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল। তিনি বন্ধু লালবিহারীর অনুরোধ রক্ষা করেন, তিনি লালবিহারীকে বলেন, তুমি ইঙরাজীতে লেখ, আমি এই চিত্রের বাঙ্গালা আরম্ভ করিব। ইহার এক বত্‌সর পরেই তারকনাথ স্বর্ণলতা রচনা আরম্ভ করেন।'[২৫]

অর্থাত্‌ 'স্বর্ণলতা' তারকনাথের অপ্রকাশিত ও সম্ভবত অসম্পূর্ণ ইঙরাজি উপন্যাসের আঙশিক অনুবাদ। বোধহয় অনুবাদকর্মের মধ্যে পরিমার্জনা ছিল : গ্রন্থনাকালেও সঙশোধন হয়। অতএব, এটি মূলত জয়কৃষ্ণ-প্রদত্ত পুরস্কারের জন্য লেখা।

লালবিহারী পুরস্কারের লোভে বন্ধুত্বের দাবিতে তারকনাথকে নিবৃত্ত করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপরে তাঁর কোনো জোর ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্র লিখেছেন[২৬]—

'..ছুটি লইয়াছেন,[২৭] আর দিবারাত্রি সাহিত্য-সাধনায় নিমগ্ন আছেন। নিজের লেখা নিজে নষ্ট করিতে প্রাণ ধরিয়া মানুষ যে সেরূপ পারে, বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনা দেখিবার পূর্বে আমার জ্ঞানই ছিল না। বিষবৃক্ষের এবঙ আনন্দমঠের সূতিকা-সমাচার আমি কিছু কিছু জানি। বিষবৃক্ষ বহরমপুরে হয়। প্রথম নাম হইয়াছিল, 'উভয়েরই দোষ'। নগেন্দ্র ও দেবেন্দ্রে বিপুল একটা মোকদ্দামা হাইকোর্টে পর্যন্ত হইয়াছিল। আমার সাক্ষাতে সেই খণ্ড খণ্ডীকৃত হইয়া অতলে গিয়াছে। সমগ্র 'উভয়ের দোষ' পাল্টাইয়া লেখা হইয়াছে 'বিষবৃক্ষ'। সমীচীন পাঠক বুঝিতে পারিবেন, উভয়েরই দোষ সাব্যস্ত হইলে--সূর্যমুখীর নিতান্তই দুর্দশা হইত। এখন যে ভাল হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাঁহার সাধনার কথা ভাবিলে এখনও সন্ত্রস্ত হইতে হয়। সেই সাধনাই একরূপ প্রতিভা..।'

তারকনাথের জীবনীকার সুরেশচন্দ্র নন্দীও লিখেছেন, যে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ পুরস্কারের জন্য উপন্যাস লিখেছিলেন।[২৮]

এ থেকে বোঝা যায়, যে বঙ্কিমচন্দ্র 'উভয়েরই দোষ' নামের রচনা ফেরত আনেন, তা সঙশোধন বা পুনর্লিখন করে তার নাম দেন 'বিষবৃক্ষ', এবঙ পুরানো পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে বহরমপুরের কাছে গঙ্গার জলে ফেলে দেন। তিনি নিশ্চয় আগেই জানতে পেরেছিলেন, যে রচনাটির পক্ষে পুরস্কারপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই। তাঁর পক্ষে একথা জানার সম্ভাবনা ছিল প্যারীচাঁদ মিত্রের কাছে। যেহেতু সঙশোধন ও পুনর্লিখনে কিছুদিন সময় লাগার কথা, এবঙ পুনর্লিখিত রচনাটি ১২৭৯ বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৭২) থেকে প্রকাশিত হয়, সেহেতু অনুমেয়, 'উভয়েরই দোষ' ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের প্রথমেই বঙ্কিমচন্দ্র ফেরত আনেন এবঙ তিন মাসের মধ্যেই তার পুনর্লিখন সম্পূর্ণ হয়।[২৯]

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসগুলির বিভিন্ন সঙস্করণে প্রায়ই কম-বেশি সঙশোধন করতেন। সাময়িকপত্রে প্রকাশ থেকে গ্রন্থনার মধ্যে বেশি পাঠভেদের উদাহরণ রজনী, রাজসিঙহ, কৃষ্ণকান্তের উইল। পরবর্তী পাঠভেদ বেশি হয়েছে কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, ইন্দিরা ও সীতারামে। 'বিষবৃক্ষে' পাঠভেদের পরিমাণ সব থেকে কম,—এমনকি বঙ্গদর্শনের পাঠ (১৮৭২) থেকে তাঁর জীবিতকালে প্রকাশিত শেষ বা অষ্টম সঙস্করণের (১৮৯২) মধ্যেও। তার প্রধান কারণ পূর্বের সঙস্কারকর্ম।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে চলিত ভাষার অপেক্ষাকৃত বেশি ও ভালো ব্যবহার করলেন,—এমনকি বর্ণনার মধ্যেও। এ থেকে তাঁর ভাষায় যুগপরিবর্তন হয়েছে। যেমন '(বঙ্গদর্শনে'র পাঠে)

ক) নদীর জল অবিরল চল্ চল্ চলিতেছে—ছুটিতেছে—বাতাসে নাচিতেছে—হাসিতেছে--ডাকিতেছে।.. কৃষকে লাঙ্গল চষিতেছে, গোরু ঠেঙ্গাইতেছে, গোরুকে মানুষের অধিক করিয়া গালি দিতেছে, কৃষাণকেও কিছু কিছু ভাগ দিতেছে। মাঠে মাঠে কলসী, ছেঁড়া কাঁথা, পচা মাদুর লইয়া কৃষকের মহিষীরা, রূপার তাবিজ, নাকছাবি, পিতলের পৈছে, দুই মাসের ময়লা পরিধেয় বস্ত্র, মসীনিন্দিত গায়ের বর্ণ, রুক্ষ কেশ লইয়া বাজার বসাইতেছেন।

(১ম পরিচ্ছেদ, ২য় অনুচ্ছেদ।)

খ) কোণে কোণে মাকড়সার জাল—ঘরে ঘরে ধূলার রাশি, কার্ণিসে কার্ণিসে পায়রার বাসা, কড়িতে কড়িতে চড়াই। বাগানে শুক্না পাতার রাশি, পুকুরেতে পানা। উঠানেতে শিয়াল, ফুলবাগানে জঙ্গল, ভান্ডার ঘরে ইন্দুর।

(৪২তম পরিচ্ছেদ, ১ম অনুচ্ছেদ।)

এমন ভাষা তাঁর আগের তিনটি উপন্যাসে কোথাও নেই, পরে আছে। এই কারণে 'বিষবৃক্ষ' গুরুত্বপূর্ণ।

প্যারীচাঁদ মিত্র এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে না পারলেও কোনো কারণে পরীক্ষার ফলাফল আগেই ঠিক অনুমান করতে পেরেছিলেন। বোধহয় তিনি তখনই বঙ্কিমচন্দ্রকে ভাষা সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দেন এবঙ লেখক তা মেনে নেন। তাতে যেমন তাঁর ভাষারীতিতে পরিবর্তন হয়, তেমনি প্যারীচাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা দৃঢ় হয়। ফলে বিশ বছর পরে তিনি লিখতে পারেন--'কিন্তু আলালের ঘরের দুলালে'র পর হইতে বাঙ্গালি লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবঙ বিষয়ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। ..ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্তি।'[৩০]

'বিষবৃক্ষ' প্রসঙ্গে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষণীয়। রচনাটিতে প্রথম থেকে দেশি জীবনযাত্রার প্রকৃত বর্ণনা করার চেষ্টা ছিল বলে এখানে প্রত্যক্ষভাবে কোনো বিলাতি কাহিনীর প্রভাব পড়েনি। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন--'প্রথম তিনখানি বইয়ের জন্য আমি ইঙরেজী সাহিত্যের কাছে ঋণী..।'[৩১] দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনীতে

যথাক্রমে স্কটের Ivanhoe, সেকস্‌পীয়রের Othello, এবঙ স্কটের The Bride of Lammermoor রচনাগুলির প্রভাব বহু-আলোচিত। 'বিষবৃক্ষে'র মূলে আদৌ এমন কিছুই নেই, এবঙ তার পরেও বিশেষ নেই।

'বিষবৃক্ষ' রচনার স্থান ও কাল সম্বন্ধে কিছু ভুল ধারণা প্রচার করা হয়েছে। মজিলপুরে প্রয়াত প্রত্নতাত্ত্বিক কালিদাস দত্তের বাড়িতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে স্থাপিত একটি প্রস্তরফলকে লেখা হয়েছে, যে ওই বাড়িতে থেকে বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' লেখেন। বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুরে ছিলেন মার্চ ১৮৬৪ থেকে মে ১৮৬৭ পর্যন্ত : অবশ্য তার মাঝখানে অল্পদিন ডায়মন্ড হারবারে ছিলেন। বারুইপুরে, প্রতাপনগর, জয়নগর ও ক্যানিঙ থানা তাঁর অধীনে ছিল, এবঙ তাঁকে মজিলপুর অঞ্চলে যেতে হয়েছে। তার পর থেকে বহরমপুরে বদলির পূর্ব পর্যন্ত তাঁর কর্মস্থল ছিল আলিপুর। সেখানে থাকার সময় ১০.১১.১৮৬৯ তারিখে 'মৃণালিনী'র প্রথম সঙস্করণ প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা এবঙ অক্ষয়চন্দ্রের রচনা থেকে 'বিষবৃক্ষ' রচনার স্থান ও কাল জানা যায়। অতএব, মজিলপুর বা বারুইপুরে বিষবৃক্ষ রচনার কাহিনী ভুল।[৩২] ভুলের একটি সম্ভাব্য কারণ, 'বিষবৃক্ষে'র নগেন্দ্রনাথ দত্তকে মজিলপুরের জমিদার দত্তবাড়ির কারো আদর্শে নির্মাণ করা হয়েছিল, এমন কপোলকল্পনা কেউ কেউ করেন। প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের আদলে নগেন্দ্রনাথ,[৩৩] নিজের স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবীর ছায়ায় সূর্য্যমুখী,[৩৪] এবঙ বন্ধু জগদীশনাথ রায়ের (১৮২৫-১৮৮৭) আদর্শে হরদেব ঘোষালের চরিত্র[৩৫] নির্মাণ করেন। ঠিক তেমনটি ঘটেছিল তারকনাথের ক্ষেত্রেও, কারণ তিনি স্বর্ণলতার একাধিক চরিত্র জীবন্ত ব্যক্তিকে ভিত্তি করে তৈরি করেছিলেন।[৩৬] লালবিহারীর 'গোবিন্দ সামন্ত' গ্রন্থেও তত্‌কালীন উত্তর-রাঢ় অঞ্চলের গ্রাম-জীবনের এবঙ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রকৃত ছবি আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র লালবিহারী বা তারকনাথ সম্বন্ধে নীরব; কিন্তু তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করার সুযোগ ছাড়েননি। কারণ, ছোট সমব্যবসায়ীর ঈর্ষা, এবঙ প্রতিযোগিতায় জয়লাভ। লালবিহারীর ক্ষেত্রে আক্রমণের লক্ষ্য বিষবৃক্ষ। লালবিহারীর কোনো ভক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের 'বঙ্গবিজেতা' উপন্যাসের একটি সপ্রশঙস সমালোচনা 'জয়চাঁদ' ছদ্মনামে প্রকাশ করেন।[৩৭] তার দুটি অঙশ এরূপ—

ক) 'স্কটের সহিত বঙ্কিমবাবুর অনেক সৌসাদৃশ্য আছে, এবঙ বঙ্কিমবাবু যে তাঁহার অনুকরণ করেন, তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন ;..কিন্তু স্কট যেমন প্রকৃতির, যেরূপ আদরের, যেরূপ গৌরবের, যেরূপ দেশ-বিদেশের সম্মানের লোক, বঙ্কিমবাবু যে তাহার চতুর্থাঙশের একাঙশও নহেন, এ কথা কোন্ জ্ঞানবান্, কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিবেন?' (প. ৭৮০)

(খ) 'শুনিতে পাই বঙ্কিমবাবুও জয়কৃষ্ণবাবু দত্ত ৫০০্ টাকা পুরস্কার পাইবার জন্য একখানি আখ্যায়িকা লিখিয়াছিলেন ; রেভারেন্ড দে বলেন যে, বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থের নাম 'উভয়েরই দোষ'। যদি এ কথা ভ্রমাত্মক না হয়, তাহা হইলে বঙ্কিমবাবুর পুরস্কার না পাইবার প্রকৃত কারণ এই যে, তিনি কখন গ্রামবাসীদের আচার-ব্যবহার বিশেষরূপে

পর্যালোচনা করিয়া দেখেন নাই।' (প. ৭৮১-২)

অপ্রাসঙ্গিক 'ক'-এর একমাত্র উদ্দেশ্য বঙ্কিমচন্দ্রকে কটূক্তি করা। 'খ'-তে সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা না পড়ে তার ত্রুটিনির্দেশ করেছেন। পূর্বনির্মিত সিদ্ধান্ত লালবিহারীর সমর্থনকে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। রমেশচন্দ্রকে ঐ রচনার অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র থেকেও বড় বলার কারণ বঙ্কিম-অনুরাগীদের দলে ভাঙ্গন সৃষ্টির চেষ্টা। এখানে 'উভয়েরই দোষ' সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্রের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া গেল।

লালবিহারী বিষবৃক্ষের একটি দীর্ঘ সমালোচনা তাঁর সম্পাদিত মাসিকপত্রে লেখেন।[৩৮] তাঁর বক্তব্য হল, প্রকাশিত মোট ছটি বাঙলা উপন্যাসের মধ্যে চারটি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা বলে বঙ্কিমচন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ বাঙলা ঔপন্যাসিক। বাঙলায় উপন্যাসের জনক প্যারীচাঁদ মিত্র ('আলালের ঘরের দুলাল') এবঙ কল্পনাশক্তিতে শ্রেষ্ঠ লেখক প্রতাপচন্দ্র ঘোষ ('বঙ্গাধিপ পরাজয়')। 'দুর্গেশনন্দিনী' অবান্তর বাগ্‌বহুল এবঙ 'মৃণালিনী' সাধারণ মানের রচনা, যদিও 'কপালকুন্ডলা' ভালো। অবিশ্বাস্য ঘটনা, নগেন্দ্রের চারিত্রিক অসঙগতি, দেবেন্দ্রের দানবিকতা, এবঙ কাব্যনীতিবর্জিত কুন্দ উপন্যাসটির মারাত্মক ত্রুটি। তবে সাধারণভাবে চরিত্রগুলি সুরচিত বলে উপন্যাসটি মোটের উপর ভালোই।

উপন্যাস লেখার জন্য অভিজ্ঞতা ছাড়াও যে গভীর মনোযোগ ও দীর্ঘ পরিশ্রম দরকার, একথা তাঁর বন্ধু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে (১৮৩৯-১৮৯৪) বঙ্কিমচন্দ্র আগেই লিখেছিলেন।[৩৯] লেখার কারণ বোধহয় 'বিষবৃক্ষ' রচনায় তাঁর সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা। সেজন্য এই সমালোচনায় ক্ষুব্ধ বঙ্কিমচন্দ্র একটি তারিখহীন পত্রে[৪০] Mookerjee's Magazine-এর সম্পাদক শম্ভুচন্দ্রকে লেখেন—'Mr. De's review of বিষবৃক্ষ is rather of the faint praise and civil sneer type. The reviewer is evidently the editor himself, who grossly contradicts some statements he made in an article he contributed to the Calcutta Review a few years ago. R.C.Dutt writes to me that he intends reviewing the book in the Patriot. Will your head-Eatership condescend to eat my head in the Mookerjee?'

'হিন্দু প্যাট্রিয়টে' রমেশচন্দ্র দত্তের 'বিষবৃক্ষে'র অস্বাক্ষরিত, দীর্ঘ, সপ্রশঙস সমালোচনায় এই উপন্যাস ও ঔপন্যাসিককে মহত্ বলা হয়।[৪১] সেখানে লালবিহারীর সমালোচনার কোনো প্রসঙ্গ নেই। কিন্তু গোপালকৃষ্ণ ঘোষ ছদ্মনামে লেখা সমালোচনায় লালবিহারীর প্রচুর বিদ্রূপ করলেন।[৪২] বঙ্কিমচন্দ্র ২৭.১১.১৮৭৩ তারিখের চিঠিতে শম্ভুচন্দ্রকে লিখেছিলেন—'I just drop a line to give my thanks to the Amateur Homoeopath–who I know is no other than the 'Head-Eater' himself.'

তারকনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করলেন 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ('মনোহারীর দোকান') প্রথম অনুচ্ছেদে তিনি প্রয়োজন ছাড়াই লিখলেন—

'গ্রন্থকারেরা লোকের মনের কথা টের পান এবঙ ইচ্ছা হইলে সকল স্থানেই গমনাগমন করিতে পারেন। ..দুর্গম যে মুসলমানের অন্তঃপুর, বঙ্কিম বাবু কি প্রকারে তথায় উপস্থিত হইয়া ওসমান ও আয়েষার কথোপকথন শুনিতে পাইলেন? এ ভিন্ন গ্রন্থকারদিগের আরও একটি শক্তি আছে, অর্থাত্ ইচ্ছা হইলেই অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন। এটি বড় সাধারণ শক্তি নহে। এ শক্তি না থাকিলে অনেক গ্রন্থকার মারা যাইতেন। ..এই শক্তির প্রভাবেই বঙ্কিম বাবু আড়াই শত বত্সর পূর্বে এক যবন-তনয়ার মুখ হইতে অধুনাতন ইউরোপীয় সুসভ্য কামিনীগণের ভাষা অবলীলাক্রমে নির্গত করাইয়াছেন।' আবার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের ('ঠাকুরুণদিদি') দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে রূপবর্ণনার বঙ্কিমী রীতিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যপ্রসঙ্গে সাধারণত অহেতুক বা ব্যক্তিগত কটূক্তি করতেন না, বা প্রকাশ করতেন না। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪) বঙ্কিম-বিরোধী ছিলেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সাধারণ প্রশঙসা করেছেন, যদিও লেখায় তাঁর উল্লেখ করেননি। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) অভিযোগ করেছেন, যে তাঁর পাঠানো 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র রচনাঙশ বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে ছাপেননি, কিন্তু তার অঙশবিশেষ নিয়ে বিষবৃক্ষের 'স্তিমিত প্রদীপে' পরিচ্ছেদ রচনা করেছিলেন।[৪৪] কথাটি অসত্য। দ্বিজেন্দ্রনাথের ঐ কবিতা বঙ্গদর্শনে ছাপা হয়েছিল।[৪৫] বিষবৃক্ষের প্রাসঙ্গিক অধ্যায় তার ছমাস আগেই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল,[৪৬] এবঙ লেখা হয়েছিল তারও প্রায় এক বছর আগে। অথচ দ্বিজেন্দ্রনাথের দার্শনিক রচনার প্রশঙসা বঙ্কিমচন্দ্র করেছেন।[৪৭] রবীন্দ্র-বঙ্কিম বিতর্কের আলোচনায় আজকাল অনেকেই প্রথম থেকে রবীন্দ্রপক্ষ নিয়ে বঙ্কিম-বিরোধিতা করেন,--বোধহয় খেয়াল করেন না, যে রবীন্দ্রনাথ পরে লিখেছিলেন-- "এই বিরোধের অবসানে..বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উত্পাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।"[৪৮] 'সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত' শব্দগুলি লক্ষণীয়।

বঙ্কিমচন্দ্র কখনো তারকনাথের উল্লেখ করেননি। তাঁর প্রকাশিত রচনায় লালবিহারীর কথা অন্তত একবার পাওয়া যায়। দীনবন্ধু মিত্রের রচনার কথায় তিনি লিখেছিলেন--'দীনবন্ধু যে ইহাতে রাগ করিয়াছিলেন,[৪৯] ইহাই অন্যায়। 'ভোঁতারাম ভাট' দীনবন্ধুর চরিত্রে ক্ষুদ্র কলঙ্ক।'[৫০] বন্ধুর অধিকারে তিনি দীনবন্ধুর ত্রুটি দেখেছেন, লালবিহারীর নয়। বঙ্কিমচন্দ্র বোধহয় তাঁদের নিজের সমতুল মনে করতেন না।

সাহিত্যিক ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার এই কাহিনীর ব্যক্তিগত চেহারা ছাড়াও একটি সাহিত্যিক রূপ আছে। তা নির্দেশ করে, যে সহজ ভাষায় সাধারণ জীবনের সত্য বর্ণনা নিয়ে সামাজিক উপন্যাস লেখার পরিবেশ এঁদের প্রত্যেকের মনে তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এই সময়ে আরো কয়েকজন সে চেষ্টা করেছিলেন। তার ক্রমিক উদ্ভবও আগে বর্ণিত হয়েছে। পর্যবেক্ষণ, কল্পনা ও নিয়ন্ত্রিত কঠোর পরিশ্রমে বঙ্কিমচন্দ্র শীর্ষস্থান পেলেন,-- লালবিহারী ও তারকনাথ অর্ধ-বিস্মৃত হয়ে রইলেন। তাঁদের বইগুলির প্রতিটি তখন বহুবার পুনর্মুদ্রিত, এবঙ তাদের তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। তা প্রমাণ

করে, যে সমকালীন আলোচনা (পন্ডিত ব্যক্তির হলেও, তা) প্রায়ই বিশেষ সাহিত্যসৃষ্টির প্রকৃত গুণ নির্ণয় করতে পারে না।

প্লেখানভ তাঁর *The Role of Individual in History* গ্রন্থে দেখিয়েছেন, যে সাধারণ মানুষ যে ধারনাগুলির উদ্ভব ও বিকাশের জন্য ব্যক্তিবিশেষকে দায়ী করে, প্রকৃতপক্ষে তার জন্য দায়ী বিশেষ সমাজ-পরিবেশ। অর্থাত্ বিশেষ সামাজিক ও ঐতিহাসিক অবস্থান বিশেষ কোনো প্রত্যয়ের জনক : ব্যক্তিবিশেষের উত্কর্ষ ও চর্চা তাকে বিশেষ স্তরে উন্নীত করতে পারে, অথবা পারে না, এবঙ ইতিহাসে ব্যক্তির অবস্থান সেখানে। রেনেসাঁস যুগের ইতালিতে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির কথা আলোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন, যে ভিঞ্চির হাতে নতুন চিত্রকলা শ্রেষ্ঠ রূপ পেয়েছিল তাঁর ব্যক্তিগত উত্কর্ষ ও চর্চার জন্য : কিন্তু একই প্রত্যয় ও রীতি তাঁর সমকালীন অনেক গৌণ ইতালীয় চিত্রশিল্পীর মধ্যেও দেখা গিয়েছিল। নইলে, নতুন কোনো প্রত্যয়–তার ভ্রূণ অথবা বিকশিত রূপে–একাধিক সমকালবর্তী ব্যক্তির চিন্তায় ক্রমশ প্রকাশ পায় কেন? কেনই বা তাঁদের আগ্রহী সমর্থক মেলে? এদেশের সাহিত্য-বিশারদেরা প্রায়ই একথা ভুলে যান বলে সাহিত্যের ঐতিহাসিক চর্চা ব্যক্তি-নির্ভর হয়ে ওঠে। তা অবৈজ্ঞানিক। বাঙলা সামাজিক উপন্যাস উনিশ শতকের তৃতীয় পাদে ক্রমশ স্পষ্ট অবয়ব নেয় : তা কারো একক সৃষ্টি নয়। রচনারীতির দিক থেকে এই বিষয়ে তখনকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্র। কালবিচারে তিনি প্রথমদিকে অবস্থিত : চর্চা তাঁকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে। 'গোবিন্দ সামন্ত' ইঙরাজিতে এবঙ 'স্বর্ণলতা' সামান্য পরে লেখা। এদের সঙ্গে রচনার মানে 'বিষবৃক্ষে'র পার্থক্য দুস্তর, একথা বর্তমানে আলোচনার অপেক্ষা করে না। বাঙলা সামাজিক উপন্যাসের উদ্ভবের সময় ছিল তখন। তবে জয়কৃষ্ণের পুরস্কার তাকে হয়ত ত্বরান্বিত করেছে।

---

১. তারকনাথের ইঙরেজি রোজনামচা। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়–তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প. ৯। (সাহিত্য সাধক চরিতমালা ৫৭। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষত্, কলকাতা, আশ্বিন ১৩৫৩, প্রথম সঙস্করণ।)

২. (a) Hindoo Partiot : 6.2.1871.
(b) *'A Dickens wanted for India'*, Friend of India : 23.2.1871.

৩. এডুকেশন গেজেট (শুক্রবার) ২ বৈশাখ ১২৭৮ / ৪.৪.১৮৭১, প. ১২। এই বয়ান ৯/১৬/২৩, ৩০ বৈশাখ এবঙ ১৩ ও ২০ জ্যৈষ্ঠ, অর্থাত্ ২.৬.১৮৭১ তারিখ পর্যন্ত সংখ্যাগুলিতে পুনর্মুদ্রিত হয়।

৪. ইঙরাজি সঙবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত খবরে রমানাথের নাম ছিল। পরে 'এডুকেশন গেজেটে'র বিজ্ঞাপনে নাম আছে প্যারীচাঁদ মিত্র। অতএব, মধ্যবর্তী সময়ে পরিবর্তন হয়েছিল।

৫. Hindoo Patriot : 27.2.1871.

৬. (a) The Times (London) : 10.3.1871.
(b) Hindoo Patriot : 27.2.1871, 8.5.1871.

৭. Hindoo Patriot : 24.4.1871. প্রসঙ্গত সম্পাদক জানান, যে বিষয়টি বিরাট, এবঙ দাতার সামাজিক অবস্থানের তুলনায় পুরস্কারের পরিমাণ কম।

৮. এডুকেশন গেজেট : ৯ বৈশাখ ১২৭৮/২১.৪.১৮৭১।

৯. Friend of India : 2.4.1874.
ভারত সঙস্কারক : ২৯ চৈত্র ১২৮০ 1.4.1874

১০. Nilmani Mukherjee.–*A Bengal Zemindar : Joykrishna Mookerjee of Uttarpara and his times,* 1808-1888. p. 352. (Calcutta, 1975, 1st edition)

১১. Englishman : 11.2.1875.

১২. (a) Bengal Government, Education Department, Proceedings No. 1, of November 1867.
(b) G. Macpherson.–*Life of Lal Behari Day,* p. 139. (Edinburgh, 1900, 1st edition.)

১৩. Bengal Government, Appointment Department (General Branch), Proceedings No. B 95-11, for July 1871.

১৪. অম্বিকাচরণ গুপ্ত—জজ দিগম্বর বিশ্বাস, প. ৫৩। (কলকাতা, ১২৯৩, প্রথম সঙস্করণ।)

১৫. ঢাকা প্রকাশ : (রবিবার) ৫ বৈশাখ ১২৭৭।
হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, প. ১৯২-তে উদ্ধৃত। (কলকাতা, ১৩৬৮, প্রথম সঙস্করণ।)

১৬. 'গৌরহরি সেন—সার গুরুদাসের জীবনস্মৃতি (২)', মানসী : অগ্রহায়ণ ১৩২০, প. ১০৬৭-৮। পুনর্মুদ্রণ : Upendra Chandra Bannerjee. (Comp.)–*Reminiscences, Speeches and Writings of Sir Gooroodas Banerjee,* pt. I. (Calcutta, 1927, 1st edition.)

১৭. Chunilal Bose.–*Sir Gooroodas Banerjee,* pp. 59-60. (Calcutta, 1921, 1st edition.)

১৮. Bankimchandra Chatterjee.– *'The most important and the first idea of the uncivilised Hindu',* বঙ্কিম-কণিকা, প. ২৫-২৯, ৩৭-৩৯। (কলকাতা, ১৩৪৮, প্রথম সঙস্করণ ; বিমলচন্দ্র সিঙহ সম্পাদিত।)
সজনীকান্ত দাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষত্ প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের ইঙরাজি গ্রন্থাবলীতে তা অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ফলে, যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত ও সাহিত্য সঙসদ প্রকাশিত রচনাবলীতেও তা অনুপস্থিত। কোনো সম্পাদক তার কারণ লেখেননি।

১৯. (a) Bengal Government, Appointment Department (General Branch), Proceedings No. B. 80-85, for January 1872.
(b) G. Macpherson.–*Life of Lal Behari Day,* p. 113.
লালবিহারীর দুর্ভাগ্য, তাঁর কোনো ভালো জীবনীকার নেই। ম্যাকফার্সনের তথ্যবিরল, আবেগকম্পিত বই প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছে। মন্মথনাথ ঘোষের 'সেকালের লোক' (১৩৩০) গ্রন্থে লালবিহারীর জীবনীমূলক প্রবন্ধে নতুন তথ্য আছে সামান্য, রচনার মানও সাধারণ। সাম্প্রতিক কালে প্রথমে রাধারমণ মিত্র ('আচার্য লালবিহারী দে' নামে রচনা নতুন পত্রিকা, নন্দন ও বিভাব-এ বারবার মুদ্রিত হয়ে 'বাঙলার তিন মনীষী'তে গ্রন্থিত) অথবা পরে অধ্যাপক ড. দেবীপদ ভট্টাচার্যের ('রেভারেন্ড লালবিহারী দে ও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' রচনা, *Studies in Bengal Renessance* গ্রন্থের দ্বিতীয় সঙস্করণে ধৃত) প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ। যে রচনাগুলি লিখেছেন অসম্পূর্ণ অনুসন্ধান, ভুল তথ্য ও চিন্তার অভাবে সেগুলি গুণে-মানে অকিঞ্চিত্কর ও অনির্ভরযোগ্য। বর্তমান আলোচনার কোনো বিষয় সেগুলিতে আদৌ নেই।

২০. Bengal Government, Judicial Department, Proceedings No. B. 51, for December 1870.

২১. *'Babu Digamber Biswas Rai Bahadoor',* letter dated 23.11.1870, from

'An Admirer', in the 'Correspondence' column, Hindoo Partiot : 28.11.1870.

২২. Hindoo Patriot : 16.9.1867.

২৩. Bengal Government, Education Department, Proceedings No. 5 & 6 of May 1867; 1 of November 1867; 23-25 of December 1867.

২৪. Report of the farewell meeting of W. G. Herschel, Magistrate and Collector of Hooghly, at Hooghly Branch School, on 21.8.1877. Bengal Magazine : (Vol.V) November 1877, pp. 533-4.

২৫. সুরেশচন্দ্র নন্দী—'তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়', সাহিত্য : অগ্রহায়ণ ১৩২৯, প. ৭০৮-৯।

২৬. অক্ষয়চন্দ্র সরকার—'বঙ্কিমচন্দ্র', বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়) : ভাদ্র ১৩১৯, প. ৩১৬। পুনর্মুদ্রণ : অক্ষয়চন্দ্র সরকার, 'বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁহার সংস্কার, শিক্ষা ও সাধনা', অক্ষয় সাহিত্য সম্ভার। (কলকাতা, ১৮৮৭ শক, প্রথম সংস্করণ ; ড. কালিদাস নাগ সম্পাদিত।)

২৭. (a) Bengal Government, Appointment Department, Revenue Branch, Proceedings No. B. 15-17, for May 1871.
(b) Calcutta Gazette : 3.5.1871.
এই সূত্রদুটি থেকে জানা যায়, যে বঙ্কিমচন্দ্র ১.৫.১৮৭১ তারিখ থেকে এক মাসের প্রিভিলেজ লিভ নিয়েছিলেন। অক্ষয়চন্দ্রের বক্তব্য অনুসারে, তখন 'উভয়েরই দোষ' লেখা হয়।
চাকুরি জীবনের শেষে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন--'এই চাকরী করতে করতেই লেখার জন্য ছুটী নিয়ে এখন ভুগছি। এতদিন পেন্সন নেওয়া যেতো..।' দ. সুরেশচন্দ্র সমাজপতি--'সেকালের স্মৃতি। বঙ্কিমচন্দ্র', নারায়ণ : মাঘ ১৩২১, প. ২২৪।
প্রসঙ্গত বলা দরকার, বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো জীবনীতে এই তথ্য নেই, এবং গুরুত্বপূর্ণ বহু তথ্য অনুপস্থিত। বঙ্কিমচন্দ্রের বিস্তৃত তথ্যপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য কোনো পূর্ণাঙ্গ জীবনী এখনো লেখা হল না, এটা আমাদের পক্ষে লজ্জার কথা।

২৮. সুরেশচন্দ্র নন্দী—'তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়', সাহিত্য : অগ্রহায়ণ ১৩২৯, প. ৭০৯। কিন্তু এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসটি সম্বন্ধে ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।

২৯. ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষদিকে একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কথাবার্তা হয়। তাতে বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষে'র রচনাকাল বলেছিলেন। "প্রশ্ন 'বিষবৃক্ষ' কত দিনেব লেখা? উত্তর—১৮৭২ সালের।" দ. শ্রীশচন্দ্র মজুমদার—'বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ', সাধনা : শ্রাবণ ১৩০১, প. ২৪৪। কথাগুলি অবশ্যই সংশোধিত রচনাটির সম্বন্ধে বলা।

৩০. প্যারীচাঁদ মিত্র--লুপ্ত রত্নোদ্ধার (১৮৯২, প্রথম সংস্করণ)। গ্রন্থের প্রথমে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-- 'বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্র'।

৩১. শ্রীশচন্দ্র মজুমদার—'বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ', সাধনা : শ্রাবণ ১৩০১, প. ২৪৯।

৩২. অথচ মল্লিলপুরের দুজনের লেখাতে এমন প্রসঙ্গ নেই। দ. (ক) কালীনাথ দত্ত—'বঙ্কিমচন্দ্র', প্রদীপ : আষাঢ়-ভাদ্র ১৩০৬। (খ) কালিদাস দত্ত—'বারুইপুর ও বঙ্কিমচন্দ্র', প্রবাসী : ভাদ্র ১৩৬৩।

৩৩. শ্রীশচন্দ্র মজুমদার—'বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ', সাধনা : শ্রাবণ ১৩০১, প. ২৪৯।

৩৪. নবীনচন্দ্র সেন--'বঙ্কিমচন্দ্র ও হেমচন্দ্র', আমার জীবন, দ্বিতীয় ভাগ, প. ৩৬৬। (কলকাতা, ১৩১৬, প্রথম সংস্করণ।)

৩৫. শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্কিমজীবনী, প. ২৭৩। (কলকাতা, ১৩৩৮, তৃতীয় সংস্করণ।)

৩৬. তারকনাথের ডায়েরি থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য দ. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়--তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প. ১০।

৩৭. জয়চাঁদ—'বঙ্গবিজেতা (শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত) (প্রথম সংখ্যা)'। দ. 'প্রাপ্তপত্র', এডুকেশন

গেজেট : ২.৪.১৮৭৫/২০ চৈত্র ১২৮১, প. ৭৮০-২।

৩৮. [Lal Behari Day]–'*Bisha-Briksha*', Bengal Magazine : September 1873, pp. 93-96.
কিন্তু তারকনাথের 'স্বর্ণলতা'র সমালোচনায় লালবিহারী লেখেন–"This is the only true novel we have read in Bengali, Babu Bankimchandra's works being poems, not novels; we are therefore glad that it has passed through its third edition." Calcutta Review : No. CXLIX, 1882.

৩৯. "The Novel is to me the most difficult work of all, as it requires a good deal of time and undivided attention to elaborate the conception and subordinate the incidents and characters to the central idea." Bankimchandra to Sambhoochandra, 27.3.1872.
প্রসঙ্গত জগদীশনাথ রায়ের কাছে ৩০.১২.১৮৭৪ তারিখে তাঁর ছেলে ঔপন্যাসিক খগেন্দ্রনাথের রচনা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য। 'Khani must, in my opinion, chasten down his style and curb his redundant flow of words and imagery.. Explain to him that clearness and simplicity are the best of all ornaments, and that I have arrived at this conviction after much painful experience. He should re-write his book with reference to these remarks.'

৪০. ১৯১৩ এপ্রিল-জুন সংখ্যার Bengal Past and Present পত্রে সঞ্জীবচন্দ্র সান্যাল চিঠিটির টীকায় রচনাকাল জুন ১৮৭৩ বলে অনুমান করেছিলেন। ফলে বিখ্যাত সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও যোগেশচন্দ্র বাগল, এবঙ তাঁদের অনুসরণে অন্যান্য পন্ডিত একই অনুমান করেছেন। এখানে বোঝা যাচ্ছে, যে চিঠিটির রচনাকাল ১৮৭৩ সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়।

৪১. Hindoo Patriot : 22.9.1873.

৪২. An Amateur Homoeopath.–'*Bisha Briksha*', Mookerjee's Magazine : October 1873, pp. 542-4.

৪৩. সুরেশচন্দ্র সমাজপতি–'সেকালের স্মৃতি। বঙ্কিমচন্দ্র', নারায়ণ : ফাল্গুন ১৩২১, প. ৩৩৯-৩৪০।

৪৪. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিকথা। দ. বিপিনবিহারী গুপ্ত--পুরাতন প্রসঙ্গ, প. ২৮৯। (কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৭৩, দ্বিতীয় সঙস্করণ; বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।)

৪৫. বঙ্গদর্শন : শ্রাবণ ১২৮০, প. ১৮৪-৭।

৪৬. বঙ্গদর্শন : মাঘ ১২৭৯, প. ৪৫৯-৪৬৩।

৪৭. (ক) 'সূচনা', প্রচার : শ্রাবণ ১২৯১।
(খ) 'দেশীয় নব্য সমাজের স্থিতি ও গতি', প্রচার : ফাল্গুন-চৈত্র ১২৯২।

৪৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – 'বঙ্কিমচন্দ্র', জীবনস্মৃতি।

৪৯. লালবিহারী Calcutta Review, Vol-IV, 1872-তে দীনবন্ধুর 'সুরধুনী কাব্য' প্রথম খন্ডের (১৮৭১) বিরূপ সমালোচনা করায়, ক্রুদ্ধ দীনবন্ধু জামাইবারিক (১৮৭২) নাটকে লালবিহারীকে ব্যঙ্গ করে ভোঁতারাম ভাট চরিত্র সৃষ্টি করেন। লালবিহারী উত্তর দিয়েছিলেন–'The biting sarcasm on Bhotaram Bhat who is represented as a reviewer scarcely does the author any credit.' পরে 'সুরধুনী কাব্যে'র দ্বিতীয় খন্ডে দীনবন্ধু লালবিহারীর সপ্রশঙস উল্লেখ করেছিলেন।

৫০. দীনবন্ধু মিত্র–দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী (১৮৮৬, দ্বিতীয় সঙস্করণ) গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়–'দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব'।

• বাঙলাদেশ : শারদীয়া ১৩৯২, প. ৩৯-৫০।

বঙ্কিমচন্দ্রের অজ্ঞাতপূর্ব রচনা

১২৮২ চৈত্রের পরে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শন বন্ধ হলে সাধারণী, বান্ধব প্রভৃতির মত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত মাসিকপত্র আর্যদর্শন দুঃখ প্রকাশ করে (শ্রাবণ ১২৮৩, প. ১৯১)। অবশ্য সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় ১২৮৪ বৈশাখে বঙ্গদর্শন পুনর্জীবিত হয়েছিল। ইতিমধ্যে আর্যদর্শন ১২৮৩ ভাদ্র সঙ্খ্যায় (প. ২৩২-৭) 'চিকিত্সা কল্পদ্রুম' নামে একটি আলোচনামূলক প্রবন্ধ 'শ্রীবঃ' স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয়। অনুরূপ স্বাক্ষরে বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি প্রবন্ধ ভিন্ন ব্যক্তির সম্পাদিত সাময়িকপত্রে প্রকাশ করেছেন; যেমন—(ক) 'চন্দ্রলোক', ভ্রমর, ১২৮১ চৈত্র ; (খ) 'বঙ্গে দেবপূজা, প্রতিবাদ', ভ্রমর, ১২৮১, অগ্রহায়ণ। সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত 'ভ্রমরে' প্রকাশিত রচনাদুটি বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীতে পুনর্মুদ্রিত হয়েছ, কিন্তু আর্যদর্শনে প্রকাশিত 'চিকিত্সা কল্পদ্রুম' আজও অজ্ঞাত রয়েছে।

বঙ্কিম-সুহৃদ্ অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত ও চুঁচুড়া থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক সঙবাদপত্র 'সাধারণী'তে ২রা আশ্বিন ১২৮৩ (১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬) সঙ্খ্যায় 'সমালোচন' শিরোনামে সাময়িক সাহিত্য সম্বন্ধে প্রকাশিত মন্তব্যগুলির মধ্যে আছে (প. ২৬৭)—'ভাদ্রের আর্যদর্শনে শ্রীবঃ (অর্থাত্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) স্বাক্ষরিত চিকিত্সা কল্পদ্রুমের সমালোচনা দেখিয়া আমাদের একবার আহ্লাদ হইল, আবার বিষাদে ক্লিষ্ট হইলাম। বঙ্গদর্শনের বিদায়ে আমাদের মর্মান্তিক কষ্ট হইয়াছে।' 'চিকিত্সা কল্পদ্রুম' ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়য়ের লেখা। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখক'[১] গ্রন্থে যদুনাথের জীবনীতে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত উক্ত আলোচনা থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব, আর্যদর্শনে প্রকাশিত গ্রন্থসমালোচনাটি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা।

নদিয়া জেলায় গরিবপুরের যদুনাথ মুখোপাধ্যায় (২৭ ভাদ্র ১২৪৬—১২ চৈত্র ১৩০০) কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে এল. এম. এস. পাশ করেন, ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী হন এবঙ রানাঘাটে প্রথমে চিকিত্সাব্যবসায় আরম্ভ করার পর ১২৭৬ শনে চুঁচুড়ায় আসেন। সেখানে চিকিত্সা ছাড়া তিনি সঙস্কৃতচর্চা করেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও তাঁর পার্ষদদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন এবঙ গ্রন্থরচনা আরম্ভ করেন। যদুনাথ ১২৮৩ শনে কলকাতায় আসেন, কিন্তু স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য পরে চুঁচুড়া ও কলকাতায় স্থান পরিবর্তন করে শেষ পর্যন্ত ১২৯৫ শনে স্বগ্রামে ফিরে যান। বিশিষ্ট চিকিত্সক ও লেখক হিশাবে তিনি খ্যাতিমান ছিলেন। তাঁর লেখা গ্রন্থাবলীর মধ্যে ছাত্রপাঠ্য 'উদ্ভিদ বিচার' ও 'শরীর পালন' ছাড়া ছিল 'ধাত্রী বিদ্যা', 'সরল জ্বর চিকিত্সা', 'বাঙালীর মেয়ের নীতিশিক্ষা', 'পল্লীগ্রাম', 'কুইনাইন প্রয়োগ প্রণালী' এবঙ দুটি অসম্পূর্ণ গ্রন্থ 'সরল রোগ নির্ণয়' ও 'সরল ভৈষজ্য প্রকাশ'। তিনি 'চিকিত্সা দর্পণ' মাসিকপত্র প্রকাশ করেন (১ বৈশাখ ১২৭৮) এবঙ কয়েক বছর পর তা বন্ধ হলে তাকে পুস্তকাকারে মুদ্রিত করেন। জনৈক সাহেবের সম্পাদনায় তিনি 'ইন্ডিয়ান এম্পায়ার' নামে ইঙরাজি সঙবাদপত্র প্রকাশ করেন এবঙ তাতে চিকিত্সাবিদ্যা সম্বন্ধে নিজের উচ্চপ্রশঙসিত প্রবন্ধ প্রকাশ করেন :

সঙবাদপত্রটি পরে হস্তান্তরিত হয়, পুত্র গিরিজানাথের সম্পাদনায়।[২]

তাঁর প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্র 'সমাজ ও সাহিত্য' (প্রথম প্রকাশ ১৩০০ শন) তাঁর মৃত্যুতে লুপ্ত হয়েছে। (অবশ্য মাসিক আকারে ১৩০৩ আশ্বিনে তা পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল।) চুঁচুড়া-বাসের শেষদিকে রাজা রাধাকান্ত দেবের 'শব্দকল্পদ্রুমের' (প্রথম-সপ্তম খন্ড ১৮১৯-১৮৫১ ও পরিশিষ্ট খন্ড ১৮৫৮) আদর্শে তিনি একক প্রচেষ্টায় ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের উত্সাহদানে 'চিকিত্সা কল্পদ্রুম' নামে সাইক্লোপিডিয়া-জাতীয় একটি বাঙলা গ্রন্থ রচনা ও মাসিক পত্রের মত প্রতি সঙ্খ্যায় ১৬ পৃষ্ঠা আকারে প্রকাশ আরম্ভ করেছিলেন ; কিন্তু কিছুদিন প্রকাশিত হবার পর তা অসমাপ্ত অবস্থায় বন্ধ হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগের মতে তার প্রথম ও দ্বাদশ সঙ্খ্যার প্রকাশকাল যথাক্রমে ২১ জুলাই ১৮৭৬ ও ২৫ জুলাই ১৮৭৯। 'সাধারণী' (১৯ ভাদ্র ১২৮৩, ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬) প্রথম সঙ্খ্যার প্রশঙসা করে (প. ২৪৫)। ('কল্পদ্রুম' শব্দটি বোধহয় সেকালে প্রিয় ছিল। রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৪৬-৫১ খ্রিস্টাব্দে তের খন্ড এনসাইক্লোপিডিয়া 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' নামে ত্রৈমাসিক রূপে প্রকাশ করেছিলেন। চাঙড়িপোতা থেকে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় মাসিক 'কল্পদ্রুম' ১২৮৫ ভাদ্র থেকে প্রকাশিত হত। শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সম্পাদিত মাসিক 'সাহিত্য কল্পদ্রুমের' প্রকাশ ১২৯৬ শ্রাবণ থেকে।)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মালদহে বদলির কিছুদিন পরে অসুস্থ হয়ে ছুটি নিয়ে কাঁটালপাড়ায় আসেন, সুস্থ হয়ে বদলির আশায় ক্রমাগত মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিয়ে ২৪.৬.১৮৭৫ তারিখ থেকে ১৯.৩.১৮৭৬ তারিখ পর্যন্ত মোট ৮ মাস ২৬ দিন ছুটি ভোগ করেন এবঙ ইতিমধ্যে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বদলির ব্যবস্থা করে ২০.৩.১৮৭৬ তারিখে চুঁচুড়ায় কাজে যোগ দেন। চুঁচুড়া ও কাঁটালপাড়া গঙ্গার বিপরীত দুই তীরবর্তী। তখন বঙ্কিমচন্দ্র ভূদেবের বৈঠকে প্রায়ই যেতেন এবঙ সেখানে যদুনাথের সঙ্গে পরিচিত হন। সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্রের এক শিশু দৌহিত্র অসুস্থ হয়ে অন্য ডাক্তারের চিকিত্সায় প্রায় মৃত্যুমুখে পড়ে, কিন্তু শেষে যদুনাথের চিকিত্সায় নীরোগ হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই কারণে যদুনাথের উপর ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিলেন। তাঁর দাদা সঞ্জীবচন্দ্র পূর্বে যদুনাথের সঙ্গে শেকহ্যান্ড করতেন : অতঃপর তাঁকে হাত তুলে নমস্কার করা আরম্ভ করেন।[৩]

এরপরে যদুনাথের 'চিকিত্সা কল্পদ্রুম' প্রকাশিত হতে থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটি বহুজ্ঞাত তথ্য এই, যে তাঁর লেখা পরিচিত ব্যক্তিদের (হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, গঙ্গাচরণ সরকার, রামদাস সেন, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি) গ্রন্থসমালোচনাগুলি প্রায়ই প্রশঙসামুখর হত। অন্যত্র আলোচনা এরূপ পক্ষপাতদুষ্ট হত না। যদুনাথের গ্রন্থসমালোচনাতেও এই বিষয়টি লক্ষণীয়। মাঝারি আকারের আলোচনাটিতে তের বার লেখকপ্রসঙ্গ আছে। তার মধ্যে বারো বার লেখা হয়েছে 'যদুবাবু', মাত্র একবার 'গ্রন্থকার'। আলোচনায় স্পষ্ট, যে সমালোচক চিকিত্সাশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ। তবু বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার কারণ তাঁর ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতাবোধ। নইলে, জানেন না, এমন বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ লিখতেন না এবঙ এই

প্রবন্ধটিও পুনর্মুদ্রিত করেননি। ফলে প্রবন্ধটি কৌতুকে স্বাদু বটে, কিন্তু খাঁটি সমালোচনা নয়, বরঙ কিছুটা প্রচারধর্মী রচনা হয়েছে। এই আলোচনায় চারটি বিষয় লক্ষণীয়।

১। ইঙরাজির মত বাঙলা পরিভাষা সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের আগ্রহ।

২। তত্‌কালীন গ্রাম-বাঙলায় চিকিত্‌সা-ব্যবসায় সম্বন্ধে তথ্য।

৩। হুবহু অনুবাদে তাঁর বীতরাগ, কিন্তু অনুসরণমূলক নতুন সৃষ্টিতে আগ্রহ।

৪। অনুরোধে লেখা রচনা প্রকাশের পূর্বে তিনি সঙশোধিত করেননি।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুবাদপ্রবণতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরূপ মন্তব্য।[৪] অনেকে তাঁর সমাজসঙস্কারবিমুখতা বিদ্যাসাগর-বিদ্বেষের প্রমাণ হিশাবে উল্লেখ করেন। কিন্তু এরূপ প্রমাণদর্শী লেখকেরা লক্ষ্য করেন না,- যে ঐ বিরূপতার সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙস্কারকর্মকে সমর্থন জানিয়েছেন, এবঙ যখন 'লুপ্তরত্নোদ্ধারে'র (১৮৯২) ভূমিকায় তিনি বিদ্যাসাগরের ভাষারীতির প্রশঙসা করেছেন (যদিও তাঁর সাহিত্যিক স্থাননির্ণয়ে বিশেষ মতপরিবর্তন করেননি) তখন তাঁর চিন্তাধারা সমাজসঙস্কারবিমুখ হয়ে উঠেছে।[৫] অর্থাত্‌ বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি (সাহিত্যিক ও সামাজিক) মত পরিবর্তন এই প্রসঙ্গে ভিন্নমুখী। বিদ্যাসাগরের প্রতি অতি উত্‌সাহে একদেশদর্শী সরলীকরণ 'গবেষণা' হতে পারে, তবে তা সর্বত্র সত্যানুসন্ধান নয়। অর্থাত্‌ অনুবাদের রীতি ও তার সাহিত্যিক মূল্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মতামতের যুক্তিগ্রাহ্যতা যা-ই হোক, তা তাঁর সম্বন্ধে বর্তমান-প্রচলিত মনোভাবের সমর্থক নয়। তা তাঁর সাহিত্যিক আদর্শের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রতিফলন নয়। বর্তমান প্রবন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্রের মত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

নিচে বঙ্কিমচন্দ্র-লিখিত প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হল।

চিকিত্‌সা কল্পদ্রুম।[১]

এই গ্রন্থখানির পরিচয় দেওয়া সহজ নহে। ইহাতে যাবতীয় ব্যাধি (পুরুষ, স্ত্রী, এবঙ শিশু ও বালকদিগের সর্ব প্রকারের পীড়া--চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, গর্ভাবস্থার পীড়া, এবঙ সূতিকা পীড়া সমেত)--অ, আ, ই, ঈ, ক, খ, গ, বর্ণ ক্রমে শব্দ কোষাকারের সহিত, এবঙ প্রত্যেক ব্যাধির আবশ্যক স্থলে

নির্বাচন	Definition.
উপশব্দ	Synonyms.
প্রকার	Varieties.
লক্ষণ	Symptoms.
উপসর্গ	Complications,
পরিণাম	Termination.
নিদান	Pathology.

১ চিকিত্‌সা কল্পদ্রুম, অর্থাত্‌ রোগ নির্ঘণ্ট এবঙ তচ্চিকিত্‌সা। সচিত্র। --শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায়, এল, এম. এস. কর্তৃক সঙগৃহীত। চুঁচুড়া, ১৮৭৬।

কারণ	Causes.
স্থিতিকাল	Duration.
মৃত্যুসঙ্খ্যা	Mortality.
নির্ণয়তত্ত্ব	Diagnosis.
ভাবীফলার্থকতত্ত্ব	Prognosis.
চিকিত্সা	Treatment.
অভিনব চিকিত্সা	Recent mode of Treatment.
লেখকের মত	Compiler's opinion.
প্রতিষেধ	Prophylaxis.

এই গুলি ক্রমান্বয়ে লিখিত হইয়াছে।'

এই গ্রন্থের প্রথম খন্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। মাসে মাসে ইহার এক এক খন্ড প্রকাশ হইবে। বলিতে কি যদুবাবু অত্যন্ত দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিয়াছেন। মনুষ্য-শরীরের রোগ প্রায় অসঙ্খ্য। গৃহে গৃহে, ইহার প্রমাণ। প্রতি মনুষ্যের শরীর রোগের আগার। এক্ষণে ইউরোপীয় চিকিত্সা শাস্ত্রের সর্বাঙ্গীণ বহুবিধ উন্নতি হওয়াতে রোগ মাত্রেরই অনেক প্রকার তত্ত্ব জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়াছে। একেত রোগের সঙ্খ্যা করাই দুরূহ, তাহাতে রোগ মাত্র সম্বন্ধেই অসঙ্খ্য তত্ত্ব জ্ঞেয়, ও সমালোচনীয় হইয়াছে। তাহাতে আবার যদু বাবু যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া সেই সকলের পর্য্যালোচনা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাহাতে এই গ্রন্থ অতি বৃহদ্ব্যাপার এবঙ যদু বাবুর স্বীকৃত ব্রত অতি কঠিন ব্রত বলিতে হয়।

কিন্তু ব্রত যেমন কঠিন, এবঙ ব্যাপার যেমন বৃহত্, সুসম্পন্ন হইলে কার্যটি তেমনি মহাশুভ-ফল-দায়ক হইবে। একেত কোন একটি শাস্ত্র বা বিদ্যা সম্বন্ধীয় একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ যে ভাষায় থাকে, সেই ভাষার সৌভাগ্য। সেই ভাষা যাহাদিগের একমাত্র অথবা প্রধান অবলম্বন, তাহাদিগের পক্ষে এইরূপ গ্রন্থ দুস্তর জ্ঞান সাগরে ভেলা স্বরূপ। তাহাতে আমাদিগের ভাষায় এরূপ এক খানি কোষগ্রন্থ বিশেষ আদরণীয়। কেন না, আমাদিগের ভাষায় বিজ্ঞানাদি তত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থ, অথবা কোন প্রকার সম্পূর্ণ, সর্বতত্ত্ববাদী গ্রন্থ একবারে নাই। যাহার অদৃষ্টে মালা ঘুনসী যোটে না, তাহার পক্ষে রত্নহার বিশেষ আদরণীয়। ইহার পর যখন মনে করা যায় এই কোষ দুর্জ্ঞেয় চিকিত্সাশাস্ত্র সম্বন্ধীয়, তখন ইহার সূচনা অস্মদ্দেশের বিশেষ গৌরব ও সুখের বিষয় বলিয়া বোধ হয়।

কেননা, বঙ্গদেশ রোগে আকুল। সুশিক্ষিত চিকিত্সকের ভাগ অতি অল্প। বড় বড় নগরেই তাঁহাদিগকে দেখা যায়। গ্রামবাসীদিগের ভাগ্যে অধিকাঙশস্থলে—কেহই নহে—কেবল যম, অথবা তাঁহার অনুচরবত্ 'কবিরাজ'—চিকিত্সাব্যবসায়ী কবিরাজের কথা বলিতেছি না—হলব্যবসায়ী কবিরাজের কথা বলিতেছি। তাঁহারা চাসও করেন—এবঙ সময় পাইলে গাছরা ঔষধও বিতরণ করেন। একবেলা ধানের তলায় ঘাস মারেন—আর একবেলা শয্যাতলে মনুষ্য মারেন—কখনও কণ্টক কুল, কখনও রোগীকুল নির্ম্মূল করেন। আমরা স্বীকার করি যে এ শ্রেণীর চিকিত্সকদিগের সঙ্গে এ গ্রন্থের কোন সম্বন্ধ নাই।

কিন্তু এরূপ চিকিত্‌সকগণ কেবল কৃষিদিগের গ্রামেই অবস্থান করেন। গ্রাম্য ভদ্রলোকদিগের সহায় বটিকা-ব্যবসায়ী কবিরাজ এবঙ কুইনাইনব্যবসায়ী নেটিব ডাক্তার। কবিরাজের বিদ্যা থাকিলে, আদরণীয় বটেন। কিন্তু অধিকাঙশ কবিরাজের বিদ্যার শেষ সীমা একটি বচনার্দ্ধ --"ক্ষীণে বলবতী নাড়ী সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা।" তার পর প্রয়োজন হইলে চাণক্য-শ্লোক ও গঙ্গাস্তব আওড়াইয়া আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পারদর্শিতার পরিচয় দেন। নেটিব ডাক্তারগণ ছুরি কাঁচি শলা পটি মলম জোলাপ লইয়া রোগীগণকে বিত্রস্ত এবঙ দক্ষিণাভিমুখে সত্বরগামী করিতে বিলক্ষণ সক্ষম বটে, তাহার অধিক আর কিছু তাঁহদিগের সাধ্য হয় না। তাহার দুইটি কারণ। এক এই যে তাঁহাদিগের কাছে যে ঔষধ পাওয়া যায়, তাহা প্রায় পলাশীর যুদ্ধের পূর্বকালের খরিদ, ধূলি কর্দমে কিঞ্চিত্‌ স্ফীত, কদাচিত্‌ লবণ ও ময়দার বিমিশ্রণে স্বাদবিশিষ্ট, সচরাচর মৃত কীটগণের দেহ এবঙ পূরীষে সুগন্ধিত ; এবঙ হীরকচূর্ণের মূল্যে বিক্রীত। এরূপ ঔষধ গৃহস্থলোকে কিনিয়া উঠিতে পারে না ; কিনিতে পারিলে গলাধঃকরণ করিতে পারে না ; গলাধঃকরণ করিতে পারিলেও কোন উপকার প্রাপ্ত হয় না। দ্বিতীয় কারণ, পুস্তকের অপ্রতুল। বাল্য কালে বিদ্যালয়ে যে কয়টি স্থূল বিষয় ঘটিত উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কেবল তাহারই উপর নির্ভর করিয়া কোন ব্যবসায় চলে না। নিত্য নূতন শিখিতে হইবে, যতকালে ব্যবসায় করিতে হইবে, ততকাল শিক্ষা করিতে হইবে। বিশেষতঃ ডাক্তারি। ইউরোপীয় বিজ্ঞানে নিত্য নূতন তত্ত্ব উদ্ভূত হইতেছে। আজ যাহা সত্য, কালি তাহা মিথ্যা ; আজ যাহা গ্রাহ্য, কাল তাহা অগ্রাহ্য। আজ যাহা অসাধ্য, কাল তাহা সুসাধ্য। আর চিকিত্‌সক ও ব্যবহারাজীবের পুস্তকের উপর বিশেষ নির্ভর। যেমন কেহ সঙসার ধর্ম্মের সকল দ্রব্য পকেটে লইয়া ভ্রমণ করিতে পারে না, তেমনি কেহ এতদুভয় শাস্ত্রগত সকল তত্ত্ব স্মৃতি মধ্যে রাখিয়া কার্য্য নির্বাহ করিতে পারে না। এইজন্য চিকিত্‌সকের পক্ষে ছুরি কাঁচি পটি বড়ী সিসি অপেক্ষা সত্‌পুস্তকের অধিকতর আবশ্যকতা। কিন্তু নেটিব ডাক্তারের ব্যবহার্য উত্‌কৃষ্ট পুস্তকের নিতান্ত অভাব। অনেকেই ইঙরেজিতে ব্যুত্‌পত্তি-হীন। তাঁহাদিগের অবলম্বন দুই একখানি ক্ষুদ্র, পুরাতন ইঙরেজি গ্রন্থ। হয়ত সে গ্রন্থ প্রপিতামহের আমলের, নয়ত তাহাতে দুই তিনটি ব্যাধির মাত্র তত্ত্ব লিখিত আছে। তাঁহাদিগের প্রয়োজন যদ্দ্বারা সুনির্বাহ হয়, এমত গ্রন্থ প্রায় নাই। যদু বাবুর এই গ্রন্থে তাঁহাদিগের সেই অভাব পরিপূরণ হইবে।

যদুবাবুর এই গ্রন্থ প্রণয়ন যেরূপ কঠিন কার্য তাহা সহজে বুঝা যায়। ইহার প্রথম উপকরণ, লেখকের চিকিত্‌সাশাস্ত্রে পারদর্শিতা—অর্থাত্‌ সকল রোগের সকল তত্ত্বে পারদর্শিতা। এরূপ পারদর্শিতা দেশীয় চিকিত্‌সকদের মধ্যে কত লোকের আছে বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা দুর্লভ, এ কথা বলিতে পারি। কেবল অধীত শাস্ত্র স্মরণ রাখাকে পারদর্শিতা বলি না। তদ্রূপ পারদর্শিতার দ্বারা এরূপ গ্রন্থ প্রণয়ন দুঃসাধ্য। অনেকের বোধ আছে যে ইঙরেজিতে যাহা আছে, তাহা বাঙ্গালা গ্রন্থে সন্নিবেশিত করণ পক্ষে, কেবল ভাষান্তর করিলেই হইল। সেরূপ ভাষান্তরে কেহ উপকৃত হয় না। কেহ কিছু বুঝিতে পারে না, কেহ কিছু শিখিতে পারে না। লেখকও যে কিছু বুঝিয়াছেন, তদ্দ্বারা ইহাও

প্রমাণীকৃত হয় না। আমি যাহা ইঙরেজিতে শিখিয়াছি, তাহা তোমাকে বাঙ্গালায় বুঝাইতে হইলে, প্রথমে প্রয়োজন, যে যাহা ইঙরেজিতে আছে তাহা নিজে পরিষ্কার করিয়া বুঝিব ; অধীত শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অধিকারী হইব। তাহার পর ইঙরেজির অবলম্বন পরিত্যাগ করিয়া আপন চিত্ত হইতে তাহা তোমাকে বুঝাইব।

যদু বাবুর গ্রন্থের প্রথম খন্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেই এবঙ তাঁহার প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থে সেইরূপ অধিকারের লক্ষণ আছে। তবে, নূতন শব্দ লইয়া বড় গোলে পড়িতে হয়। ইঙরেজিতে যে সকল ব্যাধি যে ভাবে শ্রেণীবদ্ধ এবঙ নামপ্রাপ্ত, সেই সকলের ভাষান্তর দুর্ঘট। ব্যাধির, লক্ষণের, ঔষধের বাঙ্গালা নাম, তাঁহাকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। বিশেষ শরীর তত্ত্ব সম্বন্ধীয় নাম সকল দেশীভাষায় নাই, থাকিলেও তাহার ব্যবহার নাই, সুতরাঙ তাহার অভিনব ব্যবহারে ভাষা অত্যন্ত কটমটে ও আপাততঃ দুর্গম হইয়া উঠে। সে সকল যদুবাবুর দোষ নহে–বাঙ্গালা ভাষার বর্তমান অবস্থার দোষে। যদুবাবু এইরূপ অপ্রচলিত শব্দ সকলের ব্যবহার কালে তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত ইঙরেজি শব্দও লিখিয়া দিয়াছেন।

এই গ্রন্থ প্রণয়নার্থ গ্রন্থকারকে প্রথমত বহুতর সঙগ্রহ করিতে হইয়াছে। সকল রোগের সকল কথা লিখিতে হইবে, সুতরাঙ প্রায় চিকিত্সা সম্বন্ধীয় সকল গ্রন্থ ঘাঁটিতে হইতেছে। এই সঙ্গ্রহ পর্যায়ক্রমে সঙ্কলিত এবঙ যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে। তাহার পর, লেখক নিজ মত সকল তাহাতে সঙযোগ করিয়া গ্রন্থের উত্কর্ষ বৃদ্ধি করিয়াছেন। তার পর মুদ্রাঙ্কন কার্যের পারিপাট্য সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। এই কার্যটি অতি উত্কৃষ্টরূপে নির্বাহ হইতেছে। যে গ্রন্থ অপর সাধারণের ব্যবহারের প্রত্যাশা দেখা যায় না, তাহার উপর সাহস করিয়া এত ব্যয় করিতে, আর কাহাকেও দেখা যায় না। বিশেষ ইহাতে যে চিত্রগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা বাঙ্গালা গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণে অসাধারণ ব্যবহার। প্রথম খন্ড ষোল পৃষ্ঠা মাত্র। তাহাতে তিনটি উত্কৃষ্ট চিত্র আছে, প্রথম প্রসূন, দ্বিতীয় জবায়ুজ প্রাচীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রসূন সঙশ্লেষ, তৃতীয় দর্শনচক্র। চিত্রগুলি দেখিয়া, উত্কৃষ্ট বিলাতি চিত্রের অপেক্ষা কোন ক্রমেই নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করা যায় না।

এরূপ বহুব্যয় ও বহুশ্রমসাধ্য জাতীয় কীর্তি, সাধারণের কাছে বিশেষ সাহায্য ব্যতীত পরিণাম প্রাপ্ত হইতে পারে না। এবঙ সেই সাহায্য দান বাঙ্গালি মাত্রেরই কর্তব্য। এই গ্রন্থখানি কেবল নেটিব ডাক্তারদিগের প্রয়োজনীয় এমত নহে, তদপেক্ষা অনেক উচ্চ শ্রেণীর চিকিত্সকেরা অনেক উপকার প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা। কেননা, ইহাতে সর্বরোগতত্ত্ব একত্রিত, শ্রেণীবদ্ধ ; এবঙ যথাস্থানসন্নিবেশিত থাকিবে, এবঙ যদু বাবুর ন্যায় একজন সুবিজ্ঞ চিকিত্সকের নিজের মতও লিখিত থাকিবে। আর যদি যদু বাবু, এই সঙ্গেই বৈদ্যগণ মধ্যে সুপরিচিত রোগ সকলের দেশী চিকিত্সা সন্নিবিষ্ট করেন তাহা হইলে আরও বিশেষ ফলোপধায়ী হইবে।

আমাদিগের বিবেচনায় কেবল চিকিত্সক কেন, সুশিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই এরূপ গ্রন্থখানি ঘরে রাখা কর্তব্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোগে সকলেই নিজ গৃহ মধ্যে, অথবা নিজ পল্লী মধ্যে

চিকিত্‌সা করিতে পারা নিতান্ত স্পৃহণীয়। এইরূপ অনেকেরই বিশ্বাস আছে যে বাল্যকাল হইতে যাঁহারা চিকিত্‌সা শিক্ষা এবঙ ব্যবসায় না করিয়াছেন, তাঁহাদিগের চিকিত্‌সায় ব্রতী হওয়া কেবল রোগীর মৃত্যুর কারণ হইয়া উঠে। যেখানে রোগ কঠিন অথবা ঔষধ দুষ্প্রযুজ্য সেইখানে এ কথা সত্য বটে। কিন্তু সর্বত্র সত্য নহে। সামান্য সবিরাম জ্বরে, একটু কুনাইনের ব্যবস্থা করা, বা বাহ্য প্রদাহ দেখিলে তপ্ত সেকের পরামর্শ দেওয়া, বহুজ্ঞান বা বহুদর্শিতা সাপেক্ষ নহে। অথচ ইহাতে অনেক সময়ে অনেক উপকার হয়। সুশিক্ষিত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ দুই একখানি সত্‌পুস্তক অবলম্বন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোগে স্বপরিবার এবঙ দরিদ্র প্রতিবাসীগণের মধ্যে অনেক উপকার করিতে পারেন। আর সকলেরই কখন না কখন এমত অবস্থা ঘটে যে গুরুতর বিপদ উপস্থিত, কিন্তু চিকিত্‌সক পাওয়া যায় না। অনেকেই এরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া বিনা চিকিত্‌সায় প্রাণত্যাগ করে। এই সকল সময়েরই জন্য, সকলেরই কিছু কিছু জ্ঞান এবঙ কিছু কিছু পুস্তক সঙগ্রহ থাকা চাই। যাঁহাদিগের এরূপ ইচ্ছা, যদু বাবুর পুস্তক তাঁহাদিগের বিশেষ সহায় হইবে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞান শিল্পাদির উত্‌সাহ জন্য যে কিঞ্চিত্‌ ব্যয় স্বীকৃত আছেন, সাহেবদিগের নিকট অপরিচিত কোন বাঙ্গালী কি তাহার কিয়দঙ্‌শ পাইতে পারে না? যদি পারে, তবে যদু বাবুর এই গ্রন্থ তাহা পাইবার বিশেষ অধিকারী। কেননা এরূপ বৃহত্‌ এবঙ ব্যয়সাধ্য গ্রন্থ অস্মদ্দেশে সমাজ-সাহায্য এবঙ রাজ-সাহায্য উভয়ও ব্যতীত কখন সম্পূর্ণ হইতে পারে না।

শ্রীবঃ—

---

১. কলকাতা, ১৩১১, প্রথম সঙস্করণ, প. ৪৫৭-৪৬৪।

২. গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়—'ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়', ভারতবর্ষ, (২০শ বর্ষ, ২য় খন্ড, ৪র্থ সঙ্খ্যা) চৈত্র ১৩৩৯, প. ৬৩৮-৬৪২।

৩. প্রাগুক্ত, প. ৪৬১।

৪. [ ]–Bengali Literature, *Calcutta Review,* 1871, no. 104.

৫ দ. (ক) ধর্মতত্ত্ব (১৮৮৮) ; (খ) ইন্দিরা (১৮৯৩, পঞ্চম সঙস্করণ)।

• নববঙ্গাদর্শন, (বর্ষ ১, সঙ্কলন ৪) মাঘ-চৈত্র ১৩৮৭, প. ৫-১১।

[বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার কিছু বানান আজকালের মত বদলানো হয়েছে এজন্য, যে পুরানো বানান / বর্ণ বদলে যায়। অন্য বাঙালি পুরানো লেখকদের লেখা আবার ছাপার সময়, বানানের নতুন নিয়মের যুক্তিতে, তেমন করা হয়। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের বানানে তাঁর আগের লেখা ছাপা। ফরাশিতে রেনেসাঁস্ যুগের আগের লেখকদের অনেকের বানান ছাপা হয় এখনকার মত। মধ্যযুগের বাঙলা পুঁথিগুলির বানান কি এখন ছাপায় ঠিক রাখা হয়? সঙস্কৃতে খন্ড ত ছিল না। বাঙলা বর্ণে ছাপা সঙস্কৃত বইতে ৎ থাকে কেন? সেক্সপিয়রের পুরানো বইতে যে বর্ণমালা ব্যবহার করা হয়েছে তাতে, তখনকার নিয়মে গ্রিক ডেলটা, থিটা বর্ণ ছিল। এখনকার ছাপা তাঁর বইগুলিতে সেসব মেলে? বঙ্কিমচন্দ্রের বেলায় আলাদা নিয়ম হবে কেন?

—লেখক।]

বঙ্কিম-বিতর্ক

আদর্শ বা গোষ্ঠীগত বিরোধ তত প্রাধান্য পায় যত পরিমাণে ব্যক্তিবিশেষ তার ব্যক্তিসত্তা ছাড়িয়ে আদর্শগত অবস্থানে উন্নীত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। বিরোধ বা দ্বন্দ্বের প্রকৃতি ও চরিত্র যেমন বিভিন্ন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চিন্তা ও আচরণও তেমনি পৃথক হতে থাকে। আদর্শগত দ্বন্দ্ব প্রায়ই বিতর্কের আকার নেয়। তাদের কালানুক্রমিক বিবরণের বিশ্লেষণ ব্যক্তির চিন্তা ও কর্মপদ্ধতিকে স্পষ্ট করে, কারণ দ্বন্দ্বে দুই প্রতিপক্ষ নিজেকে পূর্ণপ্রকাশিত করতে চায়। এই কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে অনেকের দ্বন্দ্বের কাহিনী স্মরণযোগ্য।

দ্বন্দ্বের দর্শন সম্বন্ধে অনেক আলোচনা আছে। বর্তমান নিবন্ধে তার বদলে সরাসরি বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য। সাহিত্যিক ও সামাজিক বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনীরচনা ছাড়াও তাঁর মূল্যায়নে এগুলি প্রয়োজনীয় হতে পারে। বর্তমান নিবন্ধের পরিসরে সে কাজ করা কঠিন।

২

বঙ্কিমচন্দ্র আগস্ট ১৮৫৮ থেকে জানুয়ারি ১৮৬০ পর্যন্ত যশোহরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তখন শিশিরকুমার ঘোষের (১৮৪০-১৯১১) সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা সাপ্তাহিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রথম প্রকাশিত এবং অল্পদিন পরে মানহানির মামলায় অভিযুক্ত হয়। শেষ পর্যন্ত পত্রিকা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়, শিশিরকুমার ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের শেষে কলকাতায় আসেন, এবং কয়েক মাস পরে তা পুনর্জীবিত হয়। তাতে নিমতলার চিত্রশিল্পী গিরীন্দ্রকুমার দত্ত সহায়তা করেছিলেন।

তখন বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, প্রতিষ্ঠিত ঔপন্যাসিক এবং 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদক। শিশিরকুমার কলকাতায় 'ইন্ডিয়ান লিগ' নামে রাজনৈতিক সভা প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট। বিদ্যাসাগর এঁদের চরিত্রে সন্দিহান ছিলেন বলে তাতে যাননি, এবং শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি অনেকে পরে এই প্রয়াস থেকে বিচ্ছিন্ন হন। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটির অকালমৃত্যু হয়। এই প্রসঙ্গে পরে শিবনাথ লিখেছেন—'কে কে এই উদ্যোগের মধ্যে আছেন [বিদ্যাসাগর] জিজ্ঞাসা করাতে আমরা [শিবনাথ ও আনন্দমোহন] যেন অপরাপর ব্যক্তিদিগের মধ্যে অমৃতবাজারের দলের নাম করিলাম, তখন বিদ্যাসাগর বলিয়া উঠিলেন, 'যা। তবে তোমাদের সকল চেষ্টা পন্ড হয়ে যাবে। ওদের এর ভিতর নিলে কেন?..' কি আশ্চর্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মানবপ্রকৃতির অভিজ্ঞতা! কি আশ্চর্য ভবিষ্যদর্শনের শক্তি। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল..'

এই সভা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করার জন্য শিশিরকুমার ধরলে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে তাতে অসম্মত কিন্তু পরে সম্মত হয়ে কাশিমবাজারের রাণী স্বর্ণময়ীর কাছ থেকে ৪০০৲ টাকা চাঁদা আদায় করে দেন। পরে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন, যে ঐ টাকা সত্কাজে দেওয়া হয়নি। সেজন্য তিনি পরে শিশিরকুমারকে টাকা ফেরত্ দিতে অনুরোধ করলে টাকা ফেরত্ আসেনি, বরং তাঁদের সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল।

'সম্পাদক মহাশয় তখন বেশ এক হাত লইলেন। তাঁহার হাতে কাগজ ছিল। তিনি সেই পত্রিকা-স্তম্ভে খুব জোর কলমে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে লিখিতে লাগিলেন। কাগজখানি সে সময় বাঙ্গালায় লিখিত হইত।..তিনি কোন উত্তর দিলেন না। শুধু 'রজনী'তে.. হীরালালকে আনিয়া সম্পাদক-চরিত্র অঙ্কিত করিলেন।'

পরে 'ভারত সভা' (১৮৭৬) স্থাপনের জন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একই সূত্র থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের সহায়তায় যে একটি বড় দান সংগ্রহ করেছিলেন, তার কথা তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করেছেন। এই সভার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র সহানুভূতি জানিয়েছিলেন। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে যশোহরে স্থাপিত ক্ষীণজীবী ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে স্থানীয় প্রধান শিক্ষক লিখেছেন—'About 1858, Babu Sisir Kumar Ghosh, one of the teachers of the school, began to read lectures to the boys after school hours on the Brahma or theistic principles. The members had no connection with the original theistic Church in Calcutta, the Adi Sanaj, but composed their own liturgy and prayers. But the publications of the Adi Samaj were afterwards used as texts,' 'বিষবৃক্ষে'র ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে স্কুলমাস্টার তারাচরণ 'এই সকল গুণে তিনি দেবীপুর-নিবাসী জমীদার দেবেন্দ্রবাবুর ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেন, ..সমাজে তারাচরণ..'হে পরমকারুণিক পরমেশ্বর!' এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা পাঠ করিতেন। তাহার কোনটা বা তত্ত্ববোধিনী হইতে নকল করিয়া লইতেন, কোনটা বা স্কুলের পণ্ডিতের দ্বারা লেখাইয়া লইতেন।' পূর্ববর্ণনার সঙ্গে এর মিল অনেকটা। ব্রাহ্মসমাজটি অন্তর্দলীয় বিরোধে ক্ষতিগ্রস্ত হলে 'A literary society was established in Jessor Station, one girls' school at Jhanjhampur, two miles off and a sencond at Bagchar'. এবঙ 'At Amrita Bazar a congregation was established in 1859.' বিষবৃক্ষের চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রথমে আছে--"নগেন্দ্র [কুন্দনন্দিনীর] গ্রামমধ্যে গমন করিলেন। শুনিলেন, গ্রামের নাম ঝুমঝুমপুর।" এই অল্পশ্রুত নাম থেকে অনুমান, এতে শিশিরকুমারের প্রতি ইঙ্গিত আছে। একই উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে আছে--'যে জেলায় সেই গ্রাম, আমরা তাহার নাম গোপন রাখিয়া, হরিপুর বলিয়া তাহার বর্ণনা করিব।' এই অপ্রয়োজনীয় কথার ইঙ্গিতে, লেখক কোনো সত্যকাহিনীকে নির্দেশ করেছেন।

বিষবৃক্ষের অস্পষ্ট ইঙ্গিত 'রজনী'তে স্পষ্ট আক্রমণ হয়েছে। যশোহরের পলুয়া-মাগুরা গ্রামের নাম পরে মতিলাল ঘোষের (১৮৪৭-১৯২২) মায়ের নামানুসারে হয়েছে অমৃতবাজার, এবঙ তা অনুসারে কাগজের নাম, যার স্পষ্ট অর্থ নেই। হীরা ও মোতি প্রায় সমার্থক ধরে মতিলালকে হীরালালে রূপান্তরিত করা যায়। তাঁদের সকলের ছোট ভাইয়ের নাম ছিল হীরালাল। তাঁরা শিক্ষকতা এবঙ একটি স্বল্পায়ু বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। শিশিরকুমার বেনামে দুটি নাটক লেখেন—নয়শো রুপেয়া (১৮৭২) ও 'বাজারের লড়াই' (১৮৭৬)। 'রজনী' উপন্যাসে হীরালাল নামে দুষ্টপ্রকৃতির লোকটি

সম্বন্ধে 'প্রথম খণ্ড, রজনীর কথা'র পঞ্চম পরিচ্ছেদে আছে—'তার পর কোন গ্রামে, বার টাকা বেতনে হীরালাল মাস্টার হইয়া গেল। সে গ্রামে মদ পাওয়া যায় না বলিয়া হীরালাল পলাইয়া আসিল। তার পরে সে একখানা খবরের কাগজ করিল। দিনকতক তাহাতে খুব লাভ হইল, বড় পসার জাঁকিল—কিন্তু অশ্লীলতা দোষে পুলিসে টানাটানি আরম্ভ করিল--ভয়ে হীরালাল কাগজ ফেলিয়া বুপোষ হইল।..অনন্যোপায় হইয়া নাটক লিখিতে আরম্ভ করিল। নাটক একখানিও বিক্রয় হইল না।' পরে হীরালাল বলেছে-- 'আমি যখন [অমৃতবাজারের মত অর্থহীন নামের] স্তুশ্চুভিশ্চশাত্ পত্রিকার এডিটার ছিলাম' ইত্যাদি। পূর্বের তথ্য এই বর্ণনায় লুকিয়ে থাকতে পারে। 'ক্যালকাটা রিভিউ'তে দীনবন্ধু মিত্রের 'সুরধুনী কাব্যে'র সমালোচনায় লালবিহারী দে রচনাটির কিছু নিন্দা করায়, 'জামাই বারিক' নাটকে ভোঁতারাম ভাটের চরিত্রে দীনবন্ধু সমালোচককে কটূক্তি করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন--'দীনবন্ধু যে ইহাতে রাগ করিয়াছিলেন, ইহাই অন্যায়। 'ভোঁতারাম ভাট' দীনবন্ধুর চরিত্রে ক্ষুদ্র কলঙ্ক।' অথচ সেই বঙ্কিমচন্দ্র হীরালাল চরিত্রে অনুরূপ কাজ করেছিলেন।

শিশিরকুমারের সহযোগী ও আত্মীয় হাটখোলার গিরীন্দ্রকুমার দত্ত এবঙ তাঁদের ভগিনীপতি রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইন্ডিয়ান লিগের সমর্থক ছিলেন। রাজেন্দ্রলাল ও বিদ্যাসাগরের রেষারেষি ও অসদ্ভাব, এবঙ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ঘোষেদের প্রীতির অভাব ছিল। ফলে, বঙ্কিমচন্দ্রের মত বিদ্যাসাগরও অমৃতবাজারে আক্রান্ত হয়েছিলেন। বহুবিবাহের আন্দোলন প্রসঙ্গে অমৃতবাজার বিদ্যাসাগরের বিপক্ষতা করেছে, যেমন করেছে বঙ্গদর্শন। এই অবস্থায় অমৃতবাজার দুজনকেই আক্রমণ করে ২৬.৬.১৮৭৩ তারিখে লেখে—

'বঙ্গদর্শন বিদ্যাসাগর মশাই সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা পাঠ করে আমরা দুঃখিত হলাম ; শাস্ত্রে বিশ্বাস না থাকলেও শাস্ত্রবচন দ্বারা কোন ব্যক্তিকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কপটাচার নয়।..দ্বিতীয়তঃ আমরা স্বীকার করি যে তিনি তাঁর প্রতিবাদীদের সঙ্গে বিচারে শান্তভাব দেখান নি। আমাদের অনুমান পুস্তক প্রকাশের পর সেজন্য তিনি দুঃখিত হয়ে থাকবেন। বঙ্গাদর্শনে এ সম্বন্ধে এতটা না লিখে শুধু তার উল্লেখমাত্র করলেই যথেষ্ট হত।'

অমৃতবাজার ৩.৭.১৮৭৩ তারিখে আবার লেখে—'কলকাতায় অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের বিশ্বাস যে, বঙ্গাদর্শনে প্রকাশিত বহুবিবাহ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটি আমাদের লেখা। বিশ্বাসের কারণ, পূর্বে বহুবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে অনৈক্য এবঙ সম্প্রতি বঙ্গাদর্শনের পৃষ্ঠপোষকতা। বঙ্গাদর্শনের সঙ্গে মতৈক্য হলেও বঙ্গাদর্শনে বিদ্যাসাগরের প্রতি ব্যবহার অত্যন্ত দুঃখের।' এক ঢিলে দু পাখি মারার চেষ্টা।

অমৃতবাজারে 'বঙ্গাদর্শন' সম্বন্ধে চিঠিপত্রেও নিন্দা করা হত এবঙ অনেকে তার প্রতিবাদ করতে চাইতেন।

বাঙলা সরকারের ফিনান্স বিভাগে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ মিত্র। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে জুন থেকে সেপ্টেম্বরের শুরু পর্যন্ত তিন মাস তাঁর অনুপস্থিতিতে

হেমচন্দ্র কর এই কাজ করেছিলেন। ১৮৮১ আগস্ট মাসে আবার রাজেন্দ্রনাথ ছুটি নিলে বঙ্কিমচন্দ্র সেপ্টেম্বরে ঐ পদে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন। রাজেন্দ্রনাথ পরে ছুটির মেয়াদ বাড়ান। ইতিমধ্যে উচ্চপদস্থ ইঙরাজ কর্মচারীদের চক্রান্তে ঐ পদটি সরকারি নির্দেশে বিলুপ্ত হয়ে ডেপুটি সেক্রেটারির পদ সৃষ্টি হয় এবঙ সেই পদে শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ান W. D. Blyth নিযুক্ত হন। সেজন্য ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রকে ঐ পদ থেকে সরিয়ে ১৮৮১ জানুয়ারির শেষে আলিপুরে পাঠানো হয় এবঙ পরে রাজেন্দ্রনাথকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ দেওয়া হয়।

পদটি রাজেন্দ্রনাথের, এবঙ তার বিলুপ্তি ঘটানোকে দেশীয়দের বিপক্ষতা বলে শিক্ষিত বাঙ্গালিরা বিরক্ত হন। দেশি খবরের কাগজগুলিতে তার চিহ্ন আছে। প্রসঙ্গত রাজেন্দ্রনাথের কথাই বেশি লেখা হয়েছে। সাধারণী, এডুকেশন গেজেট, সোমপ্রকাশ, Reis and Rayyet, Hindoo Partriot, Bengalee, এমনকি Friend of India এই বিষয়ে একমত।

হঠাত্ ২.২.১৮৮২ তারিখে Amrita Bazar Patrika লেখে যে গত ২২ জানুয়ারি নাকি সেক্রেটারি Macaulay বঙ্কিমচন্দ্রকে লেখেন—'Very pleased in the manner in which you have done your work, but you must make over charge within an hour.' The charge against Bankim Baboo is that during his time, office secrets oozed out from the office.'

এই মন্তব্য ভিত্তিহীন। সরকারি নথিপত্রে এমন কোনো কথা নেই। 'বেঙ্গালি' সরাসরি প্রতিবাদ করে লিখল—'We gravely doubt the authenticity of the extract which our contemporary makes from an alleged communication,' অর্থাত্ মেকলে এমন কোনো চিঠি লেখেননি। কদিন পরে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' লিখল, যে অমৃতবাজার-প্রচারিত কথা মিথ্যা গুজব মাত্র, এবঙ বঙ্কিমচন্দ্রের যোগ্যতা সম্বন্ধে মেকলে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। 'Nothing could be a grosser misstatement than this. We are assured that Mr. Macaulay, the Secretary, was fully satisfied with his work, and complimented him when he left the office.' পরিবর্তনটির কারণ সরকারি নীতি। 'রেইজ অ্যান্ড রাইয়ত্' অনুমান করে যে, 'The whole thing is supposed to have originated in Baboo Rajendra's differences with a European official. But he is a bold man who will accuse either Baboo of failing in such duties as fall to an Assistant Secretary.' অনুমানটি ভুল, তবে এখানেও অমৃতবাজারের বিরোধিতা আছে। 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' লেখে—'With respect to the statements here made by our contemporary, we are informed that no 'charge' of any kind has been made agaist Baboo Bunkim Chunder Chatterjee, and his transfer was accompanied by no reflection whatever on his character or on abilities. It is a singular thing that if 'office secret' were divulged

during the period for which the Baboo acted as Assistant Secretary, the head of the office is unware of the fact, and the words which purport to be an Extract from Mr. Macaulay's letters were never written by him.' এই ঘটনায় 'সাধারণী' ও 'এডুকেশন গেজেট' দুঃখপ্রকাশ এবঙ 'সোমপ্রকাশ' বঙ্কিমচন্দ্রের কর্মদক্ষতার প্রশঙসা করেছে।

অমৃতবাজার এই প্রসঙ্গে আর কিছুই লেখেনি। পূর্বের রচনার সমর্থনে তথ্য, মন্তব্য প্রত্যাহার, দুঃখপ্রকাশ--কিছুই নয়, কারণ তার উদ্দেশ্য চরিত্রহনন। এতে অনেকের সন্দেহ হয়েছিল। কালীপ্রসন্ন ঘোষকে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন--'আমার বদলি সম্বন্ধে সম্পাদক যাহা লিখিয়াছে, তাহা মোটেই বিশ্বাস করিবেন না, Statesman যাহা লিখিয়াছে তাহাই সত্য।' প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বঙ্কিমচন্দ্রের চাকুরি-জীবনে এটা পদোন্নতি বা পদাবনতি নয়, এবঙ 'আনন্দমঠ' প্রকাশের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

শিশিরকুমার বঙ্কিম-বিরোধিতার দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছিলেন 'বসন্তক' নামে কার্টুন পত্রের সঙ্গে। বিরোধিতায় দুজনের উদ্যোগ ছিল যৌথ। সেই কাহিনী সাহিত্যিক বিতর্কে বর্ণনীয়।

৩

উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮০৮-১৮৮৮) ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের প্রথমে একটি সাহিত্যরচনার জন্য যে পুরস্কার ঘোষণা করেন, এডুকেশন গেজেটে তার বিজ্ঞাপন এই--

'৫০০ টাকা পুরস্কার'

যাহারা বাঙ্গালা অথবা ইঙরাজী ভাষায় এতদ্দেশীয় জনগণের আচরিত সামাজিক ও গার্হস্থ্য ব্যবহার বিষয়ক প্রস্তাব উপন্যাস লেখার রীত্যনুসারে সবিস্তর বর্ণনা করিতে পারিবেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহার রচনা সর্বোত্কৃষ্ট হইবে, তিনিই ৫০০ টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেন।

আর যদ্যাপি লিখিত উপন্যাসের রচনা-প্রণালী ও ভাবার্থ উত্তম ও সুশ্রাব্য না হয়, এবঙ বর্ণিত প্রবন্ধ মুদ্রিত সময়ে ৮ পেজি ফরমার ২০০ পৃষ্ঠা পরিমিত না হয়, তবে উক্ত পুরস্কার দেওয়া হইবেক না।

ঐ উপন্যাসযুক্ত প্রবন্ধ লেখা প্রস্তুত হইলে তাহা সন ১৮৭২ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে মোকাম কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরিতে শ্রীযুক্ত প্যারীচাঁদ মিত্রের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। ঐ রচনার ভাল মন্দ বিচারার্থে নিম্নলিখিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ পরীক্ষক নিযুক্ত হইলেন। যথা--

শ্রীহর্শেল সাহেব, নদীয়া সেশন জজ ১
শ্রীযুক্ত রেবরেন্ড লঙ ১
শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র ১
শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১
শ্রীযুক্ত বাবু দিগম্বর মিত্র ১'

ইঙরাজি সঙবাদপত্রগুলিতে পূর্বে রমানাথ ঠাকুরের নাম ছিল। পরে এই বিজ্ঞাপনে তাঁর পরিবতে প্যারীচাঁদের নাম আসে। খবরের কাগজগুলি এই বিষয়ে নানা বক্তব্য প্রকাশ করে। এমনকি সরকারও একটা অনুরূপ পুরস্কার ঘোষণা করে, যার পরিণতি অজানা। এই সময়ের কিছু আগে থেকে য়ুরোপীয় উত্‌সাহে এদেশে যেমন শিক্ষিতেরা সমাজবিজ্ঞানে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন, তেমনি অপেক্ষাকৃত দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের চিন্তায় ছাপ ফেলেছিল। তার ফল সামাজিক উপন্যাসে আগ্রহ, জয়কৃষ্ণ প্রদত্ত পুরস্কার যার সৃষ্টিকে ত্বরান্বিত করেছিল।

এই পুরস্কার-রচনার সময় লালবিহারী, বঙ্কিমচন্দ্র, দিগম্বর বিশ্বাস, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহরমপুরে কর্মরত। ১২৭৬ চৈত্র সঙক্রান্তিতে ওখানে গ্রাণ্টস্ হলে একটি সাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠা হলে দিগম্বর সভাপতি হন। ১১.১১.১৮৭০ তারিখে দিগম্বর বদলি হন এবঙ লালবিহারী বদলি হন ১২.১.১৮৭২ তারিখে। গুরুদাস বলেছেন—'দিগম্বর বিশ্বাস বদলি হইয়া গেলে, স্যার গুরুদাস প্রস্তাব করেন যে, সহকারী সভাপতি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার স্থলে সভাপতি হউন। ইহাতে লালবিহারী অত্যন্ত বিরক্ত হন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষা ঢের ভাল ইঙরাজী জানেন এবঙ প্রেসিডেন্ট পদে তাঁহার পূর্ণমাত্রায় অধিকার। লালবিহারীর মনোভাব বঙ্কিম বুঝিতেন। স্যার গুরুদাস বঙ্কিমকে সভাপতি করিবার প্রস্তাব করিলে, বঙ্কিম তাঁহাকে বলেন 'করলেন কি?' ইহার পরে লালবিহারী ক্লাবে আসা বন্ধ করিলে উহা উঠিয়া যায়'। এই সময় ওখানে লালবিহারী প্রায়ই বঙ্কিম-পঠিত প্রবন্ধের সমালোচনা করতেন বলে দুজনের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। উদাহরণ, একবার বহরমপুর থেকে কলকাতায় আসার পথে দুজনকে নলহাটি স্টেশনের বিশ্রামাগারে চার ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়, কিন্তু তাঁদের কথাবার্তা হয়নি। লালবিহারীর দিক থেকে আলাপের চেষ্টা বিফল হয়েছিল।

রেভাবেন্ড হরিহর সান্যালের (১৮২০-১৮৮৭) দুই বন্ধু—লালবিহারী দে (১৮২৪-১৮৯৪) ও তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১) পুরস্কারের জন্য উপন্যাস লেখা আরম্ভ করেন। লেখা অনেকটা এগিয়ে যাবার পর লালবিহারীর অনুরোধে তাবকনাথ নিবৃত্ত হন। তিনি নিজের অসম্পূর্ণ ইঙরাজি রচনার অনুবাদ এবঙ তা সম্পূর্ণ ও মার্জিত করে পরে বাঙলায় 'স্বর্ণলতা' নামে প্রকাশ করেন। প্রতিযোগিতায় অনেকগুলি বাঙলা ও তিনটি ইঙরাজি উপন্যাস জমা পড়ে। ইঙরাজি রচনাগুলির লেখক ছিলেন লালবিহারী, রবার্ট নাইট এবঙ জনৈক ইঙরাজ ভদ্রমহিলা। প্রকৃতপক্ষে কোনো প্রতিযোগিতা হয়নি : রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কথায় জয়কৃষ্ণ পুরস্কারটি লালবিহারীকে দেন। এতে হর্শেলের সমর্থন ছিল। পরে সুযোগ পেয়ে লালবিহারী হর্শেল সাহেবের অত্যন্ত প্রশঙসা প্রকাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ১.৫.১৮৭১ তারিখ থেকে এক মাস প্রিভিলেজ লিভ নিয়ে উপন্যাসটি লেখেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখেছেন—'[বঙ্কিমচন্দ্র] ছুটি লইয়াছেন, আর দিবারাত্রি সাহিত্য সাধনায় নিমগ্ন আছেন।..বিষবৃক্ষ বহরমপুরে হয়। প্রথম নাম হইয়াছিল

'উভয়েরই দোষ'। নগেন্দ্র ও দেবেন্দ্রে বিপুল একটা মোকদ্দমা হাইকোর্টে পর্যন্ত হইয়াছিল। আমার সাক্ষাতে সেই খন্ড খন্ডীকৃত হইয়া অতলে গিয়াছে। সমগ্র উভয়ের দোষ পাল্টাইয়া লেখা হইয়াছে বিষবৃক্ষ।' বোধহয় প্যারীচাঁদের কাছে পুরস্কারের নেপথ্য-কাহিনী শুনে বঙ্কিমচন্দ্র রচনাটি ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের প্রথমে নতুন করে লেখেন, 'বিষবৃক্ষ' নামে তা 'বঙ্গদর্শনে' ১২৭৯ শনে প্রকাশ করেন এবঙ পুরানো পান্ডুলিপি ছিঁড়ে গঙ্গায় ফেলে দেন। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে লালবিহারীর 'গোবিন্দ সামন্ত' পুরস্কৃত এবঙ লন্ডনে পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র লালবিহারী বা তারকনাথ সম্বন্ধে নীরব : কিন্তু তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করার সুযোগ ছাড়েননি। কারণ ছোট সমব্যবসায়ীর ঈর্ষা এবঙ প্রতিযোগিতায় জয়লাভ। তারকনাথ 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লিখলেন--'গ্রন্থকারেরা লোকের মনের কথা টের পান এবঙ ইচ্ছা হইলে সকল স্থানেই গমনাগমন করিতে পারেন।..দুর্গম যে মুসলমানের অন্তঃপুর, বঙ্কিমবাবু কি প্রকারে তথায় উপস্থিত হইয়া ওসমান ও আয়েষার কথোপকথন শুনিতে পাইলেন?'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে রূপবর্ণনার বঙ্কিমী রীতিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। স্বর্ণলতায় এসব কথা অবান্তর, এবঙ তা যুক্তিসিদ্ধ নয়। অতএব, তা ভিন্ন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সেজন্য তিনি কখনো বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশঙসা করেননি, বঙ্কিম-নিন্দুককে আহারে নিমন্ত্রণ এবঙ শেষ জীবনে 'দেবী চৌধুরাণী'র অবাস্তবতার নিন্দা করতেন। লালবিহারীর আক্রমণের লক্ষ্য বিষবৃক্ষ। তাঁর কোনো ভক্ত 'জয়চাঁদ' ছদ্মনামে রমেশচন্দ্র দত্তের 'বঙ্গবিজেতা' উপন্যাসের যে সপ্রশঙস সমালোচনা প্রকাশ করেন। তার দুটি প্রাসঙ্গিক অঙশ এরূপ--

(ক) "স্কটের সহিত বঙ্কিমবাবুর অনেক সৌসাদৃশ্য আছে, এবঙ বঙ্কিমবাবু যে তাঁহার অনুকরণ করেন, তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন ;..কিন্তু স্কট যেমন প্রকৃতির, যেরূপ আদরের, যেরূপ গৌরবের, যেরূপ দেশ-বিদেশের সম্মানের লোক, বঙ্কিমবাবু যে তাহার চতুর্থাঙশের একাঙশও নহেন, এ কথা কোন্ জ্ঞানবান, কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিবেন?"

(খ) "শুনিতে পাই বঙ্কিমবাবুও জয়কৃষ্ণবাবু দত্ত ৫০০্ টাকা পুরস্কার পাইবার জন্য একখানি আখ্যায়িকা লিখিয়াছিলেন ; রেভারেন্ড দে বলেন যে, বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থের নাম 'উভয়েরই দোষ'। যদি এ কথা ভ্রমাত্মক না হয়, তাহা হইলে বঙ্কিমবাবুর পুরস্কার না পাইবার প্রকৃত কারণ এই যে, তিনি কখন গ্রামবাসীদের আচার-ব্যবহার বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিয়া দেখেন নাই।"

অপ্রাসঙ্গিক 'ক'-এর একমাত্র উদ্দেশ্য বঙ্কিমচন্দ্রকে কটূক্তি করা। 'খ'-তে সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা না পড়ে তার ত্রুটিনির্দেশ করেছেন। পূর্বনির্মিত সিদ্ধান্ত লালবিহারীকে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। রমেশচন্দ্রকে- ঐ রচনার অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র থেকেও বড় বলার কারণ বঙ্কিম-অনুরাগীদের দলে ভাঙ্গন সৃষ্টির চেষ্টা।

লালবিহারী দে তাঁর Bengal Magazine, September 1873 সংখ্যায়

বিষবৃক্ষের দীর্ঘ সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রকে ঔপন্যাসিক হিসাবে প্যারীচাঁদ মিত্র ও প্রতাপচন্দ্র ঘোষের নিচে স্থান দিয়ে লিখেছেন, যে 'দুর্গেশনন্দিনী' অবান্তর বাগ্‌বহুল এবঙ 'মৃণালিনী'র মান সাধারণ। বিষবৃক্ষ উপন্যাসটি মোটের উপর ভালো হলেও অবিশ্বাস্য ঘটনা, নগেন্দ্রের চারিত্রিক অসঙ্গতি, দেবেন্দ্রের দানবিকতা, এবঙ কাব্যনীতিবর্জিত কুন্দ উপন্যাসটির মারাত্মক ত্রুটি। তারাচরণের চরিত্রে ব্রাহ্মদের প্রতি যে ইঙ্গিত আছে তা প্রতিবাদযোগ্য। শেষ বক্তব্যে লালবিহারী দে ব্রাহ্ম সমর্থন আশা করেছিলেন তা বিফল হয়; বরঙ ব্রাহ্মেরা পরে কখনো তাঁকেই কটূক্তি করেছেন। তবে 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' লালবিহারীর সমর্থনে ছোট্ট লেখা প্রকাশ করে।

এই সমালোচনায় ক্ষুব্ধ হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র একটি চিঠিতে Mookerjee's Magazine-এর সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লেখেন—'Mr. De's review of বিষবৃক্ষ is rather of the faint paraise and civil sneer type. The reviewer is evidently the editor himself, who grossly contradicts some statements he made in an article he contributed to the Calcutta Review a few years ago.'

Mookerjee's Magazine, October 1873 সঙ্খ্যায় An Amateur Homoeopath ছদ্মনামে সমালোচক বিষবৃক্ষের আলোচনায় লালবিহারীর প্রচুর বিদ্রুপ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ২৭.১১.১৮৭৩ তারিখের চিঠিতে শম্ভুচন্দ্রকে লিখেছিলেন--'I just drop a line to give my thanks to the Amateur Homoeopath–who I know is no other than the 'Head-Eater' himself.' বঙ্কিমচন্দ্রের অনুমান ভুল। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত বঙ্কিম বিশেষজ্ঞেরা ভুলটির পুনরাবৃত্তি করেছেন। চুঁচুড়াবাসী সাহিত্যিক ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হরচন্দ্র ঘোষের (১৮১৭-১৮৮৪) ছেলে গোপালকৃষ্ণ ঘোষ (১৮৫০-?) মুন্সেফ ছিলেন। তিনি এই বেনামি রচনাটির লেখক। এর পর থেকে গোপালকৃষ্ণ 'বঙ্গদর্শনে' কবিতা লিখতে থাকেন এবঙ পরে তাঁর কাব্যসঙ্কলন 'কুসুম-মালা' (১৮৭৭) প্রকাশ করেন।

৪

বারুইপুর মহকুমার অধীন চাঙড়িপোতা থেকে সাপ্তাহিক সঙবাদপত্র 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশিত হত। সম্পাদক ছিলেন সঙস্কৃত পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ এবঙ সহকারী তাঁর গুণমুগ্ধ বোনপো শিবনাথ শাস্ত্রী। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬৪ এপ্রিলে বারুইপুরে কাজে যোগ দেবার দশ দিনের মধ্যে 'সোমপ্রকাশ' তাঁর চরিত্র ও কর্মকুশলতার প্রশঙসা করে। সামুদ্রিক বিক্ষোভে ৫.১০.১৮৬৪ তারিখে ঝড় ও বন্যায় দক্ষিণবঙ্গ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হলে বঙ্কিমচন্দ্র সপ্রশঙসভাবে রিলিফের কাজ করেছিলেন। এই বিষয়ে সোমপ্রকাশের সঙ্গে শিবনাথের 'আত্মচরিতে'র নীরবতা সমান্তরাল ও অর্থবহ।

১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হলে ১৩.১.১২৭২ তারিখে সোমপ্রকাশ লেখে—'কয়েকটি স্থান অতিবর্ণন দোষে বিরস হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে পতত্প্রকর্ষতা

দোষ ঘটিয়াছে। মধ্যে মধ্যে অশ্লীল ও গ্রাম্যতা দোষেরও বিন্দুপাত হইয়াছে। ভাষাটিও ললিত ও সর্বজন হৃদয়গ্রাহিণী হয় নাই।' কপালকুন্ডলা ও মৃণালিনী সোমপ্রকাশে আলোচিত হয়নি। বঙ্গদর্শনের প্রথম প্রকাশের পর ১১.১.১২৭৯ তারিখে সোমপ্রকাশ লেখে--'বঙ্গাদর্শন কোনও কালে সহৃদয় সমাজে আদরণীয় হইতে পারিবে না।' কারণ 'বঙ্গাদর্শনের স্থানে স্থানে যেরূপ ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, সাধারণ লোকেও তাহা প্রয়োগ করিতে লজ্জাবোধ করিয়া থাকে।..বঙ্গাদর্শনে অস্পষ্টতা প্রভৃতি দোষও বিলক্ষণ দৃষ্ট হইল।..যিনি মনের কথা সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করিতে না পারেন, তাঁহার লেখনী ধারণ করা বিড়ম্বনামাত্র।..

যাহা হউক, বঙ্গাদর্শনের অনেক স্থলে নিতান্ত কদর্য ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপ বাঙ্গালা প্রচার হইলে ভাষার উন্নতি হওয়া সুদূরপরাহত।..'

১২৮০ শ্রাবণ সঙ্খ্যার বঙ্গাদর্শন সম্বন্ধে ২১.৪.১২৮০ তারিখে সোমপ্রকাশ লিখেছে--'বস্তুতঃ বঙ্কিমবাবু সময়ে সময়ে বাঙ্গালা গ্রন্থগুলিকে যেরূপ 'অপাঠ্য' বলিয়া নির্দেশ করেন, তাঁহার বিষবৃক্ষও সেইরূপ 'অপাঠ্য' হইয়াছে, সন্দেহ নাই।' এবঙ 'বঙ্গাদর্শনের যেরূপ মাহাত্ম্য!!! 'গর্দভ স্তোত্রটী' তাহার অনুরূপই হইয়াছে।..গর্দভবুদ্ধি যখন যাহার ঘাড়ে চাপে সে সময়ে তিনি যে গর্দভবত্ ব্যবহার করেন তাহা আশ্চর্যের নহে। বঙ্গাদর্শন গর্দভবুদ্ধিবিশিষ্ট হওয়াতেই গর্দভের স্তুতিবাদ করিয়াছেন। হিতচিকীর্ষু বন্ধুর মনোরঞ্জন না করা কৃতঘ্নের কার্য।'

সোমপ্রকাশে বঙ্গাদর্শন সম্বন্ধে অন্যান্য আলোচনাও এই ধরনের। যেমন--

(১) 'চিঠিপত্র। বঙ্গাদর্শন প্রসঙ্গে।' ৩.৫.১২৮০।

(২) 'চিঠিপত্র'। বঙ্গাদর্শন প্রসঙ্গে।' ১০.৫.১২৮০।

(৩) 'বঙ্গাদর্শন হইতে বঙ্গসমাজের উপকার অথবা অপকার হইবার সম্ভাবনা? সোমপ্রকাশের মন্তব্য।' ২৪.৫.১২৮০।

(৪) 'বঙ্গাদর্শন এবঙ বাঙ্গালা গ্রন্থকার।' ১৪.৪.১২৮৫।

(৫) 'বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৯.৪.১২৮৭।

দ্বিতীয় পত্রে নিন্দার প্রতিবাদ থাকায় পরের রচনা তার প্রতিবাদে নিন্দায় উগ্রতর। এগুলি কখনো সম্পাদকীয় রচনা, কখনো অজ্ঞাতনামা লেখকের চিঠির আকারে ছাপা। কেবল শেষ রচনাটিতে যে চিঠি ও সম্পাদকীয় মন্তব্য ছাপা হয়েছে তা প্রশঙসাসূচক। কারণ, নিন্দাপ্রকাশের সময় সোমপ্রকাশের ভার শিবনাথের হাতে ছিল, কিন্তু শেষ রচনাটির পূর্বে তা হস্তান্তরিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র সোমপ্রকাশের বিরুদ্ধে কোনো লেখা ছাপেননি, কিন্তু বন্ধু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ১৩.৫.১৮৭২ তারিখে একটি চিঠি লিখে দুঃখ প্রকাশ করেন। নিন্দার ভার সোমপ্রকাশের সঙ্গে অন্যত্র ভাগ করলে উদ্দেশ্য সফলতর হয়। শিবনাথের সঙ্গে 'এডুকেশন গেজেটে'র যোগাযোগ ছিল। এজন্য শিবনাথ এই সাপ্তাহিকটি নির্বাচন করলেন। বঙ্গাদর্শনে (জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯) প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'আকাঙ্ক্ষা' কবিতাটি পরে

'কবিতাপুস্তকে' সঙকলিত হয়েছে। তার দুটি অঙশ 'সুন্দরী' ও 'সুন্দর'। এই কবিতা সম্বন্ধে ৮.৩.১২৭৯ তারিখের এডুকেশন গেজেটে 'প্রাপ্তপত্রে' শিবনাথ নিচের চিঠিটি লেখেন।

এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ।

মান্যবর সম্পাদক মহাশয়।

অনেক দিন হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যের নীতি সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। সাহিত্য সম্বন্ধে দেশের লোকের রুচি বিকৃত দেখিয়া বড় দুঃখিত হইয়াছি। বিজ্ঞান, ধর্ম্মনীতি, ইতিহাস এ সকল লোকের প্রিয় নয়। কিন্তু অশ্লীল নাটক, কদর্য্য 'নভেল' এ সকল বাজারে পড়িতে পায় না। কে যে নাটক কিম্বা নভেল লেখে না, আমি ভাবিয়া পাই না। যার একটু লিখিবার ক্ষমতা আছে, এই দিকে ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছে।

এ কবিতার পক্ষেও ঠিক এইরূপ। যাহা কিছু সারগর্ভ, যাহাতে চিন্তা আবশ্যক করে, যাহার নীতি পবিত্র তাহা লোকের ভাল লাগে না। কিন্তু যাহার ভাব লজ্জাজনক, তাহাই সকলের প্রিয়। কতকগুলি প্রসিদ্ধ ক্ষমতাশালী লেখকের অসাবধানতা এই রুচি বিকৃত হওয়ার কারণ। কোন জাতির রুচি গঠন করিবার বিষয়ে ক্ষমতাপন্ন লেখকদিগের অনেক কর্ত্তৃত্ব। তাঁহারা মনে করিলে সেই রুচি পরিশুদ্ধ কিম্বা বিকৃত করিতে পারেন। সুতরাঙ তাঁহাদের অসাবধানতানিবন্ধন যদি দেশের রুচি মলিন হইয়া যায়, তাঁহারা সে জন্য দায়ী। একবার রুচি বিকৃত হইলে আমার মত পয়সার কাঙ্গালীরা কলম ধরিয়া সেই বিকৃত রুচি আরও বৰ্দ্ধিত করিতে থাকে। বাঙ্গালা সাহিত্যের সেই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।

বঙ্গাদর্শন যখন প্রথমে বাহির হইবার কথা হয়, তখন আমি ইহার একজন প্রসিদ্ধ লেখককে (তিনি কবিতা লিখিতে পারেন) বলিয়াছিলাম যে, আপনাদের কর্ত্তব্য আমাদের জাতির এই রুচির পরিবর্ত্তন করেন। কিন্তু বঙ্গাদর্শনের দুই খন্ড ত প্রকাশিত হইয়াছে। আমি দেখিয়া বড় দুঃখিত হইয়াছি। ইহার অপরাপর বিষয়ের কথা বলিতে চাহি না। কিন্তু ইহাতে যে কবিতাটী প্রকাশ পাইয়াছে, আমার মতে তাহাতে এই বিকৃত রুচির অত্যন্ত পোষকতা করে। কোন্ ভাব হৃদয়ে উদয় করা, কি শিক্ষা দেওয়া এ কবিতার উদ্দেশ্য আমি বুঝিতে পারি না। প্রণয় বর্ণনা করিতে হইলে রাধাকৃষ্ণের মাখামাখির মত না করিলে হয় না। আমার বিশেষ এ বিষয়ে বলিবার কারণ এই আমি কতকগুলি স্ত্রীলোককে আগ্রহের সহিত বঙ্গাদর্শন পড়িতে দেখিয়াছি। প্রণয়ের এইরূপ নীচ ও কদর্য্যভাব কি স্ত্রীলোকদের মনে কেন, পুরুষেরইবা মনে বাড়িতে দেওয়া উচিত? আমার কবি ভায়ারা মনে করেন যে ফলারের পাতের মত মাখা চোকা না করিলে আর রসিকতা হয় না। যাহা হউক, বঙ্গাদর্শনের অনুকরণ করিয়া একটী কবিতা লিখিয়া পাঠাইতেছি, অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবেন। আমার গদ্য পত্রখানি ইচ্ছা করিলে প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু অস্বাক্ষরিত পত্র লেখা আমার মত নয়, সুতরাঙ আমার সম্পূর্ণ নাম দিয়াই প্রকাশ করিবেন।

সুন্দরী।

১

কেন না হইলি তুই সাধের ধুচুনি?
রে প্রাণ রতন!
প্রতিদিন করে ধরে, লয়ে প্রেম সরোবরে,
সোহাগেতে ডুবাতাম সাধের ধুচুনি।
রে প্রাণ রতন!

২

কেন না হইলি তুই দুধের ব্যাসালি
রে প্রাণবল্লভ!
দুধ হয়ে তোর কোলে, পড়িতাম কুতূহলে,
প্রেমভরে চোঁ চোঁ করে পাড়িতাম গালি ;--
রে প্রাণবল্লভ!

৩

কেন না হইলি তুই মোর ছড়া হাঁড়ি!
রে হৃদয় সখা!
না পোহাতে বিভাবরী, তোরে বাম করে ধরি,
আনন্দে দিতাম ছড়া ঘুরে সারা বাড়ী।
রে হৃদয় সখা!

৪

কেন না হইলি তুই মোর ছেঁড়া কাঁথা,
রে প্রাণ কানাই!
আমি সূতারূপ নিয়ে, তোর অঙ্গে মিশাইয়ে,
বলিতাম কাণে কত প্রণয়ের কথা!
রে প্রাণ কানাই!

৫

কেন না হইলি তুই সলিতার কানি,
হৃদয় ভূষণ।
সোহাগেতে পাক দিয়ে, আনিতাম পাকাইয়ে
হৃদি দীপে রেখে স্নেহ ঢালিতাম আনি।
হৃদয় ভূষণ!

সুন্দর।

১

কেন না হইনু হায়! সাধের ধুচুনি,
রে প্রাণ প্রতিমে।
তোর ও কমল করে, আনন্দে বিহার করে,
সার্থক ধুচুনি জন্ম হইত যে ধনি!
রে প্রাণ প্রতিমে!

২

কেন না হইনু তোর দুধের ব্যাসালি,
রে মঞ্জু হাসিনি!
ছ্যাক্ ছোঁক্ প্রেমালাপে, নিবাইয়ে মনস্তাপে,
বাহিরে কেবল আমি থাকিতাম কালি।
রে মঞ্জু হাসিনি!

৩

কেন না হইনু হায়! তোর ছড়া হাঁড়ি,
রে প্রাণ প্রেয়সি!
করিয়া তোমার করে, ছ্যাড়াক্ ছ্যাড়াক্ স্বরে,
করিতাম প্রেমগীত প্রাতে গলা ছাড়ি।
রে প্রাণ প্রেয়সি!

৪

কেন না হইনু আমি তোর ছেঁড়া কাঁথা,
রে প্রাণতোষিণী?
সোহাগে তোমাকে নিয়ে, নিজ ছিদ্র ঢাকা দিয়ে,
আদর পেতাম কত হায় যথা তথা।
রে প্রাণতোষিণী?

৫

কেন না হইনু তোর সলিতার কানি,
রে সুধাভাষিণি!
ও সুগোল উরুপরে, লুটিতাম প্রেমভরে,
করিতাম রোম ধ'রে কত টানাটানি,
রে সুধাভাষিণি!

আকাশবাণী।

১

কেন না হইলি তোরা বাঙ্গালার কবি
সুন্দরী সুন্দর!
উঠিত রসের ঢেউ, খেয়ে না বাঁচিত কেউ,
হতভোম্ভা সরস্বতী যেন আঁকা ছবি।
সুন্দরী সুন্দর!

২

বঙ্গাদর্শনের কেন হলি না লেখক?
সুন্দরী সুন্দর!
রসের কবিতা ক'রে, নিতে মন প্রাণ হ'রে,
কত বাবু ভেয়ে প'ড়ে মিটাতেন সক্!
সুন্দরী সুন্দর!

৪ঠা আষাঢ় ১২৭৯।
বহুবাজাব।

শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য।

২৯.৩.১২৭৯ তারিখে এডুকেশন গেজেটে এই অস্বাক্ষরিত চিঠিটিতে ছাপা হয়েছিল—'বিগত সপ্তাহে আপনার সাপ্তাহিক বার্তাবহে শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় কর্তৃক বঙ্গাদর্শনের প্রতিকূলে যে কতিপয় রহস্যসূচক পদ্য প্রকটিত হইয়াছিল, তদ্দৃষ্টে আমরা হর্ষে বিষাদিত হইলাম। যেহেতু রত্নগর্ভ রত্নাকরকে লবণাক্তসলিলজনিত দোষে দূষিত করা হইয়াছে।'

এডুকেশন গেজেট এর কোনো উত্তর দেয়নি, কিন্তু পরে শিবনাথের কোনো রচনা ছাপেনি। শিবনাথের রচনা যে প্যারডি নয়—অভদ্র বিদ্রূপ, কবিতার ভূমিকা ও শেষ স্তবকে তা স্পষ্ট।

শিবনাথের অনাবিষ্কৃত কবিতাটি সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—'শিবনাথের ব্যঙ্গরস সুমার্জিত এবঙ শিষ্ট রুচিসম্মত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গাদর্শনে বৈষ্ণব কবিদিগের অনুসরণে—'কেন না হইনু আমি যমুনার জল রে' এই কবিতাটি প্রকাশ করিলে, শিবনাথ ইহার এমন একটা বিদ্রূপ অনুকরণ করিয়া সোম-প্রকাশে প্রচার করিয়াছিলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত তাঁহার কবি-প্রতিভা এবঙ রচনা-নৈপুণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।' এই বর্ণনার কয়েকটি ভুল হল কবিতার উদ্ধৃতিতে বিচ্যুতি, সাময়িকপত্রের নামে গোলমাল এবঙ বঙ্কিমচন্দ্রের সন্তুষ্টির কথা। বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে এতে সন্তুষ্ট হওয়া সম্ভব ছিল না। আত্মজীবনীতে উল্লিখিত তথ্য নানা কারণে অনেক সময় নির্ভরযোগ্য থাকে না। ১২৮২ চৈত্রের বঙ্গাদর্শন ৩০.৭.১৮৭৬ তারিখে

এবঙ ১২৮৪ বৈশাখের সঙ্খ্যা ১৭.৪.১৮৭৭ তারিখে প্রকাশিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে ১২৮৩ শনে বঙ্গাদর্শন বন্ধ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তা প্রকাশিত হয়নি সাড়ে আটমাস। ১২৮৪ বৈশাখ সঙ্খ্যার বিজ্ঞাপন 'সাধারণী'তে ১৮.৩.১৮৭৭ তারিখে এবঙ 'এডুকেশন গেজেটে' ১৩.৪.১৮৭৭ তারিখে প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে ১৮৭৬ নভেম্বরে বঙ্কিমচন্দ্র একটি দানপত্রে সঞ্জীবচন্দ্রকে বঙ্গাদর্শনের স্বত্ব দান করেন। অথচ নবীনচন্দ্র সেনের মতে তিনি ঐ পুনরুজ্জীবনের প্রধান উত্সাহদাতা। নবীনচন্দ্র ১৮৭৭ ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি দু মাসের ছুটি নেন এবঙ ছুটি ফুরোবার আগেই ২.৪.১৮৭৭ তারিখে কাজে যোগ দেন। ঐ সময় তিনি চট্টগ্রাম থেকে কলকাতায় আসেন এবঙ মার্চ মাসে নৈহাটিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেন। অতএব, নবীনচন্দ্রের আত্মপ্রসাদ তথ্যপ্রতিষ্ঠ নয়। নবীনচন্দ্র লিখেছেন--'বঙ্কিমবাবু বলিলেন--'একটি কথা। শিবনাথ শাস্ত্রীকে কখনও 'বঙ্গাদর্শনে' লিখিতে দিবে না বল।' আমি বলিলাম--'আপনি এত লোকের মাথায় লঙ্কার হাঁড়ি ঝাড়িলেন। আর শিবনাথ শাস্ত্রী আপনার 'সুন্দরী সুন্দর' কবিতাটির অনুকরণে একটি বিদ্রূপাত্মক কবিতা লিখিয়াছিল বলিয়া কি তাহার প্রতি এই ক্রোধ উচিত?' তিনি বলিলেন--'বিদ্রূপের জন্য নহে। সে উহা maliciously (অসরল ভাবে) করিয়াছিল।' এবঙ 'যাহা হউক তাঁহার ভীষ্ম বাক্যে আমরা সম্মত হইলাম যে শিবনাথ শাস্ত্রী 'বঙ্গাদর্শনে' কখনও লিখিতে পারিবেন না।'

শেষ জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র যখন বাঙলা সাহিত্যে উচ্চপ্রতিষ্ঠিত এবঙ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মৃত, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতিকামনায় শিবনাথ Society for the Higher Training of Young Men প্রতিষ্ঠানে ১০.১০.১৮৯৩ তারিখ মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে পাঁচটায় 'জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় নীতি' নামে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। সাহিত্যশাখার সভাপতি হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র সভাপতিত্ব করেন। শ্রোতাদের মধ্যে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। বক্তৃতায় শিবনাথ বলেন, যে এই দুটি বিষয় পরস্পর গভীরভাবে যুক্ত বলে ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবেও সাহিত্যিক উপাদান থেকে ইতিহাস রচনা করা সম্ভব। অতিরিক্ত পারলৌকিকতা, উত্কল্পনা, এবঙ বস্তুনিষ্ঠতার অভাবের ফলে বিস্তৃত সঙস্কৃত সাহিত্যে ইতিহাস না থাকলেও তা থেকে ইতিহাস নির্মাণ করা যায়। সেজন্য য়ুরোপীয় বিদ্যা ও সঙস্কৃতে পন্ডিত দুজন ব্যক্তিকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া প্রয়োজন। অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের অবদানে গত ত্রিশ বছরে বাঙলায় সাহিত্য ও জাতীয় নীতির যুগপত্ উন্নতি হয়েছে। বিগত দশকে যে নিম্নগামী রুচি ক্রমোন্নতিকে ব্যাহত করেছে, তা প্রতিরোধ করে সত্সাহিত্য সৃষ্টির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র ও গুরুদাসকে নিয়ে একটি কমিটি তৈরি করা ভালো।

বক্তৃতাশেষে গুরুদাস বক্তাকে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর মতপার্থক্য জানান, কারণ গত ৩০/৪০ বছরে বাঙলার জাতীয় সাহিত্যের তুলনায় জাতীয় চরিত্রের উন্নতি কম হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র সময়াভাব জানিয়ে সঙক্ষেপে বলেন, যে জাতীয় সাহিত্য যে সর্বদা জাতীয়

চরিত্রের প্রতিচ্ছবি নয়, তার উদাহরণ এলিজাবেথীয় ইঙরাজি কাব্য, যা কর্মব্যস্ততার যুগে রোমান্টিকতার বর্ণনা করেছে। হিন্দু পুনরুত্থানবাদের প্রাবল্যে যখন ব্রাহ্ম আন্দোলন প্রায় নির্জীব, তখন বিশিষ্ট ব্রাহ্মের উপস্থিতিতেও ব্রাহ্ম শিবনাথ উন্নতির বরাত দিলেন দুজন গোঁড়া হিন্দুর উপরে। প্রস্তাবটির প্রকৃত কারণ বঙ্কিম-তোষণ। তা ফলবান না হওয়ায় সম্পর্কের উন্নতি হল না। ফলে শিবনাথ ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বর্ণিত 'আত্মচরিতে' কোথাও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসঙ্গ লিখলেন না। অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরে কলকাতায় টাউন হলে ৪.৫.১৮৯৪ তারিখে জনসমাকীর্ণ বঙ্কিম-স্মরণসভায় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবের সমর্থনে শিবনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশঙসা করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বিশ শতকের গোড়ায় বাঙালির সাঙস্কৃতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নেওয়ায় 'রামতনু লাহিড়ী ও তত্‌কালীন বঙ্গসমাজ' (১৯০৩) গ্রন্থে তাঁর উল্লেখ কর্তব্য। সোজাসুজি ব্যক্তিগত নিন্দা করা কঠিন বলে শিবনাথকে কৌশলে কাজ করতে হয়েছে। 'নব্যবঙ্গের দ্বিতীয় যুগের নেতৃবৃন্দ' নামে একাদশ পরিচ্ছেদে শিবনাথ, কেশবচন্দ্র সেন, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও মহেন্দ্রলাল সরকারের জীবনী লিখেছেন। তাঁদের জন্য ঐ পরিচ্ছেদে স্থানের পরিমাণ যথাক্রমে ৩২, ১৩, ৮, ১৭ এবঙ ৩০ শতাঙশ। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে শিবনাথের মনোভাব এ থেকে স্পষ্ট। দ্বারকানাথকে তাঁর দ্বিগুণ স্থান দেওয়ায় শিবনাথের ঐতিহাসিক দৃষ্টি যে সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে আচ্ছন্ন ছিল, তা-ও বোঝা যায়।

ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ সভায় পঠিত, সাময়িকপত্রে প্রকাশিত এবঙ সাধারণে আদৃত হয়েছিল। তাতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি—কোথায় গেল সেই 'বিজয়বসন্ত', সেই 'গোলেবকাওলি', সেই বালক-ভুলানো কথা—'

শিবনাথ বাধ্য হয়ে সুর মিলিয়ে লিখেছেন—'আমরা সেদিনের কথা ভুলিব না। 'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্গসমাজে পদার্পণ করিবামাত্র সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিল।..আমরা যাহা দেখিলাম তাহা অগ্রে কখনও দেখি নাই।'

এই বর্ণনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের মিল যতখানি, সোমপ্রকাশের সমালোচনার বৈপরীত্যও ততখানি। বঙ্গদর্শন প্রসঙ্গে শিবনাথ লিখেছেন—'১৮৭২ সালে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমের প্রতিভা আর এক আকারে দেখা দিল। ..বঙ্গদর্শন দেখিতে দেখিতে উদীয়মান সূর্যের ন্যায় লোকচক্ষের সমক্ষে উঠিয়া গেল।' এর সঙ্গে সোমপ্রকাশ ও শিবনাথের পূর্বোদ্ধৃত চিঠি তুলনীয়। এ ছাড়া উপায় ছিল না। অথচ বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করার ইচ্ছা প্রবল। সেজন্য একেবারে শেষে লিখেছেন—'বঙ্কিমবাবু চরিত্রাঙশে কেশবচন্দ্র সেন বা মহেন্দ্রলাল সরকার বা দ্বারকনাথ বিদ্যাভূষণের সমকক্ষ লোক ছিলেন না ; কিন্তু প্রতিভার জ্যোতিতে দেশ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।' প্রশঙসাটি যথেষ্ট নিন্দাসূচক। ইঙ্গিতবাহী আক্রমণ তথ্যগত নীরবতাকে উপেক্ষা করে।

পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র নিন্দা-বিদ্রূপের উত্তর দেননি। দিলে, শিবনাথের আত্মগৌরব বাড়ত। তাই শিবনাথ লিখলেন—'আমরা সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদল সোমপ্রকাশের পক্ষাবলম্বন করিলাম এবং বঙ্কিমী দলকে 'শবপোড়া-মড়াদাহের দল' বলিয়া বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিলাম। বঙ্কিমের দল ছাড়িবেন কেন? তাঁহারা সোমপ্রকাশের ভাষাকে 'ভট্টাচার্যের চানা' নাম দিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন।' উক্তিটি অসত্য। ২৪.৫.১২৮০ তারিখে সোমপ্রকাশে 'বঙ্গদর্শন হইতে বঙ্গসমাজের উপকার অথবা অপকার হইবার সম্ভাবনা' নামে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আছে—'শব শব্দের পর দাহ ও মড়া শব্দের পর পোড়ান শব্দ প্রয়োগ করিলেই ভাষার সৌষ্ঠব ও শোভা সম্পাদিত হয়। কিন্তু আমরা যদি শব পোড়ান ও মড়া দাহ এইরূপ প্রয়োগ করি, পাঠকগণ, বস্তুত তাহা কেমন কৌতুকাবহ হইয়া উঠে। এক গালে চূণ ও অন্য এক গালে কালি দিলে সেই দিব্য মূর্তিটী দেখিতে যেমন সুন্দর হয়, শব পোড়ান ও মড়া দাহ প্রয়োগ করিলে, পাঠকগণ, শুনিতে কি সেইরূপ মধুর হয় না! বঙ্গদর্শনের লেখকগণ মাতৃভাষাকে এই দিব্য মূর্তি পরিগ্রহ করাইতে উদ্যত হইয়াছেন!!' এটি সোমপ্রকাশের মন্তব্য—'সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদলের' কথা নয়।

প্রায় দু মাস পরে ১১.৭.১২৮০ তারিখে অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সাধারণী' প্রথম প্রকাশিত হয়। অনেকদিন পরে ওই কাগজে খুঁটিনাটি খবর নিয়ে 'চণকচূর্ণ' নামে ব্যঙ্গরচনা প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হতে থাকে। ২২.৩.১২৮১ তারিখে 'সাধারণী'তে প্রকাশিত 'চণকচূর্ণ (সংবাদপত্র)'-এর অংশবিশেষ এই রকম—

'ভট্টাচার্যকি চেনা [সোমপ্রকাশ] সোমবারকো লেনা। এস্মে প্রা-আ-আড়্-বিবাক হ্যায়, মলিম্লুচ হ্যায়, সহা-আ-আনুভূতি হ্যায়, উদূখল হ্যায়, ধৃষ্টদ্যুম্ন হ্যায়। ইয় সব্ মিল্ কর্ ভট্টাচার্যকি চেনা বনায়া হুয়া হ্যায়। ইস্মে ইষ্ট, নিষ্ট, শিষ্ট, কৃষ্ণ, রাজনীতি, সমাজনীতি, সংবাদ, বিসংবাদ, বাদানুবাদ, অপবাদ—সব ভাজা ভাজা, তাজা বতাজা মিলেগা। ভট্টাচার্যকি চেনা সোমবারকো লেনা।' সোমপ্রকাশের লক্ষ্য একমাত্র বঙ্গদর্শন, উদ্দেশ্য আক্রমণ। সাধারণীর লক্ষ্য সব সংবাদপত্র, উদ্দেশ্য রঙ্গ। উত্তরে আক্রমণ করা উদ্দেশ্য হলে দশ মাস পরে রচনাটি প্রকাশিত হত না। এটা প্রত্যুত্তর নয়। তাছাড়া, সাধারণী এই নিয়মিত রচনায় ১২.৬.১২৮১ তারিখে 'মতিচুরের সাথে চেনাচুর'-এ বঙ্গদর্শনকে নিয়েও রঙ্গ করেছিল।

৫

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬৪ মার্চে বারুইপুর মহকুমার কর্মভার নেন। ওই বছর ৫ অক্টোবর ভয়াবহ সামুদ্রিক ঝড় ও জলপ্লাবনের ফলে দক্ষিণবঙ্গ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হলে সরকারি রিলিফের কাজে বঙ্কিমচন্দ্র ৯ অক্টোবর থেকে কয়েকদিন নদীয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ব্রহ্মনাথ সেনের সঙ্গে জয়নগর, সুলতানপুর প্রভৃতি অঞ্চলে গেলে মজিলপুরের ব্রাহ্ম যুবক কালীনাথ দত্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। কালীনাথ তাঁর কাজে সাহায্য করেন। ডায়মন্ডহারবারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হেমচন্দ্র কর সরকারি অনুমতি ছাড়া ৪ তারিখে তাঁর শ্যামবাজারের বাড়িতে আসেন এবং ঝড়ে ভয় পেয়ে ফিরে যাননি। ৮ তারিখে

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তা জানতে পারেন : কিন্তু তাঁর ও কমিশনারের আদেশ সত্ত্বেও হেমচন্দ্র মাঝে মাঝে কর্মস্থলে যান এবঙ সেখানে না থেকেই কলকাতায় ফেরেন। এই অবস্থায় কাজ ব্যাহত হওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্রকে ২৪.১০.১৮৬৪ তারিখে ডায়মন্ডহারবারে অস্থায়ীভাবে বদলি করা হয়। ব্রহ্মনাথ কয়েকদিন বারুইপুরে কাজ করেন, এবঙ তারপর অস্থায়ী কাজে গাফিলতির জন্য হেমচন্দ্রের কর্মচ্যুতির প্রস্তাব করা হলেও শেষ পর্যন্ত পদাবনতি ঘটিয়ে ১৫ নভেম্বর তাঁকে গড়বেতায় বদলির আদেশ দেওয়া হয়। তিনি অবশ্য ১৮৬৫ জানুয়ারির প্রথম পর্যন্ত বারুইপুরে থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্র জানুয়ারির শেষ দিন পর্যন্ত ডায়মন্ডহারবারে থেকে জে পি প্র্যাট-কে কার্যভার বুঝিয়ে দিয়ে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারির প্রথমে বারুইপুরের কার্যভার নেন এবঙ ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের মে পর্যন্ত সেখানে থাকেন।

অতএব, কালীনাথের সঙ্গো বঙ্কিমচন্দ্রের মজিলপুরের প্রথম পরিচয় ২/১ দিনের জন্য মাত্র। কালীনাথের কথা অনুসারে, বারুইপুরে হেমচন্দ্র কর তাঁর চাকুরি করে দেন। পূর্ববর্ণনা অনুসারে তা ১৮৬৪ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে হতে বাধ্য। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বারুইপুরে প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে লিখেছেন—'এই সময় হইতে আমি বঙ্কিমবাবুকে ভাল করিয়া চিনিবার সুযোগ ও অবসর পাইলাম।' তা ১৮৬৫ ফেব্রুয়ারির পূর্বে নয়।

দুর্গেশনন্দিনী ১৮৬৫ মার্চে প্রকাশিত হয়। ৩০৭ পৃষ্ঠার বইটি বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয় ডায়মন্ডহারবারে যাবার অনেক আগে ছাপতে দিয়েছিলেন। কিন্তু কালীনাথ লিখেছেন—'এই সময়ের পূর্ব হইতে তিনি দুর্গেশনন্দিনী লিখিতেছিলেন।..দুর্গেশনন্দিনীর লেখা সমাপ্তপ্রায় হইলে, কিম্বা মুদ্রিত হইবার প্রাক্কালে আমি তাঁহার পাঠ-কক্ষের টেবিলে কয়েক ভলুম ওয়েবর্লী উপন্যাস সজ্জিত দেখি।..দুর্গেশনন্দিনী রচিত হইবার পূর্বে তিনি Ivan Hoe পড়িয়াছিলেন কি না আমি তাহা ঠিক বলিবার অধিকারী নহি। আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা সত্যের অনুরোধে প্রকাশ করিয়া দিলাম। আমি আগে দুর্গেশনন্দিনী পাঠ করি, তাহার অনেক দিন পরে Ivan Hoe অধ্যয়ন করি। বলিতে কি আমি উভয়ের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া অবাক হইয়াছিলাম। ..Ivan Hoe-র ছায়া লইয়া যে দুর্গেশনন্দিনী রচিত হয় নাই, ইহা বঙ্কিমবাবু নিজমুখে শতবার ব্যক্ত করিয়াছেন। আমার নিজের ধারণা যাহাই হউক না কেন আমি বঙ্কিমবাবুর কথায় বিশ্বাস করিয়া সে ধারণাকে অপসৃত করিয়াছি। কেন না আমি তাঁহার honesty কে Unimpeachable বলিয়া বিশ্বাস করি। বস্তুতঃ এ বিষয়ে তাঁহার কথায় বিশ্বাস ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।'

এই বর্ণনা যে দুর্গেশনন্দিনী সম্বন্ধে সত্য হতে পারে না, তা চাকুরির বিবরণ থেকে স্পষ্ট। কপালকুন্ডলা ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে প্রকাশিত হয়। কালীনাথের বর্ণনা সত্য হলে, তা কপালকুন্ডলা রচনার কথা। ওই ঘটনা ও কালীনাথের রচনার মধ্যে কালব্যবধান প্রায় ৩৫ বছর। তা স্মৃতির গোলমাল হবার পক্ষে যথেষ্ট। অর্থাৎ ঐ সময় বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠকক্ষে Ivan Hoe ছিল বটে, তবে দুর্গেশনন্দিনী তখন প্রকাশিত হয়েছে এবঙ কপালকুন্ডলা লেখা হচ্ছে। কালীনাথ স্কটের বই দেখেছিলেন, এবঙ কিছু

লেখা হচ্ছে, অনুমান করেছিলেন। তিনি তাঁর দেখা ও অনুমানকে মিশিয়ে উপাদেয় কাহিনী লিখেছেন, যার মধ্যেকার সত্য ও মিথ্যার জট এতদিন ছাড়ানো হয়নি। কালীনাথ যে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যে সন্দিহান ছিলেন, উপরের কথাগুলি তা নির্দেশ করে।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন--'আমি যখন দুর্গেশনন্দিনী লিখি তখন আমার বয়স ২৪ বত্‌সর।' অর্থাত্‌ দুর্গেশনন্দিনীর রচনারম্ভ ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে। তার আগে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরী বিনিময়' গল্প তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসে' (১৮৫৭) বেরিয়েছে। এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে বঙ্কিমচন্দ্রের উপর প্রকৃত প্রভাব নির্ণয় করা সম্ভব। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, প্লটে প্রভাব যেমন আভ্যন্তর প্রমাণে নির্ণয়যোগ্য, থিম্‌-এ প্রভাব তেমন স্পষ্ট নয়। কালীনাথের স্মৃতিচারণের গ্রহণযোগ্যতা সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান নন। বঙ্কিমচন্দ্র এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করতে পারেননি : তিনি রচনাটি প্রকাশের পূর্বে মারা গেছেন। দুর্গেশনন্দিনীতে Ivan Hoe উপন্যাসের প্রভাব বহু-আলোচিত, কিন্তু অপ্রতিষ্ঠিত। এই বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের স্পর্শকাতরতা ছিল, যা তাঁর অন্য কোনো রচনায় অন্য কোনো প্রভাবের বিষয়ে ছিল না। এমনকি কয়েক জায়গায় তিনি নিজেই প্রভাব-নির্দেশ করেছেন। চন্দ্রনাথ বসু বঙ্গদর্শনে একবার এই বিষয়ে আলোচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য তাব উত্তর দেননি, কিন্তু ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকতে পারেন। অনেকদিন পরে সারদাচরণ মিত্র আবার একই কথা লেখায় বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিগতভাবে তাঁর অসন্তোষের কথা বলেন। এই স্পর্শকাতর জায়গায় রামগতি আঘাত করেন, অথচ তিনি নিজে ইঙরাজি জানতেন না।

রামগতি ন্যায়রত্নের (১৮৩১-১৮৯৪) সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত প্রীতিসম্পর্ক ছিল। দুজনে বহরমপুরে চাকুরি করেছেন ১৮৬৯ জানুয়ারি থেকে ১৮৭৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, এবঙ চুঁচুড়ায় ১৮৭৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮৮১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। গঙ্গার পূর্বপারে নৈহাটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ি, এবঙ পশ্চিমপারে জোড়াঘাটের কাছে রামগতি ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি। ভূদেব ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে আমৃত্যু চুঁচুড়াবাসী ছিলেন। রামগতির 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' বইটির প্রথমাঙশ প্রকাশিত হলে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে একটি অস্বাক্ষরিত দীর্ঘ রচনায় তার আলোচনা করেন। এই 'বাঙ্গালা ভাষা' (বঙ্গদর্শন, ১২৭৯ আশ্বিন-অগ্রহায়ণ) প্রবন্ধের তিনটি সঙ্খ্যায় বঙ্গদর্শনের মোট ২৩ পৃষ্ঠা ব্যয় করায় বোঝা যায়, যে বইটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

১৯৬৯-৭০ খ্রিস্টাব্দে চুঁচুড়ায় 'ভূদেব ভবনে' এডুকেশন গেজেটের পুরানো ফাইল দেখার সময় ভূদেবের প্রপৌত্র অধুনা-প্রয়াত ভৃগুদেব মুখোপাধ্যায় আমাকে বঙ্কিমচন্দ্রের এই অসঙ্কলিত রচনাটির কথা ও প্রাসঙ্গিক কাহিনী শোনান। তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে কাছে রামগতির বাড়িতে গিয়ে তাঁর পৌত্র—তখন হাওড়া শালকিয়ার কুচিল ঘোষাল লেনে—উকিল চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসার ঠিকানা আমাকে দেন। কিছুদিন পরে যোগাযোগ করলে অধুনা-প্রয়াত চণ্ডীচরণবাবু রামগতির একটি দিনপঞ্জি থেকে আমাকে

সেই তথ্য দেখিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তাঁর চুঁচুড়াবাসী ছেলে বৈদ্যনাথবাবুর কাছে সে ডায়ারি নেই। চণ্ডীচরণবাবুর ছোট ভাই হরিদাসবাবুব কাছে পৈত্রিক বাড়িতে রামগতির শেষ জীবনের (১৮৯১-৯২ খ্রিস্টাব্দ) যে ডায়ারিটি বর্তমানে সংরক্ষিত আছে, তা ভিন্ন। ঐ কাহিনী অনুসারে, তাঁদের একত্রে চুঁচুড়াবাসের সময় ভূদেব জানতে পারেন, যে পুস্তক সমালোচনার সূত্রে রামগতি ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রীতি বজায় নেই। ভূদেবের আগ্রহ ও মধ্যস্থতায় দুজনের পূর্বসম্পর্ক ফিরে আসে।

রচনাটি যে বঙ্কিমচন্দ্রের, তার পক্ষে কয়েকটি আভ্যন্তর প্রমাণ আছে।

(১) সমালোচনায় বইটি সম্বন্ধে কখনো বিরূপ মন্তব্য থাকায় গ্রন্থকারের সম্ভাব্য বিরক্তির ভয়ে রচনার প্রথমে সমালোচনার পদ্ধতি এবং গ্রন্থকারের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথা আছে। তা সাধারণ সমালোচনায় অবান্তর। 'প্রস্তাব লেখক ন্যায়রত্ন মহাশয় আমাদের সুপরিচিত ও মাননীয়। এত কথা কিছু তাঁহাকে বলিলাম এমত নহে ; তাঁহাকে গুটি কত কথা বলিতেছি।..যদি কোন কথা বিদ্বেষ ভাবে বলি, তবে যেন ধর্মে পতিত হই।..তথাপি যদি তিনি আমাদিগকে বিদ্বেষী মনে করেন, তাহা হইলে আমরা যথার্থই দুঃখিত হইব।'

(২) বঙ্কিমচন্দ্র অন্যত্র বহু রচনায় সরল ভাষার পক্ষে বক্তব্য রেখে বিদ্যাসাগরী রীতির যেমন বিপক্ষতা করেছেন, এখানে তেমনি ভাবে রামগতির ভাষারীতির বিপক্ষতা করা হয়েছে। ভাষারীতিতে রামগতি বিদ্যাসাগর-গোষ্ঠীর অন্তর্গত ছিলেন।

(৩) সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যিক ইতিহাসকে মিলিয়ে দেখার যে প্রবণতা বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য লেখায় আছে, এখানেও তার এবং বাঙলাদেশের ইতিহাস-জ্ঞানের পরিচয় আছে।

(৪) কথকতা ও জয়দেবের বাঙালিত্বে বঙ্কিমচন্দ্রের আগ্রহ ছিল। এখানে তার নিদর্শন আছে।

(৫) বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত ভালোই জানতেন। আরবি, ফার্সি ও উর্দু ভাষাতেও তাঁর অল্প-বিস্তর অধিকার ছিল। এই রচনায় তার চিহ্ন আছে।

(৬) এখানে লেখা হয়েছে—'তন্ত্রশাস্ত্রকে আমরা যোগ শাস্ত্রের ও সাঙ্খ্যদর্শনের একত্র নিষ্পন্ন অতি বিকৃত কীট পরিপূর্ণ কলমের চারা বলিয়া সময়ে সময়ে বিবেচনা করি।' বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য রচনা থেকে অনুরূপ বক্তব্যের তিনটি কালানুক্রমিক উদাহরণ এখানে দেওয়া হল।

(ক) কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬) উপন্যাসে কাপালিকের চরিত্র।

(খ) বঙ্গদর্শন, ১২৭৯ পৌষ সংখ্যায় 'সাঙ্খ্যদর্শন' প্রবন্ধে—'আবার সাঙ্খ্যের প্রকৃতি পুরুষ লইয়া তন্ত্রের সৃষ্টি। সেই তান্ত্রিককাণ্ডে দেশ ব্যাপ্ত হইয়াছে। সেই তন্ত্রের কৃপায় বিক্রমপুরে বসিয়া নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ঠাকুর অপরিমিত মদিরা উদরস্থ করিয়া, ধর্মাচরণ করিলাম বলিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতেছেন।'

(গ) ২২.১১.১৮৮২ তারিখের Statesman সংবাদপত্রে The Recent

Controversy নামে পত্র-প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—'What the influence of Tantrikism has been on the people of Bengal, of Assam, and of Orissa, I do not propose to discuss here. I do not say that the influence has been beneficial.'

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অন্যান্য দীর্ঘ সমালোচনার মত এখানে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা করে প্রথম ও দীর্ঘ পাদটীকায় রামগতির পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মুক্তকণ্ঠে প্রশঙসা করেছেন। কিন্তু রামগতির সঙস্কৃতগন্ধী ভাষা নিন্দিত, তাঁর ছন্দালোচনার ভুল দেখানো এবঙ মুসলমানি ঋণ সম্বন্ধে দুজনের মতপার্থক্য জানানো হয়েছে। এই সমালোচনা রামগতিকে বিরক্ত করেছিল। সেজন্য তিনি গ্রন্থের দ্বিতীয়াঙশ লিখে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে সম্পূর্ণ বইয়ের যে প্রথম সঙস্করণ প্রকাশ করেন তাতে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনার ষষ্ঠ অনুচ্ছেদের শেষাঙশে (প. ৩২৮) হিন্দুয়ানির দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের নিন্দা, দ্বাদশ অনুচ্ছেদে 'আইভানহো' থেকে দুর্গেশনন্দিনীর ঋণ (প. ৩৩৩), দুর্গেশনন্দিনীর ভাষাগত ত্রুটির তালিকা (প. ৩৩৩-৫), বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার বিলাতি রীতি (প. ৩৩৮), কপালকুণ্ডলায় 'ব্রাইড অব ল্যামারমুর'-এর প্রভাবনির্দেশ (প. ৩৩৮), মৃণালিনীর প্রসঙ্গে বিদেশি রচনারীতির নিন্দা (প. ৩৩৮), কপালকুন্ডলার বিফলতা (প. ৩৪০) প্রভৃতি রচনাঙশে বিরূপতা স্পষ্ট। বইটির ১৭০ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, যে বঙ্গদর্শনের মত কোন সমালোচক তাঁর বইটির প্রশঙসা না করলে বুঝতে হবে, যে তিনি বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের বইয়ের বেশি প্রশঙসা করেননি বলে এমন হয়েছে। বইয়ের শেষে কিছু অপ্রাসঙ্গিক কথায় বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করা হয়েছে। সমালোচনাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ হিশাবে নেওয়ায় রামগতির দিক থেকে আগের প্রীতিবন্ধন ছিঁড়ে যায়। তবু কোনো প্রাক্তন অধ্যাপক লিখেছেন—'কিন্তু রামগতি ন্যায়রত্ন প্রথম তিনখানি উপন্যাসের যে সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহাতে পক্ষপাতহীনতার চেষ্টা আছে এবঙ ঈর্ষার রূঢ়তা নাই।' আশ্চর্য, অনেকে এসব বইকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। রামগতি ন্যায়রত্ন ইঙরাজি সাহিত্য পড়েননি। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উপর বিরূপ হয়ে তিনি গ্রন্থের প্রথম সঙস্করণে লেখেন—'ইঙরেজিভাষানভিজ্ঞ পাঠকদিগকে নিতান্ত অন্ধকারে না রাখিয়া একটু বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, এই দুর্গেশনন্দিনীস্থ কোন কোন পাত্রের অস্থিমাঙস প্রসিদ্ধ স্যর ওয়াল্‌টর স্কটের 'আইভানহো' নামক ইঙরেজি নবেল হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। বঙ্কিমবাবু বিজ্ঞাপন মধ্যে যদি একথাটী স্বীকার করিতেন, তাহা হইলেই ভাল হইত।' পরে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্তার পরে, দ্বিতীয় সঙস্করণে রামগতি এর বদলে লেখেন—'কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, দুর্গেশনন্দিনীর কোন কোন পাত্রের অনেক অস্থি মাঙস প্রসিদ্ধ সর্ ওয়ালটর স্কটের 'আইবান হো' নামক ইঙরেজি নবেল হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে ; কিন্তু আমরা বিশ্বাস্য ব্যক্তি বিশেষের মুখে শুনিয়াছি, বাস্তবিক তাহা নহে। দুর্গেশনন্দিনী রচনার পূর্বে বঙ্কিমবাবু আইবান হো পাঠই করেন নাই।' দুটি বক্তব্যের পার্থক্য স্পষ্ট। তবু

দ্বিতীয় সংস্করণে একথা লেখার তাৎপর্য এই, যে রামগতির বিরূপতা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়নি। একই ধরনের আরো অনেক পরিবর্তন হয়েছে। দুর্গেশনন্দিনীর ভাষায় ব্যাকরণগত ভুলের যে দীর্ঘ তালিকা প্রথম সংস্করণে ছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে তা বিলুপ্ত হয়েছে,—তার উল্লেখমাত্র আছে। কপালকুণ্ডলায় রামগতি Bride of Lammermoor-এর প্রভাবের যে আশ্চর্য উল্লেখ করেছিলেন, পরে তা-ও বাদ দেওয়া হয়। মৃণালিনী সম্বন্ধে প্রথম সংস্করণে তিনি লিখেছিলেন—'বঙ্কিমবাবুর রচনা এইরূপে ইউরোপীয় রীতির অনুকারিণী হইয়াছে বলিয়া উহা ইংরেজিজ্ঞ ইংরেজির সংশ্রবসম্বলিত লোকের যাদৃশ প্রীতিকরী হয়, খাঁটী বাঙ্গালীদিগের তাদৃশ হয় না। যাহা হউক, তজ্জন্য গ্রন্থকার আজি কালি আর নিন্দনীয় নহেন।' দ্বিতীয় সংস্করণে এসব বর্জিত হয়েছে। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী উপন্যাসগুলি পরেও আলোচিত হয়নি।

নৈর্ব্যক্তিক আলোচনাকে ব্যক্তিগতভাবে নেওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র শঙ্কিত ছিলেন। সেজন্য তিনি বঙ্গদর্শন, ১২৮০ ভাদ্র সংখ্যায় 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা'য় রামগতির বইয়ের দ্বিতীয় ভাগ সম্বন্ধে লেখেন—'দ্বিতীয় খণ্ডের সমালোচনায় আমরা অক্ষম।' এর পরে রামগতির ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কিছু পরিহাস করা হয়েছে। কিন্তু রামগতিব বই সম্বন্ধে সাধারণভাবে বঙ্কিমচন্দ্র যে সশ্রদ্ধ ছিলেন, তার প্রমাণ বঙ্গদর্শন, ১২৮০ ফাল্গুন সংখ্যায় 'প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনে' মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' সম্বন্ধে মন্তব্য—'বিশেষ অনুসন্ধান বা বিচারদক্ষতার পরিচয় ইহাতে কিছুই নাই। শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্নের গ্রন্থের পর ইহা না লিখিলে চলিত।'

কয়েক বছর পরে বঙ্গদর্শন, ১২৮৫ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের আলোচনায় 'বাঙ্গালা ভাষা' রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে ভাষারীতিতে প্রাচীন ও নব্যপন্থীদের বিরোধের আলোচনায়, প্রাচীনপন্থীদের প্রতিভূ হিসাবে রামগতির দৃষ্টান্ত দেখান। এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ভাষা ছেড়ে রামগতির সম্বন্ধে ভিন্ন প্রসঙ্গে বিরূপ মন্তব্য করেন—'তাঁহার প্রণীত বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে ইংরাজী বিদ্যার একটু পরিচয় দিতে গিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় কিছু লোক হাসাইয়াছেন। আমরা সেই গ্রন্থ হইতে সিদ্ধ করিতেছি যে, পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুশীলনে যে সুফল জন্মে, ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহাতে বঞ্চিত।' রামগতির গ্রন্থসমালোচনার তৃতীয় কিস্তি ১৫.১১.১৮৭২ এবং বঙ্গদর্শন, ১২৮৫ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ১৪.৭.১৮৭৮ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই কালসীমায় দুজনের সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল।

এর অল্পদিন পরে ভূদেবের মধ্যস্থতায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রামগতির পূর্বসম্পর্ক ফিরে আসায় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমালোচনা গ্রন্থিত করেননি। রামগতিও বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে প্রথম সংস্করণের বহু মন্তব্য তাঁর বইয়ের দ্বিতীয় এবং তাঁর জীবনে প্রকাশিত শেষ সংস্করণে (১৮৮৭) প্রত্যাহার করেন। অবশ্য একথা মনে করার বোধহয় যথেষ্ট কারণ নেই, যে বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁদের পারস্পরিক মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছিল। পরিবর্তন সম্ভবত ব্যবহারিক ছিল।

৬

সাহিত্যসেবা ও সমাজসংস্কার বিভিন্ন প্রত্যয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) সমাজসংস্কার বা জনপ্রিয় পাঠ্যপুস্তক রচনা তাঁর সাহিত্যকৃতিত্ব প্রমাণিত করে না। এখনো যে বিদ্যাসাগরের চরিত্রগৌরব এবং ভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্ব থেকে তাঁর সাহিত্যিক মাননির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়, তা বোঝায় যে ভুল যুক্তিপদ্ধতি ক্ষীণজীবী নয়। বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকর্ম বিভিন্ন ভাষার রচনার অনুসরণমাত্র, এই বক্তব্য প্রচার করে বঙ্কিমচন্দ্র আক্রমণের মুখোমুখি হন। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে 'কলকাতা রিভিউ' পত্রে বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—'His exertions in the cause of Hindu widows, ..his large-hearted benevolence, and his labours in the cause of Vernacular education–all these things combine to place him in the front rank of the benefactors of his country. His claims to the respect and gratitude of his countryman are many and great, but high literary excellence is certainly not among them.' বঙ্কিমচন্দ্র তার পরে লিখেছেন—'If successful translations from other languages constitute any claim to a high place as an author, we admit them in Vidyasagar's case; and if the compilation of very good primers for infants can in any way strengthen his claim, his claim is strong. ..Vidyasagar is not free from the tautology and bombast which always disfigure the writers of the school to which he belongs.'

এই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্স্ট আর্টস্ পরীক্ষায় ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' নাটক পাঠ্য এবং বইটির অন্তত তিনটি সম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সম্পাদকেরা চার্লস টনি, বিদ্যাসাগর ও নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র আগে স্বল্প-প্রচলিত নাটকটি পড়েননি। তিনি এবার তিনটি সংস্করণ মিলিয়ে পড়ে বঙ্গদর্শনে ১২৭৯ জ্যৈষ্ঠ থেকে আশ্বিন পর্যন্ত তার সমালোচনা করেন নৃসিংহচন্দ্রের গ্রন্থসমালোচনাসূত্রে। পরে কিছু বর্জন, সংযোজন ও সংশোধন করে প্রবন্ধটি প্রথমে 'বিবিধ সমালোচনা' ও পরে 'বিবিধ প্রবন্ধে' সঙ্কলিত করেন।

এই প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের রচনা ও সম্পাদনা সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য আছে, যেমন— 'সীতার বনবাসে' কান্নার বাড়াবাড়ি, অথবা সীতার রামকে স্পর্শ করার কারণ সম্বন্ধে দুজনের মতপার্থক্য। পরে গ্রন্থনার সময় বঙ্কিমচন্দ্রের বর্জিত রচনাংশে বিদ্যাসাগরের কিছু প্রসঙ্গ, সেক্সপিয়র সংক্রান্ত আলোচনা, সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় ছিল। তা থেকে কেবল বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাগত পরিবর্তন অনুধাবনযোগ্য নয়।

বঙ্গদর্শন, ১২৭৯ আষাঢ় সংখ্যায় (প্রকাশকাল ১৬.৬.১৮৭২) 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের একাদশ পরিচ্ছেদে সূর্যমুখীর চিঠিতে আছে—ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পন্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবাবিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে

বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পন্ডিত তবে মূর্খ কে?' সূর্যমুখীর স্বামী নগেন্দ্রনাথের তখন বিধবা কুন্দকে বিয়ে করার আকর্ষণ সূর্যমুখীর কষ্টের কারণ। ঐ অবস্থায় সূর্যমুখীর পক্ষে বক্তব্যটি স্বাভাবিক। তাকে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য বলে মনে করার কারণ নেই। প্রসঙ্গত পূর্বের ইঙরাজি উদ্ধৃতি তুলনীয়।

বর্ধমানে ওউপন্যাসিক তারকনাথের বাবা দিগম্বর বিশ্বাস (১৮২৩-১৮৭৭) যখন জজ ছিলেন, তখন একবার সেখানে নাকি অতিথি হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি অনেককে বিদ্যাসাগর রান্না করে খাইয়েছিলেন। সেবার বিদ্যাসাগর ওই কথা নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে ঠাট্টা করেছিলেন। কিন্তু কাহিনীটির সত্যতার মত ঠাট্টায় ব্যবহৃত ঠিক ভাষাটি আমাদের অজ্ঞাত। তাছাড়া, বিদ্যাসাগর অসন্তুষ্ট হলেও 'বিষবৃক্ষে'র শব্দপ্রয়োগে ব্যক্তিগত আক্রমণ নেই।

বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথায় আছে, যে বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বিদ্যাসাগর ছিলেন পাঠ্যপুস্তকলেখক। অন্যত্র তাঁর লেখায় কাঁদুনি বেশি আছে। গুরুদাসের এই স্মৃতিকথা প্রধানত বহরমপুরে দেখা বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে। ঐ সময়ে ঐখানে Bengali Literature প্রবন্ধ ও উত্তরচরিতের সমালোচনা লেখা হয়। তাতেও একই কথা আছে। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের স্মৃতিকথায় সেই কথা পুনরুক্ত হয়েছে মাত্র। কৃষ্ণকমল বলেছেন—'তিনি [বিদ্যাসাগর] বঙ্কিমকেও পছন্দ করিতেন না। Matter সম্বন্ধে তিনি আপত্তি করিতেন না; manner সম্বন্ধে, style সম্বন্ধে, তাঁহার বিশেষ আপত্তি ছিল।..বঙ্কিমও বিচলিত হইলেন না। বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস'কে বলিতেন 'কান্নার জোলাপ'।'

বঙ্কিমচন্দ্রের ধারনার সূত্রপাত হয়ত হয়েছিল তাঁর সাহিত্যগুরু ঈশ্বর গুপ্তের কাছ থেকে। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছিলেন—

তোমার আছে কি পুঁজি সকলেরি ধারো।
ধার করা ভাব লয়ে যা করিতে পারো।।
ধেরো হয়ে হেরো হলে মুখে বল জিত্।
জানিতে না পার কিছু কারে বলে হিত।।

বিদ্যাসাগরের সঙস্কৃতবহুল ভাষা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের আপত্তি ছিল। বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে পূর্বোক্ত প্রবন্ধে তখনকার বাঙালি লেখকদের তিনি প্রধান দুটি দলে বিভক্ত করেছিলেন—'সঙস্কৃতপণ্ডিত, বা ইঙরাজিশিক্ষিত। বঙ্কিমচন্দ্রের বেশি আস্থা ছিল ইঙরাজিশিক্ষিতদের উপর, যাঁরা নতুন বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টি করছিলেন। প্যারীচাঁদের কথ্য ভাষাকে স্বাগত জানিয়ে তিনি ভাষাকে অপেক্ষাকৃত সহজ করার চেষ্টাও করেন। 'বাঙ্গালা সাহিত্য' প্রবন্ধ (১৮৭১), রামগতির গ্রন্থ-সমালোচনা (১৮৭২), শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের আলোচনা (১৮৭৮) বা অন্যত্র তিনি দীর্ঘকাল ধরে একই কথা লিখেছিলেন। তাতে কোনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নেই।

কৃষ্ণনগরে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে সাহিত্যিক দামোদর মুখোপাধ্যায়ের মেয়ের সঙ্গে

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাইপো শচীশচন্দ্রের বিয়েতে বিদ্যাসাগর উপস্থিত ছিলেন। তখন বিদ্যাসাগরেব প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের সশ্রদ্ধ ব্যবহারের কথা শচীশচন্দ্র লিখেছেন। এই সময় বিদ্যাসাগরের নাতি সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' মাসিকপত্র পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র অবাক হযে তাঁকে বলেছিলেন, যে, যাঁর পরামর্শ নিয়ে দেশের লোক চলে, সেই দাদুর সঙ্গে পরামর্শ না করে সুরেশচন্দ্র পত্র-সম্পাদনা করছেন কেন? বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে সাহিত্যিক বিতর্ক ব্যক্তিগত বিরোধিতা সৃষ্টি করত না। বৃদ্ধ বিদ্যাসাগরের কাছে একবার কেউ বঙ্কিমচন্দ্রের চারিত্রিক নিন্দা করায়, বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, যে বঙ্কিমচন্দ্র সারাদিন চাকুরির পরিশ্রম স্বীকার করেও এত বই লিখেছেন, যে তাতে একটা বইয়ের তাক ভরে যায়। তিনি খারাপ কাজের সময় পান কখন।

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগব ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র মাবা যান। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে পাঠকেরা বাজেন্দ্রলালের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ও বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে তাঁর বিরূপতার কথা জানেন। তাঁদের স্মৃতিরক্ষার জন্য ১৮৯১ আগস্টে টাউন হলের সভায় বিদ্যাসাগরের স্মৃতিরক্ষা-কমিটিতে বঙ্কিমচন্দ্র উপস্থিত,—রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কমিটিতে নয়। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতেও তিনি ব্যক্তিগতভাবে শোকবার্তা পাঠান। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্যারীচাঁদ মিত্র সম্বন্ধে প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন—'বিশেষত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবঙ তাঁহার পরেও পারে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সর্বজন-বোধগম্য ভাষা হইতে ইহা অনেক দূরে রহিল।..বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারও শকুন্তলা ও সীতার বনবাস সঙস্কৃত হইতে, ভ্রান্তিবিলাস ইঙরাজী হইতে এবঙ বেতাল-পঞ্চবিঙশতি হিন্দি হইতে সঙগৃহীত। অক্ষয়কুমার দত্তের ইঙরাজি একমাত্র অবলম্বন ছিল।'

অর্থাত্ বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পূর্বমত প্রত্যাহার করেননি। সাহিত্যবোধ ও সঙস্কৃতবাহুল্য সম্বন্ধে পূর্বমত বজায় রেখেও বিদ্যাসাগরের ভাষাগত মিষ্টত্বের স্বীকৃতিতে আপত্তি কোথায়? এই বিরোধকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে দেখা দরকার। বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের বিরোধ প্রধানত বহুবিবাহ 'সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় বই সম্বন্ধে। বিদ্যাসাগরের সমাজসঙস্কারের বিষয় প্রধানত তিনটি—বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ নিরোধ, এবঙ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ। বিধবাবিবাহের আইনগত স্বীকৃতির প্রশ্নে বিদ্যাসাগর সফলপ্রযত্ন, কিন্তু সমাজে তার প্রচলনে ব্যর্থকাম। বহুবিবাহ নিরোধে আইনের প্রশ্নে বিদ্যাসাগর ব্যর্থ, কিন্তু তা আপনা থেকে লুপ্ত হয়। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে তিনি যৌবনে প্রবন্ধ লিখলেও ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে সরকারের কাছে বাল্যবিবাহের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন। অর্থাত্ প্রতিটি ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর অসার্থক। অথচ তাঁর মহত্ সার্থকতা বহুলপ্রচারিত।

কুলীন বাঙালি ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত বহুবিবাহপ্রথার বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের প্রধান বক্তব্য তিনটি : (১) এটা লোকাচার, (২) লোকাচারটি প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রসম্মত নয়, এবঙ

(৩) এই প্রথা অটুট রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে--

(১) লোকাচারভিত্তিক বহুবিবাহপ্রথা শাস্ত্রনির্ভর নয়, বরঙ শাস্ত্রকে উপেক্ষা করে টিকে আছে। তার বিরুদ্ধে শাস্ত্রোক্তি কিভাবে ফলপ্রসূ হবে? আইন করে তা বন্ধ করা যাবে না, যেমন ওভাবে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করা যায়নি। শিক্ষাবিস্তার ও জনমত সঙগঠন করে লোকাচারসঙস্কারে সাফল্য আসতে পারে, এবঙ তা ক্রমশ আসছে।

(২) প্রাচীন ভারতবর্ষে পুরুষের বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকায় তার সপক্ষে শাস্ত্রমত থাকা স্বাভাবিক। তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রমুখ অনেকে অনুরূপ শাস্ত্রোক্তি উদ্ধার করেছেন। তাঁদের ব্যাখ্যাও উপেক্ষণীয় নয়। 'সদ্যস্ত্যপ্রিয়বাদিনী' শ্লোকাঙশে কটুভাষী স্ত্রীকে ত্যাগ করার যে বিধান আছে, তা বহুবিবাহের পোষকতা করে। বিদ্যাসাগরের ব্যাখ্যাই যে এক্ষেত্রে প্রামাণ্য, এমন কথা নেই। 'ক্রমশোবরা' বা 'ক্রমশোঽবরা'--এই দুটি প্রচলিত বানানে উচ্চারণ অভিন্ন--অর্থ বিভিন্ন। এদের অমীমাঙসিত ব্যাখ্যাও শাস্ত্রোক্তি দিয়ে বহুবিবাহ নিবারণে সক্ষম নয়। এসব দেখলে, বিদ্যাসাগরের প্রচার সত্ত্বেও শাস্ত্রকারেরা 'লোকহিতৈষী' নন। সমাজসঙস্কারের প্রকৃত কারণ মূল্যবোধের পরিবর্তন, এবঙ বিদ্যাসাগরও এত শাস্ত্রবিশ্বাসী নন। তাহলে শাস্ত্রের প্রাসঙ্গিক প্রয়োজন কি? শাস্ত্র মানলে তো অন্য বহু অপ্রচলিত প্রথাকেও মানতে হয়।

(৩) প্রার্থিত আইনের কারণ বহু ক্ষতির উত্‌স বহুবিবাহপ্রথার বিলোপ। প্রথাটি অবশ্যই ক্ষতিকর ও নিন্দনীয়। এমনকি অনেক বহুবিবাহকারী এর নিন্দা করেন। তবে এটা কমে গেছে, ক্রমশ আরো কমছে, এবঙ সমাজে এখন অত্যন্ত অল্প লোকের মধ্যেই প্রচলিত আছে। প্রসঙ্গত, বিদ্যাসাগরের পরিসঙ্খ্যান ভুল, যাতে ইচ্ছাকৃত সঙ্খ্যাবৃদ্ধি করা হয়েছে। বহুবিবাহের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় বইটি ১.৪.১৮৭৩ তারিখে প্রকাশিত হবার পরে ১২৮০ আষাঢ় (১৪.৬.১৮৭৩) সঙ্খ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র তার আলোচনায় বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে এই আপত্তিগুলি তুলেছিলেন। বর্তমান আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা আপত্তিগুলিকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করব,--রীতিগত ও বক্তব্যগত। (খ) রীতিগত আপত্তি--রচনাটি স্থানবিশেষে অশ্লীল ও অমার্জিত। (খ) বক্তব্যগত আপত্তি--রচনাটি নিরর্থক, কারণ আক্রান্ত প্রথা মৃতকল্প। উপরে উল্লিখিত বিষয় বক্তব্যগত।

'ক' প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন--'বিদ্যাসাগর মহাশয় উদাহরণ স্বরূপ, প্রবোধচন্দ্রিকা নামক অশ্লীলতার ভান্ডার হইতে একটি অশ্লীল উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় গ্রন্থকে কলঙ্কিত করিয়াছেন। সে উপাখ্যানটি এরূপ অশ্লীল যে, বোধ হয় সামান্য ইতর লেখকও তাহা উদ্ধৃত করিতে সাহস করিতেন না, কেননা, তাঁহাদের লজ্জা না থাকুক, রাজদন্ডের ভয় আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও, তাহার একটি শব্দ পরিবর্তিত করিয়া লজ্জানুরোধের প্রমাণ দিয়াছেন--আর একটি শব্দ মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের লজ্জাহীনা লেখনী হইতে যেমন বাহির-হইয়াছিল, বোধ হয় তেমনই আছে।' মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের 'প্রবোধচন্দ্রিকা' গ্রন্থের দ্বিতীয় স্তবক, তৃতীয় কুসুমের শেষদিকে এক চক্ষুরোগীর গল্পে লেখা আছে--'সে বচনার্দ্ধ এই 'নেত্ররোগে সমুত্‌পন্নে কর্ণৌ ছিত্ত্বা গুদঙ দহেত্' ইহার অর্থ

নেত্ররোগ হইলে নেত্ররোগীর কর্ণদ্বয় ছেদন করিয়া লৌহ তপ্ত করিয়া তাহার পোঁদে দাগ দিবে..স্বকীয় দুই কর্ণ কাটিয়া সন্তপ্ত লোহেতে দুই পাছাতে দুই দাগ দেও..।' বিদ্যাসাগরের বইয়ের 'কবিরত্নপ্রকরণে'র উদ্ধৃতিতে সামান্য সংশোধন করে লেখা হয়েছে—'সে বচনার্দ্ধ এই 'নেত্ররোগে সমুত্পন্নে কর্ণৌ ছিত্ত্বা কটিঙ দহেত্' ইহার অর্থ নেত্ররোগ হইলে নেত্ররোগির কর্ণদ্বয় ছেদন করিয়া লৌহ তপ্ত করিয়া তাহার কটিতে দাগ দিবে..স্বকীয় দুই কর্ণ কাটিয়া সন্তপ্ত লৌহেতে দুই পাছাতে দুই দাগ দেও।'

মৃত্যুঞ্জয়ের 'গুদ' ও 'পোঁদে' শব্দের জায়গায় বিদ্যাসাগর 'কটি' লিখেছেন, 'পাছা' শব্দটি রেখেছেন। অবশ্য লাইন কয়েক পরে লিখেছেন—'পোঁদের জ্বালায় মরি।' 'কবিরত্নপ্রকরণে' ঐ উদ্ধৃতির কিছু আগে বিদ্যাসাগর লিখেছেন—'কোনও সম্পন্ন ব্যক্তির বাটীতে মহাভারতের কথা হইয়াছিল। কথা সমাপ্ত হইবার কিঞ্চিত্ কাল পরেই, বাটীর কর্তা জানিতে পারিলেন, তাঁহার গৃহিণী ও পুত্রবধূ ব্যভিচারদোষে দূষিতা হইয়াছেন। তিনি, সাতিশয় কুপিত হইয়া তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলে, গৃহিণী উত্তর দিলেন, আমি কুন্তী ঠাকুরাণীর, পুত্রবধূ উত্তর দিলেন, আমি দ্রৌপদী ঠাকুরাণীর দৃষ্টান্ত দেখিয়া চলিয়াছি।..তাঁহারা প্রত্যেকে পঞ্চ পুরুষে উপগতা হইয়াছিলেন ; আমরা তদতিরিক্ত করি নাই।' এই সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—'এরূপ উপাখ্যান বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিপিকৌশলেও সরস হয় নাই, অথবা তাঁহার নামের বা বয়সের গুণে নীতিগর্ভ বা ভদ্রলোকের পাঠ্য বলিয়া গৃহীত হইবে না।' তখন বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র দুজনেই কলকাতায় নবপ্রতিষ্ঠিত অশ্লীলতা নিবারণী সভার সমর্থক ছিলেন। একটি সাময়িকপত্র লিখেছিল—'যে বিদ্যাসাগর 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' নামে নেড়ির দলের গানের যোগ্য খেঁউর গ্রন্থ বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক করাইয়াছিলেন, তিনিও মত্ত হইয়া কালিদাসের গ্রন্থের স্থানে স্থানে অশ্লীলতা নিবারণার্থ পরিবর্তন করিয়াছিলেন।'

'তর্কবাচস্পতিপ্রকরণে' বিদ্যাসাগর লিখেছেন—'তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বুদ্ধি আছে, কিন্তু বুদ্ধির স্থিরতা নাই ; নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি আছে কিন্তু কোন শাস্ত্রে প্রবেশ নাই ; বিতণ্ডা করিবার বিলক্ষণ শক্তি আছে, কিন্তু মীমাংসা করিবার তাদৃশী ক্ষমতা নাই।' 'ন্যায়রত্নপ্রকরণে' আছে—'শ্রীযুক্ত রামকুমার ন্যায়রত্ন কখনও ধর্মশাস্ত্রের অনুশীলন করেন নাই, এজন্যই এত আড়ম্বর করিয়া দায়ভাগের দোহাই দিয়াছেন।'

'সামশ্রমিপ্রকরণে' আছে—'এক্ষণেও নির্দেশ করিতেছি, কবিরাজ মহাশয় ধর্মশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।' কথাগুলি যুক্তিপদ্ধতি নয়, তথ্য নয়, সিদ্ধান্তও নয়,—ব্যক্তিগত আক্রমণ মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—'গালি দিলেই যে বিচারে জয়ী হওয়া যায় না, গালিতে বাক্যের সারবত্তা বাড়ে না, সত্য নির্ণয় পক্ষে কটু কথার প্রয়োজন মাত্র নাই—তাহাতে যে লেখকের প্রতি পাঠকের অভক্তি জন্মে মাত্র ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বুঝাইতে হইবে না।' অর্থাত্ বিদ্যাসাগরের লেখাটি অমার্জিত।

প্রসঙ্গত তত্কালীন সংবাদপত্র থেকে এই বিষয়ে দুটি মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য। 'সোমপ্রকাশ' লেখে—'তাঁহার পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমাদিগের যেমন বিপুল আহ্লাদ

হইল, তেমনি এক অঙশে অতিশয় অসন্তোষ জন্মিল। তিনি যদি বাদি প্রতিবাদীগণের প্রতি গালিবর্ষণ বিষয়ে কিঞ্চিত্ হস্ত সঙ্কোচ করিতেন, তাঁহার পুস্তকখানি সর্বাঙ্গসুন্দর ও সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রের হৃদয়গ্রাহী হইত সন্দেহ নাই।' অমৃতবাজার পত্রিকার মন্তব্য পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

বিদ্যাসাগর বইটির পরবর্তী কোনো সঙস্করণে এই ত্রুটি সঙশোধনের কোনো চেষ্টা করেননি। 'খ' প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের তিনটি বক্তব্য পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

প্রথম বক্তব্য সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের চেতনার নিদর্শন তাঁর লেখায়--'ধন্য রে দেশাচার। তোর কি অনির্বচনীয় মহিমা তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে দুর্ভেদ্য দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া কি একাধিপত্য করিতেছিস!' বিদ্যাসাগর কথায় লোকাচারের গুরুত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু কর্মে তাকে উপেক্ষা করেন। এই স্ববিরোধ তাঁর অসার্থকতার মূল।

বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য খুব নতুন কিছু নয়। কুলীনদের বহুবিবাহ নিষেধে আইন করার প্রয়োজন আছে কি না, এই বিষয়ে অনুসন্ধান করে রিপোর্ট দেবার জন্য সরকার প্রধানত এদেশের কয়েকজন মান্য লোক নিয়ে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে যে কমিটি গঠন করে, তা ১.২.১৮৬৭ তারিখে লেখা রিপোর্ট ৭.২.১৮৬৭ তারিখে পেশ করে। তাতে লেখা হয়েছে—'The evils said to result from these customs are we have reason to believe, greatly exaggerated, and the abuse of the permission to take a plurality of wives is, we believe, on the decrease.

We need not notice that the number comprised in that class forms but a fraction of the population of Bengal. A legislative enactmant, however stringent and rigidly enforced, might be ineffectual in diverting the evils from their original course, that a remarkable change in the opinion of his countryman has, within the last few years, taken place on the subject.'

একা বিদ্যাসাগর মতপার্থক্য জানান ২২.১.১৮৬৭ তারিখে। অধিকাঙশের মত অনুসরণ করে সরকার আইন করেননি। পরে দেখা গেছে, আইন ছাড়া প্রথাটি বিলুপ্ত হয়েছে। কমিটির বক্তব্য ঠিক, বিদ্যাসাগরের নয়। পরবর্তী আন্দোলনের ফলে পরে সরকার আরো তিনজনের কাছে স্বতন্ত্রভাবে মত চান, এবঙ তাঁরাও অনুরূপ মত প্রকাশ করেন। আইনের ব্যবহারিক সাফল্য সম্বন্ধেও সন্দেহ ছিল। ফলে, সরকার একেবারে নিবৃত্ত হন।

এই বিরোধ থেকে কারো মনে হতে পারে, যে বঙ্কিমচন্দ্র বুঝি বহুবিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে দুজনেই ছিলেন ভঙ্গকুলীন, যাঁরা বহুবিবাহ করতেন : তাঁরা কেউ করেনি। বিদ্যাসাগরের বই লেখার আগে 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) উপন্যাসের চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে (যা পরে প্রথম পরিচ্ছেদ হয়েছে, তাতে) কপালকুণ্ডলার পিতৃগৃহবাসিনী ননদ শ্যামাসুন্দরীর দুঃখবর্ণনা আছে, কারণ সে কুলীন

ব্রাহ্মণের স্ত্রী। কুলীনের বহুবিবাহে বঙ্কিমচন্দ্রের আপত্তি প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়া আলোচ্য 'বহুবিবাহ' প্রবন্ধের শেষে বঙ্কিমচন্দ্র যে সিদ্ধান্তগুলি করেছেন, তাদের প্রথমটি হল--'(১) বহুবিবাহ অতি কুপ্রথা ; যিনি তাহার বিরোধী, তিনিই আমাদিগের কৃতজ্ঞতার ভাজন।'

আইনের খুঁটিনাটিতে--বহুবিবাহের অধিকার সম্বন্ধে দুজনের মতপার্থক্য ছিল। বিদ্যাসাগরের আগ্রহে আইনের জন্য কাশীরাজ দেবনারায়ণ সিঙহ যে 'বিল্‌' তৈরি করেছিলেন, এবঙ যা বিদ্যাসাগর তাঁর বইতে ছেপেছিলেন, তা অনুসারে স্ত্রী ভ্রষ্টা, পাগলিনী, কুষ্ঠ বা অন্য কোনো দুরারোগ্য রোগগ্রস্তা, কেবল কন্যাপ্রসবিনী, জাতিহানিকর কাজে লিপ্তা, অথবা বিয়ের উপযুক্ত জাতির নয়--এমন যে-কোনোটি হলে পুরুষ আবার বিয়ে করতে পারে। অর্থাত্‌ বিদ্যাসাগর বহুবিবাহের বিলোপ চাননি, সঙ্কোচন চেয়েছিলেন।

বঙ্গদর্শন, ১২৮২ কার্তিক (৩০.১.১৮৭৬) সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য। তৃতীয় প্রস্তাব--স্ত্রীজাতি' নামের প্রবন্ধে আছে--'মনুষ্যজাতিমধ্যে কাহারই বহুবিবাহে অধিকার নীতিসঙ্গত হইতে পারে না।' সঙশ্লিষ্ট পাদটীকায় আছে--'কদাচিত্‌ হইতে পারে বোধ হয়। যথা অপুত্রক রাজা, অথবা যাহার ভার্যা কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্ত। বোধ হয় বলিতেছি, কেন না, ইহা স্বীকার করিলে পুরুষের বিপক্ষেও সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়।'

এখানে নারীর অধিকারের বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তুলনায় অগ্রসর। এই রচনায় বিধবাবিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষতা, এমনকি অসতী বিধবার বিষয়াধিকারের সমর্থন আছে। কেরি কলিতানি বনাম মণিরাম কলিতা মামলায় হিন্দু বিধবা স্বামীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার লাভ করার পর অসতী হলে সেই সম্পত্তি ভোগ করতে পারে কি না, এই প্রশ্ন ওঠে। নিম্ন আদালত থেকে আপিলে কলকাতা হাইকোর্ট বিধবার পক্ষে রায় দিলে তার বিপক্ষে দেশজোড়া আন্দোলন হয়, এবঙ বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলে আপিলের জন্য চাঁদা তুলে প্রতিপক্ষকে টাকা দেওয়া হয়। সম্পত্তির অধিকার হস্তান্তরিত হলে তা প্রত্যাহার করার কোনো আইন নেই বলে বিলাতে পূর্বের রায় বজায় থাকে। আন্দোলনের পক্ষে আইনগত কোনো কারণ ছিল না। গোঁড়া হিন্দুরা প্রাচীন ধর্মসঙস্কারের ভিত্তিতে অসতী বিধবার বিষয়াধিকারের এই মামলা নিয়ে যে আন্দোলন করেন, এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র তাকে ব্যঙ্গ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের বইয়ের সমালোচনার প্রধান অঙশ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ', দ্বিতীয় ভাগে (১৮৯২) 'বহুবিবাহ' নামে প্রবন্ধে সঙ্কলন করেন। এখানে প্রবন্ধের পূর্বে তৃতীয় বন্ধনীতে তিনি ছোট্ট ভূমিকায় লেখেন--'বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত বহুবিবাহ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তকের কিছু তীব্র সমালোচনায় আমি কর্তব্যানুরোধে বাধ্য হইয়াছিলাম। তাহাতে তিনি কিছু বিরক্তও হইয়াছিলেন। তাই আমি এ প্রবন্ধ আর পুনর্মুদ্রিত করি নাই। এই আন্দোলন ভ্রান্তিজনিত, ইহাই প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। ..কোন না কোন দিন কথাটা উঠিবে, দোষ তাঁহার, না আমার।..উহা বিলুপ্ত করাও

অবৈধ; কেননা, ভাল হউক, মন্দ হউক, উহা আমাদের দেশে আধুনিক সমাজসংস্কারের ইতিহাসের অংশ হইয়া পড়িয়াছে।'

এখানে বর্জিত হয়েছে বিদ্যাসাগরের রচনায় অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতার কথা, যার উদ্দেশ্য ছিল রচনাটির পরবর্তী সংশোধন। সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছিল। যা-ই হোক, প্রবন্ধ সঙ্কলনের যুক্তি ছিল ভিন্ন। বাকি অংশ অবিকৃত আছে। বঙ্গদর্শনে এই সমালোচনা প্রকাশিত হলে অনেকে বঙ্কিমচন্দ্রের নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠেন। 'বসন্তক' মাসিকপত্র (প্রথম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, ১২৪ ও ১২৫ পৃষ্ঠার মধ্যবর্তী সংখ্যাহীন পৃষ্ঠা) The Bull and the Frog নামে একটি ছবি প্রকাশ করে। ছবির নিচে ছাপা হয়েছিল--The Bull and The Frog. বুড়াবেঙ 'এত গরল গায়ে ছেড়ে দিলাম তবুও কিছু হোলনা, রোস আমি ফুলে ওর সমান হোচ্ছি। দেখ দেখি ওর মতন হইনি।' দলস্থ খুদে খুদে বেঙচয় 'বাহবা বাহবা আর একটু ফুলিলেই হবে।' এখানে মতপার্থক্য অনুসরণ বিষয় নয়, ব্যক্তি আলোচিত হয়েছে। আলোচনার উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত আক্রোশ মাত্র।

বঙ্গমিহির, ১২৮০ শ্রাবণ সংখ্যায় অস্বাক্ষরিত 'বহুবিবাহ' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা নিন্দিত হয়েছে। কিন্তু সমস্ত রচনায় কোথাও একটি তথ্য বা যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না। Bengalee সংবাদপত্র Fair Play লিখিত যে The Banga Darsana *versus* Pundit Iswar Chandra Vidyasagar নামে পত্র-প্রবন্ধ প্রকাশ করে তাতে বঙ্কিম-বিরোধিতা আছে, যদিও উগ্রতা নেই। বিদ্যাসাগরের বক্তব্য সম্বন্ধে Hindoo Patriot একমত ছিল না। শুধু এই সংবাদপত্রে বঙ্কিম-বিরোধিতা নেই। এই সময় 'বঙ্গদর্শন ও বহুবিবাহ' নামে ১৫ পৃষ্ঠার একটি অস্বাক্ষরিত পুস্তিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের অস্বাক্ষরিত রচনার লেখককে দশটি পৃথক বিষয়ে আক্রমণ করা হয়। অত্যন্ত সাধারণ মানের রচনাটিতে তথ্য ও যুক্তির অভাবকে আবেগ-নির্ভর ব্যক্তিপূজা দিয়ে পূর্ণ করে লেখা হয়েছে--'[বঙ্গদর্শন] লেখকের ভাবভঙ্গি দেখিয়া বোধ হয় ইনি অসূয়া পরবশ ও বিদ্বেষ বুদ্ধির অধীন হইয়া যথেচ্ছ লিখিয়াছেন।' (প. ১) এই বক্তব্য পুনরাবৃত্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে Calcutta Review, 1873, vol. 57, no. 114-এ বিদ্যাসাগরের গ্রন্থের প্রশংসা ও বঙ্কিমচন্দ্রের নিন্দা করা হয়েছে।

'জনৈক কেঁড়েল শিষ্য' অর্থাৎ মনোমোহন বসু তাঁর সম্পাদিত 'মধ্যস্থ' মাসিকপত্রে ১২৮১ মাঘ সংখ্যায় 'উচিত বক্তার পত্রোত্তরে' লিখেছেন, যে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজি সাহিত্যের অনুকরণকারী, এবং বিদ্যাসাগরের ছাত্রের মত। তাঁর 'বহুবিবাহ' প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের ত্রুটি দেখানো নিন্দনীয়। অর্থাৎ এই সমালোচনা বিষয়গত নয়,--ব্যক্তিগত। অথচ মনোমোহন মাত্র সাত মাস পরে মধ্যস্থ, ১২৮২ ভাদ্র সংখ্যায় 'প্রাপ্ত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে উক্তি'তে ভুবনেশ্বর মিত্রের 'হিন্দুবিবাহ সমালোচন' প্রথম খণ্ডের সম্বন্ধে প্রসঙ্গত লিখেছেন--'সভাও করিতে হয় না--আড়ম্বর, বলপ্রয়োগ, কি রাজবিধি কিছুরই আবশ্যকতা থাকে না--সমাজ মধ্যে জ্ঞানের প্রভাবে শনৈঃশনৈঃ কুরীতির ক্ষয় হয়।

তাহার সাক্ষী বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথা দিন দিন কি আপনাআপনি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে না?' এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য সমর্থিত হয়েছে। দুটি প্রায়-সমকালবর্তী রচনায় লেখকের এই পরস্পর বিরোধিতার কারণ, বিদ্যাসাগর-পূজা ও বঙ্কিম-বিরোধিতা একত্র সক্রিয়।

বঙ্কিমচন্দ্র 'উত্তরচরিত' প্রসঙ্গে এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার বঙ্গদর্শনে অস্বাক্ষরিত 'তুলনায় সমালোচনে' বিদ্যাসাগরের যে সমালোচনা করেছিলেন, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (১৮৪০-১৯৩২) স্মৃতিকথায় সেই প্রসঙ্গে বলেছেন—'বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বঙ্কিমের লিখা পছন্দ করিতেন না, তাহা আপামর সাধারণ সকলেই জানে। তাঁহার একজন গোঁড়া ভক্ত প্যারী কবিরত্ন এই সম্বন্ধে একটা ছড়া বাঁধিয়া গিয়াছেন।' যেমন—

'বঙ্গদর্শনের দর্শনশক্তি চমত্কার,
এ দোষ দর্শনে রোষ হয় না কা'র?
অন্ধ যে জন, নাইকো লোচন,
সমালোচন কেন তা'র?
পদে পদে দেখতে পাই,
কর্ম কর্তা বোধ নাই,
ভাবরসের মা গোঁসাই,
কেন লেখার হুল ধরে?'

এবং

'এখন গ্রন্থকর্তা ঘরে ঘরে,
Editor বহু নরে,
কিন্তু কলম যে কিরূপে ধরে তা'
অনেকে জানে না।
ভূষিমাল গর্দাভরা,
ভেতরেতে ময়লা পোরা,
কাগজগুলা কেবল ভাল,
Binding পরিপাটি ;'

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য আরো বলেছেন—'শিক্ষিত সমাজ বিদ্যাসাগরের ভাষার অথবা জীবনের কোনও প্রকার বিরুদ্ধ সমালোচনা কখনও সহ্য করিতে পারে নাই। বঙ্কিম তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে' ভারতচন্দ্র ও বিদ্যাসাগরের সমালোচনা করিয়া বিপন্ন হইয়াছিলেন। 'হালিসহর পত্রিকা' বঙ্কিমকে নাস্তানাবুদ করিল।' ২৩ কার্তিক ১২৮০ সংখ্যায় 'হালিসহর পত্রিকা' লিখল—

'যারে পায় তারে ধরে দিগাদিগ নাই,
বাহবা বুকের পাটা বলিহারি যাই।
আবোল তাবোল বকে সকলেই নীরস,
সাগরে সাঁতার দিতে করেছে সাহস।' ইত্যাদি।

হালিসহর পত্রিকা তার আগেও সাহিত্যে বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম বিরোধে বঙ্কিমচন্দ্রের নিন্দায় মুখর হয়েছিল। অবশ্য এই ক্ষীণজীবী কাগজটি পবিচালনা কবতেন একজন অল্পবয়সী ছাত্র।

কেবল ভক্ত পাঠকেরা নন, স্বয়ং বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার জন্য যে তাঁর প্রতি কিছু বিরূপ হয়েছিলেন, তার একটি প্রমাণ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বহুবিবাহ' প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণে যুক্ত ভূমিকা। অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তিপদ্ধতি ভেদ করা তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল। সেজন্য তিনি নিজে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে কিছু লেখেননি, কিন্তু অন্য লেখককে প্ররোচিত ও সাহায্য করে লিখিয়েছেন। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

সংস্কৃতে 'মৃণাল' শব্দের অর্থ জলপদ্মের ডাঁটার শেষে পাঁকের নিচে কোমল শাদা কন্দ। 'মৃণালিনী' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ডাঁটা অর্থে মৃণাল শব্দের ব্যবহার করেছেন। বিদ্যাসাগরগোষ্ঠীর রামগতি ন্যায়রত্ন পূর্বে এই ভুলের কথা লিখেছেন। বিদ্যাসাগরগোষ্ঠীব (পরে 'উদ্ভটসাগর') পূর্ণচন্দ্র দে-কে দিয়ে 'সঞ্জীবনী'তে ছাপানোর জন্য বিদ্যাসাগর এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধের কিছু উপকরণ সংগ্রহ করে দেন। সংস্কৃত শ্লোক নির্বাচনে বিদ্যাসাগর নিজে সহায়তা করেন, কারণ, তাঁর মতে, ক্ষুরধার বুদ্ধি বঙ্কিমচন্দ্রকে পবাজিত কবা কঠিন। পূর্ণচন্দ্র প্রবন্ধটি রচনা করে প্রকাশের পূর্বে তার পাণ্ডুলিপি বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখাতে নিযে যান তাঁর ভবানীচরণ দত্ত লেনের বাসায়। বঙ্কিমচন্দ্রের জেরার প্রসঙ্গে পূর্ণচন্দ্র লিখেছেন, যে বিদ্যাসাগরের সাহায্য ছাড়া তাঁর পক্ষে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন হত। বঙ্কিমচন্দ্র ভুল স্বীকার করেছিলেন, এই কথা লিখে পূর্ণচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রমাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন। কিন্তু পত্র-সম্পাদক প্রবন্ধের নিচে লিখেছেন, যে পূর্ণচন্দ্রের লেখা প্রকাশিত হয়েছিল কি না, তা তিনি লেখেননি। তাছাড়া, বঙ্কিমচন্দ্র ভুল স্বীকার করলে রচনার সংশোধন করলেন না কেন? অর্থাত্ পূর্ণচন্দ্রের বর্ণনা আংশিক সত্য মাত্র। তারকনাথ বিশ্বাস একই কাহিনী লিখে জানান যে, সংস্কৃতে শব্দটির অর্থ যা-ই হোক না কেন, বঙ্কিমচন্দ্র ভাষাসৌন্দর্য বজায় রাখার জন্য তাঁর রচনা অপরিবর্তিত রাখতে চান।

সমাজসংস্কারক হিশাবে বিদ্যাসাগরের মাহাত্ম্য বহুকীর্তিত এবং সংস্কারবিরোধী হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের রক্ষণশীলতা বহুনিন্দিত। প্রসঙ্গত বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে একটি তথ্য উল্লেখযোগ্য। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় হরি মাইতি নামে ত্রিশ বছর বয়স্ক একজন ওড়িয়া যুবকের সঙ্গে বলপূর্বক সহবাসে তার এগার বছরের স্ত্রী ফুলমণি মারা গেলে ফৌজদারি বিচারে স্বামীর কারাদণ্ড হয়। স্ত্রীসহবাসে হিন্দু স্বামীর অধিকার আছে বলে এই দণ্ড হিন্দুধর্মবিরোধী, যুক্তিতে হিন্দুসমাজের একটি বড় অংশকে বিক্ষুব্ধ করে তোলা হয়। অন্য দিকে বিয়ের ন্যূনতম বয়স হিন্দু মেয়েদের পক্ষে ১০ থেকে ১২ বছরে উন্নীত করার জন্য অনেকে আন্দোলন আরম্ভ করেন। গোঁড়া হিন্দুদের পক্ষে 'গর্ভাধান' সংস্কারের যুক্তি দেওয়া হয়। স্ত্রী প্রথম ঋতুমতী হলে তার সঙ্গে সহবাস করার আবশ্যিক হিন্দুধর্মীয় সংস্কার গর্ভাধান। যেহেতু এদেশে অনেক মেয়ে ১২ বছর বয়েস পূর্ণ হবার পূর্বে রজস্বলা হয়, এবং তখন 'গর্ভাধান' প্রয়োজনীয়, সেহেতু বিয়ের বয়স

বাড়ানোর প্রস্তাবে অনেকে আপত্তি করেন। রজস্রাব বিশেষ হর্মোনের উপর নির্ভরশীল এবঙ প্রথম রজস্রাবেই যে ডিম্বাণু নির্গত না হতে পারে, এই তথ্য তখন জানা ছিল না। ফলে অনেকেই রজস্রাবকে মেয়েদের পক্ষে মাতৃত্বের যোগ্যতা বলে বিবেচনা করতেন। বিদ্যাসাগর যৌবনে 'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধে এই প্রথার বিপক্ষতা করেছিলেন, কিন্তু পরে এই বিষয়ে আর কোনো লেখা প্রকাশ বা আন্দোলনের চেষ্টা করেননি। আইন তৈরি করার পূর্বে সরকার মতামত আহ্বান করলে বিদ্যাসাগর ১৬.২.১৮৯১ তারিখে সরকারকে লেখেন 'I am not able to give unqualified suport to the Bill. If passed into law, it will prevent the performance of the ceremony of Garbhadhana in all cases where wives attain puberty before they are 12 years of age.' এবঙ '..the most resonable course appears to me to make a law declaring it penal for a man to have intercourse with his wife before the she has had her first menses.'

অর্থাত্ ১২ বছর বয়সের পূর্বেও রজস্বলা হলে মেয়েদের সঙ্গে যৌনসঙসর্গ করা দরকার। সহবাস-সম্মতি আইন (Age of Consent Act) সম্বন্ধে ১৮৯১ অক্টোবরে (২৯ আশ্বিন ১২৯৮) ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়কে (১৮৫১-১৯০৩) একটি চিঠিতে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন--

'বিবাহিতাদিগেব সম্মতির বয়ঃক্রম সম্বন্ধে যে আন্দোলন হইতেছে আমি ইহাকে কতকটা বৃথাড়ম্বর মনে করি। আমি যতদূর জানি, এ দেশীয় বালিকারা দ্বাদশ বত্সরের পূর্বে সচরাচর ঋতুমতী হয় না। এবঙ হরি মাইতির ন্যায় পাষন্ড বড় বিরল। সুতরাঙ এ বিষয়ের কোন আইনের প্রয়োজন আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। তবে, ইহাও বক্তব্য, যে দ্বাদশ বত্সর সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বালিকাদিগের স্বামিসঙসর্গ অবিধেয়, এবঙ ইহা আমাদিগের দেশের প্রাচীন রীতিবিরুদ্ধ। তাহার নিষেধ জন্য, যদি কোন আইন হয়, তাহাতে আমি ক্ষতি দেখি না। ঈদৃশ রাজনিয়ম প্রাচীন দেশাচার-বিরুদ্ধ হইবে না, কাজেই তাহাতে কোন আপত্তি উত্থাপিত করাও আমার মত নহে। এক্ষণে আইনমতে সম্মতিদানের [বয়স] দশ বত্সর ; দশ বত্সরের স্থানে বার বত্সর হয়, ইহা আমার অনভিমত নহে। কিন্তু বার বত্সরের অধিক হওয়া কোনক্রমে উচিত নহে।

বাল্যবিবাহের আমি পক্ষপাতী। কিন্তু বাল্যবিবাহ অর্থে বাল্যকালে বয়সের অনুচিত সঙসর্গ বুঝি না। তাহার পক্ষপাতী নহি। কোন কোন বালিকা দ্বাদশ বত্সর পরিপূর্ণ হইবার পূর্বেই ঋতুমতী হইয়া থাকে। তাহাদের সম্বন্ধে কোন শাস্ত্রোক্তি যে লঙ্ঘিত হইবে না, এমন কথা বলা যায় না। 'ঋতুকালাভিগামী স্যাত্' ইত্যাদি মনুবাক্য ইহার উদাহরণ। কিন্তু এই সকল বিধি, অনেক সময়েই রক্ষিত হয় না,দেখা যায়। রক্ষা করিতে গেলে কোন বধূই আর বাপের বাড়ী যাইতে পারে না। যে সকল শাস্ত্রোক্তি এক্ষণে সমাজগৃহীত নয়, তাহার জন্য গন্ডগোল করা বৃথা।

আমাব মতে আইন হইবার প্রয়োজন নাই। হইলেও বিশেষ কোন ক্ষতি নাই। ইতি তাঙ ২৯ আশ্বিন

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দেবশর্মা'

দুটি মতের তুলনায় দেখা যাবে, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিদ্যাসাগরের বিরোধ সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা তথ্যপ্রতিষ্ঠ নয়। তার আর একটি উদাহরণ মুসলমান সম্বন্ধে দু জনের দৃষ্টিভঙ্গি। যখন বিদ্যাসাগর তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দরজা মুসলমানদের সামনে বন্ধ রেখেছিলেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাদের মধ্যযুগের শাসনকালকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যুগ এবঙ সমকালে তাদের স্বজাতীয় বলে প্রচার করেছেন।

৭

বঙ্কিমচন্দ্র ১২৯১ শ্রাবণ থেকে 'প্রচার' এবঙ অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'নবজীবন' পত্রে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করতে থাকেন। সেই বিষয় নিয়ে গোঁড়া হিন্দু ও আদি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে বিরোধ গড়ে ওঠে। কেশবচন্দ্র সেনের 'নববিধান' সমাজের কেউ এ বিতর্কে যোগ দেননি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের লোকেরাও এতে লিপ্ত হননি। অন্য কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেরাও নয়। রচনাগুলি ধারাবাহিকভাবে উল্লেখযোগ্য।

১। অক্ষয়চন্দ্র সরকার--'সূচনা', নবজীবন, শ্রাবণ ১২৯১।

২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়--'ধর্মজিজ্ঞাসা', নবজীবন, শ্রাবণ ১২৯১।

৩। [আদি ব্রাহ্ম সমাজের কোন লেখক]--পত্র, সঞ্জীবনী।

৪। চন্দ্রনাথ বসু--[পত্রোত্তর]

৫। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]--[পত্রোত্তর], সঞ্জীবনী।

৭। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়--'বাঙ্গালার কলঙ্ক', প্রচার, শ্রাবণ ১২৯১।

৮। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর--'নব্য হিন্দু সম্প্রদায়', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৮০৬ শক।

৯। [রাজনারায়ণ বসু]--'নূতন ধর্মমত', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৮০৬ শক।

১০। কৈলাসচন্দ্র সিঙহ--'বাঙ্গালার কলঙ্ক : প্রতিবাদ', নব্যভারত, ভাদ্র ১২৯১।

১১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর--'একটি পুরাতন কথা', ভারতী, অগ্রহায়ণ ১২৯১।

১২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়--'আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব হিন্দু সম্প্রদায়', প্রচার, অগ্রহায়ণ ১২৯১।

১৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর--'কৈফিয়ত', ভারতী, পৌষ ১২৯১।

১৪। কৈলাসচন্দ্র সিঙহ--'হদ্দজবাব', নব্যভারত, পৌষ ১২৯১।

১৫। রবীন্দ্রনাথকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের অপ্রকাশিত পত্র।

উপরের তালিকার ১, ৩, ৪, ও ৫ সঙ্খ্যক রচনাগুলি বিবাদের অন্তর্গত হলেও বর্তমান আলোচনার পক্ষে খুব জরুরি নয়। কৈলাসচন্দ্র সিঙহ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কর্মচারী এবঙ তখন আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১০ সঙ্খ্যক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি লিখেছেন--'অধ্যয়ন কর। স্বাধীনভাবে গবেষণা কর। না পার গুরুগিরি করিও না।' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের পরে 'হদ্দজবাবে' তাঁর ভাষায় উদাহরণ 'বঙ্কিমবাবু নাকি প্রয়োজনমতে মিথ্যা কথা কহিবার জন্য দ্বাপর যুগের ডিজরেলীর আশ্রয় গ্রহণ করেন ; রবিবাবু সমস্ত বঙ্গবাসীর পক্ষ হইয়া মিথ্যার বিরুদ্ধে নাকি ব্রহ্মাস্ত্র

ধরিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু তাহার উত্তর দিতে যাইয়া..মিথ্যা কথা কহার অর্থ সত্য পালন কবিয়াছেন।' এখানে কৈলাসচন্দ্র উত্তর দিতে গিয়ে নিজের বিষয় থেকে দূরে সরে গেছেন। তার কারণ কি গোষ্ঠীবদ্ধতা? গাল দিলেন কৈলাসচন্দ্র। অথচ তিনিই শেষে লিখলেন--'হাতে লিখনি ধারণ করিলে সকলেই, আর কিছু পারুক আর না পারুক, অন্তত গালি দিতে পাবে। আমবা ঐ প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া লেখনীকে কলুষিত করিতে চাই না।' উদাহরণ থেকে স্পষ্ট, কৈলাসচন্দ্রের ভাষা বিকৃত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

কারো কারো ধারণা, কৈলাসচন্দ্রের অভদ্র ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র যত রুষ্ট হয়েছিলেন, অন্য লেখায় তত নয়। কৈলাসচন্দ্রের লেখার তিন মাস পরে বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর লেখেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখার এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে। বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরে সব থেকে বেশি স্থান পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, সব থেকে কম কৈলাসচন্দ্র। বর্তমান প্রবন্ধের অন্যত্র দেখা যাবে, এমন অকিঞ্চিত্কর লেখকদের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে নিন্দিত হলে বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর লিখতেন না। অতএব, এই ধারণা ·তথ্যপ্রতিষ্ঠ নয়, বরঙ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। উদ্দেশ্য কৈলাসচন্দ্রকে শিখন্ডী করে রবীন্দ্রনাথকে বাঁচানো। রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯) লেখেন--'ঘৃণিত কোমত্‌বাদের প্রবর্তন যদি নবজীবন সঞ্চারের কারণ হয়, তাহা হইলে স্বদেশীয় লোকদিগকে এরূপ নবজীবন প্রাপ্ত হইতে আমরা পরামর্শ দিই না।'

সঙযুক্ত পাদটীকায় তিনি একসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র, কঁত্‌ ও স্পেন্সারের উল্লেখ করেছেন। পরে আবাব লিখেছেন--'ধর্মজিজ্ঞাসা শিরস্ক প্রস্তাবে তিনি [বঙ্কিমচন্দ্র] যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে যে তিনি কোমতের মত হিন্দুধর্মের সারভাগ মনে করেন।' আক্রমণ বঙ্কিমচন্দ্রের উপরে এবঙ তার কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যে নাস্তিকতা ও কঁতের অনুসরণ সম্বন্ধে অনুমান। দুটির কোনোটি সত্য নয়। তাছাড়া, কঁত্‌-প্রচারিত ধ্রুববাদ (positivism) কিছু 'ঘৃণিত' বস্তু নয়। তাই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে 'উদার-প্রকৃতি' বলে তাঁর আলোচ্য রচনা থেকে উদ্ধৃতি সঙ্কলন করেছেন, যেখানে শেষ পর্যন্ত বিতর্ক ছেড়ে লেখক ব্রাহ্মধর্মের মাহাত্ম্য-কীর্তনে রত।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) লিখিত 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের অঙশবিশেষ বঙ্গদর্শন, ১২৮০ শ্রাবণ সঙখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'বিষবৃক্ষ' তার অনেক আগের রচনা। দ্বিজেন্দ্রনাথ স্মৃতিকথায় বলেন--'আমি যখন প্রথম 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' রচনা করিতে আরম্ভ করি তাহার কোনও কোনও অঙশ বঙ্কিমবাবুকে পাঠাইয়াছিলাম, তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশ করিবার জন্য। বঙ্কিমবাবু বোধহয় সেগুলো ছাপান নাই, এক-আধটা ছাপাইয়াছিলেন কি না আমার স্মরণ নাই। কিন্তু তাঁহার বিষবৃক্ষের মধ্যে ঠিক সেই রকম ছবির অবতারণা করিয়া বসিলেন।' দ্বিজেন্দ্রনাথের অভিযোগ তথ্যপ্রতিষ্ঠ নয়, ভাষাপ্রয়োগের আড়ালে অন্য উদ্দেশ্য উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ আবার বলেছেন--'ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু অন্যত্র গুরুশিষ্য খাড়া করিয়া যেভাবে দার্শনিক আলোচনা করিতে বসিলেন, তাহার বহু পূর্বে ঠিক ঐভাবে

ঐরকম আলোচনা আমিও করিয়াছিলাম।' দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ দুটি হল 'অধ্যাত্মবিদ্যার প্রথম প্রস্তাব' (ভারতী, ১২৮৭ আশ্বিন) এবঙ 'দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ' (ভারতী ও বালক, ১২৯৩ ভাদ্র)। 'ধর্মজিজ্ঞাসা' প্রভৃতি নানা নামে বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্বে'র বিচ্ছিন্ন অঙশ 'নবজীবন' মাসিকপত্রে ১২৯১ শ্রাবণ সঙ্খ্যা থেকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। তাদের রচনারীতির আদর্শ (model) ছিল কঁত্-লিখিত ধ্রুববাদী প্রশ্নোত্তরমালা (Catechism of Positive Religion)। অতএব, দ্বিজেন্দ্রনাথের বক্তব্য অপ্রতিষ্ঠিত। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে বিতর্কের প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন--'বঙ্কিমবাবু ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন যখন তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্রে'র সমালোচনা আমি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় করিলাম।

পত্রিকায় সমালোচনা বাহির হইবার পর তিনি প্রচারে এমনভাবে লিখিলেন যেন সমালোচনা আমার লেখা নহে--কর্তা স্বয়ঙ লিখিয়া দিয়াছেন। তিনি আমাকে এইটুকু মাত্র বলিয়াছিলেন--'দেখ, বঙ্কিম যে রকম করে কৃষ্ণচরিত্রের আলোচনা করচে, তার একটা প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক।' তাই আমি প্রতিবাদ করিয়া পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম।' এখানে প্রধান ভুল, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাটি 'কৃষ্ণচরিত্র' নয়--'ধর্মজিজ্ঞাসা'। দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিবাদের উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন--'আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা সব শুনিয়া, যদি প্রথম সঙ্খ্যার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া, তিনি সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তবে তাঁহার কোন দোষই দিতে পারিতাম না।' বঙ্কিমচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথেব উল্লেখও করেননি। দ্বিজেন্দ্রনাথের অসতর্ক কথায় দেবেন্দ্রনাথের অর্থাত্ আদি ব্রাহ্ম সমাজের আদেশের বিষয় ধরা পড়েছে। এই আদেশ প্রাসঙ্গিক অন্যান্য লেখক সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রনাথের সামাজিক মেলামেশা ছিল। পবে বঙ্কিমচন্দ্র প্রচার, ১২৯২ ফাল্গুন-চৈত্র সঙ্খ্যায় 'দেশীয় নব্য সমাজের স্থিতি ও গতি' প্রবন্ধে নিজের মতপার্থক্য জানিয়ে ব্রাহ্ম দ্বিজেন্দ্রনাথ ও ধ্রুববাদী H.J.S. Cotton-এর রচনার সশ্রদ্ধ আলোচনা করেছেন। স্মৃতিকথায় দ্বিজেন্দ্রনাথ সে তথ্য বিস্মৃত হয়েছেন।

'হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন--'একটি হিন্দুর কথা বলি।. কখন মিথ্যা কথা কহেন না। যদি মিথ্যা কথা কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণ পূর্বক যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যাকথা নিতান্ত প্রয়োজনীয়--অর্থাত্ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন।'

এরপরে রবীন্দ্রনাথ কয়েকবার ভবানী দত্তের গলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের বাসায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা করেছেন, কিন্তু এই প্রবন্ধের সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করেননি। অথচ ব্রাহ্ম প্রচারক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৪৩-১৯১৩) সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন, এবঙ দাদাদের সঙ্গে। সরলা দেবী স্মৃতিকথায় বাড়ির অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সাধারণ সভায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ-প্রবন্ধ শোনার উত্তেজনার কথা মনে করে লিখেছেন--'রবীন্দ্রনাথের দুই অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এ বিষয়ে শাস্ত্রকারদের ও বঙ্কিমের পক্ষাবলম্বী হলেন, তাঁরা বক্তৃতা-সভায় যোগদান

করলেন না।' ইতিমধ্যে কয়েক মাসের ব্যবধানে এবঙ রবীন্দ্রনাথের পদ্ধতিতে তাঁদের মতপার্থক্য ঘটতে পারে। সরলা দেবীও পরিণত বয়সে মন্তব্য করেছেন—'বঙ্কিমের প্রতি সুবিচার করিনি আমরা, সেদিন মাতুলভক্তিতে অযথা বঙ্কিমদ্বেষী হয়ে পড়েছিলুম।' এবঙ প্রসঙ্গত দুঃখ করেছেন—'বঙ্কিমকে বাঙালীর মনে চিরজাগরূক রাখবার কোন প্রতিষ্ঠান নেই।' এসব বলে সরলা দেবী দীর্ঘ উদ্ধৃতি ব্যবহার করে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যের সারবত্তা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ প্রকাশের চার মাস পরে রবীন্দ্রনাথ 'একটি পুরাতন কথা' নামের প্রতিবাদ-প্রবন্ধে লিখেছেন—'আমাদের শিরার মধ্যে মিথ্যাচরণ ও কাপুরুষতা যদি রক্তের সহিত সঞ্চালিত না হইত, তাহা হইলে কি আমাদের মুখ্য লেখক পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া সত্যের বিরুদ্ধে একটি কথা বলিতে সাহস করেন?'

এই কথাগুলির প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—'প্রভু [রবীন্দ্রনাথ], ভৃত্যের [কৈলাসচন্দ্রের] মত মেছোহাটা হইতে গালি আমদানি করেন নাই ; প্রার্থনা-মন্দির হইতে আনিয়াছেন।' তিনি মোট পাঁচটি বিষয়ে আপত্তি তুলেছেন। (ক) 'মুখ্য' শব্দটি রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতার সময় 'মূর্খ' উচ্চারণ করেছিলেন কেন? (বোধহয় কোনো নির্ভরযোগ্য শ্রোতার কাছে বঙ্কিমচন্দ্র কথাটা শুনেছিলেন।) (খ) তাঁকে গাল দিয়েছেন কেন? (গ) প্রতিবাদের মনোভাব প্রাতিষ্ঠানিক আরোপ না হলে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদের জন্য চার মাস সময় লেগেছে কেন? (ঘ) ইতিমধ্যে কয়েক বার ব্যক্তিগত আলোচনা হলেও মহাভারতে কৃষ্ণোক্তির সূত্র লেখক জিজ্ঞাসা করেননি কেন? (ঙ) 'সত্য' শব্দের প্রতিজ্ঞা অর্থে ব্যবহার তিনি বোঝেননি কেন?

'কৈফিয়ত' রচনায় রবীন্দ্রনাথ 'ক' প্রশ্নের জবাব দেননি। সরলা দেবীও এই বিষয়ে নীরব। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এমন কথা বলা অসম্ভব, এই প্রচারের উত্তর, বীরপূজা যেমন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নয়, বিশ্বাস তেমনি তথ্য নয়। উপরের তালিকার পঞ্চম রচনা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—'রবীন্দ্রবাবু ইতর শব্দটা চন্দ্রবাবুকে পালটাইয়া বলিলেন।' 'কৈফিয়ত' প্রবন্ধে তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'চন্দ্রনাথবাবুতে আর আমাতে যে কিঞ্চিত্‍ কথা কাটাকাটি হইয়াছিল সে তাঁহাতে আমাতে বোঝাপড়া।' অর্থাত্‍ 'ইতর' শব্দ ব্যবহার করার দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বঙ্কিম-কথিত ত্রুটি ঢাকার চেষ্টা করা বৃথা।

'খ' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'তাহা গালি নয়, তাহা আক্ষেপ উক্তি।' কোনো ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী ও কাপুরুষ বলা গালি, না আক্ষেপ?

'গ' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট কোনো উত্তর দেননি, তবে প্রসঙ্গের শেষ তিনটি অনুচ্ছেদে ব্রাহ্মসমাজের মাহাত্ম্যকীর্তন করে বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনামূলক গুরুত্বের অভাবের কথা লিখেছেন। তাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'বঙ্কিমবাবু তাঁহার প্রবন্ধে যেখানেই অবসর পাইয়াছেন আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সুকঠোর সঙক্ষিপ্ত ও তির্যক কটাক্ষপাত করিয়াছেন। সেরূপ কটাক্ষপাতে আমি ক্ষুদ্র

প্রাণী যতটা ভীত ও আহত হইব আদি ব্রাহ্মসমাজের ততটা হইবার সম্ভাবনা নাই। আদি ব্রাহ্মসমাজের নিকটে বঙ্কিমবাবু নিতান্তই তরুণ।' এবং 'আজি সেই পুরাতন আদি ব্রাহ্মসমাজের অযোগ্য সম্পাদক আমি কাহারো কটাক্ষপাত হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইব ইহা দেখিতে হাস্যজনক।'

'ঘ' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন--'তাহাতে কি আসে যায়? ..দুর্বল স্বভাববশতঃ আমার চক্ষুলজ্জা হইতে পারে। বঙ্কিমবাবু পাছে বিরোধী মত সহিতে না পারিয়া আমাকে ভুল বুঝেন এমন আশঙ্কা মনে উদয় হইতে পারে। যখন প্রথম পড়িয়াছিলাম-- গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে না পারি।' ইত্যাদি। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ সম্ভাব্য উত্তরগুলি সাজিয়েছিলেন, নিজের প্রকৃত উত্তর লেখেননি। কৃষ্ণোক্তির আকর জিজ্ঞাসায় 'চক্ষুলজ্জা' বা 'বিরোধী মত' কিছু নেই। তিনি নিজে থেকেই তো সাহিত্য আলোচনা করতে যেতেন।

'ঙ' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উত্তর--'বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন 'যদি মিথ্যা কথা কহেন'-- সত্য রক্ষা না করাকে 'মিথ্যা কথা কওয়া' কোনো পাঠকের মনে হইতে পারে না।' রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য আপাতদৃষ্টিতে ঠিক, কিন্তু উদ্ধৃতিটি যে বাক্য থেকে নেওয়া, সেখানে যে বঙ্কিমচন্দ্র পরে লিখেছিলেন 'অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়' সে কথাটা ইচ্ছা করে এড়িয়ে গেছেন। নইলে কথায় অস্পষ্টতা বা ভুল থাকে না।

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে উতোর গাইবার সঙ্গে সঙ্গে চাপানও দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন--'আমি বলিয়াছিলাম 'তিনি একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন'..ইত্যাদি। আমি এমন বলি নাই যে তিনি একটি আদর্শ হিন্দু কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন। 'একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করা' ও 'একটি আদর্শ হিন্দু কল্পনা' করা উভয় অর্থের কত প্রভেদ হয় পাঠকেরা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।' এই অভিযোগটি সত্য, এবং তা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাব্যবহারে অসতর্কতা নির্দেশ করে। অসতর্কতা, কিন্তু ভুল নয়, কারণ বঙ্কিমচন্দ্র যে হিন্দুর আদর্শ ব্যক্তির কথা লিখেছেন, তাঁকে আদর্শ হিন্দুও বলা চলে। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন, যে রবীন্দ্রনাথ কথার কায়দাকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছেন। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্রের 'হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধের যে কথায় তিনি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হিসাবে আহত হয়েছেন, তা হল--'যখন বৌদ্ধধর্ম, ইসলামধর্ম ও খ্রিস্টধর্ম, হিন্দুধর্মের স্থান অধিকার করিতে পারে নাই, তখন আর কোন্ ধর্মকে তাহার স্থানে এখন স্থাপিত করিব? ব্রাহ্মধর্মের আমরা পৃথক উল্লেখ করিলাম না, কেন না, ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মের শাখামাত্র। ইহার এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই, যাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে, ইহা ভবিষ্যতে সামাজিক ধর্মে পরিণত হইবে।'

সত্যানুসন্ধান নয়,--অহঙ্কার প্রতিষ্ঠা যেখানে আলোচনার উদ্দেশ্য, সেখানে বিতর্ক অর্থহীন। তাই বঙ্কিমচন্দ্র আরো বিতর্কে যোগ দেননি। 'কৈফিয়তে'র শেষে রবীন্দ্রনাথ ভদ্রতা করে লিখেছিলেন--'আমার সবিনয় নিবেদন এই যে আমি সরলভাবে যে-সকল কথা বলিয়াছি, আমাকে ভুল বুঝিয়া [বঙ্কিমচন্দ্র] তাহার অন্যভাব গ্রহণ না করেন।' এই

সুযোগে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিগত সৌহার্দ্য রাখতে রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লিখে বিরোধের অবসান করেন। ফলে 'প্রচার' পত্রে ১২৯১ মাঘ সঙ্খ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'মথুরায়' এবঙ ১২৯২ ফাল্গুন-চৈত্র যুগ্মসঙ্খ্যায় 'কো তুঁহু' কবিতা প্রকাশিত হল। 'একটি পুরাতন কথা' ১২৯৪ শনে 'সমালোচনা'য় গ্রন্থিত হবার সময় তার শেষ ছয়টি অনুচ্ছেদ বর্জিত হল, কারণ সেখানে বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করা হয়েছিল। এ বইটিও তিনি দ্বিতীয়বার মুদ্রিত বা 'কৈফিয়ত' প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করেননি। কালের ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথ নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। তাই ২৮-বছর পরে একে 'ভাবাবেশের কুহক কাটাইয়া' 'মল্লভূমিতে আসিয়া তাল ঠুকিতে আরম্ভ' করা বলেছেন। এবঙ মনে মনে আনন্দ পেয়েছেন যে 'বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উত্পাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।' 'ক্ষমার সহিত' শব্দ দুটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তা অনুসারে, রবীন্দ্রনাথের মতে, দোষ কার? ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের গোড়ায় (পৌষ ১২৯১) মুদ্রিত বিতর্ক শেষ হল। তার কয়েকদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র চিঠি লিখলেন। তারপরে (মাঘ ১২৯১) প্রচারে 'মথুরায়' কবিতা ছাপা হল। শেযে ১৫ই চৈত্র ১২৯১ শুক্রবার (২৭.৩.১৮৮৫) জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হল। এই নিমন্ত্রণ নির্দেশ করে যে ত্রুটি শোধরাতে উদ্যোগ নিতে হযেছিল ঠাকুরবাডিকেই—বঙ্কিমচন্দ্রকে নয়।

রবীন্দ্রনাথের ত্রুটি হয়ত তাঁকে বোঝানো সম্ভব ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রভক্তদের বোঝানো কঠিন। কাবণ, তাঁদের সিদ্ধান্ত তথ্য ও যুক্তির পূর্বগামী। প্রসঙ্গত একটি পরবর্তী বিতর্ক অনুধাবনযোগ্য।

বঙ্গদর্শন ১২৮০ মাঘ সঙখ্যায় 'ভারতভূমি' নামে কোনো বালকরচিত একটি অস্বাক্ষরিত কবিতাব গুণগত উত্কর্ষ লক্ষ্য করে কোনো প্রাক্তন অধ্যাপক থেকে পরবর্তী অনেক ববীন্দ্রভক্ত বলতে থাকেন, যে কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের লেখা। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায তথ্যসহ প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন, যে কবিতাটি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাইপো জ্যোতিশচন্দ্রের রচনা। তাতে ভক্তেরা থামেননি। সম্প্রতি নতুন তথ্যে প্রমাণিত হয়েছ, যে ব্রজেন্দ্রনাথের বক্তব্য ঠিক। জ্যোতিশচন্দ্রের আরো কবিতা পাওয়া গেছে। সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সমর্থকেরা সঙ্খ্যাগরিষ্ঠ। রবীন্দ্র-বঙ্কিম বিতর্কে ভুল কার, এই প্রশ্নের উত্তরেও রবীন্দ্রভক্তেরা দলে ভারী। দুটি বিষয় বিভিন্ন এবঙ অসমকালবর্তী। আশ্চর্য, যাঁরা এই বিতর্কে রবীন্দ্র সমর্থক, তাঁরা সকলেই রবীন্দ্রনাথকে 'ভারতভূমি'র লেখক বলে দাবী করেন। প্রাতিষ্ঠানিক প্রচার এবঙ বীরপূজার অবৈজ্ঞানিক মনোভাব বিদ্যাবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে। রবীন্দ্রনাথের বোনঝি হয়েও সরলা দেবী অনেক আগেই তা বুঝেছিলেন।

৮

তাঁর সমকালীন বাঙালি লেখকদের দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র বার বার নিন্দিত হয়েছেন। তিনি লিখেছেন—'যেখানে যশ, সেইখানে নিন্দা, সঙসারের ইহা নিয়ম। পৃথিবীতে যিনি যশস্বী হইয়াছেন, তিনিই সম্প্রদায় বিশেষ কর্তৃক নিন্দিত হইয়াছেন। ইহার অনেক কারণ

আছে। প্রথম, দোষশূন্য মনুষ্য জন্মে না ; যিনি বহুগুণবিশিষ্ট, তাঁহার দোষগুলি, গুণসান্নিধ্য হেতু, কিছু অধিকতর স্পষ্ট হয়, সুতরাং লোকে তত্কীর্তনে প্রবৃত্ত হয়। দ্বিতীয়, গুণের সঙ্গে দোষের চিরবিবোধ, দোষযুক্ত ব্যক্তি গুণশালী ব্যক্তির সুতরাং শত্রু হইয়া পড়ে। তৃতীয়, কর্মক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইলে কার্যেব গতিকে অনেকে শত্রু হয় ; শত্রুগণ অন্য প্রকারে শত্রুতা সাধনে অসমর্থ হইলে নিন্দার দ্বারা শত্রুতা সাধে। চতুর্থ, অনেক মানুষের স্বভাবই এই, প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দা করিতে ও শুনিতে ভালবাসে ; সামান্য ব্যক্তির নিন্দা অপেক্ষা যশস্বী ব্যক্তির নিন্দা বক্তা ও শ্রোতার সুখদায়ক। পঞ্চম, ঈর্ষা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম ; অনেকে পরের যশে অত্যন্ত কাতর হইয়া যশস্বীর নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এই শ্রেণীর নিন্দুকই অনেক, বিশেষ বঙ্গদেশে।' উপরের তৃতীয় ছাড়া অন্য কারণগুলি নিন্দিত ব্যক্তির অহমিকাকে তৃপ্ত করে। কারণগুলির যাথার্থ্য যা-ই হোক, এগুলির কল্পনা ছাড়া নিন্দিত ব্যক্তি টিঁকতে পারেন না। বঙ্কিমচন্দ্রও তাই করেছিলেন। পরে তিনি জানিয়েছেন--'আমার বিরুদ্ধে কেহ কখন কোন কথা লিখিলে বা বক্তৃতায় বলিলে এ পর্যন্ত কোন উত্তর করি নাই।' বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম তিনটি (দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুন্ডলা, মৃণালিনী) উপন্যাসে খ্যাতি পেলেও 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের পর থেকে তাঁর গুরুত্ব ও খ্যাতি অনেক বেড়ে যায়। তখনকার অন্যান্য সাময়িকপত্রের তুলনায় 'বঙ্গদর্শনে'র চিন্তা ও রচনারীতিতে দুস্তর পরিবর্তন চোখে পড়ে। জনপ্রিয়তাতেও তা ছিল শীর্ষে। এজন্য বঙ্গদর্শন প্রকাশের পব থেকে বঙ্কিম-বিবোধিতা ও বঙ্কিম-নিন্দা বেড়ে গিয়েছিল। ১২৮৩ শনে তিনি নবীনচন্দ্র সেনকে বলেছিলেন--'নিরপেক্ষ সমালোচনায় একটা দেশ আমাব শত্রু হইয়া উঠিতেছিল। শুনিয়াছি কোনও কোনও গ্রন্থকার আমাকে মারিতে পর্যন্ত সঙ্কল্প করিয়াছিল। গালাগালির ত কথাই নাই। সার জর্জ কেম্বেলেব পর বোধ হয় আমি এ বাঙ্গালার গালাগালির প্রধান পাত্র। (I am the worst abused man in Bengal next only to Sir George Campbell.)' তবু পূর্বোক্ত কারণে তিনি এই নিন্দাকে প্রকাশ্যভাবে উপেক্ষা ও অহঙ্কার করে ১২৮২ চৈত্রে লিখেছিলেন--'যে সকল সহযোগিবর্গ বঙ্গদর্শনকে উত্সাহিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আমার শত শত ধন্যবাদ। ইহাতেও আমার একটি স্পর্দ্ধার কথা আছে। উচ্চশ্রেণীর দেশী সম্বাদপত্র মাত্রই বঙ্গদর্শনের অনুকূল ছিলেন, অধিকতর স্পর্দ্ধার কথা এই যে, নিম্নশ্রেণীর সম্বাদপত্র মাত্রই ইহার প্রতিকূলতা করিয়াছিলেন।' অর্থাত্ নিম্নশ্রেণীর লেখকের নিন্দায় বঙ্কিমচন্দ্র অহঙ্কার প্রকাশ করেছিলেন। উচ্চশ্রেণীর মধ্যে তিনি বান্ধব, আর্যদর্শন, সহচর, ভারত সংস্কারক, এডুকেশন গেজেট, সাধারণী, সাপ্তাহিক সমাচার, Indian Observer, Indian Mirror ও Hindu Patriot-এর নাম করেছেন। অমৃতবাজার পত্রিকা, সোমপ্রকাশ, মধ্যস্থ, বসন্তক, হালিশহর পত্রিকা প্রভৃতি অনেকের নাম তিনি করেননি। অনুক্ত কাগজগুলির অনেকে বঙ্কিম-নিন্দক ছিল। এজন্য তিনি ইংরাজি সংবাদপত্রের গ্রাহক ছিলেন, বাংলা খবরের কাগজ প্রায়ই পড়তেন না। তিনি লিখেছেন--'দেশী সম্বাদপত্র পাঠসুখে আমরা ইচ্ছাক্রমে বঞ্চিত।' তাঁর

শেষ জীবনে, তিনি গ্রাহক না হলেও, 'বঙ্গবাসী' কাগজ তাঁকে নিয়মিতভাবে পাঠানো হত, কিন্তু তিনি তা-ও নিয়মিতভাবে পড়তেন না। বঙ্গদর্শন ১২৮১ শ্রাবণ (১৯.৪.১৮৭৪) সঙ্খ্যায় অস্বাক্ষরিত 'প্রাপ্তগ্রন্থের সঙক্ষিপ্ত সমালোচনা' কার॰ লেখা, বলা কঠিন। তা সম্পূর্ণভাবে বা অঙশত বঙ্কিমচন্দ্র বা অক্ষয়চন্দ্র সরকারের লেখা হতে পারে। তাতে দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' নাটকের আলোচনায় রচনাটির নিন্দা করে শেষে লেখা হয়েছে--'ভবিষ্যত্ নাটককারেরা কি লিখিবেন, তাহা ভাবিয়া আমরা ব্যাকুল হইয়াছি।..বাঙ্গালি মাছ ভাত খায়, মুরগী খায় না এই কুপ্রথায় অনেক অনিষ্ট ঘটিতেছে, এই নৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া 'মুরগী নাটক' নামে একখানি উত্কৃষ্ট নাটক হইতে পারে। আর, এদেশে অশ্বের দ্বারা চাস না হইয়া বলদের দ্বারা চাস হয়, এই কুপ্রথার নিন্দার্থ 'বলদ মহিমা' নামে আর একখানি উত্কৃষ্ট নাটক হইতে পারে। 'রোড শেষ নাটক' 'দুর্ভিক্ষ নাটক' প্রভৃতি নাটক এ পর্যন্ত হয় নাই--ভরসা করি শীঘ্র হইবে। হইলে, যেমন হউক, স্বর্ণলতা নাটকের অপেক্ষা অপকৃষ্ট হইতে পারিবে না।'

বঙ্গদর্শনে সমালোচিত কোনো লেখক এই আলোচনা উপলক্ষ করে তিন মাসের মধ্যে ১৫ পৃষ্ঠায় 'বলদ মহিমা নাটক' (৫.১০.১৮৭৪) লিখে প্রকাশ করলেন। অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের এই নাটকের মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন ঢাকার ইস্টবেঙ্গল প্রেসের নবীনচন্দ্র দে। ব্যঙ্গ-নাটিকাটিতে ইঙলন্ডের দৃষ্টান্তে গোরু দিয়ে চাষ না করানোর কথা লিখে বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি রচনাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

অপেক্ষাকৃত ভালো সাময়িকপত্রগুলি এই নাটকের নিন্দা করেছিল। ১২৮১ অগ্রহায়ণে 'বান্ধব' লেখে--'ইহাতে বলদের মহিমা অর্থাত্ বলদের বিদ্যা বুদ্ধি, বাক্পটুতা, প্রেমিকতা ও রসিকতা সমস্তই সুচারুরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের নামোল্লেখ নাই। তিনি গ্রন্থসমালোচনার জন্য দয়া করিয়া একখানি পুস্তক আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমরা আর কি সমালোচনা করিব?' একই মাসে 'জ্ঞানাঙ্কুর' লিখেছিল--'বঙ্গদর্শনের সুযোগ্য সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে গালিগালাজ করিবার জন্যই গ্রন্থকার এ গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। পুস্তিকাখানিতে কোন গুণ দৃষ্ট হইল না ; দোষ আগাগোড়া সকলই। এখানি সমালোচনার অযোগ্য।..গ্রন্থকারকে এই বলিতে চাই যে, একটু লেখা পড়া শিখিয়া পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিলে ভাল হয়।' বঙ্গদর্শনে বিজ্ঞান সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যা পরে তাঁর 'বিজ্ঞানরহস্য' (১৮৭৫) গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছিল। কোনো অজ্ঞাতনামা লেখক তার এবঙ অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'উদ্দীপনা' (বঙ্গদর্শন, ১২৭৯ বৈশাখ) প্রবন্ধের অসার নিন্দা করে ১২৮২ শনের মাঝামাঝি 'খন্ডন খন্ড খাদ্য' নামে একটি পুস্তিকা প্রচার করেন। এক আনা দামের পুস্তিকাটি সঙস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যেত। 'এডুকেশন গেজেট' সমালোচনায় বইটিকে অসার এবঙ লেখককে মূর্খ বলে। অল্পদিন পরে একই কাগজে দিনাজপুরের কোনো অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি 'সামান্যরূপ মুদ্গর' নামে চিঠিতে বইটিকে মূর্খের লেখা অসার নিন্দা বলেন। গ্রন্থকার তাতে না থেমে আরো কয়েকটি, অন্তত তৃতীয়

সঙ্খ্যা পর্যন্ত 'খন্ডন খন্ড খাদ্য' লেখেন। তৃতীয় সঙ্খ্যাতে লেখক অযথা বঙ্কিমচন্দ্রকে নোঙরা ভাষায় নিন্দা করে 'সাধারণী'র বিরূপ সমালোচককে 'ঈর্ষাকাতর গন্ডমুর্খ' বলেছে। বঙ্কিমচন্দ্র কোনো উত্তর দেননি। কিন্তু তৃতীয় সঙখ্যার 'দ্বিতীয় ক্রোড়পত্রে' এই লেখক 'সাধারণী' সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে ব্যঙ্গ করে মহানুভব বলায় 'সাধারণী' লেখে--'খন্ডন খাদ্যকারের মত মহানুমান লোক অনেক পাওয়া যায়।' নাট্যকার মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি বিরূপ ছিলেন। কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত লিখেছেন, যে আগে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে মনোমোহনের হৃদ্যতা ছিল। কিন্তু একটি রচনা-প্রতিযোগিতায় তিনি দীনবন্ধু মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে দীনবন্ধুকে বিজয়ী ঘোষণা করায় এই হৃদ্যতার অবসান হয়, এবঙ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রতি বিদ্বিষ্ট হন। এই কাহিনীর সত্যতা সন্দেহজনক। কারণ (ক) এই প্রতিযোগিতার বিবরণ দেওয়া হয়নি। (খ) দীনবন্ধু-বঙ্কিমের হার্দ্য সম্পর্ক কাহিনীটির বিপক্ষতা করে। (গ) প্রতিযোগী লালবিহারীর রচনা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিচাবে পুরস্কার পেলেও বঙ্কিমচন্দ্র রাজেন্দ্রলালের উপরে সশ্রদ্ধ ছিলেন। সেক্ষেত্রে বন্ধু দীনবন্ধু বিজয়ী হলে তিনি মনোমোহনের উপর বিরক্ত হবেন কেন? (ঘ) এই কাহিনীতে বিদ্বেষ পোষণ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র : অথচ সাময়িকপত্রে নিন্দা করেছেন মনোমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র নীরব। বরঙ বঙ্কিমচন্দ্র একবার লেখেন--'ঈশ্বর গুপ্তের নিজের কীর্তি ছাড়া প্রভাকরের শিক্ষানবিশদিগের একটা কীর্তি আছে। ..বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একজন, বাবু দীনবন্ধু মিত্র আর একজন। শুনিয়াছি বাবু মনোমোহন বসু আর একজন। ইহার জন্যও বাঙ্গালার সাহিত্য প্রভাকরের নিকট বিশেষ ঋণী।' পূর্বোক্ত 'বলদ মহিমা' নাটকের সমালোচনায মনোমোহন লিখেছেন-- 'নাটকখানির গুণাগুণ আমরা কি বলিব, অনুরোধকারীর প্রতিই সে ভার থাকিল।.. অনুবোধ করিয়া সুযোগ্য সহযোগী যে এই প্রথম অনুরোধ রক্ষকের নিকট বিশিষ্টরূপে গালি খাইয়াছেন এবঙ সেই সঙ্গে অন্যান্য গ্রন্থকর্তাকেও খাওয়াইয়াছেন, ইহাই ইহার কৌতুক।' নোঙরা আক্রমণকে মনোমোহন কৌতুক ভাবলেন, কারণ আক্রান্ত ব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্র। মনোমোহন তাঁর 'মধ্যস্থ' পত্রে অনেকগুলি বেনামি রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শনের নিন্দা করেছেন বা প্রকাশ করেছেন, প্রায়ই অত্যন্ত কটু ভাষায়। তাদের একটি তালিকা দেওয়া যেতে পারে প্রকাশকাল সহ।

'বঙ্গদর্শনের বঙ্গদেশের কৃষক' ৬.১০.১২৭৯ (এতে দুঃখ করে বলা হয়েছে, যে সোমপ্রকাশ ও হালিশহর পত্রিকার ভালো সমালোচনাও নকলনবীশ ও নিন্দনীয় বঙ্গদর্শনকে ত্রুটিমুক্ত করার বিষয়ে নিষ্ফল হয়েছে।)

'ভারতচন্দ্রের গ্রহণ' ২১.১.১২৮০ (বঙ্গদর্শন ১২৮০ বৈশাখ সঙ্খ্যায় অক্ষয়চন্দ্র সরকারের অস্বাক্ষরিত রচনা 'তুলনায় সমালোচনা'র নিন্দা।)

'বিলাসবাবুর অভিপ্রায়লিপি' ২৮.১.১২৮০ (ওই)

'বাঙ্গালা কবি ও কাব্য' ৪.২.১২৮৬

'প্রাপ্ত : প্যারীমোহন কবিরত্নের কবিতা' ১১.২.১২৮০ (ওই পূর্বে আঙশিক উদ্ধৃত।)

'সমালোচনের সমালোচনা' ১৮.২.১২৮০ এবং ২৫.২.১২৮০ ('ভারতচন্দ্রের গ্রহণ' রচনার শেষাংশ।)

'প্রেরিতপত্র' ১৮.৪.১২৮০

'বঙ্গদর্শন—গর্দভ' ৩২.৪.১২৮০ (বঙ্কিমচন্দ্রকে নোংরা আক্রমণ।)

'বঙ্গদর্শন--গর্দভ : পরিশিষ্ট' ৭.৫.১২৮০ (বঙ্কিমচন্দ্র দেশি সংবাদপত্রের নিন্দা করেছেন বলে তাঁকে নিন্দা।)

'বর্তমান লেখকগণ' ১২৮১ পৌষ। (বিদ্যাসাগর-সমালোচনার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের বিরোধিতা।)

বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বহুবিবাহ' গ্রন্থের প্রতিকূল আলোচনা করায় অনেক কাগজ বঙ্কিমচন্দ্রের বিরোধিতা করে। সাময়িকপত্রের বিরোধিতাগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হয়। 'শ্রীউচিত বক্তা' লিখিত 'বর্তমান লেখকগণ' তার দেড় বছর পরে প্রকাশিত হওয়ায় অনুমান করা যেতে পারে, যে রচনাটির উদ্দেশ্য বিষয়ের আলোচনা নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের নিন্দা করা। এজন্য রচনাটি থেকে একটি উদ্ধৃতি উদ্ধারযোগ্য। 'তাঁহারই প্রথম ভাগ পড়িয়া বঙ্কিমবাবু মানুষ, এখন কিনা তিনি সেই বিদ্যাসাগরেরই ঘাড় ভাঙ্গিতে চান! একি কম আস্পর্দ্ধা ও অহঙ্কারের কথা! শুনিলে রক্ত গরম হইয়া উঠে। অজ্ঞান বঙ্কিমবাবুর ইহা বিবেচনা করা উচিত ছিল, যে চামচিকা কখন পক্ষীরাজ গরুড়ের সমযোগ্য নহে ; অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া বঙ্কিমবাবু জ্ঞানশূন্য। এক্ষণে তাঁহার বিচারশক্তি কোথায়? নহিলে তিনি ঢাকের কাছে ট্যামটেমীর বাদ্য আরম্ভ করিবেন কেন? নিতান্ত বাতুলের কার্য্য!' সম্পাদক মনোমোহন ভালোমানুষ সেজে সংশ্লিষ্ট পাদটীকায় লিখলেন—'বিদ্যাসাগর-বিষয়ক বঙ্গদর্শনের লিপি যে বঙ্কিমবাবুর লেখা, ইহা উচিত বক্তা কিরূপে জানিলেন?'

নিন্দা করা যে উদ্দেশ্য, তার প্রমাণ উপরের প্রথম রচনায় অন্য দুটি সংবাদপত্রের নাম। পূর্বে শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' থেকে এবং বিদ্যাসাগরের প্রসঙ্গে 'হালিশহর পত্রিকা' থেকে বঙ্কিম-বিরোধিতার কয়েকটি নিদর্শন দেখানো হয়েছে। সেগুলি আলোচনা নয়, নোংরা ব্যক্তিনিন্দা মাত্র। 'হালিশহর পত্রিকা' একবার বঙ্কিমচন্দ্রের অসুস্থতার মিথ্যা খবর ছাপে এবং কোন লোককে দিয়ে তাঁর মৃত্যুর খবর কাঁটালপাড়ার বাড়িতে পৌঁছে দেয়। তখন বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে থাকতেন। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭৩ জুনে বন্ধু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন—'The story about my illness was a pure fiction. The gentlemen who gave it out in the papers managed to send news of my death to my house at Kantalpara. The announcement in the *Haleeshahar Patrika* of my illness was intended merely to create belief in the report of my death sent to my relatives, this being supposed an excellent way of punishing a man for his literary opinion.'

প্রথম বছরের (১২৭৯ বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত) বঙ্গদর্শনের মুদ্রাকর ও প্রকাশক

ছিলেন ভবানীপুরের খ্রিস্টান ব্রজমাধব বসু। তিনি বৈশাখ থেকে মাঘ পর্যন্ত দশটি সঙ্খ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে যুগ্মভাবে স্বত্বাধিকারী ছিলেন। তখন বঙ্গাদর্শনের প্রচারসঙ্খ্যা ছিল ১৫০০। ফাল্গুন থেকে স্বত্ব হল এককভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের। এতে ব্রজমাধবের আর্থিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। দ্বিতীয় বছরে (১২৮০ শন) বঙ্গাদর্শন কাঁটালপাড়ায় ছাপা হতে আরম্ভ হলে ব্রজমাধবের স্বার্থ আরো ক্ষুণ্ণ হয়। তিনি তখন বঙ্গাদর্শনের আকারে খ্রিস্টধর্ম প্রচারমূলক মাসিকপত্র 'বঙ্গামিহির' ছেপে প্রকাশ করতে থাকেন। পূর্বের ক্ষতির জন্য ব্রজমাধব বঙ্কিমচন্দ্রের উপর খুশি ছিলেন না। ফলে ১২৮০ শ্রাবণ সঙ্খ্যার বঙ্গামিহিরে 'বহুবিবাহ' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র আক্রান্ত হলেন। অথচ আক্রমণের পক্ষে কোনো স্পষ্ট যুক্তি ছিল না।

ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত সম্পাদিত 'তমোলুক পত্রিকা' বঙ্গাদর্শন ১২৮০ অগ্রহায়ণ সঙ্খ্যায় সাধারণভাবে প্রশংসিত হয়। কিন্তু এই পত্রিকা বঙ্কিমচন্দ্রের উপরে বিরূপ ছিল। দুটি উদাহরণ থেকে তার ধরন স্পষ্ট হবে। ১২৮১ শনে 'সমালোচনা' প্রবন্ধে লেখা হয়েছে, যে এক শ্রেণীর বাঙলা সাময়িকপত্রে সমালোচ্য বই সম্বন্ধে 'এই খানি বটতলার পুস্তক' বা 'পুস্তক খানি না ছাপাইলেই ভাল হইত, জাতীয় নিন্দা থাকে। 'যদ্যাপি বাঙ্গালা ভাষার প্রতি আমাদিগের নব্যযুবক সম্প্রদায়ের তাদৃশ স্নেহ থাকিত তাহা হইলে এত দিন মাতৃভাষার দুরবস্থা দূর হইত এবঙ আমাদিগের সুবিখ্যাত নভেল লেখকের উত্কৃষ্ট গ্রন্থখানি ৩৫ টাকা কমিসনে বিক্রয় করিতে হইত না।" ১২৮২ জ্যৈষ্ঠ সঙ্খ্যায় 'হরেক রকম' রচনায় আছে—"দুর্গেশনন্দিনী নভেল।—অতি উত্কৃষ্ট নির্ভুল—ব্যাকরণদোষ লেশমাত্রও নাই—বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিবার শ্রেষ্ঠ আদর্শ,—কারণ, ইহাতে ইঙরাজীর গন্ধও নাই। আর এতত্ প্রণেতার এখানি স্বকপোল-সম্ভূত, কেন না, ইঙরাজী বইতে এক আনা অনুবাদ ও ভাবগ্রহণ করিলে, তিনি অবশ্য ইহার ভূমিকায় তাহা স্বীকার করিতেন। অতএব 'দুর্গেশনন্দিনী' গ্রন্থকর্তার মানসাকাশের নিষ্কলঙ্ক পূর্ণশশী!' ১২৮২ জ্যৈষ্ঠ সঙ্খ্যার 'প্রতিবিম্ব' মাসিকপত্রে 'বঙ্গাদর্শন ও বৃত্রসঙহার' প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য হল—(ক) কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির 'শুদ্ধ পুস্তকের নাম শুনিয়া লোকের নিকট উহার গল্প শ্রবণে' বঙ্গাদর্শন তাঁদের সমালোচনা করে ; (খ) বঙ্গাদর্শন একটি সঙবাদপত্র ; (গ) সম্পাদক বাঙলা জানেন না ; এবঙ (ঘ) বঙ্গাদর্শনের 'প্রবন্ধগুলি প্রায় অনুবাদ'। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১) সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকবার সশ্রদ্ধ মন্তব্য করেছেন, তাঁর সভাতেও উপস্থিত থেকেছেন, কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের আলোচনায় তাঁর নামোল্লেখ করেননি। এর একটি কারণ, সাহিত্যের গণ্ডী বঙ্কিমচন্দ্র এখনকার তুলনায় ছোট করে দেখেছিলেন। অন্য একটি সম্ভাব্য কারণ, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আঙশিক তিক্ততার সময় তিনি রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছিলেন। রাজেন্দ্রলাল ও বিদ্যাসাগর পরস্পরের প্রতিকূল, অথচ দুজনেই যথেষ্ট খ্যাতিমান ও প্রতিপত্তিশালী। রাজেন্দ্রলাল কখনো বঙ্কিমচন্দ্রের উল্লেখ করেননি। তাঁদের সম্পর্ক যথেষ্ট হার্দ্য ছিল কি

না, সন্দেহজনক। 'রহস্য সন্দর্ভ' পত্রের সম্পাদক ছিলেন রাজেন্দ্রলাল, এবঙ সহকারী সম্পাদক ছিলেন প্রাণনাথ দত্ত (১৮৪০-১৮৮৮)। হাটখোলার দত্ত পরিবারের সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী প্রাণনাথ ছিলেন রাজেন্দ্রলালের প্রথম পক্ষের শ্যালক। প্রবন্ধ সাধারণত প্রাণনাথ লিখতেন, এবঙ তিনি ছিলেন প্রকৃত সম্পাদক। প্রাণনাথের সঙ্গে 'অমৃতবাজারে'র শিশিরকুমার ঘোষের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। শিশিরকুমারের 'ইন্ডিয়ান লিগে'র সহায়তা করেছেন প্রাণনাথ ও রাজেন্দ্রলাল। প্রাণনাথের খুড়তুতো ভাই গিরীন্দ্রকুমার দত্ত (১৮৪০-?) সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী, চিত্রকর ও ইন্ডিয়ান লিগের সমর্থক ছিলেন। গিরীন্দ্রকুমারকে সহকারী হিসাবে নিয়ে প্রাণনাথ 'বসন্তক' নামে একটি সচিত্র মাসিকপত্র সম্পাদনা করে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে দু বছর প্রকাশ করেন। বসন্তক কার্টুন ছবির জন্য খ্যাতি পেয়েছিল : কার্টুন আঁকতেন গিরীন্দ্রকুমার। প্রকাশক হরি সিঙহ ছিলেন প্রাণনাথের জমাদার। কাগজটি গরাণহাটায় ছাপা হত। শিশিরকুমারের সান্নিধ্য 'বসন্তক'কে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধবাদী করে তুলেছিল। বসন্তকের আবির্ভাব তাঁর চিহ্ন বহন করেছে। একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য।

বহরমপুর কলেজের সিভিল সার্ভিস ক্লাসের একজন ছাত্র ১৮৭৩ আগস্টে ওখানকার মিলিটারি ম্যাগাজিনের সামনে দিয়ে একদিন ঘোড়ায় চড়ে যাবার সময় Colonel Duffin-এর আদেশে তাকে বন্দী করা হয়। পরে কলেজের অধ্যক্ষের অনুরোধে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। অধ্যক্ষ জেলা-শাসককে একথা জানাবেন এবঙ ছাত্রটি মামলা করবে, এমন পরিকল্পনা ছিল। তার কয়েক মাস পরে একদিন যখন বঙ্কিমচন্দ্র ঐ জায়গা দিয়ে পাল্কিতে যাচ্ছিলেন, তখন কয়েকজন শাহেবের সঙ্গে ডাফিন সেখানে ক্রিকেট খেলছিলেন। তিনি ধাক্কা দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে ওখান থেকে সরিয়ে দেন। অপমানিত বঙ্কিমচন্দ্র আদালতে ডাফিনের বিরুদ্ধে মামলা করলে নিরুপায় ডাফিন বাধ্য হয়ে প্রকাশ্য আদালতে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন এবঙ মামলা মিটে যায়। এই কাহিনী ১৮৭৪ জানুয়ারিতে *Friend of India, Bengal Times, Indian Observer, Bengalee,* গ্রামবার্তা প্রকাশিকা, এডুকেশন গেজেট প্রভৃতি বহু সঙবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এদের বর্ণনাগুলি পরস্পরের সঙ্গে অভিন্ন। যেমন—২৪.১.১৮৭৪ তারিখে *Indian Observer* লেখে—'We learn that Lieutenant-Colonel Duffin, of Berhampore, who assaulted Baboo Bankim Chandra Chatterjee when he was passing in a *palki* across a cricket ground where the former was playing with some friends has apologised to the Baboo. The criminal case against the Lieutenant-Colonel has therefore been withdrawn.'

১১ই মাঘ ১২৮০ (২৩.১.১৮৭৪) তারিখ 'এডুকেশন গেজেট' লেখে যে বঙ্কিমচন্দ্র খেলার জায়গায় পাল্কি করে যাবার সময় ডাফিন ধাক্কা দিয়ে তাঁর অপমান করেন। 'ঐ ব্যক্তি বঙ্কিমবাবুকে না জানিয়াই ঐরূপ ঔদ্ধত্যের কার্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ কর্ণেল সাহেব প্রকাশ্য আদালতে বঙ্কিমবাবুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন।' বসন্তকের প্রথম

সঙ্খ্যা ৩১.১.১৮৭৪ তারিখে প্রকাশিত হয়। তাতে এই ঘটনার বর্ণনায় লেখা হয়--'আমরা শুনি যে ডাফিন সাহেব বঙ্কিমবাবুকে যে চপেটাঘাত করেন, তাহাতে সাহেবের হাতে যে বেদনা লাগে এবঙ তিনি মারিবার সময়ে অস্পৃশ্য বাঙ্গালিকে স্পর্শ করিয়া যে গ্লানি সহ্য করেন ও বঙ্কিমবাবু ডাফিন সাহেবের নামে রাজ বিচারালয়ে অভিযোগ করিয়া যে বেয়াদবী করেন, তন্নিমিত্ত তিনি সহস্র সহস্র ব্যক্তির সম্মুখে গললগ্নী-কৃতবাসা হইয়া শূন্য পায়ে যোড় হস্তে ডফিন সাহেবের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করেন, কিন্তু বঙ্কিমবাবুর আত্মীয় স্বজনে বলেন, তাহা নয়, সাহেব প্রকাশ্যবূপে বঙ্কিমবাবুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। ইহার কোনটী সত্য, তাহা আমরা জানি না।' বলা বাহুল্য, এই বর্ণনা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে বিকৃত। উদ্দেশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের নিন্দা। নিন্দার কারণ সম্ভবত শিশিরকুমারের প্রভাব। বঙ্গাদর্শনের দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ বর্ষের স্বত্বাধিকারী ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, কেবল একটি সঙ্খ্যা ছাড়া। তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সঙ্খ্যা অর্থাত্ ১২৮১ জ্যৈষ্ঠ সঙ্খ্যার স্বত্বাধিকারী ছিলেন ৩৩৬ নম্বর চিত্পুর রোডের হরি সিঙহ। ইনি ছিলেন প্রাণনাথের জমাদার। এর অব্যবহিত পূর্বে ও পরে যখন বঙ্গাদর্শনের ১৭০০/১৮০০ কপি ছাপা হত, তখন এই সঙ্খ্যাটির মাত্র ১০০০ কপি ছাপা হয়। প্রসঙ্গাত লক্ষণীয়, 'বসন্তকে'র পূর্বোক্ত সঙ্খ্যার কয়েকদিন পরে ৫.২.১৮৭৪ তারিখে বঙ্গাদর্শনের সঙ্খ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই ঘটনার কারণ অজ্ঞাত। এমন হতে পারে, যে বঙ্কিমচন্দ্র নিন্দা--প্রচারেব হাত থেকে রক্ষা পেতে সাময়িকভাবে বঙ্গাদর্শনের স্বত্ব ত্যাগ করেন। অবশ্য তা সাময়িক ছিল, এবঙ নিন্দা চলতে থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাইপো লিখেছেন--'বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গাদর্শনে এই নাটকখানির কিছু তীব্র সমালোচনা করিযাছিলেন। যিনি নাটক লিখিয়াছিলেন..বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা তাঁহার প্রীতিকর হইল না।.তাহাকে গালি দিবার অভিপ্রায়ে তিনি এক আত্মীয়ের শরণাগত হইলেন। এই আত্মীয়ের একখানি কাগজ ছিল। কাগজের নাম--'বসন্তক'।..বসন্তক--সম্পাদক রোরুদ্যমান আত্মীয়ের চোখের জল মুছাইয়া 'বসন্তকে' এক ছবি বাহির করিলেন।' 'বসন্তক' বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে দু বছরে লেখায় ও ছবিতে অন্তত পাঁচটি ব্যঙ্গারচনা প্রকাশ করে। তাদের পরিচয় এই--

১। প্রথম বর্ষ, ষষ্ঠ সঙ্খ্যা, প. ৯০-৯১। ১২৮১ বৈশাখে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ভ্রমর' মাসিকপত্র নৈহাটির বঙ্গাদর্শন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। সেই বিষয়ে লেখা হয়েছে--'এতদিনে বুড় থুবড়ী পাড়াকুঁদলী' 'বঙ্গাদর্শনী'র একটি ভ্রমর যুটেছে। মাগী বৃদ্ধ বয়সে নাগর পেয়ে পুরাতন রস রসিকতা যা ছিল বার কোরে বোসেছে।'

২। প্রথম বর্ষ, সপ্তম সঙ্খ্যায় 'হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী' নামে কথোপকথনে লেখা একটি ব্যঙ্গারচনায় স্পষ্টভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের নিন্দা করা হয়েছে। উপলক্ষ সম্ভবত বঙ্গাদর্শন ১২৮০ ভাদ্র ও আশ্বিনে প্রকাশিত 'প্রাচীন ও আধুনিক ভারতবর্ষ' প্রবন্ধ, যা পরে 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' নামে গ্রন্থিত হয়েছে। তার স্থানবিশেষে

ইঙরাজশাসনেব প্রশঙসা থাকায় বসন্তক এই কথা দিয়ে সমাপ্তি টেনেছে--'তিনি [বঙ্কিমচন্দ্র] পরকালের ভরসা মানেন, দেশের লোকের উপর তাঁহার ভরসা নাই, তিনি তাহা রাখিতেও চান না, এক বঙ্গদর্শনের ভরসা এইরূপ দুচার বার বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশ করিলে তাও বড় আর থাকিবে না, তবে এক ভরসা--যদি ৬০০ টাকার স্থলে ৭০০ টাকা [মাহিনা] হয়।'

৩। প্রথম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যায় The Bull and the Frog ছবি।

৪। দ্বিতীয় বর্ষ, নবম সংখ্যায় 'নসিরাম মেলা' নামের রচনায় একটি বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মৌখিক পরীক্ষার বর্ণনা থেকে অঙশবিশেষ উদ্ধারযোগ্য।

'প্রশ্ন--সর্বোত্কৃষ্ট বাঙলা পুস্তক কোন্ খানি?

বালিকা--দুর্গেশনন্দিনী।

পন্ডিতনী প্রথম বালিকাটির কর্ণে কর্ণে কহিল, 'না না বেতাল পঞ্চবিঙশতি, আর সীতার বনবাস'।'

তার পরে--

'১ম বালিকা--সলজ্জভাবে 'বিদ্যাসুন্দর'। সকল বালিকা--ছি ছি! ওমা তুই বিদ্যাসুন্দর পোড়েছিস, কি লজ্জার কথা! বঙ্কিমবাবু বলেছে সে অশ্লীল পুস্তক, তা কি পোড়তে আছে?

১ম বালিকা--ছি ছি আবার কি? পড়তে দোষ কি? আর তোমরা বেতাল পঞ্চবিঙশতি পড়েছ, দুর্গেশনন্দিনী পড়েছ, সে যে বিদ্যাসুন্দরের ঠান্দিদী।'

তখন কলকাতায় যে অশ্লীলতা নিবারণী সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র তার সমর্থক ছিলেন। বসন্তক ঐ কাজকে বারবার বিদ্রূপ করেছে। এই রচনায় ১০৯ পৃষ্ঠার মুখোমুখি ব্যঙ্গচিত্রে এক সুবেশা মহিলা 'দুর্গেশনন্দিনী' পড়ছেন, এবঙ পাশের ঘরে তাব স্বামী উনুন ধরাচ্ছেন।

৫। দ্বিতীয় বর্ষ, দশম সঙখ্যায় আছে--

'কাসারীদের সঙের গীত।'
'অশ্লীলতা শব্দ মোরা
আগে শুনি নাই;
এর বিদ্যাসাগর জন্মদাতা,
বঙ্গদর্শন এর নেতা।' ইত্যাদি।

বসন্তক ষাঁড় ও ব্যাঙের ছবির দুমাস আগে থেকে এক বছর পর পর্যন্ত অনেকবার বঙ্কিমচন্দ্রকে ব্যঙ্গ করেছে। ঐ ব্যঙ্গচিত্রসহ তাদের কয়েকটি রচনা নোঙরা ব্যক্তিগত আক্রমণ মাত্র। প্রসঙ্গত বঙ্গদর্শনের দুটি পুস্তক সমালোচনা লক্ষণীয়।

(ক) গিরীন্দ্রকুমার দত্তের গজপতি রায় ছদ্মনামে লেখা 'ঐতিহাসিক নবন্যাস' বঙ্গদর্শন ১২৭৯ ফাল্গুন সঙখ্যায় সমালোচিত হয়। তাতে বইটির বিস্তৃত আলোচনা করে প্রচুর দোষত্রুটি দেখানো হয়।

(খ) শিশিরকুমার ঘোষের বেনামি রচনা 'নয়শো রুপেয়া' বঙ্গদর্শন ১২৮০ বৈশাখ সঙখ্যায় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়। শিশিরকুমার এঁদের ঘনিষ্ঠ ছিলেন বলে এই কাগজটিকেও বঙ্কিম-নিন্দার বাহন করে থাকতে পারেন। যেহেতু রাজেন্দ্রলাল ও শিশিরকুমার বিদ্যাসাগরের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না, সেজন্য উপরের চতুর্থ ও পঞ্চম উদাহরণে 'বসন্তকে'র মনোভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রকে একত্রে আক্রমণ করা হয়েছে। ওঁদের দুজনের বিরোধ হলে কেবল বঙ্কিমচন্দ্র আক্রান্ত।

১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (১৮৬২-?) লেখা ৮৮ প্রিষ্ঠার নাটক 'বিধবার দাঁতে মিশি'র প্রথম সঙস্করণ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। সেকেলে ধরনে লেখা এই সাধারণ মানের রচনাটিতে যুবকদের মদ্যাসক্তি ও বেশ্যাসক্তিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। জমিদারের বখাটে ভাইপো বরদাকান্ত রায়ের বন্ধু উডুম্বর চট্টোপাধ্যায় নাটকে একেবারে অপ্রয়োজনে এসেছে, যেমন দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'তে ঘটিরাম ডেপুটিকে উপস্থিত করা হয়েছিল শুধু হাসাবার জন্য। উডুম্বর প্রায়-যুবক, মদ্যাসক্ত, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও গ্রন্থকার। উডুম্বর যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিরূপ ২ থেকে ১৩ প্রিষ্ঠায় তা স্পষ্ট। যেমন—

'গোরা। আর একবার বল, দোহাই ইন্ডিয়ান স্কট।

উডু। আমি তোমার কি করেছি, তা একশবারি তামাসা কোচ্চ?

গোরা। আজকাল তুমি কল্পনা কামিনীর সঙ্গে প্রেম কোরে, বঙ্গভাষারূপ বীর্য দ্বারা যে সব ছেলে মেয়ে উত্পাদন কোচ্চো, তাতে আমি কেন?—ইন্ডিয়ার সকলেইত তোমাকে ইন্ডিয়ান ওয়াল্টার স্কট বোলে সম্ভাষণ কোচ্চে।'

এই নাটকে বঙ্কিমচন্দ্রকে ব্যঙ্গ করা হলেও এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার অনুকরণ করা হয়েছে। 'মৃণালিনী' (১৮৬৯) উপন্যাসের তৃতীয় খন্ড, প্রথম পরিচ্ছেদে রত্নময়ী ও গিরিজায়ার কথোপকথনের একটি অঙশ এরূপ—

'গি। কি সই?

র। তুমি কোথায় সই?

গি। বিছানাসই।

র। উঠ না সই।'

গোপালচন্দ্রের নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কে (প. ১৯) হেমাঙ্গিনী ও যামিনীর কথোপকথনে উপরের রচনাঙশের অনুকৃতি, আছে। যেমন—

'যামিনী। একলা বসে কি ভাবছ সই?

হেমা। আজ সই হব জলসই।

যামি। যমরাজ দিয়েছে না কি সই?

হেমা। নাই বা দিলে ক্ষতি তাতে কই?'

গোপালচন্দ্র পরে আরও নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি লিখেছেন এবঙ সঙবাদপত্র-সম্পাদনা করেছেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে আর কখনো ব্যঙ্গ করেননি। তাঁদের দুজনের

ব্যক্তিগত পরিচয়ও ছিল না। তখনকার বঙ্কিম-নিন্দার প্রবল স্রোতে তিনি গা ভাসিয়েছিলেন। পরে গোপালচন্দ্র যখন 'সঙবাদ প্রভাকরের' সম্পাদনা করেন, তখন ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাসংকলন বঙ্কিমচন্দ্রকে দিয়ে সম্পাদনা করাতে চান। এই উদ্দেশ্যে ঈশ্বর গুপ্তের ছোট ভাই রামচন্দ্রের জামাই গোঁসাইদাস গুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে তিনি ভবানি দত্ত লেনে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করেন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে আলাপের পর বঙ্কিমচন্দ্র কবিতা নির্বাচন ও সম্পাদনা করতে সম্মত হন। তাঁর অপ্রকাশিত 'স্মৃতিকথা'য় গোপালচন্দ্র লিখেছেন—'একঘন্টাকাল এই আলাপের পর আমরা প্রীতচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিলাম।' বঙ্কিমচন্দ্র নিন্দাকারীর প্রতি কিছুমাত্র বিরক্তি দেখাননি, বরঙ নিন্দুকই ব্যক্তিগত পরিচয়ের পর নিজের মনোভাব একেবারে পরিবর্তন করেছেন। এমনকি পরবর্তী ঘনিষ্ঠতার পরে তিনি হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত করেন। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাসঙগ্রহ দু খন্ডে ১২৯২ ও ১২৯৩ শনে প্রকাশিত হয় : প্রথম খন্ডের সম্পাদক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিতীয় খন্ডের সম্পাদক গোপালচন্দ্র। প্রথম খন্ডে বঙ্কিমচন্দ্র 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' নামে যে দীর্ঘ জীবনী লেখেন, তাতে আছে—'এই সঙগ্রহের জন্য বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ই পাঠকের ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার উদ্যোগ ও পরিশ্রম ও যত্নেই ইহা সম্পন্ন হইয়াছে।..গোপালবাবু নিজে সুলেখক, এবঙ বাঙ্গালা সাহিত্যসঙসারে সুপরিচিত।'

'বিধবার দাঁতে মিশি'র কয়েক বছর পরে ৬.৫.১৮৭৯ তারিখে দন্ডধারী শর্মা লিখিত ৫৯ পৃষ্ঠার 'পাঁচালী নাটক' কলকাতার শ্রীনাথ দাস লেনের প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করেন। নিচু মানের এই নাটকটির কাহিনী সামান্য। পাঁচালী নামে নায়িকা পরপর দুটি বিয়ে করে, দুই স্বামীই নিরুদ্দেশ হয় এবঙ শেষে সে বিলাপ করে। বইটি সমালোচকদের প্রতি উত্সর্গ করা হয়েছে, বিশেষ করে 'নানকিন' নামে সমালোচকের প্রতি, যিনি পূর্বে বঙ্গদর্শনের সম্পাদক ছিলেন—অর্থাত্ বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা এবঙ তাঁর বিষবৃক্ষ, কমলাকান্তের দপ্তর ও মৃণালিনী এখানে আক্রান্ত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা বিশেষভাবে এই আক্রমণের কারণ।

ভবানিপুরে ৪৮ নম্বর বলরাম বসু ঘাট রোডের কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬১-১৯০৭) সঙস্কৃত কলেজের দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের কাছে সঙস্কৃত পড়ে 'কাব্যবিশারদ' উপাধি লাভ করেন। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে সোমপ্রকাশ ভবানিপুরে স্থানান্তরিত হবার পর থেকে ১৮৭৯ পর্যন্ত তিনি ঐ কাগজের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। এই সূত্রে শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে তাঁর যেমন ঘনিষ্ঠতা হয়, তেমনি 'অমৃতবাজারে'র শিশিরকুমার ঘোষের সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল। অথচ শিবনাথ Indian Association ও শিশিরকুমার Indian Legue দলের, যারা পরস্পর বিবদমান। কালীপ্রসন্ন দু দলেই থেকে বিবাদে ইন্ধন যুগিয়েছেন। শিবনাথ লিখেছেন—'সঙস্কৃত কলেজের ছাত্র ও আমার সুপরিচিত এক ব্যক্তিকে তখন আমার সহকারীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার সহকারী মধ্যে মধ্যে অমৃতবাজার আপিসে

যাইতেন। একদিন তিনি আমাকে বলিলেন, 'আজ শিশির ঘোষের অনুরোধে একটা খারাপ কাজ করে এলাম। ইন্ডিয়ান লীগের এক মিটিঙ-এ হাত তুলে আনন্দমোহন বসু ও মনোমোহন ঘোষকে পরাস্ত করে এলাম।' আমি বললাম, 'সে কি? তুমি তো লীগের মেম্বর নও'। তিনি বলিলেন, 'তাইতে তো বলছি, খারাপ কাজ করে এলাম।'

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে এই দুটি কাগজের দলই বিরূপ ছিল। ফলে, কালীপ্রসন্ন তাঁকে ব্যঙ্গ করে বই ছাপলেন। কালীপ্রসন্নের প্রবণতা ছিল এমন আক্রমণের প্রতি। তার উদাহরণ তাঁর তিনটি বেনামি বই। ফকিরচাঁদ বাবাজী—বঙ্গীয় সমালোচক (২১.৫.১৮৮০; প. ১৮)। এতে বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। ফকিরচাঁদ বাবাজী—অবতার (১০.১০.১৮৮১; প. ২০)। এই প্রহসনের লক্ষ্য কেশবচন্দ্র সেন। রাহু—মিঠেকড়া (১৭.৪.১৮৮৮ ; প. ২)। রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্যকে এখানে আক্রমণ করা হয়েছে। আবার, Anti-Christian নামে কালীপ্রসন্ন কিছুদিন যে ইঙরাজি কাগজে পরিচালনা করতেন, তাতে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ইঙলন্ডের পজিটিভস্টদের নেতা রিচার্ড কঙগ্রিভের (১৮১৮-১৮৯৯) বক্তব্যকে বিকৃত করে ছাপায় কঙগ্রিভসহ বাঙ্গালি ধ্রুববাদীরা অসন্তুষ্ট হন। তাঁদের চাপের কাছে কালীপ্রসন্ন শেষ পর্যন্ত নতিস্বীকার করেন। উইলিয়ম হেস্টির বিরুদ্ধে তিনি *Tit for Tat* নামে একটি পুস্তিকা লিখেছিলেন।

অর্থাত্ কালীপ্রসন্ন আক্রমণ করে কবিতা প্রভৃতি লিখতে ভালবাসতেন এবঙ বিখ্যাত ব্যক্তিদের ব্যঙ্গ করে লিখতেন। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'পঞ্চানন্দ' নামে ব্যঙ্গ-পত্রে তিনি যে কবিতা লেখেন তা সঙ্কলন করে যৌবনে 'বঙ্গীয় সমালোচক' নামে ১৮ পৃষ্ঠার ছোট্ট কাব্য ভবানিপুরের সুধাকর প্রেস থেকে ছেপে উমেশচন্দ্র নন্দী প্রকাশ করেন। তার অঙশবিশেষ এরূপ—

কাঁঠাল গাছের কাছে বানর বসিয়া আছে
[বসে কি দাঁড়ায়ে কেবা করিবে নির্ণয়?]
কি বাহার মরে যাই। চরণে পাদুকা নাই
চাপকানে অঙ্গ ঢাকা দেখে দুঃখ হয়।

অথবা,

হে বঙ্গ দর্শন কর বঙ্কিম বানর,
[যশের নিশান ধরি শীর্ষের উপর]
হে বঙ্গের আশা ভূমি, ভেবোনা ভেবোনা তুমি
আপনারে অদ্বিতীয় ; তব সম আর
শাখা মৃগ অবতঙশ দেখেনি সঙসার।
কাঁঠাল তলায় বসি, বঙ্গের গৌরব শশী
কি ভাবিছ মনে মনে? দৃষ্টান্তে তোমার
হয়েছে এ বঙ্গদেশে সুরস সঞ্চার।

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদও প্রথম যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্রকে ব্যঙ্গ করেন। দুজনেই পরিণত বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্ত হয়ে ওঠেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কালীপ্রসন্নের কখনো ব্যক্তিগত পরিচয় হবার নিদর্শন নেই। কালীপ্রসন্নেব ক্ষেত্রে বঙ্কিম-বিরোধিতায় সোমপ্রকাশ ও শিশিরকুমারের প্ররোচনা থাকা অস্বাভাবিক নয়। 'বঙ্গীয় সমালোচক' কাব্যে তিনি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কেও ব্যঙ্গ করেন, অথচ তাঁর লেখা 'মাইকেল ও হেমচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত' নামে ২০ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা ১৪.১০.১৯০০ তারিখে প্রকাশিত হয়। ১০.১১.১৯০৫ তারিখে প্রকাশিত তাঁর সম্পাদিত স্বদেশী সঙ্গীত' নামে ছোট বইতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমতরম্' গানটি সঙ্কলিত হয়। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত রচনা ছেপে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বসুমতী কার্যালয়ের উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আগেই সে স্বত্ব কিনে নেওয়ায়, কালীপ্রসন্ন বেনামে চন্দননগর থেকে তা ছাপেন এবঙ নিজের সম্পাদিত 'হিতবাদী' কাগজে তার বিজ্ঞাপন দেন। শেষ পর্যন্ত মামলায় জড়িয়ে পড়ে তিনি ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হন।

এই পরবর্তী ঘটনাগুলি বোঝায়, যে কালীপ্রসন্ন পরিণত বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ ছিলেন। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র দে প্রভৃতির পরিণতিও অনুরূপ। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরে ভবানিপুর কটেজ লাইব্রেরির উদ্যোগে সাউথ সাবার্বন স্কুলে ৩.৫.১৮৯৪ তারিখে সন্ধ্যায় যে বঙ্কিম-স্মরণসভা হয় তাতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতির সঙ্গে কালীপ্রসন্নও বক্তৃতা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে তিনি ব্যঙ্গ করায় সম্ভবত দোষ লাঘবের জন্য ভবানিপুরের ৪৮/৪৯ নম্বর বলরাম বসু ঘাট রোডের রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পরে 'প্রলাপ' নামে একটি ছোট্র কাব্য রচনা ও প্রকাশ করেন। রামলাল তাঁর আত্মীয় হতে পারেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রশঙসা করে লেখা কাব্যটি বঙ্কিমচন্দ্রকে উত্সর্গ করা হয়েছিল। 'বঙ্গাদর্শন' প্রকাশের—বিশেষত তাতে গ্রন্থসমালোচনা প্রকাশের—পর থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি বাঙ্গালি লেখকদের, বিশেষত বিভিন্ন সাময়িকপত্র ও সঙবাদপত্রের সম্পাদকদের আক্রমণ তীব্র হয় ও সঙ্খ্যায় বেড়ে যায়। বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরে লেখকবিশেষের বিরুদ্ধে কলম না ধরলেও মনে আঘাত পেয়ে কিছু সাধারণ মন্তব্য করেছিলেন। যেমন—(ক) 'এটি একখানি পুস্তক লিখিয়াছে, একটু রস দাও,—সেটি পেটের দায়ের একখানি সম্বাদ-পত্র করিয়াছে, উহাকেও একটু রস দাও।'

(খ) 'গোরুও যেমন উপকারী, নব্য বাঙ্গালিও সেইরূপ। ইহারা সম্বাদপত্ররূপ ভান্ড ভান্ড সুস্বাদু দুগ্ধ দিতেছে।'

(গ) 'বাঙ্গালিরা যে ইঙরেজি শিখে, ইহাতে সকলেরই উত্সাহ। কিন্তু ইহার ফল কি, তাহার সমালোচনা কেবল আজিকালি হইতেছে।..দুই একটি ফল সুপক্ক এবঙ সুমধুর বটে, কিন্তু অধিকাঙশ তিক্ত ও বিষময়, উদাহরণ—মাতালের দল এবঙ সাধারণ বাঙ্গালি লেখকের পাল।'

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলা সাময়িকপত্র ও সঙবাদপত্রগুলির উপর বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ইঙরাজি কাগজ কিনতেন, বাঙলা নয়। বাঙলা কাগজগুলি সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যও তীব্র হয়ে উঠেছিল। যেমন—'I believe that the influence of the vernacular press is, on the whole, rather for evil than for good. The amount of shallow and erroneous notions which it helps to spread is almost incredible. The wholesale propagation of false, mischevious notions must be an unmitigated evil, which more than balances the good done in other respects. Much of the general feeling of distrust towards the Government, which has often been the subject of comment, is due to the action of the native press. Yet, however hostile and hypocritical in its tone, the vernacular press is loyal to the Government in its spirit.'

উল্লেখ ঃ

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্কিম-জীবনী।

(দ. চতুর্থ সংস্করণের সম্পাদক অলোক রায় ও অশোক উপাধ্যায় লিখিত 'প্রাসঙ্গিক তথ্য'।)

অলকরঞ্জন বসুচৌধুরি—'বাঙ্গালির বঙ্কিমচর্চার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান', কৌরব : জানুয়ারি

সৌম্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত—'বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গাদেশের কৃষক : উত্সের সন্ধানে', অনীক : ফেব্রুয়ারি-মার্চ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি

No. 655.

From Babu Bunkim Chunder Chatterjee
Dy Magte and Dy Collector
To The Offg. Magte and Collector of Moorshedabad
Behrampore dated the 25th Sept/73.

Sir,

With reference to you endorsement on the Govt. Cir. No. 32 dated the 10th September/73, I have the honor to report that I do not edit any *newspaper* to which alone these rules appear to have any reference.

2. The *Banga Darsan,* which I edit is a Vernacular monthly magazine of a purely literary and scientific character and is as little of a newspaper as Cornhill or Macmillan.

3. Nevertheless as it is possible that by the word newspaper all periodical publications whatever may have been intended, I request the favor of your obtaining the permission of Govt. towards my continuing to edit the Magazine.

I have &c.
B. C. Chatterjee
Dy Collr and Dy. Magte.

ভারত সরকার একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে জানান—

No officer in the service of Government is permitted without the previous sanction in writing of the Government under which he immediately serves to become the Proprietor either in whole or in part, of any Newspaper or periodical publication or to edit or manage any such Newspaper or Publication. Such sanction will only be given in the case of Newspaper or Publication mainly devoted to the discussion of topics not of a political character, such for instance as Art, Science or literature. The sanction will be liable to be withdrawn at the discretion of the Government.

তার পূর্ব থেকে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করছিলেন। সরকারি কর্মচারী হিশাবে বঙ্কিমচন্দ্র অনুমতি পাবার জন্য উপরের দরখাস্ত করেন। ১.১১.১৮৭৩ তারিখে সরকারি অনুবাদক জন রবিন্সন রিপোর্ট দেবার পর ১২.১১.১৮৭৩ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুমতি দেওয়া হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র ও শিবনাথ শাস্ত্রী

১

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫.৩.১৮৬৪ তারিখে খুলনা থেকে বারুইপুরে বদলির আদেশ পান,[১] কদিন পরে চার্জ বুঝিয়ে দেন,[২] এবঙ ১৫.৪.১৮৬৪ তারিখে বারুইপুরে কাজে যোগ দেন।[৩] কদিন পরে ২৫.৪.১৮৬৪ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' সঙবাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্র ও কর্মকুশলতার প্রশঙসা আছে।[৪]

সামুদ্রিক বিক্ষোভে ৫.১০.১৮৬৪ তারিখে প্রচন্ড ঝড়, বৃষ্টি ও বন্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা ক্ষতিগ্রস্ত হলে বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুর ও ডায়মন্ড হারবারের রিলিফের কাজ পরিচালনা করেছিলেন। মজিলপুরের কালীনাথ দত্ত তার সপ্রশঙস বর্ণনা করেছেন।[৫] শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিতে'র চতুর্থ পরিচ্ছেদের মাঝামাঝি ঐ ঝড়ের কথা আছে, কিন্তু বঙ্কিম-প্রসঙ্গ নেই। সোমপ্রকাশ ২৪.১০.১৮৬৪ ও ৩১.১০.১৮৬৪ ঝড়ের প্রসঙ্গে অনেক কথা লেখে,[৬] এবঙ ৫.১২.১৮৬৪ তারিখে বারুইপুর মহকুমার অঙশবিশেষ সদরের অধীন করার সরকারি প্রস্তাবে আপত্তি করে, কারণ তাতে সুশাসন বিঘ্নিত হবে।[৭] কোথাও বঙ্কিমচন্দ্রের কথা নেই। বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে সোমপ্রকাশ ও শিবনাথের নীরবতা সমান্তরাল এবঙ অর্থবহ। সোমপ্রকাশ ওখানে চাঙড়িপোতা গ্রাম থেকে প্রকাশিত হত, সম্পাদক ছিলেন সঙস্কৃত পন্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ এবঙ শিবনাথ ছিলেন তাঁর গুণমুগ্ধ বোনপো ও সহকারী।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে সোমপ্রকাশের আলোচনাগুলি বিরোধের দৃষ্টান্ত।[৮] ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের প্রথমে 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হলে ১৩.১.১২৭২ তারিখে সোমপ্রকাশ লেখে—'কয়েকটি স্থান অতিবর্ণন দোষে বিরস হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে পতত্প্রকর্ষতা দোষ ঘটিয়াছে। মধ্যে মধ্যে অশ্লীল ও গ্রাম্যতা দোষেরও বিন্দুপাত হইয়াছে। ভাষাটিও ললিত ও সর্বজন হৃদয়গ্রাহিণী হয় নাই।'

'কপালকুন্ডলা' ও 'মৃণালিনী' সোমপ্রকাশে আলোচিত হয়নি। ১২৭৯ বৈশাখে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্র প্রথম প্রকাশিত হলে ১১.১.১২৭৯ তারিখে সোমপ্রকাশ লেখে—

'..'বঙ্গদর্শন' কোনওকালে সহৃদয় সমাজে আদরণীয় হইতে পারিবে না।..

..বীজ অঙ্কুরিত না হইতেই কি তাহার ফল লক্ষ্য করিয়া আড়ম্বর করা বিধেয়? এরূপ করিলে বক্তার শূন্যহৃদয়তা প্রকাশ পায় না? বিষবৃক্ষের এরূপ গল্পবন্ধন প্রণালী নিরতিশয় অসহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিতেছে।..

'..'আমরা বড়লোক' 'ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল'..এরূপ সামান্য বিষয় অনেক বাঙ্গালা পত্রিকাতেও দৃষ্ট হইয়া থাকে।..

..বঙ্গদর্শনের স্থানে স্থানে যেরূপ ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, সাধারণ লোকেও তাহা প্রয়োগ করিতে লজ্জাবোধ করিয়া থাকে।

বঙ্গদর্শনের অনেক স্থলে উদাত্ত ও সমাসবহুল পদের সহিত সাধারণ ব্যবহার্য শব্দের

উল্লেখ করা হইয়াছে। এইরূপ ভঙ্গ প্রক্রমতা নিতান্ত দোষাবহ।..বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি সুলেখক বলিয়া যশোলাভ করিয়াছিলেন, আক্ষেপের বিষয় এক বঙ্গদর্শনের প্রান্তরে তাঁহাদিগের সেই কীর্ত্তি মলিন হইল।

বঙ্গদর্শনে অস্পষ্টতা প্রভৃতি আরও বিলক্ষণ দৃষ্ট হইল।..যিনি মনের কথা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে না পারেন, তাঁহার লেখনী ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র।..

যাহা হউক, বঙ্গদর্শনের অনেক স্থলে নিতান্ত কদর্য ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপ বাঙ্গালা প্রচার হইলে তাহার উন্নতি হওয়া সুদূরপরাহত।..'

১২৮০ শ্রাবণ সঙ্খ্যার বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে ২১.৪.১২৮০ তারিখে সোমপ্রকাশ লিখেছে—'বস্তুতঃ বঙ্কিম বাবু সময়ে সময়ে বাঙ্গালা গ্রন্থগুলিকে যেরূপ 'অপাঠ্য' বলিয়া নির্দেশ করেন, তাঁহার বিষবৃক্ষও সেইরূপ 'অপাঠ্য' হইয়াছে, সন্দেহ নাই।..এই শৈবলিনী চরিত্র আমাদের একান্ত রুচিবিকার জন্মাইয়া দিয়াছে।..এটী বঙ্কিমবাবুর অসহৃদয়তা ও উদ্ভাবনী-শক্তির ক্ষীণতার পরিচায়ক। ফলে বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস গ্রন্থন চাতুরী যে দিন দিন বিলুপ্ত হইতেছে, তাঁহার রচিত উপন্যাসগুলিই তাহার সাক্ষী স্বরূপ।' এবঙ

'বঙ্গদর্শনের যেরূপ মাহাত্ম্য!!! 'গর্দভ স্তোত্রটী' তাহার অনুরূপই হইয়াছে। গর্দভবুদ্ধি যখন যাহার ঘাড়ে চাপে সে সময়ে তিনি যে গর্দভবত্ ব্যবহার করেন তাহা আশ্চর্যের নহে। বঙ্গদর্শন গর্দভবুদ্ধি বিশিষ্ট হওয়াতেই গর্দভের স্তুতিবাদ করিয়াছেন। হিতচিকীর্ষু বন্ধুর মনোরঞ্জন না করা কৃতঘ্নের কার্য।..'

সোমপ্রকাশে বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে অন্যান্য আলোচনাও এই ধরনের। যেমন—

(১) 'চিঠিপত্র। বঙ্গদর্শন প্রসঙ্গে।' ৩. ৫. ১২৮০

(২) 'চিঠিপত্র। বঙ্গদর্শন প্রসঙ্গে।' ১০. ৫. ১২৮০

(৩) 'বঙ্গদর্শন হইতে বঙ্গসমাজের উপকার অথবা অপকার হইবার সম্ভাবনা? সোমপ্রকাশের মন্তব্য।' ২৪. ৫. ১২৮০

(৪) 'বঙ্গদর্শন এবঙ বাঙ্গালা গ্রন্থকার।' ১৪. ৪. ১২৮৫

(৫) 'বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।' ১৯. ৪. ১২৮৭

উপরের দ্বিতীয় চিঠিতে নিন্দার প্রতিবাদ থাকায় পরের রচনা তার প্রতিবাদে নিন্দায় উগ্রতর হয়ে উঠেছিল। এগুলি কখনো সম্পাদকীয় রচনা, কখনো অজ্ঞাতনামা লেখকের চিঠির আকারে ছাপা। কেবল শেষ রচনাটিতে যে চিঠি ও সম্পাদকীয় মন্তব্য ছাপা হয়েছে তা প্রশঙসাসূচক। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিবনাথ শাস্ত্রীর বিবরণ মেলালে দেখা যায়, বঙ্গদর্শনের নিন্দাগুলির সময় সোমপ্রকাশের ভার শিবনাথের হাতে ছিল, কিন্তু শেষ রচনাটির পূর্বে তা হস্তান্তরিত হয়েছিল।[৯] বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙগে দ্বারকানাথ-শিবনাথের 'সোমপ্রকাশে'র ভূমিকা ছিল বিরুদ্ধবাদীর।

বঙ্কিমচন্দ্র সোমপ্রকাশের বিরুদ্ধে কোনো লেখা ছাপেননি, কিন্তু তাঁর বন্ধু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছে ১৩. ৫. ১৮৭২ তারিখে একটি চিঠিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, 'My potbellied reviewer comes out strong under the disguise of an

anonymous correspondent as he did an previous occasions when he had to review my books.'[১০] অনুরূপ কারণে তিনি নবীনচন্দ্র সেনের কাছেও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন।[১১] তিনি লিখেছিলেন--'উচ্চশ্রেণীর দেশী সম্বাদপত্র মাত্রই বঙ্গদর্শনের অনুকূল ছিলেন, অধিকতর স্পর্ধার কথা এই যে, নিম্নশ্রেণীর সম্বাদপত্র মাত্রেই ইহার প্রতিকূলতা করিয়াছিলেন।'[১২] ভাল দেশি সংবাদপত্র হিশাবে তিনি অবজর্ভার, মিরার, হিন্দু পেট্রিয়ট, সহচর, ভারত সংস্কারক, এডুকেশন গেজেট, সাধারণী ও সাপ্তাহিক সমাচারের নাম করেছেন। সোমপ্রকাশ অনুপস্থিত।

২

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত[১৩] বঙ্কিমচন্দ্রের 'আকাঙ্ক্ষা' কবিতাটির পূর্ণ পাঠ এই—

[সুন্দরী]

১

কেন না হইলি তুই, যমুনার জল,
রে প্রাণ বল্লভ।
কিবা দিবা কিবা রাতি, কূলেতে আঁচল পাতি,
শুইতাম শুনিবারে, তোর মৃদুরব॥
রে প্রাণ বল্লভ!

২

কেন না হইলি তুই, যমুনাতরঙ্গ,
মোর শ্যামধন।
দিবারাত্রি জলে পশি, থাকিতাম কালো শশি,
করিবারে নিত্য তোর, নৃত্য দরশন॥
ওহে শ্যামধন!

৩

কেন না হইলি তুই, মলয় পবন,
ওহে ব্রজরাজ।
আমার অঞ্চল ধরি, সতত খেলিতে হরি,
নিশ্বাসে যাইতে মোর, হৃদয়ের মাঝ!!
ওহে ব্রজরাজ!

৪

কেন না হইলি তুই কানন কুসুম,
রাধা প্রেমাধার।
না ছুঁতেম অন্য ফুলে, বাঁধিতাম তোরে চুলে,
চিকণ গাঁথিয়া মালা, পরিতাম হার॥
মোর প্রাণাধার!

৫

কেন না হইলে তুমি, চাঁদের কিরণ,
ওহে হৃষীকেশ।
বাতায়নে বিষাদিনী, বসিত যবে গোপিনী,
বাতায়ন পথে তুমি, লভিতে প্রবেশ॥
আমার প্রাণেশ!

৬

কেন না হইলে তুমি, চিকণ বসন,
পীতাম্বর হরি।
নীলবাস তেয়াগিয়ে, তোমারে পরি কালিয়ে,
রাখিতাম যতন করে হৃদয় উপরি॥
পীতাম্বর হরি!

৭

কেন না হইলে শ্যাম, যেখানে যা আর,
সঙসারে সুন্দর।
ফিরাতেম আঁখি যথা দেখিতে পেতেম তথা
মনোহর এ সঙসারে, রাধামনোহর॥
শ্যামল সুন্দর!

[সুন্দর]

১

কেন না হইনু আমি, কপালের দোষে
যমুনার জল।
লইয়া কম কলসী, সে জল মাঝারে পশি,
হাসিয়া ফুটিত আসি, রাধিকা কমল।
যৌবনেতে ঢল ঢল॥

২

কেন না হইনু আমি, তোমার তরঙ্গ,
তপন নন্দিনি!
রাধিকা আসিলে জলে, নাচিয়া হিল্লোল ছলে,
দোলাতেম দেহ তার, নবীন নন্দিনী।
যমুনাজলহঙসিনী।

৩

কেন না হইনু আমি, তোর অনুরূপী,
মলয় পবন।
ভ্রমিতাম কুতূহলে, রাধার কুন্তল দলে,
কহিতাম কানে কানে প্রণয় বচন।
সে আমার প্রাণধন।

৪

কেন না হইনু হায়! কুসুমের দাম
কণ্ঠের ভূষণ
এক নিশা স্বর্গসুখে, বঞ্চিয়া রাধার বুকে,
ত্যজিতাম নিশি গেলে, জীবন যাতন—
মেখে শ্রীঅঙ্গে চন্দন॥

৫

কেন না হইনু আমি, চন্দ্রকরলেখা,
রাধার বরণ।
রাধার শরীরে থেকে, রাধারে ঢাকিয়ে রেখে,
ভুলাতেম রাধারূপে, অন্যজনমন—
পর ভুলান কেন?

৬

কেন না হইনু আমি, চিকণ বসন,
দেহ আবরণ।
তোমার অঙ্গেতে থেকে, অঙ্গের চন্দন মেখে,
অঞ্চল হইয়ে দুলে, ছুইয়ে চরণ—
চুম্বি ও চাঁদবদন॥

৭

কেন না হইনু আমি, যেখানে যা আছে,
সংসারে সুন্দর।
কেন না হতে অভিলাষে, রাধা যাহা ভাল বাসে?
কে মোহিতে নাহি চাহে, রাধার অন্তর—
প্রেম-সুখ রত্নাকর?

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কবিতাপুস্তক' (আগস্ট ১৮৭৮) বইতে এই কবিতাটির পাঠ অপরিবর্তিত আছে।[১৪]

৮. ৩. ১২৭৯ (=২১. ৬. ১৮৭২) তারিখে এডুকেশন গেজেটে 'শ্রীঃ' স্বাক্ষরিত একটি ছোট প্যারডি কবিতা ছাপা হয়। (প. ১৭০, স্ত. ১-২). যেমন—

উত্তর আকাঙ্ক্ষা

১

শ্যামতনু হবে, সখি, যমুনার জল!
নদী এত কি দুর্লভ?
সখি যমুনার জল, কি রব শুনাবে বল,
শুনেছে যে মুরারির মুরলী উত্‌সব,
তারে শুনাবে কি রব?

২

কি নৃত্য দেখাবে, সখি, যমুনা হিল্লোল?
বারি নাচিতে কি পারে?
নর্তন কাহারে বলে, শ্যামসাগরের জলে,
দেখ্ লো আসিয়া ঢেউ অপাঙ্গের ধারে!
বারি নাচিতে কি পারে?
ইত্যাদি।

নিন্দার সব ভার সোমপ্রকাশে না রেখে অন্যত্র তার ভাগ-বাঁটোয়ারা করলে উদ্দেশ্য সফলতর হয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায় সরকারিভাবে 'এডুকেশন গেজেটে'র সম্পাদক হলেও কাজের চাপে অন্যের উপর নির্ভর করতেন। শিবনাথের সঙ্গে এডুকেশন গেজেটের যোগাযোগ ছিল। তাঁর অনেক বাল্যরচনা ঐ সাপ্তাহিকে ছাপা হয়, এবঙ তিনি নবীনচন্দ্র সেনের কবিতাও সেখানে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।[১৫] এজন্য শিবনাথ ওই সাপ্তাহিকটি নির্বাচন করলেন।

এডুকেশন গেজেটের পূর্বোক্ত সঙ্খ্যায় 'প্রাপ্তপত্রে' পরে (প. ১৭৫ স্ত. ২ থেকে প. ১৭৬, স্ত. ১ পর্যন্ত) শিবনাথের যে চিঠি ছাপা হয়েছে তা সম্পূর্ণ উদ্ধারযোগ্য, কারণ এতদিন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত রচনাটি বর্তমান আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ।

'মান্যবর সম্পাদক মহাশয়!

অনেক দিন হইতে বাঙ্গলা সাহিত্যের নীতি সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। সাহিত্য সম্বন্ধে দেশের লোকের রুচি বিকৃত দেখিয়া বড় দুঃখিত হইয়াছি। বিজ্ঞান, ধর্মনীতি, ইতিহাস ও সকল লোকের প্রিয় নয়। কিন্তু অশ্লীল নাটক, কদর্য্য 'নভেল' এ সকল বাজারে পড়িতে পায় না। কে যে নাটক কিম্বা নভেল লেখে না, আমি ভাবিয়া পাই না। যার একটু লিখিবার ক্ষমতা আছে, এই দিকে ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছে।

এ কবিতার পক্ষেও ঠিক এইরূপ। যাহাকিছু সারগর্ভ, যাহাতে চিন্তা আবশ্যক করে, যাহার নীতি পবিত্র তাহা লোকের ভাল লাগে না। কিন্তু যাহার ভাব লজ্জাজনক, তাহাই সকলের প্রিয়। কতকগুলি প্রসিদ্ধ ক্ষমতাশালী লেখকের অসাবধানতা এই রুচি বিকৃত হওয়ার কারণ। কোন জাতির রুচি গঠন করিবার বিষয়ে ক্ষমতাপন্ন লেখকদিগের অনেক কর্তৃত্ব। তাঁহারা মনে করিলে সেই রুচি পরিশুদ্ধ কিম্বা বিকৃত করিতে পারেন। সুতরাঙ

তাঁহাদের অসাবধানতা নিবন্ধন যদি দেশের রুচি মলিন হইয়া যায়, তাঁহারা সেজন্য দায়ী। একবার রুচি বিকৃত হইলে আমার মত পয়সার কাঙ্গালীরা কলম ধরিয়া সেই বিকৃতরুচি আরো বর্দ্ধিত করিতে থাকে।.বাঙ্গালা সাহিত্যের সেই দুর্দশা ঘটিয়াছে।

বঙ্গাদর্শন যখন প্রথমে বাহির হইবার কথা হয়, তখন আমি ইহার একজন প্রসিদ্ধ লেখককে (তিনি কবিতা লিখিতে পারেন) বলিয়াছিলাম যে, আপনাদের কর্ত্তব্য আমাদের জাতির এই রুচির পরিবর্ত্তন করেন। কিন্তু বঙ্গাদর্শনের দুই খন্ড ত প্রকাশিত হইয়ছে। আমি দেখিয়া বড় দুঃখিত হইয়াছি। ইহার অপরাপর বিষয়ের কথা বলিতে চাহি না। কিন্তু ইহাতে যে কবিতাটী প্রকাশ পাইয়াছে, আমার মতে তাহাতে এই বিকৃত রুচির অত্যন্ত পোষকতা করে। কোন্ ভাব হৃদয়ে উদয় করা, কি শিক্ষা দেওয়া এ কবিতার উদ্দেশ্য আমি বুঝিতে পারি না। প্রণয় বর্ণনা করিতে হইলে রাধাকৃষ্ণের মাখামাখির মত না করিলে হয় না। আমার বিশেষ এ বিষয়ে বলিবার কারণ এই আমি কতকগুলি স্ত্রীলোককে আগ্রহের সহিত বঙ্গাদর্শন পড়িতে দেখিয়াছি। প্রণয়ের এইরূপ নীচ ও কদর্য্যভাব কি স্ত্রীলোকদের মনে কেন, পুরুষেরইবা মনে বাড়িতে দেওয়া উচিত? আমার কবি ভায়ারা মনে করেন যে ফলারের পাতের মত মাখা চোকা না করিলে আর রসিকতা হয় না। যাহা হউক, বঙ্গাদর্শনের অনুকরণ করিয়া একটী কবিতা লিখিয়া পাঠাইতেছি, অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবেন। আমার গদ্য পত্রখানি ইচ্ছা করিলে প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু অস্বাক্ষরিত পত্র লেখা আমার মত নয়, সুতরাঙ আমার সম্পূর্ণ নাম দিয়াই প্রকাশ করিবেন।

সুন্দরী।

১

কেন না হইলি তুই সাধের ধুচুনি?
রে প্রাণ রতন!
প্রতিদিন করে ধরে, লয়ে প্রেম সরোবরে,
সোহাগেতে ডুবাতাম সাধের ধুচুনি।
রে প্রাণ রতন!

২

কেন না হইলি তুই দুধের ব্যাসালি
রে প্রাণবল্লভ!
দুধ হয়ে তোর কোলে, পড়িতাম কুতূহলে,
প্রেমভরে চোঁ চোঁ করে পাড়িতাম গালি ;—
রে প্রাণবল্লভ!

৩

কেন না হইলি তুই মোর ছড়া হাঁড়ি!
রে হৃদয় সখা।

না পোহাতে বিভাবরী, তোরে বাম করে ধরি,
আনন্দে দিতাম ছড়া ঘুরে সারা বাড়ী।
রে হৃদয় সখা!

৪

কেন না হইলি তুই মোর ছেঁড়া কাঁথা,
রে প্রাণ কানাই!
আমি সূতারূপ নিয়ে, তোর অঙ্গে মিশাইয়ে,
বলিতাম কাণে কত প্রণয়ের কথা!
রে প্রাণ কানাই!

৫

কেন না হইলি তুই সলিতার কানি,
হৃদয় ভূষণ।
সোহাগেতে পাক দিয়ে, আনিতাম পাকাইয়ে
হৃদি দীপে রেখে স্নেহ ঢালিতাম আনি।
হৃদয় ভূষণ!

সুন্দর

১

কেন না হইনু হায়! সাধের ধুচুনি,
রে প্রাণ প্রতিমে!
তোর ও কমল করে, আনন্দে বিহার করে,
সার্থক ধুচুনি জন্ম হইত যে ধনি!
রে প্রাণ প্রতিমে!

২

কেন না হইনু তোর দুধের ব্যাসালি,
রে মঞ্জু হাসিনি!
ছ্যাঁক ছোঁক প্রেমালাপে, নিবাইয়ে মনস্তাপে,
বাহিরে কেবল আমি থাকিতাম কালি।
রে মঞ্জু হাসিনি!

৩

কেন না হইনু হায়! তোর ছড়া হাঁড়ি,
রে প্রাণ প্রেয়সি!
ধরিয়া তোমার করে, ছ্যাড়াক্ ছ্যাড়াক্ স্বরে,
করিতাম প্রেমগীত প্রাতে গলা ছাড়ি।
রে প্রাণ প্রেয়সি!

৪

কেন না হইনু আমি তোর ছেঁড়া কাঁথা,
রে প্রাণতোষিণী?
সোহাগে তোমাকে নিয়ে, নিজ ছিদ্র ঢাকা দিয়ে,
আদর পেতাম কত হায় যথা তথা।
রে প্রাণতোষিণী?

৫

কেন না হইনু তোর সলিতার কানি,
রে সুধাভাষিণি!
ও সুগোল উরুপরে, লুটিতাম প্রেমভরে,
করিতাম রোম ধ'রে কত টানাটানি,
রে সুধাভাষিণি!

আকাশবাণী।

১

কেন না হইলি তোরা বাঙ্গালার কবি
সুন্দরী সুন্দর!
উঠিত রসের ঢেউ, খেয়ে না বাঁচিত কেউ,
হতভোম্বা সরস্বতী যেন আঁকা ছবি।
সুন্দরী সুন্দর!

২

বঙ্গাদর্শনের কেন হলি না লেখক?
সুন্দরী সুন্দর!
রসের কবিতা ক'রে, নিতে মন প্রাণ হ'রে,
কত বাবু ভেয়ে প'ড়ে মিটাতেন সক্।
সুন্দরী সুন্দর!

৪ঠা আষাঢ় ১২৭৯। }
বহুবাজার। } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য।'

২৯.৩.১২৭৯ (১২.৭.১৮৭২) তারিখে এডুকেশন গেজেটে 'শ্রীঃ' স্বাক্ষরিত এই চিঠি ছাপা হয়েছিল (প. ২২৩, প ১)—

'মহাশয়!

বিগত সপ্তাহে আপনার সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহে শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় কর্তৃক বঙ্গাদর্শনের প্রতিকূলে যে কতিপয় রহস্যসূচক পদ্য প্রকটিত হইয়াছিল, তদ্দৃষ্টে

আমরা হর্ষে বিষাদিত হইলাম। যেহেতু রত্নগর্ভ রত্নাকরকে লবণাক্তসলিলজনিত দোষে দূষিত করা হইয়াছে।'

এডুকেশন গেজেট এর কোনো উত্তর দেয়নি, কিন্তু পরে শিবনাথের কোনো রচনা ছাপেনি। ৫.৯.১২৮০ তারিখে এডুকেশন গেজেটে 'বেদ সমালোচক বাবু রামদাস সেন' নামে অস্বাক্ষরিত রচনায় (প. ৫৩৫-৮) রামদাস সম্বন্ধে নোঙরা কটূক্তি ছিল। ১২.৯.১২৮০ তারিখে সম্পাদক জানিয়েছেন, যে অন্যের ঐ রচনা অমনোনীত হলেও কর্মচারিদের দোষে ছাপা হওয়ায় তিনি দুঃখিত। ভবিষ্যতে এমন লেখা ছাপা হবে না। বঙ্গদর্শনের আলোচনা-প্রসঙ্গে সোমপ্রকাশ রামদাস সেন সম্বন্ধে একাধিকবার আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করেছে।

৩

কোনো রচনার ভাষা ও গঠনে অনুকরণজাত নতুন সৃষ্টি উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন হতে পারে। পরবর্তী সৃষ্টির ভাব বা রীতিতে মূলের নিয়ন্ত্রণের পরিমাণভেদে তা প্রভাবিত, স্বাধীন, বা অনুকরণমূলক রচনা হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় স্রষ্টা সিরিয়াস হলে এতে পরোক্ষভাবে মূলের গৌরব বাড়ে, যদিও তার অস্তিত্ব-নিরপেক্ষভাবে দ্বিতীয় রচনা উপভোগ্য হতে পারে। গম্ভীর বিষয়ের মূলের গঠন অনুসরণে লঘু বিষয়ের এমন বর্ণনা করলে সেগুলি প্যারডি হয়ে সাপেক্ষভাবে মূলের পরোক্ষ প্রশংসা করে। কিন্তু অতিরিক্ত কথায়, মন্তব্যে বা ভাষায় মূলের স্রষ্টা বক্তব্য বা ব্যক্তিগতভাবে নিন্দিত হলে প্যারডি রচনা স্যাটায়ার হয়ে ওঠে। এই স্যাটায়ার নিন্দাসূচক সাপেক্ষ অনুকরণ। বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতার পরবর্তী উদ্ধৃতিটি প্যারডি ; কিন্তু শিবনাথের রচনাটি যে গ্রাম্য স্যাটায়ার, প্রথমে চিঠি, মাঝে 'সুন্দরে'র চতুর্থ ও পঞ্চম স্তবক, এবং শেষে 'আকাশবাণী' তার প্রমাণ।

এডুকেশন গেজেটে বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য কবিতার অনুকরণেও কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি প্রভাবিত রচনা। ১২৮১ বৈশাখে (প. ২৮-২৯) 'ভ্রমরে' প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'জলে ফুল' নামে কবিতাটি 'কবিতাপুস্তকে'ও আছে। এডুকেশন গেজেটে তার অনুকরণে অন্তত তিনটি কবিতা প্রকাশিত হয়। যেমন—

১। অঘোরনাথ দত্ত—'আর কি?' ৬.৬.১২৮৪, প. ৯৩-৯৪।

২। রাজকৃষ্ণ মিশ্র—'জলে কমল', ২০.৪.১২৮৪, প. ২৭০।

৩। গোপালচন্দ্র বসু—'স্রোতে ফুল' ১৩.৮.১২৯২, প. ৪৯৩।

শিবনাথের অনাবিষ্কৃত কবিতাটি সম্বন্ধে আগে কোনো সিদ্ধান্ত করা কঠিন ছিল।[১৬] বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন—[১৭] 'বাঙলা সাহিত্যেও শিবনাথ তখনই বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কবি-প্রতিভা প্রথমে 'সোমপ্রকাশে' ফুটিয়া উঠিয়াছিল।..শিবনাথের ব্যঙ্গরস সুমার্জিত এবং শিষ্ট রুচিসম্মত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে বৈষ্ণব কবিদিগের অনুসরণে—

'কেন না হইনু আমি যমুনার জল রে'

এই কবিতাটি প্রকাশ করিলে, শিবনাথ ইহার এমন একটি বিদ্রূপ অনুকরণ করিয়া 'সোম-প্রকাশে' প্রচার করিয়াছিলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত তাঁহার কবি-প্রতিভা এবঙ রচনা-নৈপুণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।'

এই বর্ণনার ভুলগুলি হল—(ক) কবিতার উদ্ধৃতিতে বিচ্যুতি, (খ) এডুকেশন গেজেটের জায়গায় সোমপ্রকাশ লেখা এবঙ (গ) বঙ্কিমচন্দ্রের সন্তুষ্টির কথা। বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে এতে সন্তুষ্ট হওয়া সম্ভব ছিল না। বার্ধক্যের অস্পষ্ট স্মৃতি এবঙ / বা পরোক্ষ জ্ঞান এর কারণ হতে পারে। শিবনাথ বিপিনচন্দ্রের মত ব্রাহ্ম বঙ্কিমচন্দ্র নন : এজন্য দু জনের দ্বন্দ্বের পটভূমিতে বিপিনচন্দ্রের কলমে শিবনাথের প্রশঙসা থাকতে পারে। আত্মজীবনী বা স্মৃতিকাহিনী এসব কারণে অনেক সময় নির্ভরযোগ্য থাকে না।

১২৮২ চৈত্রের বঙ্গদর্শন ৩০.৭.১৮৭৬ তারিখে এবঙ ১২৮৪ বৈশাখের বঙ্গদর্শন ১৭.৪.১৮৭৭ তারিখে প্রকাশিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে ১২৮৩ সাল হলেও বঙ্গদর্শন প্রকৃতপক্ষে বন্ধ ছিল সাড়ে আট মাস। ১২৮৪ বৈশাখ সঙখ্যার বিজ্ঞাপন 'সাধারণী'তে ১৮.৩.১৮৭৭ তারিখে (প. ২৫২) এবঙ এডুকেশন গেজেটে ১৩.৪.১৮৭৭ তারিখে (প. ১৫, স্ত. ২) প্রকাশিত হয়। ১২.৮.১২৮৩ (নভেম্বর ১৮৭৬) তারিখ একটি দানপত্রে[১৮] বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের স্বত্ব সঞ্জীবচন্দ্রকে দান করেন এই সর্তে, যে তিনি তা প্রকাশ করবেন বা করাবেন। অথচ নবীনচন্দ্র সেনের মতে তিনি ঐ পুনরুজ্জীবনের প্রধান উত্সাহদাতা। তিনি একটি কাজে চট্টগ্রাম থেকে কলকাতায় আসেন,[১৯] এবঙ তখন (মার্চ ১৮৭৭ নাগাদ) নৈহাটিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেন। নবীনচন্দ্রের আত্মপ্রসাদ তথ্যপ্রতিষ্ঠ নয়, কারণ তার পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র দানপত্র তৈরি করেছিলেন। নবীনচন্দ্র লিখেছেন—'তখন স্থির হইল সঞ্জীববাবু উভয় সম্পাদক ও কার্য্যাধ্যক্ষ হইবেন, এবঙ এভাবে 'বঙ্গদর্শন' পুনঃ প্রচারিত হইবে। তখন বঙ্কিমবাবু বলিলেন—একটি কথা। শিবনাথ শাস্ত্রীকে কখনও 'বঙ্গদর্শনে' লিখিতে দিবে না বল।' আমি বলিলাম—'আপনি এত লোকের মাথায় লঙ্কার হাড়ি ঝাড়িলেন। আর শিবনাথ শাস্ত্রী আপনার 'সুন্দরী সুন্দর' কবিতাটির অনুকরণে একটি বিদ্রূপাত্মক কবিতা লিখিয়াছিল বলিয়া কি তাহার প্রতি এই ক্রোধ উচিত?' তিনি বলিলেন—'বিদ্রূপের জন্য নহে। সে উহা maliciously (অসরল ভাবে) করিয়াছিল ;[২০] এবঙ 'যাহা হউক তাঁহার বাক্যে আমরা সম্মত হইলাম যে শিবনাথ শাস্ত্রী 'বঙ্গদর্শনে' কখনও লিখিতে পারিবেন না।'[২১]

বঙ্গদর্শনে নবীনচন্দ্রের কাব্যের প্রশঙসা এবঙ কবিতা প্রকাশের সূত্রে তাঁর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় হয় ; কিন্তু পরে মহাভারতের প্রথম নতুন ব্যাখ্যাকারের দাবিতে দুজনের মধ্যে মনোমালিন্য হয়েছিল। তার পরে নবীনচন্দ্র 'আমার জীবন' লেখেন। অন্যদিকে, নবীনচন্দ্রের সহপাঠী ও কবিতার গুণগ্রাহী শিবনাথের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব দীর্ঘজীবী ছিল। বঙ্কিম-শিবনাথ বিরোধে নবীনচন্দ্রের বর্ণনায় উদ্দেশ্যমূলকতা থাকা অস্বাভাবিক নয়।

৪

বঙ্কিম-শিবনাথ সম্পর্কে অবনতির সূত্রপাত বাঙলা সাহিত্যে স্বাধীন প্রেমকে প্রধান করায়, যা নবাগত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে নবীনচন্দ্রের অভিযোগও ছিল অনুরূপ। আরো অনেকের সাহিত্যিক প্রক্রিয়া অভিযোগ মুখর ছিল। বাঙলা সাহিত্যে স্বাধীন প্রেমের সামাজিক উত্স লক্ষণীয়।

উনিশ শতকের প্রথমে বাঙালির মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় যৌবনের প্রাক্-বিবাহ অনুরাগ অনুপস্থিত ছিল। নিয়ন্ত্রিত বিবাহে বর্ণভেদ প্রথা মানা হত। যৌবনের পূর্বরাগের প্রবল মানসিক আকর্ষণে জাতিবিচার উপেক্ষা করার সুযোগ তখন ছিল না। পর্দাপ্রথাব ফলে অনাত্মীয় ছেলে-মেয়েদের মেলামেশাও কঠিন ছিল। বাল্যবিবাহ, বর্ণভেদ ও পর্দাপ্রথা যুগ্মভাবে সমাজে পূর্বরাগের সম্ভাবনা লুপ্ত করেছিল। স্বামী-স্ত্রী যৌবনের প্রথমেই সন্তান-পালনের ভারে প্রেম-কল্পনার অবকাশ পেত না।

তখনকার গ্রাম-জীবনে পূর্বনির্ধারিত কৌলিক বৃত্তি স্থির এবঙ জীবিকাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কৃষি-নির্ভরতা থাকায় ভৌগোলিক বা সামাজিক প্রতিষ্ঠার দিক থেকে অবস্থান এবঙ আর্থিক সঙ্গতি সাধারণভাবে পূর্বনির্ধারিত হত। সামাজিক উত্থান-পতনের অভাবে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটার সুযোগ কম ছিল। যৌথ পরিবার ছিল সাধারণ ব্যবস্থা। তাতে পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের বিশেষত কনিষ্ঠদের পক্ষে নিয়ামকের আনুগত্য কঠোর ছিল। ব্যবহারিক আনুগত্যের অভাবে পরিবারবিচ্যুত হলে সমাজে ব্যক্তিবিশেষের ঠাঁই হত না। সামাজিকভাবে যেমন ঠাঁই হত না, তেমনি আর্থিকভাবে, কারণ দায়ভাগ বিধিতে সন্তান পিতৃধনে জন্মসূত্রে অঙশীদার হত না, এবঙ যৌথ পরিবারের সম্পত্তিতে ব্যক্তিবিশেষের স্বতন্ত্র মালিকানা ছিল না। তা ব্যক্তিস্বাধীনতা স্ফুরণের অনুকূল নয়। যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বাধীন প্রেমের জন্ম দিতে পারে, পারিবারিক জীবনে তার অবকাশ ছিল না।

এসবের ফলশ্রুতি সমাজের মত সাহিত্যেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও প্রেমের অনুপস্থিতি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য না থাক, পুরানো সাহিত্যে ছক-বাঁধা পূর্বরাগের সামান্য উপস্থিতি ছিল। প্রাচীন সঙস্কৃত কাহিনীজাত যে প্রেম তা প্রধানত ছেলের, এবঙ তার উপকরণ রাজার রূপমোহ ও ভোগ। তা একাধিক হতে পারত, এবঙ হত। প্রেমের আধুনিক প্রত্যয়ের একনিষ্ঠতা ও মানসিক বিক্ষোভ তাতে নেই। 'লয়লা-মজনু' জাতীয় মুসলমানি প্রেম-কাহিনীতে আমাদের বাস্তব জীবন অনুপস্থিত। আর ছিল চলতি প্রেমের গল্প, যার উপাদান হয় অলীক রূপকথা, নয় 'বিদ্যাসুন্দর' জাতীয় রাজসভা সাহিত্যের রসালো দেহভোগ। কোনোটি আধুনিক অর্থে প্রেম নয়। বৈষ্ণব পদাবলীর পূর্বরাগ দেবতার লীলাখেলা, যার গান শোনা যায় মাত্র। প্রেমের আধুনিক প্রত্যয়ে নারী পুরুষের সমানাধিকারী : নবজাত সামাজিক পটভূমিতে মেয়েরা পুরুষের কাছাকাছি যেতে চাইছে। প্রাচীন ধারণায় পতি দেবতা : প্রেমের প্রত্যয়েও পুরুষের প্রাধান্য,—নির্বাচন তার, এবঙ নারীবিশেষ নির্বাচিতা হলেই ধন্যা,—ঐতিহ্য অনুসারে তা তার প্রধান সঙস্কার। মধুসূদনের কাব্যে এর বিরুদ্ধে নায়িকার কণ্ঠস্বর কখনো শোনা গেছে।[২২] পরে বঙ্কিমচন্দ্রে

তার বলিষ্ঠতর ছবি আছে।

কৃষি-নির্ভর গ্রাম্য যৌথ পরিবারে আর্থিক অবস্থা স্থির এবঙ ব্যক্তির পক্ষে পারিবারিক নির্ভরশীলতা বেশি। ফলে, মানসিক ধারনাগুলি স্থাণু। উল্টো চেহারা শহুরে, বুদ্ধি-নির্ভর একক পরিবারে, যেখানে আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা অপেক্ষাকৃত বেশি পরিবর্তনশীল। পারিবারিক প্রধানের নিয়ন্ত্রণও তুলনায় শিথিল। ফলে, মানসিক অবস্থা পরিবর্তনের সাপেক্ষ,—গতিশীল। যৌথ পরিবারে নীতি-নিয়ন্ত্রণে নারীর স্থান নেই, অথচ ছোট পরিবারে কোনো কাজে স্বামীর উপর স্ত্রীর প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। যৌথ থেকে একক পরিবারে বিবর্তন নারীকে আঙশিক মুক্তির স্বাদ এনে দিয়েছে। তা পরোক্ষভাবে প্রেমের সহায়ক। যাঁরা তখন সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে, তাঁরা গুরুজনের প্রতি আনুগত্য, ভ্রাতৃপ্রেম, ধর্মাচার ও পারিবারিক প্রীতি বজায় রাখার জন্য গৃহবধূর আত্মত্যাগের মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন। শরত্চন্দ্রও এই অপস্রিয়মাণ সঙস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। অন্যদিকে প্রেম শুধু ত্যাগ করে না,—দাবিও করে। বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীতে তার আগমনবার্তা লেখা হয়েছে।

সামাজিক জীবনে কোন ব্যবহারের প্রচলন বা বীজ কোনো মানসিক প্রত্যয়ের সৃষ্টি করে। নইলে নতুন প্রত্যয় দুর্নিরীক্ষ্য থেকে যায়। ব্যবহার থেকে প্রত্যয়ের জন্ম, এবঙ তা থেকে নতুন ব্যবহার। ইঙরাজিশিক্ষালব্ধ দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্য নিজের জোরে প্রেমের প্রত্যয় এবঙ তার আনুষঙ্গিক উপাদান এদেশে প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। অন্তত তা সামাজিকভাবে দৃষ্টিগোচর হতে পারে না। সামাজিক পরিবর্তনে জাত বীজের উপর ইঙরাজিশিক্ষা জলসিঞ্চন করতে পারে মাত্র। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন প্রেমে সামাজিক পরিবর্তন ও ইঙরাজিশিক্ষা প্রায় সমান্তরালভাবে উপস্থিত বলে দৃষ্টিবিভ্রমে দ্বিতীয়টিকে প্রধান কারণ মনে হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এটি অতিরিক্ত সহায়ক শক্তি। বিদেশি শাসনের ফলে যেমন এদেশে ইঙরাজিশিক্ষার প্রচলন হয়েছে, তেমনি পরোক্ষভাবে পূর্বোক্ত সামাজিক পরিবর্তন এসেছে। ঐ সামাজিক পরিবর্তন প্রায়ই ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করায় ইঙরাজিশিক্ষিতেরা সাধারণভাবে নতুন পরিবর্তনের সপক্ষ। কিন্তু শুধু ইঙরাজিশিক্ষা সে পরিবর্তনের সপক্ষ মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে না। তার প্রমাণ একদিকে গ্রাম্য যৌথ পরিবারে বর্ধিত ইঙরাজিশিক্ষিতদের ব্যবহারিক প্রথানুগত্য, এবঙ অন্যদিকে শহুরে একক পরিবারে স্বল্পশিক্ষিতদের নবীনতা।

ভৌগোলিক অবস্থানগত স্থায়ী বা দীর্ঘকালীন পরিবর্তন বৃত্তির প্রয়োজনে ও যানবাহনের সুবিধায় তখন বেশি দৃশ্যমান। নতুন অভিজ্ঞতা এখানে ব্যক্তিমনকে অপেক্ষাকৃত পরিবর্তনসহ করে তোলে। প্রায়ই তার সঙ্গে যুক্ত হত আর্থিক পরিবর্তন। কুলগত বৃত্তি, গ্রাম-সমাজ ও প্রত্যক্ষ ভূমি-নির্ভরতার অভাবে অর্থ-কৌলীন্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। আধুনিক মধ্যবিত্ত সমাজেরও উদ্ভব হচ্ছিল। এর ফলে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন স্বাভাবিক।

বাল্যবিবাহ থেকে যৌবনবিবাহ, বর্ণভেদপ্রথার ভাঙ্গন, কুলগত কৃষি-নির্ভরতা থেকে

স্বাধীন বৃত্তি-নির্বাচন, পর্দাপ্রথা অস্বীকার, যৌথ থেকে একক পরিবার--এগুলি উনিশ শতকে মিলিতভাবে মুক্তির স্বাদ এনে দিয়েছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মত স্বাধীন প্রেমও মুক্তি হিশাবে সামাজিক অগ্রগতির একটি নিদর্শন। উনিশ শতকের (চার পাদের) দ্বিতীয় পাদ থেকে এই সামাজিক পরিবর্তনগুলি আরম্ভ হয়েছে, এবঙ তৃতীয় পাদ থেকে বাঙলা সাহিত্যে স্বাধীন প্রেমের দেখা মিলেছে। সাহিত্যিক প্রত্যয় সামাজিক ব্যবহারকে অনুসরণ করে।

পরিবর্তন যুগপত্ অভ্যর্থনা ও প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। উনিশ শতকের তৃতীয় পাদ থেকে যৌথ পরিবার, বর্ণভেদপ্রথা ও হিন্দু বিবাহের মাহাত্ম্যের প্রচারকেরা যৌবন--প্রেমকে ধিক্কার দিচ্ছিলেন। এই প্রচারক ও ধিকৃতেরা পাশাপাশি একই সমাজের বিভিন্ন শক্তির ভিন্নমুখী গতির নিদর্শন। এগুলি পরস্পর-বিরোধী। বঙ্কিমচন্দ্র ও শিবনাথ যে পরস্পর-বিরোধী হয়ে উঠবেন, তা অস্বাভাবিক নয়।

শিবনাথের কবিতার উপজীব্য নিসর্গ-সৌন্দর্য, ঈশ্বরানুভূতি প্রভৃতি। তাঁর মেজবউ (১৮৮০), যুগান্তর (১৮৯৫), নয়নতারা (১৮৯৯) প্রভৃতি উপন্যাসে গ্রাম্য যৌথ পরিবার এবঙ তাকে রক্ষা করার জন্য গৃহবধূর আত্মত্যাগ প্রশঙসা পেয়েছে। সেখানে প্রথানুসারী জীবন আছে, স্বাধীন প্রেম নেই। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আধুনিক সমাজের পারিবারিক ভাঙ্গান, ইঙরাজিশিক্ষা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য উপস্থিত : প্রেম প্রধান। অন্য উপন্যাসেও স্বাধীন প্রেমের জন্য কখনো প্রাচীন, কখনো মধ্যযুগের ভারতে তিনি কাহিনী স্থাপন করেছেন। হিন্দু-মুসলমান, বাঙ্গালি-অবাঙ্গালি, পরস্পরের অপরিচিত স্বামী-স্ত্রীর যৌবনপ্রেমের তিনি বর্ণনা করেছেন—বিধবার প্রেম সহ। যৌথ পরিবার, বর্ণভেদপ্রথা প্রভৃতি তাঁর চোখে নিন্দনীয়।[২৩] দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের ফলে তিনি দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম, আনন্দমঠ ও রাজসিঙহ উপন্যাসে প্রেমকে প্রাধান্য দেননি। বঙ্কিমচন্দ্রের অবস্থানগত পরিবর্তন ভিন্নকালীন। শিবনাথের মধ্যে—ব্রাহ্মসমাজের মত--অন্তর্বিরোধ ছিল প্রবল। তিনি স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, যৌবনবিবাহ প্রভৃতির তাত্ত্বিক প্রশঙসা এবঙ বর্ণভেদ ও পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধতা করেন। কিন্তু তার ফলে যে নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা ও স্বাধীন প্রেমের উদ্ভব হতে পারে, তার বিপক্ষতা করেছেন। এজন্য প্রেমের কাহিনী প্রচার বা মেয়েদের প্রেমের কবিতা পড়ায় তিনি শঙ্কিত। বর্তমান আলোচনার পটে বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রসর, কিন্তু শিবনাথ অন্তর্বিরোধে প্রথানুগত। বাবা হরানন্দের 'তথাপি লৌকিকচারঙ মনসাপি ন লঙ্ঘয়েত্' আবৃত্তি, এবঙ মামা দ্বারকানাথের পন্ডিতি সঙস্কার তাঁর মনেও ছায়া ফেলেছিল।

৫

বঙ্কিমচন্দ্র শিবনাথের সম্পর্ক বিরোধিতার। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলা সাহিত্যে উচ্চপ্রতিষ্ঠিত : শিবনাথের প্রাসঙ্গিক অবস্থান নিচে। তখন অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন ও দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মৃত। এই অবস্থায় শিবনাথের পক্ষে

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি কাম্য বলে তিনি 'সোসাইটি ফর দি হায়ার ট্রেনিঙ অব ইয়ঙ মেন' প্রতিষ্ঠানে ১০ই অক্টোবর ১৮৯৩ তারিখ মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে পাঁচটায় একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। সাহিত্যশাখার সভাপতি হিশাবে বঙ্কিমচন্দ্র সভাপতিত্ব করেন। শ্রোতাদের মধ্যে বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (গোঁড়া হিন্দু), অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন (ব্রাহ্ম) প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।[২৪]

'জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় নীতি' নামের বক্তৃতাটিতে শিবনাথ বলেন, যে এই দুটি বিষয় পরস্পর গভীরভাবে যুক্ত বলে ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবেও সাহিত্যিক উপাদান থেকে ইতিহাস-রচনা সম্ভব। অতিরিক্ত পারলৌকিকতা, উত্কল্পনা, এবঙ বস্তুনিষ্ঠতার অভাবে বিস্তৃত সঙস্কৃত সাহিত্যে ইতিহাস না থাকলেও তা থেকে ইতিহাস-নির্মাণ করা যায়। সেজন্য য়ুরোপীয় বিদ্যা ও সঙস্কৃতে পন্ডিত দুজনকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া প্রয়োজন। অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের অবদানে গত ত্রিশ বছরে জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় নীতির যুগপত্ উন্নতি হয়েছে। বিগত দশকে যে নিম্নগামী রুচি ক্রমোন্নতিকে ব্যাহত করেছে, তা প্রতিরোধ করে সত্সাহিত্য সৃষ্টির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র ও গুরুদাসকে নিয়ে সমিতি একটি কমিটি তৈরি করলে ভালো হয়।

বক্তৃতাশেষে গুরুদাস বক্তাকে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর মতপার্থক্য জানান, কারণ গত ৩০।৪০ বছরে বাঙলার জাতীয় সাহিত্যের তুলনায় জাতীয় চরিত্রের উন্নতি কম হয়েছে। শেষে বঙ্কিমচন্দ্র সময়াভাব জানিয়ে সঙক্ষেপে বলেন, যে জাতীয় সাহিত্য যে সর্বদা জাতীয় চরিত্রের প্রতিচ্ছবি নয়, তার একটি উদাহরণ এলিজাবেথীয় ইঙরাজি কাব্য, যা কর্মব্যস্ততার যুগে রোমান্টিকতার বর্ণনা করেছে।

তখন হিন্দু পুনরুত্থানবাদের প্রাবল্যে ব্রাহ্ম আন্দোলন নির্জীব। বঙ্কিমচন্দ্র গোঁড়া হিন্দু হয়েছেন। গুরুদাসের গোঁড়ামি বহুজ্ঞাত। বিশিষ্ট ব্রাহ্মের উপস্থিতিতেও শিবনাথ উন্নতির বরাত দিলেন দুজন গোঁড়া হিন্দুর উপর। শিবনাথের প্রস্তাবের কারণ ছিল বঙ্কিম- -তোষণ। আগে অগ্রসর বঙ্কিমচন্দ্রের নিন্দা করে, তিনি পরে পশ্চাতমুখী বঙ্কিমচন্দ্রকে স্বাগত জানালেন। কিন্তু তোষণ ফলবান হল না,--দুজনেই বক্তব্যের বিপক্ষতা করলেন। সম্পর্কের উন্নতি হল না। ফলে শিবনাথ ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বর্ণিত 'আত্মচরিতে' কোথাও বঙ্কিম-প্রসঙ্গ লিখলেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র বিশ শতকের গোড়ায় বাঙালির সাঙস্কৃতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিয়েছেন বলে 'রামতনু লাহিড়ী ও তত্কালীন বঙ্গসমাজ' (১৯০৩) গ্রন্থে তাঁর উল্লেখ কর্তব্য। সোজাসুজি ব্যক্তিগত নিন্দা করা কঠিন বলে শিবনাথকে কৌশলে কাজটি সম্পন্ন করতে হয়েছে। 'নব্যবঙ্গের দ্বিতীয় যুগের নেতৃবৃন্দ' নামে একাদশ পরিচ্ছেদে শিবনাথ কেশবচন্দ্র সেন, দীনবন্ধু মিত্র বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ এবঙ মহেন্দ্রলাল সরকারের জীবনী লিখেছেন। এঁদের জন্য ঐ পরিচ্ছেদে স্থানের পরিমাণ হল মোটামুটি হিশাবে যথাক্রমে ৩২, ১৩, ৮, ১৭ এবঙ ৩০ শতাঙশ। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে শিবনাথের মনোভাব এ থেকে স্পষ্ট। দ্বারকানাথকে তাঁর দ্বিগুণ স্থান দেওয়ায় শিবনাথের

ঐতিহাসিক দৃষ্টি যে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে আচ্ছন্ন ছিল তা-ও বোঝা যায়।

এডুকেশন গেজেটে আক্রমণের কথা এতে অনুক্ত রয়েছে, যেমন রয়েছে সোমপ্রকাশের অশালীন রচনার কথা, যদিও 'সংবাদ প্রভাকরে', বঙ্কিমচন্দ্রের ছেলেবয়সের কবিতাযুদ্ধের প্রসঙ্গ রয়েছে। ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ[২৫] সভায় পঠিত, সাময়িকপত্রে প্রকাশিত এবং আদৃত হয়েছে। তাতে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব সম্বন্ধে লিখেছেন--'কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি—কোথায় গেল সেই 'বিজয়বসন্ত', সেই 'গোলেবকাওলি', সেই বালক ভুলানো কথা--কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য! বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মতো 'সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ'।'

শিবনাথ বাধ্য হয়ে সুর মিলিয়ে লিখেছেন--'আমরা সেদিনের কথা ভুলিব না। 'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্গসমাজে পদার্পণ করিবামাত্র সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিল। ..আমরা তত্পূর্বে..কতিপয় সেকেলে ধরণের উপন্যাস..আগ্রহের সহিত পড়িয়া আসিতেছিলাম। আমরা যাহা দেখিলাম তাহা কখনও দেখি নাই।..দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল। কি বর্ণনার রীতি, কি ভাষার নবীনতা, সকল বিষয়ে বোধ হইল, যেন বঙ্কিমবাবু দেশের লোকের রুচি ও প্রবৃত্তির স্রোত পরিবর্তিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন।'

এই বর্ণনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের মিল যতখানি, সোমপ্রকাশের সমালোচনার বৈপরীত্যও ততখানি। বঙ্গদর্শন প্রসঙ্গে শিবনাথ লিখেছেন--'১৮৭২ সালে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমের প্রতিভা আর এক আকারে দেখা দিল।..তিনি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হইতে গিয়া এরূপ মাসিক পত্রিকা সৃষ্টি করিলেন, যাহা প্রকাশমাত্র বাঙ্গালির ঘরে ঘরে স্থান পাইল। তাহার সকলি যেন চিত্তাকর্ষক, সকলি যেন মিষ্ট। বঙ্গদর্শন দেখিতে দেখিতে উদীয়মান সূর্যের ন্যায় লোকচক্ষুর সমক্ষে উঠিয়া গেল।' এর সঙ্গে সোমপ্রকাশ ও শিবনাথের পূর্বোদ্ধৃত চিঠি তুলনীয়। এ ছাড়া উপায় ছিল না।

অথচ বঙ্কিমচন্দ্রকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করার ইচ্ছা প্রবল। সেজন্য একেবারে শেষে লিখেছেন—'বঙ্কিমবাবু চরিত্রাংশে কেশবচন্দ্র সেন বা মহেন্দ্রলাল সরকার বা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সমকক্ষ লোক ছিলেন না ; কিন্তু প্রতিভার জ্যোতিতে দেশ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।' প্রশংসাটি যথেষ্ট নিন্দাসূচক। ইঙ্গিতবাহী আক্রমণ তথ্যগত নীরবতাকে উপেক্ষা করে।

বঙ্কিমচন্দ্র এসব নিন্দা-বিদ্রূপের উত্তর দেননি। দিলে, শিবনাথের আত্মগৌরব বাড়ত। তবু শিবনাথ লিখেছেন--'আমরা সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদল সোমপ্রকাশের পক্ষাবলম্বন করিলাম এবং বঙ্কিমী দলকে 'শবপোড়া-মড়াদাহের দল' বলিয়া বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিলাম। বঙ্কিমের দল ছাড়িবেন কেন? তাঁহারা সোমপ্রকাশের ভাষাকে 'ভট্টাচার্যের চানা' নাম দিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন।' উক্তিটি অসত্য।

২৪.৫.১২৮০ তারিখের সোমপ্রকাশের 'বঙ্গদর্শন হইতে বঙ্গসমাজের উপকার অথবা অপকার হইবার সম্ভাবনা?' নামের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আছে--'শব শব্দের পর দাহ ও মড়া শব্দের পর পোড়ান শব্দ প্রয়োগ করিলেই ভাষার সৌষ্ঠব ও শোভা সম্পাদিত হয়। কিন্তু আমরা যদি শব পোড়ান ও মড়া দাহ এইরূপ প্রয়োগ করি, পাঠকগণ, বস্তুত তাহা কেমন কৌতুকাবহ হইয়া উঠে। এক গালে চুণ ও অন্য গালে কালি দিলে দিব্য মূর্তিটা দেখিতে যেমন সুন্দর হয়, শব পোড়ান ও মড়া দাহ প্রয়োগ করিলে, পাঠকগণ, শুনিতে কি সেইরূপ মধুর হয় না! বঙ্গদর্শনের লেখকগণ মাতৃভাষাকে এই দিব্য মূর্তি পরিগ্রহ করাইতে উদ্যত হইয়াছেন।।' এটি 'সোমপ্রকশের মন্তব্য।'--সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদলের কথা নয়।

প্রায় দু মাস পরে ১১.৭.১২৮০ তারিখে অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সাধারণী' প্রথম প্রকাশিত হয়। অনেকদিন পরে ঐ কাগজে তত্কালীন খবরের খুঁটি-নাটি নিয়ে 'চণকচূর্ণ' নামে রঙ্গরচনা[২৬] প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হতে থাকে। ২২.৩.১২৮১ তারিখে সাধারণীতে প্রকাশিত 'চণকচূর্ণ (সংবাদপত্র)'-এর অংশবিশেষ এই রকম—

'..পৈলা নম্বর—কিষণ দা-আস কি চেনা [Hindoo Patriot] জোর মসালাদার..
দুসরা নম্বর—বাগ্‌বাজারকি চেনাচুর [অমৃতবাজার পত্রিকা]—বড়া রঙ্গাদার..
তিসরা নম্বর—সেন্‌জীকি চেনা [Indian Mirror] ধরম্‌সে খানা।..
সু-উ-উলভ চেনা [সুলভ সমাচার]-সব কোই লেনা।..

ভট্টাচার্যকি চেনা (সোমপ্রকাশ) সোমবারকো লেনা। এস্মে প্রা-আ-আড়্‌-বিবাক হ্যায়, মলিম্লুচ হ্যায়, সহা-আ-আনুভূতি হ্যায়, উদূখল হ্যায়, ধৃষ্টদ্যুম্ন হ্যায়। ইয় সব্‌ মিল্‌ কর ভট্টাচার্যকি চেনা বনায়া হুয়া হ্যায়। ইস্মে ইষ্ঠ, নিষ্ট, শিষ্ট, কৃষ্ণ, রাজনীতি, সমাজনীতি, ভ্রাতৃপ্রীতি, সংবাদ, বিসংবাদ, বাদানুবাদ, অপবাদ—সব ভাজা ভাজা, তাজা বতাজা মিলেগা। ভট্টাচার্যকি চেনা সোমবারকো লেনা।

..ফ্রেন্ডইন্ডিয়া [Friend of India] খোস্‌বর,
আর নওয়া অবজরবর্‌ [Oriental Observer]..' ইত্যাদি।

সোমপ্রকাশের লক্ষ্য একমাত্র বঙ্গদর্শন, উদ্দেশ্য আক্রমণ। সাধারণীর লক্ষ্য সব সংবাদপত্র, উদ্দেশ্য রঙ্গ। আক্রমণ করা উদ্দেশ্য হলে দশ মাস পরে রচনাটি প্রকাশিত হত না। এটা প্রত্যুত্তর নয়। তাছাড়া, সাধারণী এই নিয়মিত রচনায় ১২.৬.১২৮১ তারিখে 'মতিচুরের সঙ্গে চেনাচুর'-এ বঙ্গদর্শনকে নিয়েও রঙ্গ করে। বঙ্কিম এসব থেকে দূরে থাকতেন।[২৭]

৬

সামান্য অপ্রাসঙ্গিক হলেও উল্লেখযোগ্য, শিবনাথের মত রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে দুটি বিতর্ক আছে। একটিতে ওঁরা দুজন উপস্থিত। অন্যটিতে আছেন অনেক

আধুনিক পন্ডিত. যাঁদের লেখা থেকে বোঝা যায়, যে বয়স, পদ, উপাধি, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা ও রচনার পরিমাণের মূল্য লেখার গুণগত মান বা বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা সম্বন্ধে নেহাত্ অকিঞ্চিত্কর। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কাছে বিষয় নয়,—'হিরো', এবঙ সত্যানুসন্ধান নয়, পূর্বকল্পিত ধারনা প্রচার লেখার উদ্দেশ্য।

প্রথমটি অর্থাত্ রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের বহুজ্ঞাত বিতর্কের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ পরে লিখেছিলেন—[২৮] 'সেই লড়াইয়ের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গেও আমার একটা বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল।..বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উত্পাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।' নিম্নরেখ শব্দগুলির পরে ওকালতির অবকাশ কোথায়?

দ্বিতীয়টিতে কয়েকজন পন্ডিত বঙ্গাদর্শনে (মাঘ ১৮২৩) প্রত্যাশিত 'ভারতভূমি' কবিতার লেখক হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রাণপণ পন্ডশ্রম করেছেন। কিন্তু তাঁদের একজন প্রতিবাদী একটি অদ্ভুত মন্তব্য করেছেন[২৯]—এখন অনুমান করা যেতে পারে, বঙ্কিমের উপর শিবনাথের অখুশি ভাবের জন্য, শিবনাথ ভারতভূমি কবিতা প্রকাশের ব্যাপারটা জেনে [অবশ্য না জেনেও হতে পারে] ঐ বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। 'ভারতভূমি' কবিতা প্রকাশের দেড় বছরেরও বেশি আগে শিবনাথের মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল। তথ্যভিত্তি ছাড়া অনুমান হয় না।

ঐ কবিতাটির লেখক যে প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাইপো জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৬০-১৯৩৫) অনেক পন্ডিতের দাম্ভিক আলোচনা উপেক্ষা করে তা প্রমাণিত হয়ে গেছে। তাঁর প্রথম ডায়েরি থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এবঙ ১৮৭৭ সালের ডায়েরি এবঙ বঙ্গাদর্শন ও ভ্রমর থেকে গোপালচন্দ্র রায় জ্যোতিষচন্দ্রের কবিতা রচনার কথা প্রকাশ করেছেন। তাঁর ১৮৭৯ সালের ডায়েরিতে জানুয়ারির শেষে [২২ থেকে ২৯ তারিখের মধ্যে] এক দিন, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৭ মার্চ এবঙ ১৬-১৭ জুলাই তারিখে আরও কবিতা রচনার কথা আছে।[৩০] এডুকেশন গেজেটে জ্যোতিষচন্দ্রের স্বাক্ষরিত অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়েছে (যা নিয়ে কেউ কেউ—জ্যোতিষচন্দ্র অখ্যাত বলে—সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন), যেমন—

'বীণার প্রতি'[৩১], ১৬.৩.১২৮৪ (২৯.৬.১৮৭৭), প. ১৮৮।
'অতুল আভরণ', ১০.১২.১২৮৪ (২২.৩.১৮৭৮), প. ৭৬৪-৫।
'ভগ্নগৃহে জ্যোত্স্না', ৮.৫.১২৮৫ (২৩.৮.১৮৭৮), প. ৩০১।

ডায়েরি লিখতে বা সাময়িকপত্রে কবিতা প্রকাশ করতে হলেই যে লেখককে বিখ্যাত কবি হতে হবে, এমন নিয়ম নেই।

---

১ Bengal Government, Judicial Department Proceedings, No. B. 276-7, March 1864.

২ Ditto, No. B 633, March 1864.

৩ Ditto, No. B 309, April 1864.

৪ Report on Native Paper (Bengal), for the week ending 30.4 1864.

৫ কালীনাথ দত্ত—'বঙ্কিমচন্দ্র', প্রদীপ, আষাঢ় ১৩০৬।

৬ R. N. P. (Bengal), 5.11.1864.

৭ R. N. P. (Bengal), 10. 12. 1864.

৮ সোমপ্রকাশ থেকে উদ্ধৃতিগুলির আকর হল বিনয় ঘোষ (সম্পা.)—সাময়িকপত্রে বাঙলার সমাজচিত্র, চতুর্থ খন্ড। (কলিকাতা, ১৯৬৬, প্রথম সংস্করণ।)

৯ (ক) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙলা সাময়িকপত্র ; ১২২৫-৭৪, প. ১৫৮। (কলিকাতা, ১৩৫৪, তৃতীয় সংস্করণ।)

(খ) ওই—বাঙলা সাময়িকপত্র : ১২৭৫-১৩০৭, প. ২৬। (কলিকাতা, ১৩৫৯, দ্বিতীয় সংস্করণ।)

(গ) শিবনাথ শাস্ত্রী—'দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ' (একাদশ পরিচ্ছেদে), রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।

১০ J. C. Bagal [ed.]–*Bankim Rachanavali,* p. 172. (Sahitya Samsad, Calcutta, 1969, first edition.)

১১ নবীনচন্দ্র সেন—আমার জীবন, দ্বিতীয় ভাগ, প. ৩৬৮। (কলিকাতা, ১৩১৬, প্রথম সংস্করণ।)

১২ 'বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ', বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৮২।

১৩ বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯, প. ৭৯—৮০। প্রকাশের তারিখ ১৮.৫.১৮৭২।

১৪ এক জন লিখেছেন—'এখানে উল্লেখযোগ্য বঙ্কিম পরে তাঁর কবিতা সঙ্কলন গ্রন্থে ঐ 'সুন্দরী-সুন্দর' কবিতাটি বাদ দিয়ে যাওয়ায়, কবিতাটি আজ আর পাওয়া যাচ্ছে না।' গোপালচন্দ্র রায়—'ভারতভূমি কবিতায় রচয়িতা কে?', রবীন্দ্রনাথের ছাত্রজীবন, প. ১০৩! (কলিকাতা, ১৯৮৬, প্রথম সংস্করণ।)

এই কবিতাটি যে কারণে যে ভাবে শিবনাথের ব্যঙ্গের বিষয় হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যের 'হৃদয়যমুনা' কবিতাটি কি সেভাবে তাঁর আক্রমণের যোগ্য হতে পারত? অনুরূপ কারণ কি আছে?

১৫ বারিদবরণ ঘোষ—সাহিত্য-সাধক শিবনাথ শাস্ত্রী, প. ৫৪, ৫৬, ৬১। (কলিকাতা, [১৩৮০], প্রথম সংস্করণ।)

১৬ বারিদবরণ ঘোষ—'শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র', তত্ত্বকৌমুদী, [৯১ বর্ষ, ১৭-১৮ সঙখ্যা], ১লা ও ১৬ই পৌষ ১৩৭৫।

১৭ বিপিনচন্দ্র পাল—সত্তর বত্সর : আত্মজীবনী, প. ২১২—৩। (কলিকাতা, ১৩৬২, প্রথম সংস্করণ।)

১৮ গোপালচন্দ্র রায়—অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র, প, ৩৯। (কলিকাতা, ১৯৭৯, প্রথম সংস্করণ।)

১৯ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত নবীনচন্দ্রের চাকুরির ইতিহাসে (দ. নবীনচন্দ্র সেন, প. ৯, সাহিত্য-সাধক চরিতমালা-৫১) আলোচ্য সময়ে কোনো ছুটি নেই। সরকারি কাগজপত্র অনুসারে ১. ২. ১৮৭৭ তারিখে নবীনচন্দ্রের দু মাসের ছুটি মঞ্জুর হয়। (General Department, Appointment Branch. Proceedings No. B 576-7, January 1877.), তিনি কদিন পরে ছুটি নেন, এবঙ ছুটি ফুরোবার আগেই ২. ৪. ১৮৭৭ তারিখে কাজে যোগ দেন। (Ditto, No. B 285, April 1877.)

২০ নবীনচন্দ্র সেন—আমার জীবন, দ্বিতীয় ভাগ, প. ৩৬৮—৯। (কলিকাতা, ১৩১৬, প্রথম সঙস্করণ।)

২১ তদেব, প. ৩৭০।

২২ 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' (১৮৬২) দুষ্মন্ত তাঁকে ভুলে গিয়ে কর্তব্যচ্যুত হয়েছেন, প্রেমের দাবিতে এই অভিযোগ শকুন্তলা প্রকাশ করেছেন, তবে পরোক্ষভাবে সখীদের কথায়—

নিন্দে যবে অনুসূয়া মন্দ কথা কয়ে,
অপবাদে প্রিয়ম্বদা তোমায়,—কি বল্যে
বুঝাবে এ দোঁহে দাসী, কহ তা দাসীরে?

('দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা')

এখানে প্রাচীন সাহিত্যের নায়িকার অবয়বে আধুনিকার অভিযোগ ধ্বনিত হয়েছে।

২৩ দ. '"সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী', 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবঙ পরাধীনতা' প্রভৃতি প্রবন্ধ।

২৪ Society for the Higher Training of Young Men, *Indian Mirror,* 13.10.1893. এতে বক্তৃতা ও সভার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। সঙক্ষিপ্ত বর্ণনার জন্য দ. Society for the Higher Training of Young Men, *Statesmen,* 12. 10. 1893, p 3, col 3. সঙক্ষিপ্ততর বর্ণনার জন্য দ.—(ক) *Amrita Bazar Patrika,* 11. 10. 1893, p, 2, col. 6. (খ) শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্কিম-জীবনী, প. ৩৮৭। (কলিকাতা, ১৩৩৮, তৃতীয় সঙস্করণ।)

২৫ চৈতন্য লাইব্রেরি আয়োজিত বঙ্কিম স্মৃতিসভায় পঠিত। প্রথম প্রকাশ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'বঙ্কিমচন্দ্র', সাধনা, বৈশাখ ১৩০১। প্রবন্ধটি পরে তাঁর 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে সঙকলিত হয়েছে।

২৬ এই রচনার ইতিহাস সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য : অক্ষয়চন্দ্র সরকার—'পিতাপুত্র', বঙ্গভাষার লেখক, প. ৬৩৬—৭। (কলিকাতা, ১৩১১, প্রথম সঙস্করণ; হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।) এই রচনাগুলির মধ্যে ছয়টি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। দ. অক্ষয়চন্দ্র সরকার—রূপক ও রহস্য। (কলিকাতা, ১৩৩০, প্রথম সঙস্করণ; অজরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত।)

২৭ অজরচন্দ্র সরকার--বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা, প. ২৩। (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, [১৯৪০], প্রথম সংস্করণ)। অজরচন্দ্র 'সাধারণী'-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্রের ছেলে।

২৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'বঙ্কিমচন্দ্র' [শেষ অনুচ্ছেদ], জীবনস্মৃতি। নিম্নরেখা আমার।

২৯. গোপালচন্দ্র রায়—'ভারতভূমি কবিতার রচয়িতা কে?' রবীন্দ্রনাথের ছাত্রজীবন, প. ১০৩। (কলিকাতা, ১৯৮৬, প্রথম সংস্করণ।)

৩০. তাঁর অন্য ডায়েরির মত জ্যোতিষচন্দ্রের ১৮৭৯ সালের ডায়েরিটি নৈহাটি 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা'য় সংরক্ষিত আছে।

৩১. এই কবিতাটির প্রসঙ্গে জ্যোতিষচন্দ্রের ১৮৭৭ সালের ডায়েরি থেকে দুটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

'21st June–Composed a piece of poem to-day and handed it over to Professor Gopal Chandra Gupta for inserting it in the Education Gazette'.

'29th June–Saw to-day that poem written by me inserted in the Education Gazette.'

বঙ্কিমচন্দ্রের অজ্ঞাত রচনা

কবিতা

১

কেন কাঁদিব না সখে, কেন ভা[বি]ব না
সে কম মোহিনী মূর্ত্তি নয়নরঞ্জন
তুমি কি জানিবে হায়, কতেক বৎ[সর] আজ
কত সুখ কত আশা দিয়া বিসর্জ্জন
পাগলের মত আহা, বেড়াইয়াছি ছুটি ছুটি,
তীব্র হলাহল বুকে করিয়া ধারণ
ফেটেছে [?] হৃদয় তবু ফোটেনি বয়স

২

কি জানিবে কতদিন বুকে হাত খানি
নে[ ] যেন ফাটে বক্ষ শতধা হইয়া।
নির্জনে চীৎকার করি, কাঁদিয়াছি প্রাণভরি—
করিবারে লঘু পথে হৃদয়ের ভার
[প্রতি] পলে দীর্ঘশ্বাস [?] ক্ষরিয়াছে আ[হা]
চূর্ণিয়াছে প্রতি শ্বাসে [?] হৃদয় আ[মার]
নিতান্ত ব্যথিত মনে, ডেকেছি করুণা
নিবাতে এ তীব্র জ্বালা দারুণ।

৩

কি দারুণ জ্বালা সদা বুকের মাঝারে
কি [জ্বালা]—কি তীব্র জ্বলিছে নিয়ত

চিঠি

মহোদয়গণ!

আপনাদিগের গ্রামে সর্ব্বদা চুরির কথা শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তন্মধ্যে পুলিসে সেদিন কেবল দুইটি চুরির এজাহার হইয়াছে। বোধ হয়, ইহাও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের অনিচ্ছাক্রমে হইয়া থাকিবে! আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, গ্রামবাসীরা ইচ্ছাপূর্বক এইরূপ চুপ করিয়া থাকাতে পুলিস কর্ম্মচারিগণের কত কষ্ট হয়। যাহা হউক আপনারা গ্রামের তস্করতা বিষয়ে যাহা কিছু জানেন, আমাকে জানাইলে বাধিত হইবে। বিশেষতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আমার গোচর করিলে আমি আপনাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিব।

১ম।। কোন ২ বাটীতে সম্প্রতি চুরি হইয়াছে।

২য়।। যে সকল লোক ঐ ঘটনায় লিপ্ত ছিল বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে ও আপনাদিগের যে সকল লোকের প্রতি সন্দেহ জন্মে, তাহাদিগের নাম।

৩।। আপনাদিগের গ্রাম ও নিকটস্থ গ্রামবাসীদিগের মধ্যে যে সকল লোকের চরিত্রের প্রতি আপনারা সন্দেহ করেন, তাহাদিগের নাম!

৪র্থ।। কোন বিষয়ের তদারকের সময় পুলিস কর্ম্মচারিগণের যেরূপ অমনোযোগিতা ও অসদ্ব্যবহার দেখিতে পান তাহার বিবরণ।

সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা ঐ সকল বিষয় উত্তমরূপে অবগত আছেন, তাঁহাদিগের সহিত আমার মৌখিক আলাপ হইলে নিঃসন্দেহ অনেক উপকার হইতে পারে। অতএব আপনারা আমার সহিত সর্ব্বদা সাক্ষাত্ করিলে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইব।

বঙ্কিমচন্দ্রের অজ্ঞাত রচনা প্রসঙ্গে

এই অসম্পূর্ণ কবিতাটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষত্ থেকে সঙ্গ্রহ করেছেন শ্রীমৃদুলকান্তি বসু। কবিতাটি এযাবত্ অপ্রকাশিত। তৃতীয় বন্ধনীচিহ্নিত অঙশ কীটদষ্ট, বন্ধনীর অন্তর্ভুক্ত শব্দ আমাদের সঙযোজন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথমা স্ত্রীর নাম মোহিনী।

১ সঙখ্যক চিঠি খুলনা জেলার সেনহাটী দেশহিতৈষিণী সভার সদস্যদের কাছে লেখা। বঙ্কিমচন্দ্র খুলনার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন নভেম্বর ১৮৬০ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৮৬৪ পর্যন্ত। জুলাই ১৮৬৩ বা তার পূর্বে কোন সময় উল্লিখিত সভা স্থানীয় চুরি বন্ধ করার আবেদন জানালে বঙ্কিমচন্দ্র এই চিঠি লেখেন। চিঠিটি সাপ্তাহিক 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় মুদ্রিত হয় (৮ শ্রাবণ ১২৭০, ২৩ জুলাই ১৮৬৩)। শ্রীমৃদুলকান্তি বসুর সৌজন্যে আমরা এটি পেয়েছি।

অতিথি সম্পাদক, বাঙলা দেশ

ধ্রুববাদ আন্দোলন ও যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

উনিশ শতকের অধুনা-বিস্মৃত বাঙালি মনীষীদের মধ্যে যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (১৮৪২-১৯০২) দুটি কারণে স্মরণীয়। প্রথমত বাঙলাদেশে ধ্রুববাদ আন্দোলনে তিনি প্রধান ব্যক্তি ; দ্বিতীয়ত বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মমতের বিবর্তনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের ঘনিষ্ঠতা।

খুলনা জেলার শ্রীপুর থেকে মোহনচাঁদ ঘোষ (১৮০১-১৮৬২) প্রথমে মুর্শিদাবাদে এবঙ পরে ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে খিদিরপুরে বসবাস আরম্ভ করেন। খিদিরপুরের মোহনচাঁদ স্ট্রিট তাঁর নামাঙ্কিত। তাঁর দুই ছেলে—বড় শ্রীশচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৬০) এবঙ ছোট যোগেন্দ্রচন্দ্র। যোগেন্দ্রচন্দ্র ২.১.১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে (২০ পৌষ ১২৪৮ শন) খিদিরপুরে ১৪ নম্বর পদ্মপুকুর স্ট্রিটের (বর্তমান নাম হেমচন্দ্র স্ট্রিট) বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। মোহনচাঁদের কনিষ্ঠ, ডেপুটি কালেক্টর তারাচাঁদ অপুত্রক অবস্থায় মেদিনীপুরে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে মারা গেলে শ্রীশ-যোগেন্দ্র তাঁর উত্তরাধিকারী হলেন। মোহনচাঁদ ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে কাশীতে মৃত্যুকালে খুলনা, ২৪ পরগনা ও কলকাতায় প্রচুর ভূসম্পত্তি রেখে যান।[১] তা দীর্ঘকাল তাঁর বঙশধরদের জীবিকার সঙস্থান করেছিল। শৈশবে মায়ের মৃত্যুতে যে বালবিধবা, সন্তানহীনা পিসিমা ভুবনমোহিনী তাঁকে পালন করেন, তিনি ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে মারা যান।

শ্রীশচন্দ্র ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে বি. এ. পাশ করেন, সন্তানের জনক হন, এবঙ ৮.৮.১৮৬০ তারিখে আত্মহত্যা করেন।[২] ফলে তাঁর শোকার্ত বন্ধু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'চিন্তাতরঙ্গিণী কাব্য' (১৮৬১) রচনা করেন।[৩] ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে যোগেন্দ্রচন্দ্র হিন্দু স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে থাকেন। তিনি ঐ বছর জুনিয়র স্কলার্শিপ পরীক্ষাতেও বৃত্তিলাভ করেন।[৪] শোকবিমূঢ় পরিবার সম্ভবত ইঙরাজি শিক্ষাকে আত্মহত্যার কারণ ভেবে তাঁকে আর কলেজে পড়তে দেননি।[৫] তাঁর গৃহশিক্ষা বন্ধ থাকেনি।

তাঁদের বাড়িতে দেবপূজার 'সঙ্কল্প' মোহনচাঁদের নামে করা হত। মোহনচাঁদের দীর্ঘ কাশীবাসকালে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে একটি পূজায় যোগেন্দ্রচন্দ্র আপত্তি জানিয়ে বলেন, যে যেহেতু তিনি ঈশ্বর ও হিন্দুধর্মে বিশ্বাস করেন না, সেজন্য তাঁর নামে 'সঙ্কল্প' অবাঞ্ছনীয়। তখন শ্রীশচন্দ্রের শিশুপুত্র (খিদিরপুরে 'বকু সাহেব' নামে বিখ্যাত) তারাপদর নামে পূজার 'সঙ্কল্প' করা হয়। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, যে তরুণ বয়সেই যোগেন্দ্রচন্দ্র নাস্তিক হয়েছিলেন। দীর্ঘকাল পরে ব্যবহারে বাঙালি ও ধর্মবিশ্বাসে য়ুরোপিয় যোগেন্দ্র, এবঙ পোশাকে ইঙরাজ ও ধর্মে হিন্দু তারাপদ একত্র থাকতে পারেননি। হেমচন্দ্রের সাহায্যে তাঁদের সম্পত্তি-বিভাগ হয়। এই বিচ্ছেদ বোধহয় যোগেন্দ্রচন্দ্রের ধ্রুববাদে বিশ্বাস নির্দেশ করে।

সূত্র ঃ মন্মথনাথ ঘোষ—হেমচন্দ্র, ১ম খন্ড, প. ৬১। (কলকাতা, ১৩৩৫)
সৌজন্য ঃ ড. অলোক রায়।

উনিশ শতকের শেষার্ধে ফরাশি দার্শনিক Auguste Comte (১৭৯৮-১৮৫৭) প্রচারিত ধ্রুববাদ (Positivism) শিক্ষিত বাঙালিদের প্রভাবিত করেছিল। তার ভিত্তিতে কঁত্ পরে মানবধর্মের (Religion of Humanity) প্রতিষ্ঠা করেন। প্রত্যক্ষকে জ্ঞানের একমাত্র ভিত্তি বলা, সামাজিক বিবর্তনের ত্রিস্তরবিভাগের দ্বারা ইতিহাসের নতুন ব্যাখ্যা, বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ, মানুষকে সর্বাধিক গুরুত্বদান, ঈশ্বরবিশ্বাসের জায়গায় মানবসমাজপূজা প্রভৃতি এই দর্শন ও ধর্মের অঙ্গ। ধ্রুববাদের প্রভাবে যোগেন্দ্রচন্দ্র নাস্তিক হয়েছিলেন। তাঁর রচনাগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা নিচে সাজানো হল।[৬]

১৮৭২ On the Effects produced on the Fortunes of different Nations and of Makind in General, by the individual character of remarkable persons, illustrated from History.[৭]
স্তোত্র[৮]
'একান্নবর্তী পরিবার', বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১২৭৯।

১৮৭৩ শ্রীযঃ—'জাতিভেদ', বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ, অগ্রহায়ণ ১২৮০, কার্তিক-পৌষ ১২৮১।

১৮৭৫ The Law of Enhancement of Rent with Suggestions for its amendment.[৯]

১৮৭৬ 'আত্মাভিমান', বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১২৮১।
The Rent Question in Bengal, *C. R.*, 1876, vol 63, no. 125 pp. 88-124.
দুর্গাস্তব[১০]

১৮৭৭ The Rent Question. A Reply to Sir Henry Ricketts,[১১] *C R.*, 1877, vol. 65, no. 129, 161-6.

১৮৭৮ [অপ্রকাশিত বাঙলা প্রবন্ধ][১২]
Anon.–Dignity of Labour,[১৩] *Brahmo Public Opinion*, 24.10.1878. (Vol. I, no. 30.)

১৮৭৯ বিবেক[১৪]
[বাঙলা প্রবন্ধ][১৫]
[An essay on communal organisation.][১৬]

১৮৮০ 'বঙ্গ বৈজ্ঞানিক', বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১২৮৭।
যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ—'উপাসনাবিষয়ক তুলনা',[১৭] বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১২৮৭।
Caste in India. (From a native point of view.)[১৮], *C.R.*, October 1880, vol. 71, no. 142, pp. 273-286.

১৮৮১ Our Joint Family Organisation,[১৯] *C. R.*, October 1881, vol. 73, no.146, pp. 275-300.

১৮৮২ The Village Community of Bengal and Upper India,[২০] *C. R.*, April 1882, vol. 74, no. 148, pp. 227-270.

শ্রীযো--'অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য',[২১] বঙ্গদর্শন, বৈশাখ-আষাঢ়, ভাদ্র, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১২৮৯।
সভার কার্যনির্বাহবিষয়ক বিধি।[২২]
Remarks Explanatory to the Petition to Parliament of the Zemindars of Bengal and Bihar regarding the Bengal Tenancy Bill.[২৩]

১৮৮৩ On Transmigration of Souls : I. Solidarity and Continuity,[২৪] *C.R.*, October 1883, vol. 77, no. 154, pp. 264-276.
শ্রীযো--'নারায়ণ'[২৫], বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১২৯০, প. ২৭-৪২।

১৮৮৪ আমার গৃহাশ্রিত স্মৃতিরক্ষণ বিষয়ক কতিপয় স্তোত্র।[২৬]
'ব্রততত্ত্ব',[২৭] নবজীবন, আশ্বিন-অগ্রহায়ণ ১২৯১।
Chaitanya's Ethics.[২৮]
[খোজা-সমস্যা][২৯]
The Idea of Humanity.[৩০]

১৮৮৫ A Scheme of Caste Reform.[৩১]
The Idea of Humanity.[৩২]

১৮৮৬ Worship of the Dead, or the Positivist Mahalaya,[৩৩] *Concord*, February 1887, vol. I, no. 2, pp. 41-56.

১৮৮৭ Letter to the Editor, *Friend of India and Statesman*, 6.7.1887, p. 2.

১৮৮৮ Brahman, the Priest.[৩৪]
'ব্রহ্ম নিরূপণ--আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম।',[৩৫] প্রচার, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫।
'পাশ্চাত্য দর্শন।',[৩৬] প্রচার, আষাঢ়-চৈত্র ১২৯৫।

১৮৮৯ 'বাল্যাবস্থায় শিক্ষাপ্রণালী',[৩৭] প্রচার, ফাল্গুন-চৈত্র ১২৯৫, প. ৪৪৩-৮।
Robert Elsmere, *N. M.*, June 1889, vol. III, pp. 207-217.
Conduct in Society : A Treatise on Morals.[৩৮]

১৮৯০ 'পাশ্চাত্য দর্শন', সাহিত্য, বৈশাখ ১২৯৭।
'প্রণয়, ভক্তি এবঙ দয়া', সাহিত্য, শ্রাবণ, আশ্বিন ১২৯৭।
Open Questions in Morality,[৩৯] *N. M.*, May-July 1890.

১৮৯১ The Age of Consent.[৪০]
Remarks on Bill for the amendment of I.P. Code, sec. 375.[৪১]
A Note on Indian Congress,[৪২] *N. M.*, June 1891, pp. 227-235.

১৮৯২ The East and the West.[৪৩]

১৮৯৪ The Brahman Problem.[৪৪]

Letter on Hindu Sea-Voyage Movement.[৪৫]

In Memory of Bankim Chandra Chatterjee,[৪৬] under Chaitanya library, in *The Calcutta University Magazine*, 1.6.1894, pp. 67-68.

'শাস্ত্র ও যুক্তি',[৪৭] সাহিত্য, মাঘ ১৩০০।

১৮৯৫ The Commemoration of Comte's Death.[৪৮]

১৮৯৬ Brahmanism and Ethics.[৪৯]

The Political Side of Brahmanism.[৫০]

১৮৯৭ Brahmanism and Marriage.[৫১]

The Marriage Question.[৫২]

The Hindu Theocracy : How to further its ends.[৫৩]

১৮৯৮ Continuity of Indian Life and History.[৫৪]

Hindu Jurisprudence and Indian Education.[৫৫]

[A list of positivist festivals.][৫৬]

১৮৯৯ [কয়েকটি অমুদ্রিত রচনা][৫৭]

১৯০০ A Memorial Note.[৫৮]

১৯০১ Brahmanism and the Sudra, or the Hindu Labour Problem.[৫৯]

The Anniversary of Richard Congreve.[৬০]

In Memorium : Nilkantha Majumdar.[৬১]

The Substance of an Address.[৬২]

Colonial Policies : assimilation and autonomy, *C. R.*, 1901, vol. 112, no. 224, pp. 278-283.

১৯০২ The Views of an Eniment Hindu Positivist on Hindu Social Matters,[৬৩] *The Dawn*, vol. vi, 1903 March (pp. 225-9), April (pp. 265-8).

যোগেন্দ্রচন্দ্রের অনেক বাঙলা প্রবন্ধ 'বঙ্গদর্শন' পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল : 'সোমপ্রকাশে' তিনি কচিত্ লিখেছেন। বঙ্গদর্শন ও বঙ্কিমচন্দ্রের সূত্রে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। ফলে 'নবজীবনে' তাঁর রচনা ছাপা হয়েছিল। তবে প্রথম বর্ষের পরে লেখকদের তালিকায় তাঁর নাম নেই। যোগেন্দ্রচন্দ্র 'প্রচার' পত্রের লেখক হয়েছিলেন। পত্রর সঙক্ষিপ্ত আকার সম্বন্ধে কৈফিয়ত্ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, যে অবহেলিত পত্র দিয়ে ঘুড়ি বানিয়ে ছেলেরা ওড়ায়। তখন 'হেম বাবু, রবীন্দ্রবাবু, নবীন বাবুর কবিতা, দ্বিজেন্দ্র বাবু, যোগেন্দ্র বাবুর দর্শনশাস্ত্র, বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস, চন্দ্রবাবুর সমালোচনা, কালীপ্রসন্নবাবুর চিন্তা সূত্রবদ্ধ হইয়া পবনপথে উত্থানপূর্বক বালকমণ্ডলীর নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিতে থাকে।'[৬৪] এ থেকে যোগেন্দ্রচন্দ্রের

রচনা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রদ্ধা স্পষ্ট। 'প্রচারে'র পরে বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহভাজন সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' মাসিকপত্রে যোগেন্দ্রচন্দ্রের কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরে তাঁর কোনো বাঙলা রচনা ছাপা হয়নি।

বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে যখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। প্রথম সঙ্খ্যায় বিজ্ঞাপনে বঙ্গদর্শনের লেখকদের তালিকায় যোগেন্দ্রচন্দ্র নেই, কিন্তু কৃষ্ণকমল উপস্থিত। কৃষ্ণকমল কখনো বঙ্গদর্শনে কিছু লেখেননি। সেজন্য 'বঙ্গদর্শনে'র চতুর্থ বর্ষের শেষ সঙ্খ্যায় 'বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ' রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র কৃতজ্ঞতা স্বীকারের সময় কৃষ্ণকমলের নাম করেননি ; অথচ ওই তালিকায় যোগেন্দ্রচন্দ্র উপস্থিত। অনুমান করা সম্ভব, যে বঙ্গদর্শন সূত্রপাতের সময় বঙ্কিমচন্দ্র ও যোগেন্দ্রচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা ছিল না, শ্রীশচন্দ্রের সূত্রে ও কৃষ্ণকমলের মাধ্যমে পরে তা হয়। এর আগে গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮২৯-১৮৬৯) Bengalee পত্রে ধ্রুবদর্শন সম্বন্ধে কৃষ্ণকমলের একাধিক রচনা প্রকাশিত হয়।[৬৫] ধ্রুববাদে উত্সাহ সম্ভবত বঙ্কিমকে কৃষ্ণকমলের রচনায় আগ্রহী করে। যোগেন্দ্রচন্দ্রের রচনার বিষয় ধ্রুবদর্শন। পরে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিম হাওড়াতে বদলি হন। কৃষ্ণকমল সেখানে ওকালতি করেন। দুজনে একত্রে হাওড়া থেকে খিদিরপুরে যোগেন্দ্রচন্দ্রের বাড়িতে আলোচনার জন্য যেতেন।[৬৬]

এই ঘনিষ্ঠতার মূল্যবান নিদর্শন Letters on Hinduism নামে বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্বপ্রকাশিত আটটি ইঙরাজি চিঠি।[৬৭] এগুলি যোগেন্দ্রচন্দ্রকে সম্বোধন করে লেখা। প্রথম পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ধ্রুববাদে তাঁর পূর্ণবিশ্বাসের অভাব জানিয়ে হিন্দুধর্মকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। দ্বিতীয় পত্রের আলোচনা ধ্রুববাদের প্রভাবমুক্ত নয়। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে লেখা এই পত্রগুচ্ছ প্রকাশ করা তাঁর উদ্দেশ্য হলেও বঙ্কিমচন্দ্র আলোচনা সম্পূর্ণ বা পত্রাবলী প্রকাশ করেননি। কেবল 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থের 'ক্রোড়পত্র-খ'তে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি সঙ্কলন করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যে একদা ধ্রুববাদের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন, তা সুবিদিত। বিবিধ প্রবন্ধের কয়েকটি রচনা, কমলাকান্তের দপ্তরের প্রথম সঙখ্যা, 'কোমত্ দর্শন' প্রবন্ধ, রজনী, দেবী চৌধুরাণী, ধর্মতত্ত্ব, Letters on Hinduism প্রভৃতি রচনা তার প্রমাণ। Comte-এর দর্শন ঠিক কখন থেকে, কিভাবে বাঙলাদেশে প্রচারিত হয়েছিল, এবঙ বঙ্কিমচন্দ্র কবে, কিভাবে ধ্রুববাদে আগ্রহী হয়ে ওঠেন, সে বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য এখনো অপ্রকাশিত। তাঁর দুই বন্ধু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ও যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ধ্রুববাদী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মমত প্রসঙ্গে কৃষ্ণকমলের ভূমিকা যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, তাঁর স্মৃতিকথা তার প্রমাণ।[৬৮] যোগেন্দ্রচন্দ্রের বন্ধুত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্রুববাদচর্চা ও ধর্মাদর্শ গঠনে প্রভাব ফেলে থাকতে পারে। নিচের তথ্যগুলি এই অনুমানের সমর্থক।

(১) দুজনে প্রায়ই পরস্পরের বাড়িতে যেতেন। সাহিত্য, আইন ও দর্শন সম্বন্ধে তাঁদের আলোচনা হত।

(২) ধ্রুববাদ ও মানবধর্মের প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় ছিল। যোগেন্দ্রচন্দ্র বাঙালি ধ্রুববাদীদের নেতা ছিলেন।[৬৯]

(৩) J. R. Seeley (১৮৩৪-১৮৯৫) দুজনের প্রিয় লেখক ছিলেন।[৭০]

(৪) যোগেন্দ্রচন্দ্রকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের Letters on Hinduism-এ তাঁর ধর্মচিন্তার সুন্দর পরিচয় আছে।[৭১]

(৫) বাঙলা সাময়িকপত্রে যোগেন্দ্রচন্দ্রের প্রবন্ধ রচনার পিছনে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণা সক্রিয় ছিল।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের রচনাগুলির সাধারণ পরিচিতি হিশাবে কয়েকটি মন্তব্য করা চলে।

(১) তিনি শুধু প্রথমদিকে বাঙলা রচনা লিখেছিলেন ; তাঁর অধিকাংশ রচনার ভাষা ইঙরাজি। রচনার বিষয়বস্তু প্রধানত ধ্রুবদর্শন ও মানবধর্ম। তবে আইন ও জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধেও রচনা আছে। হয়ত বিষয় এবঙ অবাঙালি পাঠকদের প্রতি আগ্রহে ভাষা ইঙরাজি হয়েছে। তা বাঙলাদেশে ধ্রুববাদের আন্দোলনকে দুর্বল করে তুলেছে।

(২) আইন সম্বন্ধে রচনায় তিনি (পরবর্তীকালে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি) রমেশচন্দ্র মিত্রের সাহায্য পেয়েছিলেন। জাতি সম্বন্ধে আলোচনা প্রায়ই ভারতে বর্ণভেদ নয়, Comte-এর মানবধর্মে পরিকল্পিত ব্যবস্থার ভারতীয় রূপান্তর মাত্র। শুধু Calcutta Reviewতে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি এই বিষয়ে পৃথকধর্মী।

(৩) তাঁর কোনো রচনাতে ধ্রুবদর্শন ও মানবধর্ম সম্বন্ধে কোনো নতুন ব্যাখ্যা বা নিজস্ব মৌলিক চিন্তার পরিচয় বিশেষ নেই। তিনি কেবল ঐ ধর্মাদর্শ ও তার অনুষ্ঠানগুলিকে ভারতীয় রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। এই কাজে ইঙলন্ডে ধ্রুববাদীদের নেতা Dr. Richard Congreve (১৮১৮-১৮৯৯) তাঁর প্রধান সহায় ছিলেন।[৭২]

(৪) বাঙলা প্রবন্ধগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ নির্দেশ করে।

(৫) তাঁর বাঙলা প্রবন্ধগুলি পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে লেখা হলেও, কেবল On Transmigration of Souls ছাড়া অন্যান্য ইঙরাজি প্রবন্ধ বাদ-প্রতিবাদ বা সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে হঠাৎ লেখা। National Magazine, vol. v, no. 7-এ তিনি কঙগ্রেসের রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য কলেজ-জীবন থেকে আমৃত্যু যোগেন্দ্রচন্দ্রের বন্ধু ছিলেন। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের প্রতিবেশী, আর্থিক দিকে উপকৃত, এবঙ শ্রীশচন্দ্রের বন্ধু ছিলেন। শ্রীশচন্দ্রের মৃত্যুর পরে ধীরে ধীরে যোগেন্দ্রচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।[৭৩] বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্ব হয়।[৭৪] প্রতিবেশি হিশাবে হেমচন্দ্রের অনুজ ঈশানচন্দ্রের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। কৈশোর থেকে প্রতিবেশি হিশাবে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও উমাকালী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল, যেমন পরে হয়েছিল দ্বারকানাথ মিত্র, রমেশচন্দ্র মিত্র ও নীলকণ্ঠ মজুমদারের সঙ্গে। পরে অক্ষয়চন্দ্র সরকার,[৭৫] ভূদেব মুখোপাধ্যায়,[৭৬] সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,[৭৭] কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়, H. J. S. Cotton (১৮৪৫-১৯১৫), J. C. Geddes (?

-১৮৮০), H. Beveridge (১৮৩৭-১৯২৯) প্রভৃতি ব্যক্তির সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গ হন। এই ধ্রুববাদী ও পুনরুত্থানবাদী বন্ধুদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ঘটাতে যোগেন্দ্র সক্রিয় ছিলেন। দ্বারকানাথ মিত্র ও হেমচন্দ্রের সঙ্গে তিনি কৃষ্ণকমলের পরিচয় করিয়ে দেন, এবঙ তাঁর কাছে যাতায়াতের সূত্রে কৃষ্ণকমল ও বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়।[৭৮] পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নীলকণ্ঠ মজুমদারের যোগসূত্র ছিলেন তিনি।[৭৯]

প্রতিবেশি ও বন্ধু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার উপর যোগেন্দ্রচন্দ্রের প্রভাব ছিল। হেমচন্দ্রের *Brahmo Theism in India* (Calcutta, 1869) গ্রন্থে ব্রাহ্ম-বিরাগ ও কঁত্-প্রীতির যে নিদর্শন রয়েছে, তা এই প্রভাবের সাক্ষ্য। সাধারণের কাছে তা অবিদিত ছিল না।[৮০] তাঁর 'দশমহাবিদ্যা' (১৮৮২) কাব্যের শেষে কঁত্-কল্পিত Humanity-র রূপ 'শিশুক্রোড়ে মাতৃমূর্তি' বর্ণনার প্রয়াস করা হয়েছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের বিরোধিতায় সেই প্রয়াস পরিত্যক্ত হয়।[৮১] বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্র (১৮৪০-৯৯) যৌবনে ধ্রুববাদী ছিলেন : পরবর্তী জীবনে তাঁর বিশ্বাস বিচলিত হয়েছিল।[৮২] সম্ভবত যোগেন্দ্রচন্দ্র ও দ্বারকানাথ মিত্রের প্রভাব এর সঙ্গে জড়িত ছিল।

ভ্রাতুষ্পুত্র তারাপদ বড় হলে যোগেন্দ্রচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত যৌথ পরিবার ভেঙ্গে যায় এবঙ সম্পত্তি-বিভাগ হয়। মামলা এড়ানোর জন্য দুজনের অনুরোধে হেমচন্দ্র মধ্যস্থতা করে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে সম্পত্তি-বিভাগ করে দেন। তারপর যোগেন্দ্রচন্দ্র পদ্মপুকুরের বাড়ি ছেড়ে কিছুদিন অস্থায়ীভাবে ভবানিপুরে, এবঙ পরে নেমক মহাল রোডে নতুন বাড়িতে উঠে যান।[৮৩] এতে তাঁদের মামলার বিরাট খরচ বেঁচে যায়, কিন্তু উভয় পক্ষই অভিযোগ পোষণ করতে থাকেন, যে হেমচন্দ্র অন্যের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছেন।[৮৪] এর পরে হেমচন্দ্রের সঙ্গে যোগেন্দ্রচন্দ্রের হৃদ্যতায় ফাটল ধরে। অন্ধ হেমচন্দ্র শেষজীবনে যখন অর্থকষ্ট ভোগ করছিলেন, তখন পরিচিত বন্ধুরা—এমনকি শ্রীশচন্দ্রের ছেলে বকু শাহেবও তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এই তালিকায় সর্বনিম্ন স্থান যোগেন্দ্রচন্দ্রের।[৮৫] যোগেন্দ্রচন্দ্র ধ্রুবধর্মের নামে নিঃস্বার্থ পরোপকার ও সর্বজনহিতের মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন, কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থবোধকে কিছুমাত্র নিয়ন্ত্রিত করতে পারেননি। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য প্রজাদের সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্ক ও তাঁর চারিত্রিক ঔদার্যের প্রশঙসা করেছেন।[৮৬] কিন্তু সেই ঔদার্য কেবল বাক্যে নিবদ্ধ। যোগেন্দ্রচন্দ্রের ব্যবহার ভিন্ন মনোভাবের পরিচয় দেয়।[৮৭] অর্থাত্ ধ্রুববাদের চর্চা যোগেন্দ্রচন্দ্রের চরিত্রে কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটায়নি। নিজের আর্থিক স্বার্থ আহত না হলে তিনি পরহিতকামী।

দ্বারকানাথের মধ্যস্থতায় গেডেসের সঙ্গে যোগেন্দ্রচন্দ্রের প্রথম পরিচয় হয়ে থাকতে পারে। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে যোগেন্দ্রচন্দ্রের একটি অপ্রকাশিত রচনা পড়ে গেডেস উত্সাহী হয়ে কঙগ্রিভের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপের ব্যবস্থা করে দেন।[৮৮] গেডেসের প্রয়োজনে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগেন্দ্রচন্দ্র পরিচিত হন।[৮৯] ইতিমধ্যে কটনের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ হয়েছে। তখন কলকাতায় ধ্রুববাদী সমিতি প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলছে। এই

যোগাযোগের পরে যোগেন্দ্রচন্দ্র ক্রমশ গোঁড়া ধ্রুববাদী হয়ে ওঠেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, দ্বারকানাথ নিজের চাঁদার সঙ্গে ধ্রুববাদে অনুরাগী আরো কয়েকজন ব্যক্তির চাঁদাও কঙগ্রিভের কাছে পাঠিয়েছেন, কিন্তু কখনো যোগেন্দ্রচন্দ্রের চাঁদা পাঠাননি। যোগেন্দ্রচন্দ্র কঙগ্রিভের কাছে প্রথম চাঁদা পাঠান গেডেসের মাধ্যমে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে,[৯০] তাঁদের পত্রালাপের অল্পদিন পরেই ; কিন্তু তিনি ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দেও ধ্রুববাদী সমিতির সদস্য হতে ইতস্তত করেছেন।[৯১] ঐ সময় পর্যন্ত তাঁর মতৈক্য কেবল তাত্ত্বিক। ব্যবহারে তিনি পরিবর্তনকামী ছিলেন না। কঙগ্রিভের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ হবার পরে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে যোগেন্দ্রচন্দ্র স্বেচ্ছায় চাঁদা পাঠান[৯২] এবঙ সদস্য হিসাবে যোগদানের বিরুদ্ধে তাঁর আপত্তি তুলে নেন।[৯৩] বিশ্বাস পরিবর্তিত হবার পর থেকে তিনি আমৃত্যু ধ্রুববাদী ছিলেন।[৯৪]

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সঙ্গে যোগেন্দ্রচন্দ্রের পরিচয় আবাল্য : দ্বারকানাথের সঙ্গে পরিচয় যৌবন থেকে। যোগেন্দ্রচন্দ্রের মধ্যস্থতায় তাঁর বাড়িতে কৃষ্ণকমল ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে হেমচন্দ্রের সঙ্গে এবঙ ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বারকানাথের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন। ধ্রুববাদের সঙ্গে কৃষ্ণকমলের পরিচয় ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে। দ্বারকানাথের ধ্রুববাদী পড়াশুনার আরম্ভ আরো কয়েক বছর পরে। যোগেন্দ্রচন্দ্রের নাস্তিকতার প্রথম নিদর্শন মেলে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে দেবপূজায় 'সঙ্কল্পে'র ঘটনায়। তিনি কৃষ্ণকমল ও দ্বারকানাথকে ধ্রুববাদচর্চায় তাঁর গুরু হিশাবে স্বীকার করেছেন।[৯৫] অতএব, ১৮৬১-৬৫ খ্রিস্টাব্দে যোগেন্দ্রচন্দ্র ধ্রুববাদের সঙ্গে পরিচিত হন। পূর্বার্জিত নাস্তিকতা তাঁর মনে ধ্রুববাদচর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যোগেন্দ্রচন্দ্রের শেষ জীবনে রচিত কিন্তু অমুদ্রিত রচনার প্রসঙ্গে কৃষ্ণকমলের স্মৃতিকথার একদেশদর্শী বিবরণ যোগেন্দ্রচন্দ্রকে উপহাসাস্পদ করে তুলেছে। ধ্রুববাদে সঙস্কৃত সূর্যস্তব প্রভৃতি কথার পরে কৃষ্ণকমল আরো বলেছেন, 'এই সমস্ত উদ্যম দেখিয়া আমি বড়ই শঙ্কিত হইয়াছিলাম, পাছে জিনিষটা বিবেচক লোকদিগের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া পড়ে।' এবঙ 'যোগেন্দ্র কোঁতের যে হিন্দুয়ানি সঙস্করণ করিতে চাহিয়াছিলেন সেটা আমি বিশেষ পছন্দ করিতে পারি নাই।'[৯৬] কিন্তু কৃষ্ণকমলও একই আক্রমণের লক্ষ্য হতে পারেন। কঁতের Positivist Library-র অনুকরণে সঙস্কৃত বই দিয়ে কৃষ্ণকমল Pandit's Library-র তালিকা তৈরি করেছিলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন—'I lay before the public a catalogue of books prepared by my friend Babu Krishna Kamal Bhattacharya. It is published here with his permission under the heading Pandit's Library.'[৯৭] বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল বলেছেন—'কোঁতের ভক্ত শিষ্য দ্বারিবাবু স্ত্রীবিয়োগের পর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়া প্রকাশ্যত কোঁতের আজ্ঞা একপ্রকার উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন।'[৯৮] প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পরে তাঁর ধ্রুববাদী ছাত্র নীলমণি কুমারের দ্বিতীয় বিয়ে যে কঙগ্রিভ অনুমোদন করেছিলেন, তা কিন্তু কৃষ্ণকমল বলেননি। নিজের সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল বলেছেন—'প্রভাতকুমারের সিন্দুরকৌটা পড়িয়াছ? প্রভাত দেখছি

মনোগামিষ্ট নয়। ও প্লটটা কি প্রভাত আমার জীবনকাহিনী হইতে লইয়াছে?..আমার সম্বন্ধে চারিদিকে অনেক কথা রটিল; শেষে বিদ্যাসাগর একদিন আমায় বলিলেন—'আমার বন্ধুবান্ধব আমায় কি বলে জানিস? তুই আমার কথা শুনিস্, চিরকাল তুই আমার বাধ্য, আমি যদি তোকে এই বিয়ে করতে বারণ করি, তা' হলে তুই শুনবি আমার কথা।' আমি অম্লানবদনে উত্তর দিলাম—'আপনি কেন তাঁদের বলেন না যে, আমি আপনার কথা শুনতে না পারি; আমি আপনার অবাধ্য।'[৯৯] কৃষ্ণকমলকে নিয়ে হেমচন্দ্রের লেখা 'নাকে খত্' নক্সাতেও দুই স্ত্রীর কথা আছে।

যোগেন্দ্রচন্দ্র দীর্ঘকাল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্য এবঙ ১৮৯২-৯৫ ও ১৮৯৬-৯৭ খ্রিস্টাব্দে তার সহ-সভাপতি ছিলেন। এই বিষয়ে তাঁর অবস্থিতি জমিদার হিশাবে। কর সঙক্রান্ত খসড়া আইন আলোচনার জন্য ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ওই প্রতিষ্ঠানের সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।[১০০] ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত (১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ) ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভার সঙ্গে তিনি প্রথমাবধি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।[১০১] কলকাতার ধ্রুববাদী সমিতির প্রধান সদস্য ছিলেন তিনি।[১০২] যোগেন্দ্রচন্দ্র ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হন। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে তুলনামূলক আইন সম্বন্ধে গবেষণার জন্য তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ হাজার টাকা দান করেন এবঙ সিন্ডিকেট ৮.২.১৯০২ তরিখে সেই দান গ্রহণ করে যোগেন্দ্রচন্দ্রের নামে একটি গবেষণা-বৃত্তির ব্যবস্থা করেন।[১০৩] যদিও যোগেন্দ্রচন্দ্র সাধারণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চাইতেন না,[১০৪] তবু আরো কয়েকটি সঙস্থার সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। পিসিমার স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁর নাম অনুসারে যোগেন্দ্রচন্দ্র শ্রীপুরে ভুবনমোহিনী বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবঙ আমৃত্যু তার পরিচালনা করেন। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : (ক) হিন্দু হোস্টেল পুনর্নির্মাণের জন্য ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে গঠিত কমিটি;[১০৫] (খ) খিদিরপুর স্কুল ; (গ) পটলডাঙ্গায় (কলকাতা) প্রতিষ্ঠিত হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের জাতীয় বিদ্যালয়;[১০৬] এবঙ (ঘ) আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষার জন্য ভবানিপুরে আয়োজিত সভা।[১০৭]

যোগেন্দ্রচন্দ্র ৬ মার্চ ১৯০২ (২২ ফাল্গুন ১৩০৮) তারিখে খিদিরপুরে মারা যান। নানা কারণে মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্ব থেকে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। যোগেন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যুতে লন্ডনে চ্যাপেল স্ট্রিটের ধ্রুববাদী গির্জায় হেনরি কটন তাঁর নামে একটি স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠা করেন।[১০৮] এই উপলক্ষে তিনি যোগেন্দ্রচন্দ্র সম্বন্ধে একটি সশ্রদ্ধ দীর্ঘ বক্তৃতা করেন।[১০৯]

কলকাতার ধ্রুববাদী সমিতিতে যোগ দিয়ে যোগেন্দ্রচন্দ্র ধ্রুববাদী রচনার প্রয়াসে ক্রমশ বেশি উত্সাহী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি একবার Thomas à Kempis রচিত *Imitation of Christ* গ্রন্থের অনুবাদ করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন।[১১০] তার কারণ বোধহয় এই, যে গ্রন্থটি কঁতের প্রিয় ও ভক্তিমূলক। তবে কোনো অনুবাদ বোধহয় প্রকাশিত হয়নি। পরে কোন ধ্রুববাদী বন্ধুর—হয়ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের পরামর্শে

যোগেন্দ্রচন্দ্র Nineteenth Century পত্রে F. Harrison রচিত *A Layman's Creed* নামে একটি প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণে উত্সাহী হয়েছিলেন।[১১১] এই উত্সাহ বোধহয় নিষ্ফল ছিল। কঁত্ ফরাশি ভাষায় ধ্রুবদর্শন ও ধর্মের বই লিখেছেন। ধ্রুববাদে যোগেন্দ্রচন্দ্রের গুরু দ্বারকানাথ ও কৃষ্ণকমল ফরাশি ভাষা জানতেন। বঙ্কিমচন্দ্রও জানতেন। এজন্য ফরাশি ভাষার প্রতি দুর্বলতা থাকায় যোগেন্দ্রচন্দ্র চৈতন্যের নীতিতত্ত্ব গ্রন্থে না জেনেও একটি ফরাশি বাক্য ছেপেছেন।[১১২] কিন্তু ফরাশি ভাষায় তাঁর জ্ঞানের অভাব তিনি বারবার স্বীকার করেছেন।[১১৩]

ধ্রুববাদ ও মানবধর্মে উত্সাহী বাঙ্গালিদের অনেকে ব্যক্তিগত জীবনে এই ধর্মাদর্শ মানতেন। তাঁরা আলোচনার জন্য কলকাতায় Positivist Club-এর পত্তন করেছিলেন। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের স্মৃতিকথায় এ সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এই বিবরণ অসম্পূর্ণ এবঙ অঙশত ভুল। প্রধানত ইঙরাজ সিভিলিয়ান H.J.S. Cotton-এর চেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। ইঙল্যান্ডের ধ্রুববাদীদের নেতা Richard Congreve-এর ভায়রাভাই সিভিলিয়ান J.C. Geddes নেতা হবেন, এমন সম্ভাবনা ছিল। গেডেস হঠাত্ অল্পবয়সে বসন্ত রোগে মারা যান। নেতা হন কটন শাহেব। কটনের ব্যস্ততা ও অবর্তমানে পরে যোগেন্দ্র প্রধান হয়ে ওঠেন। কৃষ্ণকমলের বক্তব্য অনুসারে এই প্রতিষ্ঠানের কোন ইঙরাজ সভ্য ছিলেন না, এবঙ তালতলার একটি বাড়িতে এই প্রতিষ্ঠানের অধিবেশন হত।[১১৪] দুটি কথাই ভুল। প্রথম কথার জন্য H.J.S. Cotton, J.C.Geddes, H.Beveridge প্রভৃতি ইঙরাজ ধ্রুববাদী সিভিলিয়ানের নাম ভুলে যেতে হয়। তালতলাতে নীলমণি কুমারের কোন আত্মীয়ের বাড়িতে এমন অধিবেশন হয়ে থাকতে পারে, তবে ছোট আদালতের জজ K.M.Chatterjee ও খিদিরপুরে যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের বাড়ি, British Indian Association-এর সভাকক্ষ এবঙ অন্যত্র এর অধিবেশন হত। এই প্রতিষ্ঠানের নিজের কোন বাড়ি ছিল না। কৃষ্ণকমলের মতে প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল Positivist Club; কিন্তু এর প্রকৃত নাম ছিল Society for the Study of Positive Religion in India, যাকে সঙ্ক্ষেপে Positivist Society বলা হত। এর প্রধান সভ্য ছিলেন যোগেন্দ্রচন্দ্র।[১১৫] অন্যান্য সদস্যের মধ্যে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জজ K.M. Chatterjee, কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, নীলকণ্ঠ মজুমদার, নীলমণি কুমার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সূত্রপাতের কুড়ি বছর পরে যোগেন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে এর বিলোপ হয়। কৃষ্ণকমল বলেছেন--'ইহার অল্পকাল মধ্যেই যোগেন্দ্র লোকলীলা সম্বরণ করিলেন ; সুতরাঙ এই সকল উদ্যমও বন্ধ হইয়া গেল। যোগেন্দ্রের মৃত্যুর পরে এ দেশে Positivism-এর আর কেহ পান্ডা রহিল না।'[১১৬]

মানবধর্মের কতকগুলি সঙস্কারের মধ্যে Sacrament of Maturity একটি অনুষ্ঠান, যা এই ধর্মাবলম্বীর ৪২ বছর বয়ঃপূর্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। এমন আরো কিছু অনুষ্ঠান সমিতিতে করা হত। যোগেন্দ্রচন্দ্রের বয়ঃপূর্তি উপলক্ষে ২.১.১৮৮৪ তারিখে Cotton-এর পৌরোহিত্যে এখানে একটি ধর্মানুষ্ঠান হয়।[১১৭] ভারতবর্ষে এরূপ অনুষ্ঠান

এই প্রথম।

তখনকার একাধিক লেখকের রচনায় যোগেন্দ্রচন্দ্রর ব্যক্তিগত মহত্ত্ব ও ঔদার্যের সাক্ষাত মেলে। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের স্মৃতিকথা একটি উদাহরণ। পিতৃবিয়োগকাতর অক্ষয়চন্দ্র সরকার কিভাবে যোগেন্দ্রচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করার পরে মানসিক ভারসাম্য ফিরে পেলেন, সেই কথা তিনি 'পিতাপুত্র' গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে লিখে গেছেন। শেষ জীবনে ভিন্ন মত পোষণ করলেও অক্ষয়চন্দ্র যৌবনে ধ্রুববাদে আস্থাবান ছিলেন, এবঙ এই বিষয়ে কিছু মত শেষ পর্যন্ত পোষণ করেছিলেন, যেমন--সমাজে ব্রাহ্মণের উচ্চ স্থান। বিভিন্ন গ্রন্থে যোগেন্দ্রচন্দ্র এই বিষয়ে বারবার আলোচনা করেছেন। সম্ভবত অক্ষয়চন্দ্র তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বাঙলাদেশে ভূদেব, বিহারীলাল, কৃষ্ণকমল, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র প্রভৃতি লেখকের সাহিত্যসৃষ্টি যেমন, তেমনি নতুন ধর্মচর্চার দ্বারা প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তন, এবঙ সমাজসেবা ও স্বাদেশিকতার বোধ একদা ধ্রুববাদের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে যোগেন্দ্রচন্দ্রের অবদান উপেক্ষণীয় নয়।

যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ সম্বন্ধে অনেকে বহু ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন। কয়েকটি ভুলের প্রতি এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল।

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন লিখেছেন--'তখনকার দিনে যোগেন ঘোষ Positive Religion নামে এক বই লিখিয়াছিলেন ; বইখানি ভবানীপুরে ছাপা হয়।..কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত পজিটিভিস্ট ছিলেন না, বরঙ বলিয়া গিয়াছেন যে কঁতের প্রচারিত মানবতা ধর্ম স্বার্থভাব প্রণোদিত।..A philosophy which eschews all positive science and concerns itself solely with the actual sense perceptions and the ephemeral sense perceptions which sets up humanity,..is no doubt very sentimental, poetic and imaginative, but is not scientific and is opposed to potent facts and absolutely unreal, and is thus certainly not positive'[১১৮]

এই যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (১৮৬০-১৯৪৭) কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষের জ্যেষ্ঠপুত্র, পেশায় আইনজীবী, পার্ক স্ট্রিটে Society of Theists-এর সভাপতি, রামমোহন রায়ের ইঙরাজি রচনাবলীর (১৮৮৫) সম্পাদক এবঙ হিন্দু আইন সম্বন্ধে মূল্যবান গ্রন্থের লেখক। চা-শ্রমিকদের উপর অত্যাচারের প্রতিবিধান এবঙ বয়স্কদের জন্য সান্ধ্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর। বিখ্যাত Principles of Hindu Law ছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইন অধ্যাপক হিশাবে তাঁর বক্তৃতা Law of Impartible Property and the Law of Endowment and Religious Institutions উল্লেখযোগ্য রচনা। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও সিনেটের সদস্য, দুবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবঙ কলকাতা পুরসভার কমিশনার ছিলেন। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে Association for the Advancement of Scientific and Industrial Education in India প্রতিষ্ঠা

করেন। তাঁর *The Positive Religion* (Calcutta, 1917) বইটি একদা আদৃত এবঙ জার্মান ভাষায় অনূদিত (১৯২৬) হয়। ঈশ্বর, অবতার, পরাবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্বাস এই গ্রন্থের ভিত্তি, এবঙ এর সঙ্গে, কঁত্‌-প্রচারিত ধ্রুববাদের কোন সম্পর্ক নেই। তিনি কখনো ধ্রুববাদী ছিলেন না।[১১৯]

দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনীকার কালীপ্রসন্ন পর্যন্ত দুই যোগেন্দ্রচন্দ্রকে মিলিয়ে ফেলে লিখেছেন—'পরিশেষে কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি, দ্বারকানাথের কতিপয় বিশেষ বন্ধু ও আত্মীয় তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী সঙ্গ্রহ করিবার বিষয়ে আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা আমার প্রতি এই প্রকার অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে..খিদিরপুর নিবাসী যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম. এ., বি. এল..প্রভৃতি মহোদয়গণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।..'[১২০]

ইন্দিরা সরকার লিখেছেন--'It is a fact of extraordinary significance in this regard that Bankim at his death-bed in 1894 was ministered to by a Bengali Comtist, namely Jogen Ghosh, who had published the Positivist Calendar at Calcutta in 1872 and 1874'.[১২১] অন্যত্র তিনি এই কথা আবার লিখেছেন।[১২২] এই বক্তব্য সম্পূর্ণ ভুল। লেখিকা ঐ গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে কোন তথ্যসূত্র দেননি; যোগেন্দ্রচন্দ্র নিজের রচনাপঞ্জীতে[১২৩] এই গ্রন্থের নাম করেননি ; বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে[১২৪] এর উল্লেখ নেই ; বাঙ্গালি ধ্রুববাদীদের কোনো রচনা বা চিঠিপত্রে এর কোন প্রসঙ্গ নেই।[১২৫] যোগেন্দ্রচন্দ্র ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে এই গ্রন্থের সঙ্গে সর্বপ্রথম পরিচিত হন।[১২৬] তার পূর্বে যোগেন্দ্রচন্দ্রের পক্ষে এই গ্রন্থ প্রকাশ করার সম্ভাবনা ছিল না। বাঙ্গালি ধ্রুববাদীদের সঙ্খ্যাল্পতা এই গ্রন্থ প্রকাশের প্রতিকূল ছিল।[১২৭]

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে প্রচারিত তথ্যটিও ভুল। যোগেন্দ্রচন্দ্র বন্ধুত্বসূত্রে প্রায়ই বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে যেতেন।[১২৮] তাঁর ভাইপো শচীশচন্দ্র লিখেছেন—'মৃত্যুর সময় তাঁহার কক্ষে এই কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রী ও জ্যেষ্ঠা কন্যা, ভ্রাতা শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র, দৌহিত্র সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ও বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ।'[১২৯] এই ঘটনা থেকে একটি অদ্ভুত কথা তৈরি করা হয়েছে, যে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুকালে তাঁর অনুরোধে যোগেন্দ্রচন্দ্র কঁতের রচনা থেকে পাঠ করার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। এই প্রচার আদৌ ভিত্তিহীন। ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিশাবে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুশয্যায় যোগেন্দ্রচন্দ্রের উপস্থিতি আদৌ অস্বাভাবিক নয়। তার জন্য ধ্রুববাদী পৌরোহিত্যের অনুমান করা নিষ্প্রয়োজন। শচীশচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র বা কোন প্রত্যক্ষদর্শী অনুরূপ কোন বিবরণ দেননি। এমনকি যোগেন্দ্রচন্দ্রও বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিসভায় পঠিত প্রবন্ধে এরূপ ঘটনার উল্লেখ করেননি, বরঙ ধ্রুববাদের বিষয়ে তাঁর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মতপার্থক্যের কথা লিখেছেন।[১৩০] বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাও সাক্ষ্য দেয়, যে মৃত্যুর বহু পূর্বেই তিনি ধ্রুববাদে আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন।[১৩১] হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুশয্যার পাশে যোগেন্দ্রচন্দ্রের উপস্থিতি, যোগেন্দ্রচন্দ্রের ধ্রুববাদী বিশ্বাস, এবঙ তাঁর

সঙ্গে যোগেন্দ্রচন্দ্রের ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথা লিখেছেন, কিন্তু সেখানে উক্ত কঁত্-পাঠের কোন প্রসঙ্গ নেই।[১৩২] কবি হেমচন্দ্রের জামাতা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর পরিচিত বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে লিখেছেন—'পরে কিন্তু বঙ্কিমবাবুর বাস্তবিক একটা পরিবর্তন হইয়াছিল।'[১৩৩] শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বঙ্কিমচন্দ্রের জবানিতে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই এরূপ পরিবর্তনের কথা লিখেছেন।[১৩৪] বার্ধক্যে ধ্রুববাদ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের আগ্রহের হ্রাস হয়েছিল। অথচ এই ভুল বিবরণ অনেকের বিশ্বাস উত্পাদন করেছে। [১৩৫]

আরো কিছু ভুলের তালিকা এরূপ :

১। অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র মৈত্র তাঁর গবেষণাগ্রন্থে লিখছেন—'বঙ্গদর্শন ১২৮২ চৈত্র—কমতেবাদী যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে কমতের নারীকল্পনা (Ideal conception of woman) আলোচিত হয়।[১৩৬] প্রকৃতপক্ষে এই প্রবন্ধে ধ্রুববাদের বিন্দু-বিসর্গ নেই, এবঙ লেখকের নাম হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য (পরে শাস্ত্রী)।[১৩৭] পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনাটি ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে 'ভারতমহিলা' নামে গ্রন্থিত হয়।[১৩৮]

২। অধ্যাপক প্রদীপ সিঙহ 'lawyer-zamindar' বলে যোগেন্দ্রচন্দ্রের পরিচয় দিয়েছেন।[১৩৯]

৩। অনুরূপ ভুল করেছেন অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায়।[১৪০]

৪। যোগেন্দ্রচন্দ্রের নাম বিকৃত হয়ে অনেকের হাতে যোগীন্দ্রচন্দ্র, যোগেন্দ্রনাথ বা যোগেশচন্দ্র হয়েছে।[১৪১]

৫। গ্রন্থাগারে দুজনের রচনাবলী একজনের লেখা বলে নির্দেশিত হয়েছে।[১৪২]

৬। অধ্যাপিকা বেলা দত্তগুপ্তা একই ভুল করেছেন।[১৪৩]

---

১. দ. (ক) যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ—'মোহনচাঁদ ঘোষ মহাশয়ের জীবনপত্রিকা', আমার গৃহাশ্রিত স্মৃতিরক্ষণ বিষয়ক কতিপয় স্তোত্র, প. ৯-১০। (খ) মন্মথনাথ ঘোষ—হেমচন্দ্র, প্রথম খন্ড, প. ৫৯-৬২। (কলকাতা, ১৯১৯)

২. শ্রীশচন্দ্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের অগ্রজ রামকমল, এবঙ তাঁদের হাওড়াবাসী কোন বন্ধু পরলোকচর্চার জন্য অল্পদিনের ব্যবধানে আত্মহত্যা করেন। ধর্মবিশ্বাসে তাঁদের মিল ছিল। খিদিরপুরের ঘোষ পরিবারে প্রচলিত এই প্রাচীন জনশ্রুতির সত্যতা সন্দেহজনক। (যোগেন্দ্রচন্দ্রের পৌত্র স্বর্গত অহিধর ঘোষ, এবঙ কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র স্বর্গত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ব্যক্তিগতভাবে নানা কাহিনী শুনেছি।)

৩. দ. (ক) মন্মথনাথঘোষ—হেমচন্দ্র, তৃতীয় খন্ড, প. ১৪১। (কলকাতা, ১৯২৩) (খ) অক্ষয়চন্দ্র সরকার—'জীবদুঃখ সমস্যার মীমাঙসা চেষ্টা', কবি হেমচন্দ্র। (কলকাতা, ১৩১৮)

৪. *The Calcutta University Calendar* : 1858-9, p. 83. *General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency* for 1856-7, Appendix C, p. 14.

৫. পূর্বোক্ত অহিধর ঘোষ ও রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া যোগেন্দ্রচন্দ্রের পৌত্রী সুধা মজুমদার ও প্রপৌত্র শীতাঙশুশেখর ঘোষ নানা প্রাচীন কাহিনী আমাকে বলেছেন। তাঁদের সূত্রে এই কথা শুনেছি।

৬. নানা সূত্র থেকে সঙ্কলিত। পুরো নাম লেখা নেই, এমন কয়েকটি সঙ্ক্ষিপ্ত সূত্রের ব্যাখ্যা দেওয়া হল।

প. প. পুরাতন প্রসঙ্গ (১৩৭৩ শনে পুনর্মুদ্রিত)
B.S *Brahmanism and the Sudra.* (1901)
B L C Bengal Library Catalogue
C.R Calcutta Review
H.P. Hindoo Patriot
N.M National Magazine
N.P. National Paper
MEL Manuscript English letters. (Some series of manuscript letters in English between Jogendrachandra and some Positivists. Some of them were copied by Jogendra for Dr Richard Congreve, and after his demise are now preserved in Bodeleian Library, Oxford.)
AM Additional Manuscripts (Several series like the above, in British Museum, London)

৭. হিন্দু কলেজের ছাত্র হিশাবে যোগেন্দ্রচন্দ্রের রচনা। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন লেখকের ২৮টি প্রবন্ধের সঙ্কলন *Prize Essays* গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত। দ N.P., 4.9. 1872, p. 432. এই গ্রন্থে মাইকেল মধুসূদনের একটি (এখনো অপুনর্মুদ্রিত) প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

৮. 'আমার গৃহাশ্রিত স্মৃতিরক্ষণ বিষয়ক কতিপয় স্তোত্র' নামের পুস্তিকায় প্রথম স্তোত্রের সঙ্গে যুক্ত পাদটীকায় যোগেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন—'এই স্তোত্রটি প্রামাণিক ধর্মানুযায়ী স্বকীয় আহ্নিক ক্রিয়ার উপযোগী হইবে, এই কল্পনায় সন ১৮৭২ সালে বিবচিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল। এখন অন্যান্য স্তোত্রের সহিত একত্র রাখিবার নিমিত্ত কিঞ্চিত্ পরিবর্তিত হইয়া দ্বিতীযবার মুদ্রিত হইল।' প. ১।

৯. প্রকাশকাল ১৯.৯.১৮৭৫ ; পৃষ্ঠসঙখ্যা ৬২ ; মুদ্রণসঙখ্যা ৪০০। সূত্র B L C. কোন সমালোচকেব মতে গ্রন্থের ঐতিহাসিক আলোচনা সুন্দর, কিন্তু ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের দশ আইনের আলোচনায় প্রজাদেব স্বার্থ ও নতুন অধিকাবেব বিরুদ্ধে যোগেন্দ্রচন্দ্রের কথা অপ্রঙশসনীয়। H.P., 23.8.1875, p. 401.

১০. প্রথমে সোমপ্রকাশ পত্রে প্রকাশিত, এবঙ পরে বঙ্গাদর্শনে 'উপাসনাবিষয়ক তুলনা' প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত।

১১. যোগেন্দ্রচন্দ্রের The Rent Question in Bengal প্রবন্ধের প্রতিবাদে Henry Ricketts লেখেন A letter to the Editor on the Rent Question, *C.R.*, 1877, vol 64, no. 128, pp.xi-xvi. তার উত্তরে বর্তমান প্রবন্ধ লেখা।

১২. (ক) নিজের রচনাগুলির তালিকায় যোগেন্দ্রচন্দ্র লেখেন—'1878. An unpublished Bengali essay on attachment veneration and kindness which brought me into notice of Mr. Geddes, and through him of Dr. Congreve' B.S., p. 125. (খ) এই অপ্রকাশিত প্রবন্ধটির মূল্যায়নে যোগেন্দ্রচন্দ্র Henry Cotton-এর সাহায্য চান, এবঙ J. C. Geddesকে তার কপি পাঠান। Jogendra to Geddess, 5. 9. 1878, MEL e. 70, ff. 337-8. (গ) আবার—'My obligation is great to you for your kind offer to go through my pamphlet and to talk over the subject with me in Calcutta'. Jogendra to Geddes, 15.9.1878, MEL e. 70, f. 339. যোগেন্দ্র আবার লেখেন—'I am indeed very happy to know that I shall have the suggestions of your friend Babu Guru Das Chatterji about my essay on Attachment Veneration and Kindness. I have not an extra copy on hand to send him at once but I hope to

do so in one or two days· I shall also place myself in communication with him' Jogendra to Geddes, 17.11 1878, MEL e. 70. তিনি আবার লেখেন-"Touching the pamphlet on attachment veneration and kindness, I am under very great need to communicate to you the chief points I have dwelt upon in it . My essay has not been published yet ' Jogendra to Congreve, 8 12.1878, MEL e. 70

১৩. (ক) 'I send you by this day's post a short essay on Dignity of Labour which I contributed to the Brahmo Public Opinion ' Jogendra to Geddess, 16.11.1878, MEL e 70. (খ) 'I am greatly obliged to you for the kind things you have said of my essay on Dignity of Labour.' Jogendra to Geddes, 17 11.1878, MEL e. 70. য়ুরোপের সভ্যতা, বিশেষত উপযোগবাদের বিরুদ্ধে লেখা এই প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য সঙরক্ষণের পক্ষে মত প্রকাশ করা হয়েছে। একটি পাদটীকায় (প. ৩৩৩, স্ত. ১) সম্পাদক লিখেছেন, যে এই প্রবন্ধের মূল ভাব কঁতের রচনা থেকে গৃহীত হয়েছে।

১৪. উপরের ১২ সঙখ্যক পাদটীকায় বলা বাঙলা প্রবন্ধ সম্বন্ধে যোগেন্দ্রচন্দ্র লিখেছিলেন--'I have also in the press an essay on conscience in which I have presented the emotional portion of Comte's Functions of the Brain, and have also tried to establish the doctrine of unity ..I have it therefore in contemplation to write some essays of the kind sent to you through the favour of Mr. Geddes.' Jogendra to Congreve, 8.12 1878, MEL e 70 আবার--'I send you along with this by book post a Bengali essay on conscience ' Jogendra to Congreve, 27.2.1879, MEL e 70, f 12

১৫ বাল্যবিবাহের সমর্থনে যোগেন্দ্রচন্দ্র একটি প্রবন্ধ লেখেন, এবঙ তার সারসঙক্ষেপ কঙ্গ্রিভকে লিখে পাঠান। Jogendra to Congreve, 8.11.1879, MEL e. 70, ff.25-26. অতএব, মনে হয়, তা বাঙলায় লেখা হয়েছিল।

১৬ কঙ্গ্রিভ এই প্রবন্ধের প্রাপ্তিস্বীকার করেছিলেন। Congreve to Jogendra, 27.11.1879, AM 45262, f 34.

১৭. 'But as it contains a Bengali translation of your church service I suppose it is but proper that I should send you a copy. The translation extends as far as your commemoration of our Great Master.' Jogendra to Congreve, 22.8.1880, MEL e. 70. দ. উপরের ১০ সঙ্খ্যক পাদটীকা।

১৮. একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল : M.A. Sherring.–Natural History of Hindu Caste, *C.R.*, 1880, vol. 71, no. 141, pp.26-54. তাতে ভারতের জাতিভেদ প্রথার নিন্দা এবঙ খ্রিস্টধর্মের প্রশঙসা ছিল। এর উত্তরে যোগেন্দ্রচন্দ্রের প্রবন্ধটি রচিত। তার উত্তর দেননি, কিন্তু Sherring আবার লেখেন Unity of the Hindu caste, *C.R.*, 1880, vol.71, no.142, pp.211-238. অনেক পরে এমিল সেনার যোগেন্দ্রচন্দ্রের কথার উত্তরে লেখেন- 'Il est frappant combien le pandit Jogendra Chandra Ghosh, en cherchant à lui répondre, reste influencé par des vues analogues, quoiqu'il s'en dégage à plusieurs égards.' Emeil Senart.–*Les castes dans l'Inde : les faits et le système*, p.5. (Paris, 1896.)

১৯. পুস্তিকা-হিশাবে রচনাটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। দ. H.P., 21.11.1883, p.543. এই বিষয়ে তাঁর

পূর্বের প্রবন্ধের মত এখানেও যোগেন্দ্রচন্দ্র যৌথ পরিবারের একান্নবর্তী হিশাবে ব্যাখ্যা করেছেন। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন--'I have got sent my paper on Joint Families to the editor of the Calcutta Review. I do not know if it will be accepted. The only point where I venture to differ from you is that I fear very much that with the dissolution of Joint Families and even of that great evil of our society–infant marriage–will arise the question of bread-winning occupation of our widows and unmarried women'. Jogendra to Cotton, 22.7.1871, MEL e. 70, f.337. যৌথ হিন্দু পরিবার ব্যবস্থা সঙরক্ষণের উপযোগিতা সম্বন্ধে কটন শাহেবের সঙ্গো যোগেন্দ্রের তর্ক চলেছিল। Jogendra to Cotton, 6.5.1881 (now lost), 22.7.1881, MEL e. 70, f.337. Cotton to Jogendra, 24.6 1881, published in Henry J.S. Cotton—*New India, or India in Transition,* pp.177–184. (London, 1885.) Jogendra to Congreve, 21.11.1881, MEL e.70, ff 80-81.

২০. *Selections from Calcutta Review,* Second Series, no 28 (1898) সঙ্খ্যায় পুনর্মুদ্রিত। তা সম্ভবত এই বিষয়ে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে লিখিত ও অপ্রকাশিত প্রবন্ধের বিস্তারিত আকার, এবঙ হিন্দু যৌথপরিবার-ব্যবস্থা সম্বন্ধে উপরের প্রবন্ধটিব চিন্তার ধরন অনুসরণ করা। এই বিষয়ে যোগেন্দ্রচন্দ্র কয়েক বছর যাবত্ পড়াশুনা করেছিলেন। Jogendra to Congreve, 9.3.1881, MEL e.70 ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি রচনাটির প্রকাশনা সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে লিখেছিলেন–'I have since written another essay in continuation of the former and upon the next larger association of our society–the village. ..I am therefore most concerned to build up a national account of our social system. But my most cherished object is to arrive at a sound judgement as to how that system may be assimilated to Positivism in the best, easiest and speediest way' Jogendra to Congreve, 5.1.1882, MEL e 70, ff.88-90.

২১. 'Our subject was the fushion of History in the East and the West. I tried to follow up your suggestions by a series of essays in Bengali' Jogendra to Congreve, 28.11.1882, MEL e.70, f.117.

২২. Reginald D. Palgrave লিখিত *Chairman's Hand-Book* গ্রন্থের বাঙলা অনুবাদ। প্রকাশের তারিখ ১১. ৫ ১৮৮২ ; পৃষ্ঠাসঙ্খ্যা ১৫ + ১৮ ; মুদ্রণসঙ্খ্যা ৩০০ ; প্রকাশক উমাকালী মুখোপাধ্যায়। তথ্যসূত্র B.L.C. এই দেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থার প্রবর্তন হওয়ায় সাধারণের সুবিধার জন্য যোগেন্দ্রচন্দ্র এই গ্রন্থ প্রচারের প্রয়োজন অনুভব করেন। একাধিক পত্রে বইটি প্রশঙসিত হয়, যেমন–(ক) *C.R.,* 1882, vol.75, no.149, p.xxviii; (খ) H.P., 28.8.1882, p. 416; (গ) বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯, প. ৯২-৯৩।

২৩. British Indian Association প্রকাশক ; প্রকাশের তারিখ ১৪.৭.১৮৮২ ; পৃষ্ঠাসঙ্খ্যা ৬৬ ; মুদ্রণসঙ্খ্যা ৫০০। তথ্যসূত্র B.L.C.। অথচ গ্রন্থের মলাটে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ মুদ্রিত হয়েছে।১২৮৯ শনের (কারণ তখন বঙ্গদর্শনের নবম বর্ষ চলছিল) কথায় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন–'একটু পরে খিদিরপুর হইতে বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ও উকীল উমাকালী বাবু আসিলেন। খাজানার আইন বিলের আন্দোলন জন্য ইঙলন্ডে লর্ড লিটনকে মুরুব্বি খাড়া করা হইয়াছে বলিয়া বঙ্কিমবাবু যোগেন্দ্রবাবুকে ঠাট্টা করিতে লাগিলেন।' বোধহয় এই বই উপলক্ষ ছিল। দ. শ্রীশচন্দ্র মজুমদার–'বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ', সাধনা, শ্রাবণ ১৩০১।

২৪. দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার প্রবন্ধপাঠে আনন্দিত হয়ে যোগেন্দ্রচন্দ্রের সঙ্গো পত্রালাপ করেন।

দ.মন্মথনাথ ঘোষ--হেমচন্দ্র, দ্বিতীয় খন্ড, প. ৬২ (২য় সঙস্করণ)। 'You may recollect that sometime last year I asked you to send two little pamphlets one to Mr. Herbert Spencer and the other to Mr. Harrison. Mr. Spencer was so good as not only to acknowledge the essay but even to make some important enquiries. But I had not the same good fortune with Mr. Harrison.' Jogendra to Congreve, 25.8.1884, MEL e.70

২৫ বঙ্গদর্শনের এই সঙ্খ্যা সম্বন্ধে B.L.C. লেখে--'Narayana is a philosophical paper in which an attempt is made to reconcile the Hindu idea of Narayana with the Positive conception of *Humanity.*'

প্রসঙ্গাত ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে লেখা যোগেন্দ্রচন্দ্রের একটি অপ্রকাশিত পত্রের অঙশ উদ্ধার করছি। (চুঁচুড়ায় ভূদেবের অধুনা-প্রয়াত প্রপৌত্র ভৃগুদেব মুখোপাধ্যায়ের সঙগ্রহে এই পত্র দেখেছি।)

'This same post will carry to you what answers for a spare copy of an article contributed to the pages of Bangadarsan on Narayan. Knowing as I do your feelings against tinkering at Hinduism I am very diffident about what you think of my essay. But I am so unfortunate about my progress with the reading public, that the only consolation left me is to discuss matters with my seniors and try to arrive at some sort of understanding about each other's views Though I cannot attract my readers to me I may by writing find admittance into the views of one like yourself. And I think it would be of some consequence if some of us understood one another more intimately than we do.' Jogendrachandra to Bhudev, 29 11.1883.

যোগেন্দ্রচন্দ্র তরুণদের চিন্তাধারার সঙ্গো অপরিচিত এবঙ পরিচয়লাভে অনুত্সাহী। প্রবহমান সমাজের চিন্তাধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হবার মুখে তিনি প্রাচীনপন্থীদের সঙ্গো মিলনপ্রয়াসী। তাঁর বাঙলা প্রবন্ধের প্রতি পাঠকমহলের অনাদরে তিনি দুঃখিত, কিন্তু তার কারণ জানতে নিরুদ্যম। তাঁর সম্বন্ধে অন্যের বক্তব্য--'While he is trying to discover excuses for institutions unquestionably rotten, I am thinking of the best means of getting rid of them and of the best substitutes we can have.' Nagendranath Ghosh to H.J.S. Cotton, n.d. (1883?) MEL e.70, ff.46-48.

২৬. দ্বিতীয় সঙস্করণের আখ্যাপত্রে আছে--'স্বীয় পরিবারগণেব ব্যবহারার্থে মুদ্রিত। ১৮৮৪। মার্চ।' পরপৃষ্ঠায়--'শ্রীঅহিধর ঘোষ কর্তৃক পুনঃমুদ্রিত। ২৭ নঙ ক্লিন্টন স্ট্রীট, কলিকাতা। সন ১৯৪২ জানুয়ারী।' অহিধর যোগেন্দ্রচন্দ্রের পৌত্র। ১৭ পৃষ্ঠার পুস্তিকায় মোহনচাঁদ, পরিবারের সমস্ত গুরুজন এবঙ শ্রীশচন্দ্রের উদ্দেশ্যে লেখা তিনটি স্তোত্র আছে। তাছাড়া আছে মোহনচাঁদের সঙক্ষিপ্ত জীবনী। শ্রীশচন্দ্রের উদ্দেশ্যে রচিত স্তোত্রটির প্রথমে কঙ্গ্রিভের ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের একটি বক্তৃতার অঙশবিশেষ উদ্ধার করা হয়েছে। ৮.৮.১৮৮৩ তারিখে যোগেন্দ্রচন্দ্র কঙ্গ্রিভকে লিখেছেন--'I have been writing short prayers in Bengali so as to stimulate the genuine subjective condition in my domestic circle. But I lack models.' MEL e. 70, f.151.

২৭. তিন সঙ্খ্যায় প্রবন্ধটির উপশিরোনাম ছিল যথাক্রমে সমাজ, সুখ ও নিয়ম। বছরের লেখকপঞ্জীতে যোগেন্দ্রচন্দ্রের নাম আছে, কিন্তু রচনা-নির্দেশ নেই : প্রবন্ধটি অস্বাক্ষরিত। ১৬. ১২. ১৮৮৪ তারিখে ভূদেবকে লেখা যোগেন্দ্রচন্দ্রের পত্রে লেখকের নাম জানা যায়। তার প্রাসঙ্গিক অঙশ উদ্ধার করা হল।

'I am happy that you have had the kindness to patiently to go through my *two* essays .

* *

PS You have said nothing about ব্রত I am anxious to hear your views about self-discipline for the individual and how far the traditionary ideas about the *Brata's* may be utilised for the purpose.'

২৮ প্রকাশের তারিখ ৭. ১২. ১৮৮৪; পৃষ্ঠাসঙখ্যা ৫৮ ; মুদ্রণসঙ্খ্যা ১৫০। তথ্যসূত্র B.L.C। ১৫. ২. ১৮৮৫ তারিখে Hindoo Partriot সম্বাদপত্র এর প্রাপ্তিস্বীকার করে। *New India* গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে H.J.S. Cotton বইটির সপ্রশঙস আলোচনা করেন। Calcutta Review সাময়িকপত্র প্রবন্ধটি মুদ্রিত করেনি, কিন্তু সঙশোধনের জন্য যোগেন্দ্রচন্দ্রকে পাণ্ডুলিপি ফেরত্‌ দিতে দেরি করে : ইতিমধ্যে সম্পাদক মারা যান। যোগেন্দ্রচন্দ্র তখন একে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। দ. (ক) কঙ্গ্রিভকে যোগেন্দ্রচন্দ্র, ১৫.৫.১৮৮৪, এবঙ ২৬.৬.১৮৮৪। MEL e.70 (খ) ভূদেবকে যোগেন্দ্রচন্দ্র, ১৬. ১২. ১৮৮৪। অনেক বছব পরে মাত্র একবার ছাড়া যোগেন্দ্রচন্দ্র Calcutta Review পত্রে আর কোন রচনা পাঠাননি। শেষোক্ত পত্রের অঙশবিশেষ নিচে উদ্ধার করা হল।

'I am happy that you have had the kindness to patiently go through my *two* essays *Chaitanya's Ethics* I wrote in the expectation that it would find a place in the Calcutta Review. But I was not only put off from time to time, but when I wanted back my MSS in order to make some alterations but still in the hope that I should send them back afterwards, my letters were not acknowledged and so I had to apply to the proprietor–[..] as it were from the Editor. Thus I was driven to the [.] almost though fully aware that my writings are unfit to rouse attention.'

কটনের কাছ থেকে এই রচনাটির কথা জেনে কঙ্গ্রিভ নিজে উত্সাহী হয়ে এই বিষয়ে যোগেন্দ্রচন্দ্রকে প্রশ্ন করেছিলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্রকে কঙ্গ্রিভ, ৫.৬.১৮৮৪, AM 45262, f. 141 ২৪.১১.১৮৮৪ তাবিখে যোগেন্দ্রচন্দ্র মতামতের জন্য কঙ্গ্রিভকে পান্ডুলিপি পাঠান। ৭. ২.১৮৮৫ তারিখে তিনি কঙ্গ্রিভকে জানান, যে তিনি পান্ডুলিপি ফেরত্‌ পেয়েছেন, এবঙ মুদ্রিত গ্রন্থের ছয় কপি পাঠাচ্ছেন। MEL e.70. ৭.২.১৮৮৫ তারিখের চিঠিতে যোগেন্দ্রচন্দ্র প্রসঙ্গত লেখেন–'I happened to find in his system a fair enumeration of three virtues attachment veneration and kindness. And it occurred to me that we might engraft Comte's system upon his. ..But the present generation of English-reading Bengalis are in quest of agruments in support of indigenous systems, and I mean to address them, and it may add to the strength of my proposition if I can make out a fair case with European readers.'

যোগেন্দ্রচন্দ্র J.R. Seeley-র *Natural Religion* গ্রন্থকে বহুবার আক্রমণ করেছেন : কিন্তু চৈতন্যের নীতিতত্ত্ব রচনায় যোগেন্দ্রচন্দ্র তা থেকে সাহায্য নেন। Jogendra to Congreve, 26.6.1884, MEL e. 70, f.191.

২৯. উত্তরভারতে মুশলমান খোজাদের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে ভারত সরকার নতুন আইন প্রবর্তন করে তাদের বঞ্চিত করার যে চেষ্টা করেছিলেন, তার বিরুদ্ধে যোগেন্দ্রচন্দ্র আইনসঙক্রান্ত একটি রচনা লিখেছিলেন। Jogendra to Congreve, 13.7.1884, MEL e. 70, f.196.

৩০. কলকাতার ধ্রুববাদী সমিতিতে ৩০. ১২. ১৮৮৪ তারিখের বক্তৃতা–'An address on the Day of Dead : Subject; the Idea of Humanity.' *B.S.*, p. 125. যোগেন্দ্রচন্দ্র

কঙ্গ্রেভকে লেখেন--(a) 'On the 30th December last year we kept the festival of all the dead, and the published proceedings of the small private meeting will reach your hands along with this I send 30 copies of them.' 7 2.1885. (b) 'I am glad to hear that the print has attracted your attention as well as of your friend ' 21 2 1885. (c) 'I am happy to hear from Mrs. Crompton's letter to you that my address has done any good.' 23.4.1885. MEL e. 70

৩১. দ. (a) *B.S.*, p.125. (b) '..from before 1885 when I wrote my little pamphlet on Caste-Reform...' J.C. Ghosh.–*The Political Side of Brahmanism,* p 1.

৩২ কলকাতার ধ্রুববাদী সমিতিতে ৩১. ১২ ১৮৮৫ তারিখে দেওয়া বক্তৃতা। দ. *B S* p.125 (a) 'The subjects of my address are 1. The hierarchy of Existence leading up to Humanity. 2. The Ancestor Worship of the Hindus in its bearing upon Positivist worship and (3) by way of an appendix, a programme of domestic reforms to elevate caste first to the position of guilds and trade unions and then to the Positivist ideals. I believe that the more pressing want just now is the question of caste reform To this last named question I have been encouraged by Mr. Cotton's book..in the appendix to my address for the approaching Festival of the Dead.' Jogendra to Congreve, 28.11.1885, MEL e 70, ff.224-5. (b) 'I am anxious to have your opinion and in fact full corrections of what I wrote in my address on the Festival of the Dead on the Hierarchy of Existences ' Jogendra to Congreve, 5.6 1886, MEL e. 70, f. 228 (c) কটন শাহেবের অনুমতি নিয়ে যোগেন্দ্রচন্দ্র *Indian Courier* নামেব পত্রে বচনাটি প্রকাশ করেছিলেন। Jogendra to Congreve, 5.9.1886, MEL e. 70, f. 234 (d) ২৩. ৮. ১৮৮৬ তারিখে এর একটি সঙক্ষিপ্ত সঙ্শোধনী ছাপা হয়েছিল। Mel e. 70, f.232.

৩৩. একটি পাদটীকা (প. ৪১) এই--'An address read before a private meeting of Indian Positivists held in the suburbs of Calcutta on their Festival of All the Dead. December 31, 1886.' আরো দ. *B.S*, p.125. 'In former years I did not venture to write so much as I did on the late occasion.' Jogendra to Congreve, 3.1.1887, MEL e.70. রচনাটি বোধহয় পুস্তিকা হিশাবে বিলি করা হয়েছিল। দ. প্রাপ্তিস্বীকার, *Bengalee,* 30.4.1887, p. 207.

৩৪. প্রকাশকাল ২০. ৩. ১৮৮৮, পৃষ্ঠাসঙ্খ্যা ৫২, বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ১৫০ কপি মুদ্রিত। B.L.C. অনুসারে--'The annual address at the Positivist Society.' যোগেন্দ্রচন্দ্র একে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের রচনা বলেছেন। গ্রন্থশেষে 'February 29th, 1888' মুদ্রিত। নগেন্দ্রনাথ ঘোষ লিখেছেন–'..read by him on the 31st of December 1887, the positivist day of all the dead and since published in pamphlet form.' *Indian Nation,* 30.10.1892, p.493. অতএব, রচনার পাণ্ডুলিপি সভায় পঠিত ও মুদ্রিত হয়। আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় সভার কার্যক্রম এবঙ উপস্থিত ব্যক্তিদের নামের তালিকা মুদ্রিত হয়েছে। গ্রন্থের ৩২ পৃষ্ঠায় প্রকাশ, গেডেস যোগেন্দ্রচন্দ্রকে এই রচনার ভাবসূত্র দেন এবঙ যোগেন্দ্রচন্দ্র ৫.৯.১৮৮৩ তারিখের চিঠিতে কঙ্গ্রিভের কাছে এই বিষয় সম্বন্ধে জানতে চান। এতে ব্রাহ্মণের সপক্ষতা ও খ্রিস্টানির বিরুদ্ধতা থাকায় ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রীত হন। দ. [মুকুন্দদেব

মুখোপাধ্যায়]- ভূদেব চরিত, তৃতীয় ভাগ, প. ২১৩।

৩৫. প্রবন্ধের প্রথমে একটি পাদটীকায় মুদ্রিত—'লেখকের সনাতন ধর্মশিক্ষা নামক অসম্পূর্ণ হস্তলিপি হইতে উদ্ধৃত।' যোগেন্দ্রচন্দ্র দু বছর পূর্ব থেকে এই গ্রন্থ রচনায় নিযুক্ত হন। 'I am working out my Bengali book ' Jogendra to Congreve, 5.9 1886, MEL c.70, f.236

৩৬. ১০৭ পৃষ্ঠার একটি পাদটীকায় বলা হয়েছে--'লেখকের সনাতন ধর্মশিক্ষা নামক অসম্পূর্ণ হস্তলিপি হইতে উদ্ধৃত।' ৩১৯ পৃষ্ঠায় মূল রচনার আংশিক বর্জন বিজ্ঞাপিত হয়েছে।

৩৭. 'শিষ্যা ও আচার্য মধ্যে কথোপকথনচ্ছলে বিরচিত।' একটি পাদটীকা এই--'মূল, কঙ্গ্রিভ কর্তৃক ভাষান্তরিত কোমতের প্রামাণিক ধর্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তরমালা, ২য় সংস্করণ, ১৯৬-১৯৮ পৃষ্ঠা।'

৩৮. প্রকাশের তারিখ ১২. ১২ ১৮৮৯ ; মুদ্রণসংখ্যা ১০০০ ; পৃষ্ঠাসংখ্যা ২১০। *B.L.C* এর মন্তব্য- 'What a moral text-book in India should be.' রচনাকাল ১৮৮৮ দ Postcript to the Preface যোগেন্দ্রচন্দ্র বইটিকে কলেজপাঠ্য করার চেষ্টা করেন। (ক) বহরমপুর কলেজের বোর্ড অব ট্রাস্টির সম্পাদিকা স্বর্ণময়ী দেবীকে যোগেন্দ্রচন্দ্র এক খন্ড উপহার দেন এবং গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় পেন্সিলে লেখা চিঠিতে তাঁকে অনুরোধ করেন, যেন তিনি বহরমপুর কলেজে ঐ বইটি প্রচলিত করার জন্য চেষ্টা করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে 'কাশিমবাজার সংগ্রহে' রক্ষিত গ্রন্থ প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য। (খ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে ১১ ৫ ১৮৯০ তারিখের সভায় পাঠ্যপুস্তক হিশাবে বিবেচনা করার জন্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বইটি উপস্থিত করলে তা বিবেচনার জন্য বোর্ড অব স্টাডিজে পাঠানো হয়। পরে তার কোনো উল্লেখ মেলে না। দ. Calcutta University.—*Minutes of the Senate* for the year 1889-90.

৩৯. তিন সংখ্যায় প্রবন্ধটির উপশিরোনাম ছিল যথাক্রমে Political Morality, Politics and Morality, এবং Religion and Morlity। নিচের রচনার উত্তরে এই প্রবন্ধ লেখা। L. Salzer.—Buddhism, Positivism and Modern Philosophy, *NM*, February, April-July 1890 Salzer ছিলেন তখনকার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ। *B L C* মন্তব্য করে—(ক) Salzer সম্বন্ধে '..the writer thinks that Buddha solved some of the most difficult problems of thought which Auguste Comte could not even approach.' (খ) যোগেন্দ্রচন্দ্র সম্বন্ধে—'Babu Jogendra Chandra Ghosh says that every religion has its own code of moral duties. In some of these duties all religions are agreed. But there are exceptional cases which he classes with those sectarian dictates of morality which must needs vary with different religious creeds.'

৪০. প্রকাশকাল ২০.২. ১৮৯১ ; পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৮ ; ১০০০ কপি মুদ্রিত ; বিনামূল্যে বিতরিত। *B L.C* মন্তব্য করে—'Opposes the Age of Consent Bill'. যোগেন্দ্রচন্দ্রের স্বকৃত গ্রন্থতালিকায় অনুপস্থিত। দ. *B.S.*, p.125.

৪১. *B.S.*, p.125. *B.L C.*-তে অনুক্ত। বইটি দেখিনি। তা ঠিক উপরের বই বোঝাতে পারে, এবং তাতে হরি মাইতির মামলার প্রসঙ্গ থাকতে পারে।

৪২. *B.L.C.* comments–'Babu Jogendranath[sic.] Ghosh advises the Congress to make a departure from their accepted principles of agitation.'

৪৩. প্রকাশের তারিখ অজানা ; পৃষ্ঠাসংখ্যা ২২ ; ১০০ কপি মুদ্রিত ; বিনামূল্যে বিতরিত। 'Read before the meeting of the Indian Positivists in Calcutta on the Positivist Mahālayā or festival of all the dead. The writer thinks that Eastern ethics has run off into mendicancy and suicide; Western

ethics into competition and depopulation'.–*B.L.C.* তু. 'অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য', বঙ্গদর্শন, বৈশাখ-অগ্রহায়ণ ১২৮৯। কলকাতার ধ্রুববাদী সমিতিতে ৩০. ১২ ১৮৯২ তারিখের মুদ্রিত বক্তৃতা : গ্রন্থশেষে ঐ তারিখ মুদ্রিত। ভূমিকার তারিখ ২৭ ১২ ১৮৯২। কলকাতার Imperial Library Catalogue, Part I, vol.I-এ বইটির দুটি কপি-কে ১৮৮৩ ও ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই ভুল জাতীয় গ্রন্থাগারের বর্তমান পুস্তক-তালিকায় পুনরাবৃত্ত হয়েছে।

৪৪. পৃষ্ঠাসংখ্যা ২২। কলকাতা সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগারে একটি কপি আছে।

৪৫ বিনয়কৃষ্ণ দেব-কে ৪ ৭.১৮৯২ তারিখে লিখিত। দ. *The Hindu Sea-Voyage Movement in Bengal,* pp. 22-23.

৪৬. ২৭ ৪.১৮৯৪ তারিখে লিখিত ও পরদিন Star Theatre-এ চৈতন্য লাইব্রেরি ও বিডন স্কোয়ার লিটারারি ক্লাব আয়োজিত বঙ্কিম স্মৃতিসভায় পঠিত। ঐ সভার আয়োজন করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। *Indian Mirror,* 5 5.1894. রচনাটির পুনর্মুদ্রণ, দ. বিমলচন্দ্র সিংহ (সম্পা.)–বঙ্কিম-কণিকা. প. ৪৩-৪৮ (কলকাতা, ১৩৪৮)। 'বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর যে শোকসভা হয় তাহাতে তাঁহার বন্ধু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের লিখিত যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে লিখিত ছিল, তাঁহার মৃত্যুর পরই তাঁহার জীবনচরিত লিখিত হয়, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না এবঙ তাঁহার কোন দৌহিত্র পরে সে কাজ করিবেন ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল।' হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ–'বিজ্ঞাপন', বঙ্কিমচন্দ্র। (কলকাতা, ১৮৮৪ শক)।

৪৭. 'সাহিত্যে' প্রকাশিত রচনাগুলি বোধহয় 'প্রচারে' প্রকাশিত রচনার শেষাঙশ।

৪৮. ধ্রুববাদী সমিতিতে ৫.৯.১৮৯৫ তারিখের সভায় পাঠের জন্য মুদ্রিত বক্তৃতা।

৪৯. ধ্রুববাদী সমিতিতে ২৭. ১২. ১৮৯৬ তারিখের বক্তৃতা। সম্ভবত অমুদ্রিত। দ. Jogendra to Congreve, 3.1.1897, MEL e. 70, ff. 293-4.

৫০. প্রকাশের তারিখ ১০ ৫. ১৮৯৬ ; পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯৯ ; ৩০ কপি মুদ্রিত ; বিনামূল্যে বিতরিত। *B.L.C* সূত্র। গ্রন্থশেষে–৯৪ পৃষ্ঠায় 'Nov 1895' মুদ্রিত হয়েছে। যোগেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন–'An unpublished pamphlet entitled the political Side of Brahmanism.' *B.S.,* p 126. গ্রন্থের 'Preface'-এ (তারিখ ৬.৪.১৮৯৬) আছে–'The following pages are privately printed in the hope of an exchange of views with a few of my personal friends. . The personal friends to whom in particular I submit these papers are Messrs. K.M. Chatterji, W.C. Bonnerjee, Sir R.C. Mitter and Justice Gurudas Banerji; Babus Krishnakamal Bhattacharya, Shama Charan Ganguli, Nagendranath Ghose, Umakali Mukujje, Nilkantha Majumdar, Nakuleswar Bhattacharyya and Hara Prasad Sastri. I should add that I shall depend upon Dr. R. Congreve and Hon'ble H.J.S. Cotton in deciding whether these pages will at all be published.' ১৯. ১. ১৮৯৬ তারিখে যোগেন্দ্রচন্দ্র কঙ্গ্রিভকে লিখেছেন, যে তখনো বইটি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়নি। ২৪.৪.১৮৯৬ তিনি কঙ্গ্রিভকে এক কপি বই পাঠিয়ে লিখেছেন–'I have not mentioned a few names who will also have the pamphlet for various reasons.' তাঁরা ছিলেন Mr. Sulman, Max Muller, W.W. Hunter এবঙ পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি। MEL e. 70, ff.257, 275-8. অতএব, *B.L.C.*-তে উল্লিখিত তারিখ প্রকৃত নয়। রচনাটিকে 'academic discourse' বলে *B.L.C.* মন্তব্য করে–'The author thinks that the political aspect of Brahmanism, apart from its obvious religious bearings, is little understood or appreciated by his countrymen.'

৫১. ধ্রুববাদী সমিতিতে ১.১. ১৮৯৭ তারিখে দেওয়া বক্তৃতা। 'We had pretty satisfactory meetings on the 27th December and the New Year's Day. In regard to my two addresses–one on Brahmanism and Ethics and the other on Brahmanism and Marriage I have drawn up a string of definite propositions.' Jogendra to Congreve, 3.1 1897, MEL e 70, f 293.

৫২ (a) '1897 The Marriage Question. (In settling this I had the benefit of the late Sir Romes Chandra Mitter's advice)' *B.S.*, p.126. (b) 'When the leaflet on the Marriage Question was in the press.' Jogendra to Congreve, 2.3.1897, MEL e. 70. অতএব ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারির মধ্যে তা ছাপা হয়েছিল।

৫৩ প্রকাশের তারিখ ১ ৯ ১৮৯৭, ভূমিকার সময় জুলাই ১৮৯৭ ; পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৫। *B.L C.* মন্তব্য করে—'An address for the anniversary of Comte's death To be read before the Indo-Positivists on the 5th September, 1897'

৫৪ ধ্রুববাদী সমিতিতে ১.১ ১৮৯৮ তারিখে দেওয়া বক্তৃতা। 'The subject of the Address was entitled *Continuity of Indian Life and History.* The following points touched upon may be recorded, the paper being preserved in manuscript' সভার কার্যপরিচালনার বিবরণের সঙ্গে রচনাটির সংক্ষিপ্তসার লেখা আছে। MEL e 70, ff.304-5.

৫৫. কঁতের মৃত্যুর বাৎসরিক স্মরণসভায় ১১. ৯. ১৮৯৮ তারিখে ধ্রুববাদী সমিতিতে প্রদত্ত বক্তৃতা। 'Our meeting could not be held on the 5th September as it was a week-day We met on the 11th .The subject of my address was Hindu Jurisprudence and Indian Education.' Jogendra to Congreve, 14.9.1898, MEL e.70, ff 324-5.

৫৬. 'Your expositon of the Abstract Calendar in the letter to hand extends considerably about ideas I had formed for myself by tabulating the eightyone or eightytwo Festivals. I wonder if the publication of a complete list would not be useful My own Notes have been of very great service to me.' Jogendra to Congreve, 7.7.1898, MEL e. 70, f.322. রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল কি না, তা অজানা।

৫৭. (a) '1899. Some verbal matters : *Narayan,* as a Bengali equivalent of Humanity. The *Gayatri;* a reading for Progress; the words *bhub, bhuvah* and *swah* as being taken respectively for Earth, Man and Space. Brahman (ব্রহ্মণ্) as equivalent to Great Being ..A Brahmanic text, on universal brotherhood; and another about human languages. The Sanskrit and Bengali words, *vidhi* signifying law, and *purushakar,* man's modifying agency. Equivalent terms in Bengali for the three sympathetic instincts, attachment, veneration and kindness, and for the three psychological divisions, feeling, thought and action. *Savitri* for truth.' *B.S.*, p. 126.

(b) কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন—'এতদ্ব্যতীত যোগেন্দ্র শেষাশেষি কোঁত্‌কে ঋষি নাম দিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে আমার সহিত তাঁহার একটু বাদানুবাদও হইয়াছিল। আমি দেখিলাম, অমরকোষে লিখিয়াছে, ঋষয়: সত্যবচস: অর্থাৎ ঋষিরা সত্যভাষী.; ইহার অর্থ সাধারণ

সত্যবাদী নহে, ইহার অর্থ বাক্‌সিদ্ধ ; যে ব্যক্তির এমন ক্ষমতা আছে, যে যাহা বলিবেন তাহাই ফলিবে, যেমন শাপ দেওয়া ও বর দেওয়া, তিনিই প্রকৃত ঋষিপদবাচ্য। ঋষি শব্দের প্রাথমিক অর্থ যে এইপ্রকার সঙ্কীর্ণ (limited) তাহা জানিতাম না। যোগেন্দ্রের সহিত বাদানুবাদ প্রসঙ্গেই সর্বপ্রথম আমার মনে এই অর্থের স্ফূর্তি হইল। একথা আমি যোগেন্দ্রকেও জানাইয়াছিলাম ; এবঙ সেই নিমিত্ত কোঁত্‌কে ঋষি নাম দেওয়ার ব্যাপারে কিঞ্চিত্‌ ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম। যোগেন্দ্র কিন্তু আমার এই পরাঙ্মুখতাদর্শনে কতকটা বিরক্ত হইয়াছিলেন। প্রকৃত কথা এই যে, যোগেন্দ্র কোঁতের যে হিন্দুয়ানি সঙস্করণ করিতে চাহিয়াছিলেন সেটা আমি বিশেষ পছন্দ করিতে পারি নাই। কটন প্রভৃতি ইঙরাজ Positivist-রাও যোগেন্দ্রের নারায়ণীমূর্তির বড় একটা অনুমোদন করিতে পারেন নাই। উক্তপ্রকার প্রবণতার বশবর্তী হইয়া যোগেন্দ্র আরও অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি জবাকুসুমসঙ্কাশঙ প্রভৃতি সূর্যের স্তব পর্যন্ত Positivism ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।' প. প., প. ১০২।

৫৮. কঙ্গ্রিভের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ২৫. ৬. ১৯০০ তারিখে রচিত, এবঙ *B.S.* ১৫৭-১৬০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত।

৫৯. পুরো নাম *Brahmanism and the Sudra, or Hindu Labour Problem; with several other Papers, Reprints &c.* পৃষ্ঠাসঙখ্যা ১৬৮ ; প্রকাশকাল অজ্ঞাত। রচনাকাল ১৯০০-০১ খ্রিস্টাব্দ। দ. *B.S.*, pp. 2,7,9 পাদটীকা। বইটি মার্চ ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে প্রেসে যায়। *B.S.*, p.132. গ্রন্থটির Miscellaneous Papers (প. ১২১-১৬৩) ধ্রুববাদী সমিতি, যোগেন্দ্রচন্দ্রের রচনাবলীর তালিকা, এবঙ বাঙলাদেশে ধ্রুববাদ আন্দোলনের বিভিন্ন তথ্যে সমৃদ্ধ।

৬০. মুদ্রিত ছোট বক্তৃতা ; তারিখ ৩১.৭.১৯০১। MEL e.70, ff.330-1.

৬১. দ. Jogendra to Congreve, 24 9 1901, MEL c. 186.

৬২. *The Substance of an Address delivered on the 8th September 1901 before the meeting of the Secretary of the [Society for the] Study of Comte's positive religion held in Calcutta to commemorate the Anniversary of Comte's death.* পৃষ্ঠাসঙখ্যা ১৩। কলকাতার সঙস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারে পুস্তিকাটির একটি কপি আছে। আত্মমুখী চিরস্থায়িত্ব সম্বন্ধে এই বক্তৃতা *Synoptic View of Hindu Labour Problem* নামে মুদ্রিত পুস্তিকার ভিত্তিতে রচিত হয়েছিল। দ. Jogendra to Congreve, 24.9.1901, MEL c. 186. এই পত্র *Brahmanism and the Sudra* গ্রন্থকে নির্দেশ করে কি না, বলা কঠিন।

৬৩. যোগেন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যু ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে : এই রচনার প্রকাশ তার পরের বছর। অন্য তথ্যের অভাবে রচনাকাল ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। ২২৫ পৃষ্ঠায় ছাপা একটি সম্পাদকীয় টীকা এই--'The Hindu Positivist whose views on Hindu social questions are here given, the late Babu Jogendra Chunder Ghose, Zeminder, was a man of great power of thought and of blameless character. He was a great friend of Sir Henry Cotton, K.C.S.I., who in a recent address has done ample justice to his memory.'

৬৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়--'সূচনা', প্রচার, শ্রাবণ ১২৯১।

৬৫. M.N.Ghosh.-*The Life of Grish Chunder Ghose,* pp.231-4. (Calcutta, 1911.)

৬৬. প. প., প. ৪১।

৬৭. প্রথম প্রকাশের জন্য দ. বিমলচন্দ্র সিঙহ (সম্পাদিত)--বঙ্কিম-প্রতিভা। (কলকাতা, ১৯৩৮)। গ্রন্থশেষে ১-৬২ পৃষ্ঠায় পত্রগুলি মুদ্রিত। প্রকৃতপক্ষে এগুলি পত্রাকারে প্রবন্ধ।

৬৭. প. প., প. ৪১-৪২।

৬৯. দ. পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়--'বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী', নারায়ণ, বৈশাখ ১৩২২।

৭০. বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'কৃষ্ণচরিত্রে' Seeley-র আদর্শ স্পষ্ট। *Letters on Hinduism* গ্রন্থে (Centenary edition, p.14) বঙ্কিমচন্দ্র যোগেন্দ্রকে লিখেছেন--'I, may reply to you, in the words of a writer, whom we both admire, that 'the substance of religion is culture.' সঙ্গের পাদটীকায় তিনি লিখেছেন 'Natural Religion by the author of Ecce Homo, p.145'। Seeley-র বক্তব্য তিনি 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থেও তুলে ধরেছেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র Brahman, the Priest গ্রন্থেও Natural Religion-এর উল্লেখ করেছেন। পূর্বের গ্রন্থের দ্বিতীয় পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন-- 'Hinduism is in need of a reformation'. এর পিছনে পাশ্চাত্য আদর্শ ছিল।

৭১. *Letters on Hinduism* (Centenary edition) গ্রন্থের ৫০-৫২ পৃষ্ঠায় বঙ্কিমচন্দ্র Comte-এর ধ্রুববাদের বক্তব্য সংক্ষেপে লিখেছেন ; তার বিরুদ্ধে কিছু লেখেননি। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে 'নবজীবনে' প্রকাশিত 'ধর্মজিজ্ঞাসা' প্রবন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র Comte-এর কথা লিখেছেন।

৭২. যোগেন্দ্রচন্দ্রের অধিকাংশ গ্রন্থে তাঁকে লেখা Dr. Congreve-এর চিঠিপত্রের নানা অংশ প্রয়োজনে যুক্তি হিশাবে উপস্থিত করা হয়েছে।

৭৩. মন্মথনাথ ঘোষ--হেমচন্দ্র, ১ম খন্ড, প. ৬০। (কলকাতা, ১৩২৬,১ম সংস্করণ।)

৭৪. (ক) J.C. Ghosh.–*In Memory of Bankimchandra Chatterjee*, বঙ্কিম-কণিকা, প. ৪৩ (বিমলচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত)। (খ) বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে সাহিত্যবৈঠকে যোগেন্দ্রচন্দ্র আসতেন। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়--বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনচরিত, প. ৬২৪। (কলকাতা, ১৩২২, দ্বিতীয় সংস্করণ।)

৭৫. অক্ষয়চন্দ্র সরকার--'পিতাপুত্র', বঙ্গভাষার লেখক (কলকাতা ১৩১১, হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত)।

৭৬. দ. (ক) [মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়]--ভূদেব চরিত, ২য় ভাগ, প. ২৯৩-৩০১। (কলকাতা, ১৯২৩)
(খ) মন্মথনাথ ঘোষ--হেমচন্দ্র, ২য় খন্ড, প. ৩০৯-৩২১। (কলকাতা, ১৯২১)
(গ) মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়--আমার দেখা লোক, প. ১০-১১। (কলকাতা, তারিখহীন, I.)

৭৭. বঙ্গদর্শনের সম্পাদক হিসাবে সঞ্জীবচন্দ্র রচনা ও আলোচনার জন্য কয়েকবার খিদিরপুরে যোগেন্দ্রচন্দ্রের গৃহে গিয়েছিলেন।

৭৮. প. প., প. ৩৩, ৪১-৪২।

৭৯. পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়--'স্মৃতিকথা : হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়', প্রবাহিনী, ১৫। ১১। ১৩২০।

৮০. নবীনচন্দ্র সেন এই প্রসঙ্গে লিখেছেন--'তিনি [হেমচন্দ্র] যাহা লেখেন তাহা তাঁহার বন্ধু বঙ্কিমবাবু, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, যোগেন্দ্র ঘোষ মহাশয়েরা সমালোচনা করিয়া কাটান।' নবীনচন্দ্র সেন--আমার জীবন, ২য় ভাগ, প. ৩৭৬ (কলকাতা, ১৯০৯, I)।

৮১. মন্মথনাথ ঘোষ--হেমচন্দ্র, ২য় খন্ড, প. ৩১০-১। (কলকাতা, ১৩৪৫, II.)

৮২. দ. *The Dawn* : 1899 পত্রে ধারাবাহিক প্রকাশিত In Memory of Sir Ramesh Chandra Mitra প্রবন্ধ।

৮৩. তাঁর মৃত্যুর পরে কলকাতার ডক্ কর্তৃপক্ষ ঐ বাড়ি অধিগ্রহণ করলে, তাঁর বংশধরেরা স্থায়ীভাবে ভবানিপুরে চলে আসেন।

৮৪. মন্মথনাথ ঘোষ--হেমচন্দ্র, ৩য় খন্ড, প. ১৪১-৬। (কলকাতা, ১৯২৩, I.)

৮৫. তদেব, প. ১৯৪, ১৯৮, ২৪৬, ২৭৯-২৮০।

৮৬. কৃষ্ণকমল বলেছেন--"আমার স্বর্গীয় বন্ধু যোগেন্দ্র কোমত্ পড়িয়া পড়িয়া মনোবৃত্তি এতদূর পরিবর্তিত করিয়া ফেলিয়াছেন যে, তাঁহার আবাদের চাষারা তাঁহাকে নমস্কার করিবার জন্য তাঁহার বাটীতে কখনও কখনও আসিত। একদা তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন--'দেখ, তোমরা

আমাদিগকে খাইতে দাও বলিয়া আমরা চারিটি খাইতে পাই।' চাষারা ত শুনিয়া অবাক ও হতবুদ্ধি। তাহারা কখনও কোনও জমীদারবাবুর মুখে এ প্রকার অত্যাশ্চর্য বাক্য শ্রবণ করে নাই। তাহারা শিহরিয়া উঠিল, কিছুই তাত্পর্যগ্রহ করিতে পারিল না।" দ. বিপিনবিহারী গুপ্ত--'Positivism বা ধ্রুবদর্শনপ্রসঙ্গ', আর্য্যাবর্ত্ত, আষাঢ় ১৩২০, প. ২০৬। কোন আধুনিক লেখকের কাছেও বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। দ. অলোক রায়--প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র ও উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজ-মন, প. ৪৮-৪৯। (কলকাতা, ১৯৬৭)

৮৭. যোগেন্দ্রচন্দ্র ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিলের বিরোধিতা করে লেখেন, যে সরকার, জমিদার ও প্রজার ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অনুসারে প্রাসঙ্গিক ব্যবস্থা নির্ধারিত হওয়া উচিত : কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রজাদের বক্তব্য শোনা হয়নি,—ইলবার্টের এই যুক্তি অসার। 'An immediate reply to this argument would 'be, that in the sale and purchase of slaves the third party was never consulted,' and 'the ryots have no right to the soil,' except what is conferred by the Zeminders." J.C. Ghosh—*Remarks Explanatory of the Petition to Parliment of the Zemindars of Bengal and Behar regarding the Bengal Tenancy Bill,* p.9. এদেশে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের পরে প্রকাশিত প্রত্যেক বইয়ের তিন কপি সরকারকে বিনামূল্যে দেবার জন্য আইন হয়। যোগেন্দ্রচন্দ্র বিনামূল্যে বই দিতে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। নিজের লিখিত ও প্রকাশিত The Political Side of Brahmanism গ্রন্থ সম্বন্ধে লন্ডনে ধ্রুববাদীদের নেতা Dr. Richard Congreve-কে ১২. ৪. ১৮৯৬ তারিখে যোগেন্দ্র লেখেন—'I have had printed only 30 copies of which 3 ..Government as a tax upon literary venture.' f. 275. MEL e. 70.

৮৮. (a) *B.S.*, p 125. (b) Jogendra to Geddes, 16.11.1878, MEL e.70, f. 344

৮৯. (a) 'I have by this day's post sent to your address a small print in Bengali. .I should not think that you would take any interest in the essay unless my friend Babu Khetternath Bhuttarji, who I believe is known to you had written to me to the contrary effect.' Jogendra to Geddes, 5.9.1878, MEL e.70, ff.337-8. গেডেস বাঙলা পড়তে পারতেন কি না, জানা নেই। (এই ক্ষেত্রনাথ কি ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, যিনি 'এডুকেশন গেজেট' পত্র সম্পাদনায় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সহকারী ছিলেন?) (b) তাঁর প্রবন্ধের মূল্যায়ন করার জন্য যোগেন্দ্রচন্দ্র গেডেসের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। Jogendra to Geddes, 15.9.1878, MEL e. 70, ff.339-340. (c) 'Shall I be right in writing to him for a copy of his printed paper?' Gurudas to Geddes, 9.11.1878, MEL e. 71, ff.16-17. (d) 'I am indeed very happy to know that I shall have the suggestions of your friend Babu Gurudas Chatterji about my essay on Attachment Veneration and Kindness.' Jogendra to Geddes, 17.11.1878, MEL e. 70, ff.351-2.

৯০. অনুরোধে যোগেন্দ্র সামান্য চাঁদা পাঠান, কিন্তু ধ্রুববাদী সমিতিতে তাঁর যোগ না দেবার কারণ লেখেন। Jogendra to Geddess, 16.11.1878, MEL e.70, ff.343-351.

৯১. (ক) যোগেন্দ্র ভেবেছিলেন, যে ধ্রুববাদকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নিলে তাঁকে হিন্দু সমাজ ও নিজের যৌথ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে, এবং তিনি জমিদার থাকতে পারবেন না। সেজন্য তিনি ধ্রুববাদী হতে চাননি। Jogendra to Geddes, 16.11.1878, MEL e.70,ff.343-351. (খ) 'I am sorry that I cannot formally join the

Positivist body · ..the chief obstacles with me are my domestic and social ties which must be a cut through in some shape or other, if I call myself a follower of the Religion of Humanity.' Jogendra to Congreve, 8.12.1878, MEL e.70 (গ) তবু কঙ্গ্রিভ যোগেন্দ্রকে যোগদানের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। Congreve to Jogendra, 17.1 1879, AM 45262, ff.6-9.

৯২ ১৮৭৯ নভেম্বরে কঙ্গ্রিভ যোগেন্দ্রচন্দ্রের চাঁদা পান। তারপরে তিনি যোগেন্দ্রকে নিয়মিত চাঁদাদাতা হিশাবে দেখতে চান। Congreve to Jogendra, not dated (postmark 27 2 1880, received on 21 3.1880), AM 45262, f.37. যোগেন্দ্রচন্দ্রের চাঁদা পাঠানোর প্রমাণ পরের চিঠি। Jogendra to Congreve, 8.11.1879, MEL e.70, f.24.

৯৩ কঙ্গ্রিভ যোগেন্দ্রচন্দ্রকে আশ্বাস দেন, যে ধ্রুববাদী সমিতিতে যোগদানের ফলে তাঁর সামাজিক সম্পর্ক ব্যাহত হবে না। তার পরে যোগেন্দ্র যোগ দেন। ২. ১. ১৮৮৪ তারিখে যোগেন্দ্রচন্দ্রের উপরে কটন প্রদত্ত ধ্রুববাদী 'Maturity' প্রদানের আগে যোগেন্দ্র নিজের অনেক সামাজিক পারিবারিক ও ধর্মীয় কর্তব্য নিজের ছেলের উপর ন্যস্ত করেন। কিন্তু তিনি নিজের সামাজিক বন্ধনগুলি ছিন্ন করতে চাননি। Jogendra to Congreve, 11.6.1883, MEL e.70. কিন্তু তিনি পারিবারিক গোলযোগে, বিশেষত তাঁর ধ্রুববাদ ও মানবধর্মে তাঁর পরিবারের লোকেদের আগ্রহের অভাবে ব্যথিত ছিলেন। Jogendra to Congreve, 5.6.1886, MEL e.70.

৯৪. কৃষ্ণকমলের মতে যোগেন্দ্রচন্দ্র বৃদ্ধ বয়সে ধ্রুববাদ সম্বন্ধে লেখালিখিতে ব্যস্ত ছিলেন। প. প., প ১০২। বৃদ্ধ যোগেন্দ্র যুবক হীরেন্দ্রনাথকে ধ্রুববাদে নিজের পূর্ণ বিশ্বাসের কথা জানিয়েছিলেন। দ. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত--দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র, প. ৩৫ পাদটীকা। (কলকাতা ১৩৪৭)। তবু আমেরিকার লেখিকা ফোর্বস জানিয়েছেন, যে যোগেন্দ্রচন্দ্র শেষ জীবনে ধ্রুববাদ সম্বন্ধে মোহমুক্ত হয়েছিলেন। দ. G.H. Forbes.—'Jogendra Chandra Ghosh and Hindu Positivism', *Contributions to Indian Sociology* (N.S.), 1975, no. 8. তিনি বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণ দেননি।

৯৫. কঙ্গ্রিভকে যোগেন্দ্রচন্দ্র, ৮.১২.১৮৭৮, ২৫. ৮. ১৮৮১ Mel e. 70.

৯৬. প. প., প. ১০২।

৯৭. *B S.*, p 130.

৯৮. প. প., প. ৩৫।

৯৯. প. প., প. ৩১৪।

১০০. এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ, ২২. ৯. ১২৮৯, প. ৫৮২। প্রসঙ্গত স্মরণীয়—'He was one of the leading spirits of the British Indian Association was a believer in the Permanent Settlement and in Zemindar's rights and was for a time the principal working hand of the Association.' *Indian Nation,* 10.3.1892, p.111.

১০১. যোগেন্দ্রচন্দ্র এক হাজার টাকা দান করেন, এবং কয়েকটি কমিটির সদস্য থাকেন। দ. Mahendralal Sircar.—*Indian Association for the Cultivation of Science,* pp. 55, 82, 107, lvi. (Calcutta, 1877.) প্রস্তাবিত বিজ্ঞান সভা নির্মাণের জন্য ২৫ জন সদস্যের অস্থায়ী কমিটির একজন সদস্য ছিলেন যোগেন্দ্রচন্দ্র। দ. *Bengalee,* 27.11.1875, p.373.

১০২. *Brahmanism and the Sudra* গ্রন্থের শেষে নিজের নামের পরে যোগেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন—'Leading Member : Society for the Study of Positive Religion in India.' প্রসঙ্গত একটি ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। G. H. Forbes লিখেছেন

—'In 1884 Jogendra formally joined the Positivist organisation after receiving the Sacrament of Maturity. Very soon he began to share leadership duties with Henry Cotton and by 1890 he had replaced the English leaders'. G.H. Forbes.–Jogendra Chandra Ghose and Hindu Positivism, *Contributions to Indian Sociology* (N.S.), 1975, no. 8, p.3. যোগেন্দ্রচন্দ্র ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে এই গোষ্ঠিতে যোগ দেন, বক্তৃতা করেন, এবঙ ১৮৮২-৮৩ খ্রিস্টাব্দে উৎসবের আয়োজন করেন। তিনি প্রথমাবধি এই সমিতির সদস্য ছিলেন, ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ থেকে নেতৃত্বের কাজে অঙশগ্রণ করতে থাকেন, এবঙ ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে তার প্রধান সদস্য (অর্থাৎ নেতা) হন।

১০৩. দ. (a) Calcutta University.—*Minutes of the Senate* for the year 1901-02, pp.360-1. (b) *Indian Nation*, 23.2.1902. এই দান থেকে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদের মধ্যে কেউ ব্রিটিশ আইনের সঙ্গে ভারতীয় হিন্দু আইনের তুলনামূলক আলোচনা করে বার্ষিক বৃত্তি পেতে পারেন।

১০৪ 'I would not like to omit mention of my dear friend Jogendra Chandra Ghose of Kidderpore, a profound student and philsopher, who took little or no part in public life, but deeply impressed by his example and teaching the many friend who cherish his memory and mourns his loss..' H.J.S. Cotton.–*Indian and Home Memories*, p.223. (London, 1911.)

১০৫. এড়ুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ. ১।১২।১২৮৫, প. ৭২৪।

১০৬ দ. (ক) 'জাতীয় বিদ্যালয়', ধর্মপ্রচারক, জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র ১৮১০ শক। (খ) 'জাতীয় বিদ্যালয়', বেদব্যাস, অগ্রহায়ণ ১২৯৫।

১০৭. *Brahmo Public Opinion*, 27.9.1883.

১০৮. মন্মথনাথ ঘোষ--হেমচন্দ্র, ১ম খন্ড, প. ৬১। (কলকাতা, ১৩২৬)। নাম ও ঠিকানা -Church of Humanity, 47 Chapel Street, Strand, London. যুদ্ধের বোমাবর্ষণে এই গৃহ পরে ভেঙ্গে গেছে। আরো দ. W. F. Westbrook–The Religion of Humanity and Sir Henry Cotton, *Modern Review*, January 1916, p.55.

১০৯. বিজ্ঞপ্তির জন্য দ. *India* (published from London), 13.6.1902, p.277 এই বিষয়ে তথ্যের জন্য দ. *India*, 20.6.1902, pp.289-290. বক্তৃতাটির সঙক্ষিপ্তসারের জন্য দ. 'Mr. Cotton on Babu Jogendro Chunder Ghosh (Special Report)', *India*, 20.6.1902, p.295. জে. এন. টাটা (বোম্বাই) এবঙ আরো কয়েক জন ভারতীয় ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তবে সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের অধিকাঙশ ছিলেন ইঙরাজ ধ্রুববাদী। এই বক্তৃতা ভারতীয়দের সন্তুষ্ট করেছিল। দ. (a) Satischandra Ghosh to Mrs. Congreve, 7.8.1902, MEL c. 186, f. 255. (b) সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লেখা সম্পাদকীয় টীকা। দ 'The Views of an Eminent Hindu Positivist on Hindu Social Matters', *The Dawn*, vol. VI, March 1903, p. 225 footnote.

১১০. 'Whether a Bengali translation of Imitation of Christ will be of good service.' Jogendra to Congreve, 22.6.1881, f. 57. MEL e.70. Also see– Jogendra to Congreve, 1.8.1881, ff. 63-66. MEL e. 70.

১১১. (a) 'A third friend..has just written to me suggesting a reprinting of Mr. Harrison's exposition of the system in the March number of the Nineteenth–(the article headed A layman's Creed–if I mistake not)–

for gratuitious distribution in this country. ..Whether to reprint at all–if we can afford the cost–and how to secure the permission if it have to be reprinted.' Jogendra to Congreve, 25.8.1881, ff. 68-69, MEL e. 70. (b) 'I have not read the article in the Nineteenth Century you allude to. ..Your friend the lawyer would find it quite possible to study the Catechism if he would do as one of our Indian civilians. Dr. Burnell told me he has done;..if you determine to reprint the article..I can through friends procure the permission you require.' Congreve to Jogendra, 21.10.1881, AM 45262. রচনাটির লেখক পরে তা একটি বইতে প্রকাশ করেন। যোগেন্দ্র-কঙ্গ্রিভের পরের চিঠিপত্রে এই প্রসঙ্গে আর কোন কথা পাওয়া যায় না।

১১২. '..The French is a sealed language with me, but the motto–La soumission est la base du perfectionnement– is peculiarly grateful to my feelings. Indeed I have ventured to cite it already though I do not know exactly from what place in Comte's writings it has been taken.' Jogendra to Congreve, 15.5.1884, f. 187. MEL e.70. রায় রামানন্দের দাস্য প্রেমের অর্থ প্রসঙ্গে কঁতের লেখা থেকে নেওয়া।

১১৩. (a) 'I am not a French scholar'. Jogendra to Congreve, 13.7.1879, f. 18. MEL e. 70. (b) 'The French publications are a sealed book to me; and I think it would be more useful to keep them with you for those who know French.' Jogendra to Congreve, 28.4.1881, f. 50. MEL e.70. (c) Jogendra to Congreve, 5.9.1883. MEL e.70.

১১৪. প.প., প. ১০১।

১১৫. যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের *Brahman, the Priest* (১৮৮৮) গ্রন্থ ধ্রুববাদী সমিতির ৩১. ১২. ১৮৮৭ তারিখের 'day of all the dead' নামের অনুষ্ঠানে পঠিত বক্তৃতা। অধিবেশনে উপস্থিত সভ্য ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের একটি তালিকা এই গ্রন্থে আছে। তা অনুসারে H.J.S. Cotton ও H. Beveridge সদস্য ছিলেন। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে F. H. Barrow ছিলেন য়ুরোপীয়। এই তালিকা থেকে জানা যায় আদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিপুরাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়, সত্যচরণ দেব, দীননাথ চট্টোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র চৌধুরী, অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়, শ্যামলাল দেব, শরত্চন্দ্র রায় প্রভৃতি অনেকে এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য ছিলেন ; কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁদের উল্লেখ করেননি। পরের একটি পাদটীকায় জানা যাবে, ২. ১. ১৮৮৪ তারিখে British Indian Association Hall-এ প্রতিষ্ঠানের একটি অধিবেশন হয়েছিল। যোগেন্দ্রচন্দ্রের *Brahmanism and the Sudra* গ্রন্থের শেষে তাঁর নামের পাশে 'Leading Member : Society for the Study of Positive Religion in India' ছাপা আছে। অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা মুদ্রিত হলে, শেষে যোগেন্দ্রচন্দ্রের বাড়ির ঠিকানা আছে। বোধহয় সেখানে অধিবেশন হয়েছিল।

১১৬. প. প., প. ১০২।

১১৭. দ. (a) Moncure Daniel Conway.–A Tour Round the World, *Glasgow Herald,* 17.4.1884. পুনর্মুদ্রণ *B.S.*, pp.140-9. (b) M.D. Conway.–*My Pilgrimage to the Wise Men of the East,* pp. 218-9. (London, 1906.)

১১৮. প্রিয়রঞ্জন সেন--'বাঙলায় ধ্রুববাদ', *Krishnagar College Centenary Commemoration Volume,* p.35. (1948.) কথাগুলি অধ্যাপক সেন *The Positive Religion* গ্রন্থ থেকে আহরণ করেছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন 'বাঙলায় ধ্রুববাদী চিন্তা' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা

করেছেন (মানসী ও মর্মবাণী, আশ্বিন ১৩৩৩,জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৩৬), এই সঙবাদ জনৈক গবেষক তাঁর গবেষণা-গ্রন্থে পরিবেশন করেছেন। দ. রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত--বঙ্গদর্শন ও বাঙলাসাহিত্য. প. ২৫২। (কলকাতা, ১৯৭৭)। প্রকৃতপক্ষে অত্তে ঐ সঙ্খ্যাগুলিতে এমন কোনো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়নি। অবশ্য সেখানে বিপিনবিহারী গুপ্তের 'পুরাতন প্রসঙ্গ' ধারাবাহিক ছাপা হচ্ছিল।

১১৯. যোগেন্দ্রচন্দ্রের সঙক্ষিপ্ত জীবনীর জন্য দ. B. Roy Choudhury. (Ed.)–*Speeches of J.C. Ghosh.* (Calcutta, 1924.)

১২০. কালীপ্রসন্ন দত্ত---'বিজ্ঞাপন', বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনচরিত। (কলকাতা, ১২৯৯)। বোধহয় বলা বাহুল্য, এম. এ, বি. এল, উপাধিধারী যোগেন্দ্রচন্দ্র ছিলেন চন্দ্রমাধব ঘোষের জ্যেষ্ঠপুত্র ও ভবানিপুরবাসী। খিদিরপুরের যোগেন্দ্রনাথের কোন ডিগ্রি ছিল না, এবঙ তিনি দ্বারকানাথের বন্ধু ছিলেন।

১২১. Indira Sarkar.—The Milieu of Comte and Renan in the Poetry of Nabin Sen, *C.R.*, June 1948, vol. 107,p.126.

১২২. Indira Sarkar.—*Social Thoughts in Bengal* (1757-1947) : *a bibliography of Bengali Men and Women of Letters,* pp.13, 16, 19. (Calcutta, 1949.) এই বিবরণ অনুসারে যোগেন্দ্রচন্দ্র ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে *Positivist Calendar* প্রকাশ করেন : তার দ্বিতীয় সঙস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে,--উপরের বর্ণনার মত ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে নয়। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে মানবধর্মের ধর্মাচার পালনের প্রসঙ্গ এখানে আবার লেখা হয়েছে। কিন্তু লেখিকা তাঁর পরের গ্রন্থে অনুরূপ প্রসঙ্গে এই বিষয়ে কিছু লেখেননি। দ. Indira Sarkar.—*Nabin Sen, the Poet.* (Calcutta, 1975.)

১২৩. *B.S.*, pp.125-6.

১২৪. আইন অনুসারে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই থেকে বাঙলাদেশে মুদ্রিত / প্রকাশিত সমস্ত গ্রন্থ ও সাময়িকপত্রের কপি কয়েকটি তথ্যের সঙ্গে সরকারকে দিতে হত। রাইটার্স বিল্ডিঙ-এ Bengal Library-তে তা রাখা হত। পরে তা উঠে গেছে। বিবরণসহ তালিকা Calcuttta Gazette-এ বছরে চার বার প্রকাশিত হত। Bengal Library Catalogue সেই তালিকার নাম।

১২৫. এমনকি অনেক বছর পরে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য যখন অনুলেখকের সহায়তা নিয়ে এই বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন, তখন তিনি প্রসঙ্গত যোগেন্দ্রচন্দ্রের উল্লেখ করেও এরূপ কোন প্রকাশনার কথা বলেননি। দ. বিপিনবিহারী গুপ্ত—'পজিটিভজম্ বা ধ্রুবদর্শনপ্রসঙ্গ' 'আর্যাবর্ত, ১৩১৯-২০। যোগেন্দ্রচন্দ্র অবশ্য ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে ধ্রুবধর্মের অনুষ্ঠানগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। দ. কঙ্গ্রিভকে যোগেন্দ্রচন্দ্র ৭.৭.১৮৯৮, MEL e. 70, f. 322. তা বোধহয় অপ্রকাশিত ছিল।

১২৬. (a) 'Since I wrote to you last I have succeeded in procuring a copy of Mr. Edgar's Positivist Calendar. But the more I sutdy it the more I am impressed about the immense intellectual gulf between the East and the West.' Jogendra to Congreve, 2.6.1880, f.37. MEL e. 70. This was an American edition. (b) 'Newton Hall gentlemen are going to publish the Positivist Calendar.' Jogendra to Congreve, 5.6.1886, f. 229. MEL e.70.

১২৭. এই গ্রন্থে ধ্রুববাদী উত্সবের বর্ণনা, ধ্রুববাদী পঞ্জিকা, তার দুরকম ব্যাখ্যা, এবঙ তাতে উল্লিখিত ব্যক্তিদের বর্ণনা ছিল। W.Reeves অনূদিত ও F. Harrison সম্পাদিত *The Positivist Calendar of 558 Worthies of all the Ages and Nations* ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ইঙলন্ডে প্রকাশিত হয়। বাঙালি ধ্রুববাদীদের পক্ষে কঙ্গ্রিভ অনূদিত *Catechism of Positive Religion* গ্রন্থের শেষে ধ্রুববাদী পঞ্জিকার বর্ণনাই যথেষ্ট ছিল। যোগেন্দ্রচন্দ্রও সেই বিষয়ে জানতে উত্সুক ছিলেন। 'Are you going to reprint the Catechism? When?' Jogendra to

Congreve, 28.11.1882, f.121, MEL e.70. প্রসঙ্গত দ. Samuel Lobb—*A Brief View of Positivism : compiled from the works of Auguste Comte. (Calcutta, 1871)* এই গ্রন্থে পত্রিকার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছিল। বাঙালি ধ্রুববাদীদের সংখ্যা কম, এবং গোঁড়া মানবধর্মাবলম্বী ছাড়া অন্যের কাছে এই গ্রন্থের বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল না।

১২৮ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস--বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প. ৯৫। (কলকাতা, বৈশাখ ১৩৬১, ৪র্থ সংস্করণ, প. ৯৫)।

১২৯. শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়--বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনচরিত, প. ২৮০ (কলকাতা, ১৩২২ সন, ২য় সংস্করণ)। এই বিবরণে যোগেন্দ্রচন্দ্রের নামে ভুল হয়েছে।

১৩০. J. C. Ghose.—*In Memory of Bankimchandra Chatterjee,* বঙ্কিম-কণিকা। (বিমলচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত। কলকাতা, ১৩৪৮।)

১৩১. দ. (ক) B.C. Chaterjee.—*Letters on Hinduism.* (প্রথম পত্র।) (খ) প্রভাত, ১৩৭৫ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় বর্তমান লেখকের প্রবন্ধ 'বঙ্কিমচন্দ্র'। (বর্তমান গ্রন্থে সঙ্কলিত।)

১৩২. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত--দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র, প. ৩৫। (কলকাতা, ১৩৪৭)

১৩৩. মন্মথনাথ ঘোষ--হেমচন্দ্র, ৩য় খন্ড, প. ৩৮১। (কলকাতা, ১৩৩০)

১৩৪ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার--'বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ', সাধনা, ১৩০১ শ্রাবণ।

১৩৫. হরিদাস মুখোপাধ্যায়--'বাঙালি চিন্তায় অগস্ত কোঁত্,' আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৬৪ দোল সংখ্যা।

১৩৬. সুরেশচন্দ্র মৈত্র--বাঙলা কবিতার নবজন্ম : ১৮৫৮-১৮৯১, প. ৩৩৫। (কলকাতা, ১৩৬৯)

১৩৭. দ. বঙ্গদর্শন,১২৮২ মাঘ, প. ৪৬৮ পাদটীকা।

১৩৮. বঙ্গদর্শনে এই রচনাটি প্রকাশের সম্বন্ধে একটি কৌতুককর বিবরণের জন্য দ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী--'বঙ্কিমচন্দ্র কাঁঠালপাড়ায়', নারায়ণ ১৩২২ বৈশাখ। এর পুনর্মুদ্রণ--(ক) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (সম্পাদিত)-বঙ্কিম-প্রসঙ্গ (১৯২২)। (খ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অনিলকুমার কাঞ্জিলাল (সম্পাদিত)--হরপ্রসাদ রচনাবলী, প্রথম সম্ভার (১৯৫৬)। (গ) সোমেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদিত)--কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র (১৯৬৪)। (ঘ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ, ২য় খন্ড (১৯৮১)। (ঙ) বারিদবরণ ঘোষ (সম্পাদিত)--বঙ্কিম-স্মৃতি (১৩৯৫)। মন্মথনাথ ঘোষ তাঁর 'মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়' (১৩৪০) গ্রন্থের ৬৪-৬৫ পৃষ্ঠায় সেই কাহিনী লিখেছেন।

১৩৯. P. Sinha.—*Nineteenth Century Bengal : aspects of social history,* p.114 (Calcutta, 1965.)

১৪০. প্রাগুক্ত।

১৪১. দ. (ক) শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়--বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনচরিত, প. ২৮০। (কলকাতা, ১৩২২) (খ) সুশীলকুমার গুপ্ত--'বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মজিজ্ঞাসা', মাসিক বসুমতী, ১৩৬৬ বৈশাখ। (গ) অরবিন্দ পোদ্দার--বঙ্কিম মানস, প. ১৮১-২। (কলকাতা, ১৯৫৫)।

১৪২. যেমন, কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার।

১৪৩. Bela Dutta Gupta—*Sociology in India,* p. 183. (Calcutta, 1972.)

• প্রান্তিক (নব পর্যায়) : বর্ষ ১, সংখ্যা ১, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৫, প. ১৬-৩০।

অংশত আবার লেখা। কিছু সংশোধন, এবং নতুন তথ্যে বর্ধন। নিচের বইগুলিতে উপরের লেখার উল্লেখ, এবং তাকে অতিক্রম করলে ভুল আছে।

ভবতোষ দত্ত--চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র। (কলকাতা, ১৯৭৩. দ্বিতীয় সংস্করণ)।

G.H.Forbes.—*Positivism in Bengal.* (Calcutta, 1975.)

রবীন্দ্র গুপ্ত--বঙ্গদর্শন ও বাঙলা সাহিত্য। (কলকাতা, ১৯৭৭।)

রবীন্দ্রনাথ সিভিলিয়ান হতে চেয়েছিলেন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্কুলের পড়াশুনা শেষ করেননি। ওরিয়েন্টাল সেমিনারি থেকে বেঙ্গল একাডেমি, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর যাতায়াত নিষ্ফল হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়েরা যখন এই বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন, তখন তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আই সি এস হয়ে আমেদাবাদে জজ ছিলেন। তখনকার দিনে এন্ট্রান্স বা তার সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে বিলাতে গিয়ে ব্যারিস্টারি পড়া বা আই সি এস পরীক্ষা দেওয়া যেত। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পূর্বে স্নাতক হবার নিয়ম অনেক পরে প্রবর্তিত হয়। এই উদ্দেশ্যে আই সি এস পরীক্ষার্থীর বয়স একুশ বছরের অনধিক হওয়া প্রয়োজন ছিল বলে সরকারের কাছ থেকে বয়সের প্রমাণপত্র নেবাব প্রয়োজন হত। সেকালে যেসব ভারতীয় আই সি এস পরীক্ষা দেবার জন্য ইঙলন্ডে যেতেন তাঁদের অনেকে ব্যারিস্টারিও পড়তেন এবঙ প্রথমোক্ত পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরতেন। যেমন চিত্তরঞ্জন দাশ। অবশ্য কেউ কেউ দুটি পরীক্ষাতেই পাশ করেছেন, যেমন, রমেশচন্দ্র দত্ত।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রস্তাব করেন, যে রবীন্দ্রনাথ বিলাতে গিয়ে ব্যারিস্টারি পড়বেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই প্রস্তাবে সম্মত হলে রবীন্দ্রনাথের বিলাতযাত্রা স্থির হয়।[১]

লন্ডন থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করে যোগ্যতা অর্জন করা ছিল তাঁর প্রথম উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, যে তিনি বিলাতে গিয়েছিলেন ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য।[২]

১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি রবীন্দ্রনাথ আমেদাবাদে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে যান এবঙ সেখানে ও বোম্বাইতে মাস ছয়েক থেকে তিনি ঐ বছর সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর মেজদাদার সঙ্গে বিলাতযাত্রা করেন। তখন তাঁর বয়স আঠারো পূর্ণ হয়নি। তাঁর মেজবৌদি তখন ব্রাইটনে থাকায় রবীন্দ্রনাথ প্রথমে সেখানে একটি পাবলিক স্কুলে এবঙ পরে লন্ডন য়ুনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে কিছুদিন পড়াশুনা করেছিলেন।[৩]

হেনরি মর্লি ইঙরাজি সাহিত্যে তাঁর অধ্যাপক ছিলেন। তখন তাঁর যে নতুন বন্ধুলাভ হয় তাঁর নাম লোকেন পালিত। তিনি বিখ্যাত আইনজীবী তারকনাথ পালিতের পুত্র। লোকেন্দ্রনাথ পরে সিভিলিয়ান হয়ে দেশে ফিরেছিলেন। পিতা দেবেন্দ্রনাথের আদেশে অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে পড়াশুনা অসমাপ্ত রেখে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে দেশে ফিরতে হয়। এই তথ্য বহুজ্ঞাত।

লন্ডন থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করলে রবীন্দ্রনাথ ব্যারিস্টারি পড়তে বা আই সি এস পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করতে পারতেন। তখনকার দিনে দুটো রাস্তা খোলা রাখাই ছিল রীতি, এবঙ সিভিলিয়ান হওয়ার প্রতি সাধারণের বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ সিভিলিয়ান ছিলেন। সেই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও শুধু ব্যারিস্টারি নয়, আই সি এস পরীক্ষার কথা মনে করা স্বাভাবিক ছিল। তবে সেই বিষয়ে এযাবত্ কোনো তথ্য জানা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ কিছু লেখেননি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লেখ্যাগারে কিছুদিন আগে পুরনো কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে রবীন্দ্রনাথের হাতে লেখা একটি পুরনো দরখাস্ত পাওয়া গেল যাতে লেখা আছে, যে তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে বিলাতে যাবেন বলে নিয়ম অনুযায়ী বয়সের জন্য একটি প্রমাণপত্র চান। সেইজন্য তিনি দরখাস্তের সঙ্গে নিজের কোষ্ঠী জমা দিচ্ছেন। মূল পত্রটি সামান্য ছেঁড়া এবং তার ভেঙে-যাওয়া ভাঁজে আঠা দিয়ে হলদে রঙের কাগজ জুড়ে দেওয়ায় লেখা স্থানবিশেষে অস্পষ্ট। (আলোকচিত্রে এরূপ রচনাংশ ধরা পড়েনি।) পত্রটি এরূপ--

To
The Secretary to the Government of Bengal

Sir,

As I intend to proceed to England for the purpose of competing at the Indian Civil Service Examination. I beg to request the favour of your granting me a certificate of my age as required by the Rules. I beg to submit my Horoscope in evidence of my age and to express my readiness to appear at the time and place, which you may be pleased to appoint to prove the [ ].

I have the honour to be
Sir,
Your most obedient servant,
[Sd/-] Rabindranath Tagore

Calcutta,
The 10th March, 1878.

এই দরখাস্তের সঙ্গে এনক্লোজার হিসাবে একটি কোষ্ঠী পাঠানো হয়েছিল। স্বাভাবিক কারণেই তা ফাইলে পাওয়া যায়নি। উদ্ধৃত পত্রে বন্ধনীস্থ অংশের শব্দের পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

এই পত্র রচনার সময়ে রবীন্দ্রনাথের আমেদাবাদে যাত্রা আসন্ন। তাঁর বয়সের জন্য প্রমাণপত্র নেবার প্রয়োজন ছিল, অথচ সেজন্য হাতে বেশি সময় ছিল না। সরকারি কাজটি তাড়াতাড়ি করানোর পক্ষে তাঁর সহায়ক ছিলেন তাঁর বড় ভগ্নিপতি জানকীনাথ ঘোষাল। জানকীনাথ তখন বিচার বিভাগে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে আবেদনকারীর সম্পর্কও কাজের পক্ষে সহায়ক হতে পারত। রবীন্দ্রনাথ এই দুটি সুবিধাই ভোগ করেছিলেন।

মূল ফাইলে রবীন্দ্রনাথের দরখাস্তের সঙ্গে ছোট ছোট কাগজে লেখা দুটি চিঠি আছে। হলদে কাগজে নীল পেন্সিলে (এখন অস্পষ্ট) লেখা প্রথম কাগজের শেষে জানানো হয়েছে, যে দরখাস্তকারীর একজন দাদা আমেদাবাদের জজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর,

আই সি এস। দ্বিতীয় কাগজে বাঙলা সরকারের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি রাজেন্দ্রনাথ মিত্রকে জানকীনাথ ঘোষাল এই কাজটি তাড়াতাড়ি করে দেবার জন্য অনুরোধ করেছেন। তাঁর চিঠিটি এরূপ--

My dear Rajendra Baboo,

Herewith I send that application of Baboo Robindra N. Tagore, his Horoscope-we shall feel greatly obliged to you by your forwarding them to the [ ] today with instructions to expediate the matter.

Janokeenath Ghosal
13th March, 1878.

এই চিঠিতে হরোস্কোপ শব্দের পরে 'সাম লিটিল বুকস' শব্দগুলি লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে।

বাঙলা সরকারের ছোটলাটের সাধারণ বিভাগের 'বিবিধ' কার্যবিবরণে প্রসিডিঙস্ অফ দি অনারেবল দি লেফট্ন্যাণ্ট গভর্নর অফ বেঙ্গল ডিউরিঙ মার্চ ১৮৭৮, জেনারেল ডিপার্টমেন্ট বি প্রসিডিঙ্সের তালিকায় দুটি প্রাসঙ্গিক তথ্য আছে। তার অনুবাদ নিচে উল্লিখিত হল।

(ও-সি) ফাইল সঙখ্যা ৬৯, ক্রমিক সঙখ্যা ১-২ , আদেশের তারিখ ১৩.৩.১৮৭৮।

ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের জন্য পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বয়সের জন্য প্রমাণপত্র প্রার্থনা করায় তাঁর আবেদনপত্র কলকাতার পুলিশ কমিশনারের কাছে পাঠিয়ে তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছে, যে অনুসন্ধানের জন্য তিনি যেন অবিলম্বে পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে সাক্ষাত করেন।

(ও-সি) ফাইল সঙখ্যা ৬৯ : ক্রমিক সঙখ্যা ৩, ৬ : আদেশের তারিখ ২০.৩.১৮৭৮।

ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বয়সের প্রমাণপত্র দেওয়া হল।

প্রথমোক্ত ফাইল থেকে উপরে উদ্ধৃত দরখাস্ত পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় ফাইল পাওয়া যায়নি। ফলে তাঁর বয়সের প্রমাণপত্র সম্বন্ধে অন্য কোনো তথ্য মেলেনি।

য়ুনিভার্সিটিতে তাঁর পড়াশুনা সমাপ্ত হয়নি বলে রবীন্দ্রনাথ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারেননি। ফলে তাঁর ব্যারিস্টারি পড়া বা আই সি এস পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়া--কোনোটাই ঘটেনি। তবে তিনি যে মুখ্যত সিভিলিয়ান হবার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রথম বার বিলাতযাত্রা করেছিলেন, এই নতুন তথ্যটি আমাদের হাতে এসেছে।

১. দ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর--'আমেদাবাদ', 'বিলাত' অধ্যায়, জীবনস্মৃতি।
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর--'চতুর্দশ অধ্যায়', ছেলেবেলা।
৩. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়--রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক, প্রথম খন্ড, প. ৮০-৮১, ৮৭, ৯০, ৯৭। (চতুর্থ সঙস্করণ।)

• অমৃত, (বর্ষ ১৮ সঙখ্যা ৪১); ২৪। ১১।

উল্লেখ : প্রশান্তকুমার পাল- রবিজীবনী, প্রথম খন্ড, প. ৩৫৯।

রবীন্দ্রনাথ বন্দুকের লাইসেন্স নিয়েছিলেন!

নানা মামলা ও আপোস করে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পিতা দ্বারকানাথের সম্পত্তির ৫/৯ ভাগ পান। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা হাইকোর্টে সম্পত্তি-বিভাগেব জন্য একটি মামলা করে তিনি যে ডিক্রি পেয়েছিলেন, তা অনুসারে বিরাহিমপুর, কালীগ্রাম ও সাজাদপুরের জমিদারির অধিকার লাভ করেন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি শান্তিনিকেতনের জন্য বাত্সরিক ১৮০০ টাকা ব্যয়ের জন্য একটি সম্পত্তি চিহ্নিত করে একটি ট্রাস্ট-ডিড তৈরি করেছিলেন। ৮.৯.১৮৯৯ তারিখে তাঁর ছেলেদের ভরণপোষণ এবঙ অন্যান্য বিষয়ের জন্য দেবেন্দ্রনাথ একটি উইল সম্পাদন করেন। সেই ব্যবস্থায় দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ সমান অঙশে বিরাহিমপুর ও কালীগ্রাম তহশিলের জমিদারি লাভ করেন। অন্যান্যদের জন্য পান্ডুয়া তহশিল বা বৃত্তির ব্যবস্থা থাকে। ১৯০৪ সেপ্টেম্বরে দেবেন্দ্রনাথ অসুস্থ হন এবঙ কিছুদিন রোগভোগের পর ১৯.১.১৯০৫ তারিখে কলকাতায় মারা যান।

দেবেন্দ্রনাথের অসুস্থতার খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আসেন এবঙ তাঁর মৃত্যুর পরেও অনেকদিন সেখানে থাকেন। এই সময় থেকে উইল অনুসারে ভাইয়েরা পৃথক ভাবে বসবাস করেন। দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে বিরাহিমপুর ও কালীগ্রাম তহশিলের বাত্সরিক মোট আদায়ী খাজনা ছিল প্রায় এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকা।[১]

দ্বিজেন্দ্রনাথের ছেলে দ্বিপেন্দ্রনাথ এবঙ সত্যেন্দ্রনাথের ছেলে সুরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একত্রে জমিদারির কার্যনির্বাহক ছিলেন। মোটা তহবিলের নিরাপত্তার জন্য নিজেরা তিনজন এবঙ দশজন রক্ষকের জন্য ভারতীয় অস্ত্র আইন অনুসারে তাঁরা অস্ত্র রাখার জন্য ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের মাঝামাঝি সরকারি অনুমতি প্রার্থনা করে একত্রে দরখাস্ত করেন। সরকারি নীতি অনুসারে এই বিষয়টি বিবেচনার জন্য জমিদারির অবস্থান এবঙ আবেদনকারিদের বাসস্থান অনুসারে কলকাতার পুলিশ কমিশনার এবঙ রাজশাহি ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার, এই তিনজনের অভিমত চাওয়া হল ১৭.৫.১৯০৫ তারিখে। ২৩.৬.১৯০৫ তারিখে উত্তর পাঠাবার জন্য তাঁদের কাছে 'রিমাইন্ডার' গেল।[২]

কলকাতার ডেপুটি পুলিশ কমিশনার এফ সি হ্যালিডে ১৯.৬.১৯০৫ তারিখে জানান, যে আবেদনকারিরা অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক, এবঙ তাঁদের জমিদারির বাত্সরিক তহবিল দেড় লক্ষ টাকারও বেশি। অতএব, তাঁদের অস্ত্র রাখার অনুমতি দিতে আপত্তি থাকার কারণ নেই। ২৯.৬.১৯০৫ তারিখে প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার তাঁর উত্তরে উপরের মতে সায় দিলেন।

রাজশাহি বিভাগের কমিশনার নিজের মত জানাবার আগে ২.৬.১৯০৫ তারিখে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট গ্যারেটের কাছে মত জানতে চান। গ্যারেটের বদলে কর্তব্যরত ডেপুটি সেক্রেটারি হরচন্দ্র ঘোষ ৮.৭.১৯০৫ তারিখে জানান, যে মৃত জমিদার দেবেন্দ্রনাথ অস্ত্র আইনের যে সুবিধা ভোগ করতেন, কেবল সম্পত্তি রক্ষার জন্য তাঁর

উত্তরাধিকারীদের সেই সুবিধা পাবার অধিকার নেই, যদিও তাঁর অপরিচিত এই আবেদনকারিরা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাঁর মতে, কেবল বিশিষ্ট ভারতীয়দের বিশেষ মর্যাদার চিহ্ন হিসাবে অনুমতি দেওয়া চলে। কমিশনার এই চিঠির সঙ্গে ১৬.৭.১৯০৫ তারিখে নিজের স্বতন্ত্র চিঠিতে অনুরূপ বক্তব্য জানালেন। তিনি অবশ্য যোগ করলেন, যে এই আবেদনকারিরা সরকারের মতে যথেষ্ট সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন বলে বিবেচিত হলে, যদি যদি সরকার তাঁদের অনুমতি দেন, তবে তাঁর বা ম্যাজিস্ট্রেটের কোনো আপত্তি নেই।

এই উত্তরগুলি পাবার পর ২৪শে, ২৬শে, ২৭শে ও ৩০শে এপ্রিল সরকারের পক্ষে ফাইলে যেসব মন্তব্য করেন তার সঙক্ষিপ্ত বিবরণ এই : (১) সরকারি মতে আবেদনকারিদের যথেষ্ট সামাজিক সম্ভ্রম আছে, এবঙ অনুরূপ একটি ক্ষেত্রে সম্প্রতি প্রয়াত রমানাথ ঘোষের বিধবা এবঙ তাঁর ছজন রক্ষককে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। (২) আবেদনকারিরা কেবল দেবেন্দ্রনাথের উইলের কার্যনির্বাহক নন, তাঁদের একজন তাঁর ছেলে, এবঙ অন্য দুজন নাতি। অতএব অনুমতি দেওয়া সম্ভব। (৩) যদিও কেবল সম্পত্তিরক্ষার জন্য এই অনুমতি দেওয়া অনুচিত এবঙ সাধারণভাবে অনুমতি দেবার সর্তগুলি স্থির করা দরকার, তবু যেহেতু দেবেন্দ্রনাথ পূর্বে অনুমতি পেয়েছিলেন, সেহেতু তাঁর ছেলে বলে কেবল রবীন্দ্রনাথকে অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।[২]

তারপরে ৪ঠা ও ৫ই আগস্ট তিনজন আবেদনকারির মধ্যে কেবল রবীন্দ্রনাথকে অনুমতি দেওয়া স্থির হয়। অন্য দুজনকে অনুমতি না দেবার কারণ লেখা হয়নি।

এই মত স্থির করার পর ৭.৮.১৯০৫ তারিখে বাঙলা সরকারের তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি কার্নডাফ ১০জন রক্ষকসহ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র রবীন্দ্রনাথকে ভারতীয় অস্ত্র আইনের ব্যবস্থা অনুসারে কামান, বিশেষ দুটি ধরনের রাইফেল বা কোনো যুদ্ধাস্ত্র ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র রাখার অনুমতি একটি বিজ্ঞপ্তিতে প্রচার করেন।[৩]

এই বর্ণনা থেকে জানা যায়, যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অস্ত্র রাখার জন্য সরকারি অনুমতি পেয়েছিলেন। এবঙ অন্তত ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সরকারি মহলে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব প্রতিষ্ঠা দেবেন্দ্রনাথের পুত্র হিশাবে, তার বেশি নয়।

সরকারি মহলে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের প্রথম থেকে বঙ্গাভঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল। ১.৯.১৯০৫ তারিখে সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত এবঙ ১৬.১০.১৯০৫ তারিখে বঙ্গাভঙ্গ সম্পন্ন হল। অব্যবহিত পরে দেশব্যাপী যে রাজনৈতিক আন্দোলন ও পরে সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ বহুজ্ঞাত। বর্তমান তথ্য আপাতদৃষ্টিতে তার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।[৪]

---

১. দ. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়—ঠাকুরবাড়ীর কথা (১৯৬৬, ১ম সঙস্করণ), প. ৯৮, ১০১-৩, ১৮২, ১৮৬।

২. আবেদনপত্রসহ ফাইলটি অত্যন্ত জীর্ণ এবঙ ব্যবহারের অযোগ্য, অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারি লেখ্যাগারে সঙরক্ষিত আছে। তার বিবরণ : Judicial Department—Police Branch.

File No. P. $\frac{5A}{29}$, 1-2. Proceedings No. B.214-215 for May 1905.

৩. এই জীর্ণ ফাইলটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লেখ্যাগারে সঙরক্ষিত আছে। Judicial Department—Police Branch. File No. P. $\frac{5A}{29}$. 3-6. Proceedings No. B. 33-36 for August 1905.

৪. এই আন্দোলনের বিবরণের জন্য দ. Sumit Sarkar—*Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908.*

বাঙলাদেশ : (বর্ষ ১৫, সঙখ্যা ৪) ২৪. ৫. ১৯৮৫, প. ৪, স্তম্ভ ১-৩।

সঙ্‌যোজন :

রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য দু জনের আবেদন বিবেচনার জন্য কলকাতার পুলিশ কমিশনার এবঙ রাজশাহি ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনারদের মত জানতে চাওয়া হয়। তাঁর কাছে জানতে চাইলে, মধ্যপথে রাজশাহির ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে ডেপুটি সেক্রেটারি হরচন্দ্র ঘোষ ৮.৭.১৯০৫ তারিখে পদ্ধতিগত আপত্তি তুলেছিলেন। তাঁর কথা গুরুত্ব পায়নি, কারণ আবেদনকারিদের জোর ছিল বেশি। কমিশনারেরা আপত্তি করেননি। তাঁদের প্রত্যেকে লেখেন, যে আবেদনকারিরা সম্ভ্রান্ত বঙশের, তাঁরা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলে ও নাতি, এবঙ তাঁদের জমিদারির বাত্‌সরিক আয় দেড় লক্ষ টাকার বেশি। অতএব, ব্যক্তিগত সম্পত্তিরক্ষার জন্য হলেও অনুমতি দেওয়া চলে। তবে দেবেন্দ্রনাথের ছেলে হিশাবে কেবল রবীন্দ্রনাথকে অনুমতি দেবার কথা ফাইলে ২০.৭.১৯০৫ তারিখের মন্তব্যে একজন এভাবে লিখেছেন—"..of the late Maharshi Devendra Nath Tagore, who himself enjoyed the exemption, it should now be granted to his son Babu Rabindra Nath Tagore alone." পরে যে সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়, নিচে তা সঙ্কলিত হল।

Notification No. 3670 J.–D.

The 7th August 1905.—Under paragraph 1, clause 9(f) of the Notification No. 518, issued by His Excellency the Governor-General in Council, on the 6th March 1879, under the Indian Arms Act, XI of 1878, the Lieutenant-Governor directs that Babu Rabindra Nath Tagore, son of the late Babu Debendra Nath Tagore of Calcutta, and ten of his retainers, be exempted from the operation of all prohibitions and directions contained in sections 13, 14, 15, and 16 of Indian Arms Act, 1878, other than those referring to cannon, articles designed for torpedo service, war-rockets..

H.W.C. Carnduff,
Offg. Secretary to the Government of Bengal.

প্রেসিডেন্সি বিভাগ, রাজশাহি বিভাগ ও কলকাতায় কমিশনারের অবগতির জন্য এই

বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়।

বিদেশি শাসকেরা শাসনের সুবিধার জন্য উপনিবেশের জমির বড় মালিকদের সঙ্গে আঁতাত গড়ে তোলেন। তাতে এই দু শ্রেণীর লোকের স্বার্থরক্ষা হয়। এই কারণে আমাদের দেশে উনিশ শতকে বড় জমিদারদের সঙ্গে ইঙরাজ শাসকদের ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। অন্যদিকে, আপাতদৃষ্টিতে খ্রিস্টানি প্রচার ঠেকাতে, প্রকৃতপক্ষে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একদল দেশি জমিদার ও সরকারি আমলার পৃষ্ঠপোষকতায় খ্রিস্টানি হিন্দুধর্মের পত্তন হয়। খ্রিস্টানি হিন্দুধর্মের বাজারি নাম ব্রাহ্মধর্ম। রবীন্দ্রনাথ ইঙরাজি-জানা, ধনী, ব্রাহ্ম, জমিদার। শাসক ইঙরাজের সঙ্গে তাঁর ভালো সম্পর্কের জন্য তিনি তাঁদের স্বার্থে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিপক্ষতা করবেন। তা স্বাভাবিক। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। 'সবুজপত্র' কাগজে ১৩২২ শনে ধারাবাহিক ছাপা হয়ে, পরের বছর—১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বইটি প্রকাশিত হয়। বই প্রকাশ এই আন্দোলনের পরে, এবঙ উপরের অস্ত্রকামনা তার কিছু আগে। তাদের যোগাযোগ পাঠকদের অনুমেয়।

প্রসঙ্গত মনে রাখা ভালো, যে উনিশ শতকে পাবনায় প্রজাদের গোলমালের ঠিক আগে রবীন্দ্রনাথের উদাসী, দার্শনিক (!) দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তেমনি সাবধানী হয়ে ইঙরাজ সরকারকে চিঠি লিখেছিলেন। (দ. K. K. Sengupta.—*Pubna Disturbances and the Politics of Rent* : 1873-1885.)

অভিজ্ঞতা বলে, যে সাধারণত সাহিত্যিকদের খ্যাতির নগদ পাওনা তাঁর ভবিষ্যত্ খ্যাতির তহবিল নিঃশেষ করে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সাতাশ বছর পরেও তাঁর রচনার সাহিত্যমূল্য সম্বন্ধে এই অভিজ্ঞতাকে যাচাই করে দেখা হয়নি। তাঁর লেখার প্রকৃত মূল্যায়নের প্রয়াস আজ পর্যন্ত বেশি হয়নি, এবঙ সামান্য যেটুকু হয়েছে, তা প্রায়ই নিন্দিত বা অবহেলিত হয়েছে।

বর্তমান প্রবন্ধে নতুন মূল্যায়নের প্রয়াস নেই, তবে তাকে সাহায্য করার জন্য কয়েকটি তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। ইঙরাজি সাহিত্য থেকে রবীন্দ্রনাথের ঋণের যে তালিকা এখানে আছে, আমার ধারণা, অনুসন্ধিত্সু গবেষকের চেষ্টায় তা অনেক বেড়ে যাবে। রবীন্দ্রনাথের পুনর্বিচারে এই তথ্যগুলির স্থান ভবিষ্যতের যুক্তিপ্রবণ সমালোচকদের লেখায় দেখা যাবে, এই আশায় বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রথমে দুটি বহুপরিচিত কথা স্মরণীয়।

১। কোনো বিষয়ে ধারণা করার জন্য দরকার প্রথমত তথ্য, দ্বিতীয়ত বৈজ্ঞানিক যুক্তিপদ্ধতি। তথ্যের অভাবে কোনো ধারণা গ্রহণযোগ্য হয় না, এবঙ যুক্তিসহ বিশ্লেষণ ছাড়া শুধু তথ্য কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত করে না। পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ রবীন্দ্রসাহিত্যের বিচারে মূল্যবান তথ্য। আলোচনার সময় যুক্তির বদলে 'মহামানবে'র প্রতি ভক্তিমদিরতা যেমন চ্যুতি,—উপস্থাপিত তথ্যগুলির ফল সম্বন্ধে ঔদাসীন্য তা থেকে কম নয়।

২। পরিমাণগত পরিবর্তন গুণগত পরিবর্তন ঘটায় ; বহুপূর্বে রবীন্দ্রনাথের লেখায় বিদেশি সাহিত্য থেকে অনুকরণের পরিমাণ সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য অজ্ঞাত ছিল। এখন তা ক্রমশ জমে উঠছে।

ইঙরাজি ও অন্যান্য পাশ্চাত্য সাহিত্যের কাছে রবীন্দ্রনাথের ঋণ কতখানি, সে বিষয়ে এখনো যথেষ্ট তথ্যমূলক আলোচনা হয়নি। যেটুকু হয়েছে সেখানে প্রায়ই তথ্যগুলির ফল উপেক্ষিত হয়েছে। ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য স্বীকার করতে পারেননি[১], যে রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষে'র উত্স Shelley-র Ode to the West Wind; কারণ দুটি কবিতা এক নয়। যেন অনুকরণমূলক রচনা মূল রচনার প্রতিলিপি হবে! অধ্যাপক তারকনাথ সেন তো পণ্ডিতি মন্তব্য করেছেন[২]—'The magnificence of Tagore's style in verse or prose owes nothing to western languages or literature', অথবা 'It is difficult to recall any great piece of his poetry that would have been impossible without western influence.' ড. শীতাঙশু মৈত্র এসব মন্তব্যের বিরোধিতা করেও লিখলেন[৩]—'এই জাতীয় প্রভাব-অন্বেষণকারীদের নেতৃত্ব করেন Edward Thompson সাহেব। তারক সেন মশায় এই লঘুচিত্ত গোয়েন্দাগিরির সমুচিত জবাব দিয়েছেন সন্দেহ নেই।' মোহিতলাল মজুমদার Swinburne-এর Atalanta in Calydon-এর Chorus-এর

সঙ্গে 'উর্ব্বশী'র যে মিল দেখিয়েছেন[৪] তা অস্বীকার করা কঠিন, কিন্তু সঙস্কার কঠিনতর। তাই ড. মৈত্রের মন্তব্য—'সেগুলি আপতিক হতে পারে।'—অধ্যাপনা পুনরাবৃত্তি করে—চিন্তা জাগায় না।

কয়েকজন গবেষক রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি রচনায় ইঙরাজি সাহিত্যের প্রতিধ্বনি শুনেছিলেন। *Rabindranath Tagore : poet and dramatist*-এ Edward Thompson, 'রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝরে' প্রমথনাথ বিশী, 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস', তৃতীয় খন্ডে ড. সুকুমার সেন এবঙ 'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্যে' মোহিতলাল মজুমদার তার আলোচনা করেছেন। এসব আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের যে যে রচনায় ইঙরাজি সাহিত্যের অনুকরণ লক্ষিত হয়েছে তাদের একটি তালিকা এখানে সঙ্কলিত হল :

১। Ode to the West Wind.—Shelley. ... বর্ষশেষ (কল্পনা)
২। Alastor.—Shelley. ... কবি-কাহিনী
৩। Hound of Heaven.—F. Thompson. ... রাহুর প্রেম (ছবি ও গান)
৪। Oenone.—Tennyson. ... চরণ (কড়ি ও কোমল)
৫। Reverie of Poor Susan.—Wordsworth. ... বধূ (মানসী)
৬। Lotos Eaters : Choric song.—Tennyson. ... ভৈরবী গান (মানসী)
৭। The Day Dream.—Tennyson. ... নিদ্রিতা ; সুপ্তোত্থিতা (সোনার তরী)
৮। Palace of Art.—Tennyson. ... দেউল (সোনার তরী)
৯। Hymn to Intellectual Beauty.—Shelley.
১০। Epipsychidion.—Shelley. } ... মানসসুন্দরী (সোনার তরী)
১১। Imaginary Conversation.—W.C. Landor.
১২। Love and Duty.—Tennyson. } ... বিদায়-অভিশাপ
১৩। Poet's Epitaph.—Wordsworth. ... মৃত্যুর পরে (চিত্রা)
১৪। Atalanta in Calydon : Chorus. —Swinburne. ... উর্বশী (চিত্রা)
১৫। Prince Otto.—R.L. Stevenson. ... ঘরে-বাইরে
১৬। Duplicity of Hargraves.—O' Henry. ... ঠাকুর্দা (গল্পগুচ্ছ)
১৭। Whistling Dick's Christmas Stocking.—O'Henry. ... অতিথি (গল্পগুচ্ছ)
১৮। M'iss.—Bret Hart. ... সমাপ্তি (গল্পগুচ্ছ)

এই বিষয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠি থেকে এ বিষয়ে আলোচনা করা সম্ভব।

১। হেমন্তবালা দেবীকে ২৪.৯.১৯৩১ তারিখে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন[৫] —'বিদেশের উপাদান নিয়ে আমি কখনো কিছু লিখিনি। বাইরে থেকে মালমশলা ধার

নিয়ে লেখা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।'—বর্তমান প্রবন্ধের দুটি তালিকা এই বক্তব্যের বিরুদ্ধতা করে, এবঙ তা খাঁটি হলে উদ্ধৃত উক্তি সত্যভাষণ নয়। তা হলে এই বিষয়ে অন্য কোনো অনুরূপ বক্তব্যও নিজগুণে সত্য বলে গৃহীত হবার দাবি রাখে না।

২। আলমোড়া থেকে ৩০.৫.১৯৩৭ তারিখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাইঝি ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন[৬]—'বিদেশী গল্পের ভূমিকায় গীতিনাট্য লিখব সেরকম তাগিদ নেই মনের মধ্যে। লেখবার ফরমাস অনেকগুলো আছে। সবগুলিই রয়েছে শিকেয় তোলা।'—এই চিঠির ভাব পূর্বোদ্ধৃত পত্রাঙশ থেকে ভিন্ন, কারণ এরূপ রচনা তাঁর পক্ষে অসম্ভব বলা হয়নি। তার কারণ কি এই, যে ইন্দিরা দেবীর কাছে ঋণ ধরা পড়ার সম্ভাবনা হেমন্তবালা দেবীর থেকে বেশি ছিল? তাহলে সত্যভাষণ নয়, শ্রোতার পাশ্চাত্যবিদ্যানৈপুণ্য অনুসারে বক্তব্য সাজিয়ে ঋণ গোপন করার প্রয়াস কি এ থেকে স্পষ্ট হয় না?

প্রমথ চৌধুরীর ব্যক্তিগত সঙগ্রহে বিশ শতকের ইঙরাজি সাহিত্যগ্রন্থ অনেক ছিল। তিনি সেই গ্রন্থসঙগ্রহ বিশ্বভারতীকে দান করলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ৫ই শ্রাবণ ১৩৪০ তারিখে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন[৭]—'তোমার বইগুলো আমার বিশেষ কাজে লাগবে। অনেকদিন থেকে বিলিতি আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে সঙশ্রব নেই। অথচ এখন বাঙলা সাহিত্যে সকলেই সেই পাড়ায় গুরুকরণ করে বসেচে।.. আমরা আছি মিড্‌ভিক্টোরীয় যুগের মাঝদরিয়ার বালুচরে—খেয়ার সুবিধে পেলে পার হয়ে আসি এপারে।' কয়েকদিন পরে—১লা ভাদ্র ১৩৪০ তারিখে তিনি প্রমথ চৌধুরীকে আবার লিখছেন[৮]—'প্রমথ, তোমার বইগুলি নাড়াচাড়া করতে করতে মন চঞ্চল হয়ে উঠল। অনেকদিন ছিলুম নানা কাজে নানা অকাজে আপাদমস্তক জড়িয়ে, আধুনিক কালের বাণীলোকে প্রবেশের ছুটি পাইনি। লোভ হল অত্যন্ত।..এইজন্যে বইগুলি আমার ঘরেই রাখলুম।' এ থেকে অনুমান করা সম্ভব, যে ১৯৩৩ শালের আগে রবীন্দ্রনাথের রচনায় বিশ শতকের ইঙরাজি সাহিত্যের ছাপ নেই, তবে উনিশ শতকের ইঙরাজি কাব্যের ছাপ থাকা সম্ভব।[৯] এর প্রায় দু বছর আগে হেমন্তবালা দেবীকে তিনি ১৫.৩.১৯৩১ তারিখে লিখেছিলেন[১০]—আমাদের দেশের প্রচলিত সাহিত্যের সীমানার মধ্যে আমার চিত্ত পদে পদে বাধা পায়।..আমার দেশে আমি বেগানা।..য়ুরোপীয় সাহিত্যের মধ্যে বিশ্বসাহিত্যের যে প্রকাশ আছে ঘটনাক্রমে তার পরিচয় তোমার কাছে নেই। অথচ আধুনিক বাঙলা সাহিত্য যে ভিতের উপর তার বাসা ফাঁদছে সে ভিতটা য়ুরোপীয়।' বক্তব্যটি পূর্বের ধারণার সমর্থক।

নিজের আঁকা ছবি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন, যে এগুলির মধ্যে তাঁর য়ুরোপীয় মনের প্রতিফলন ঘটেছে। য়ুরোপীয় ও ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন হলে একই ব্যক্তির মন সৃষ্টির ক্ষেত্রে একবার য়ুরোপীয় ও অন্যবার ভারতীয় হতে পারে না, কারণ তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির চরিত্র একরূপ হবে। অতএব, ছবি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা সত্য হলে (অন্তত রবীন্দ্রনাথের ধারণায় তা সত্য ছিল), তাঁর কবিতায় য়ুরোপীয় মনোভাবের প্রতিচ্ছবি আছে। এই সত্যটির পক্ষে একটি তথ্যের উল্লেখ করা যায়। ভারতীয় দৃষ্টিতে

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতি, কবিকল্পনা, দেবী প্রভৃতির সম্বন্ধ মা ও ছেলের মত : রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রায়ই তা হয়েছে প্রেমিক ও প্রিয়ার সম্বন্ধের অনুরূপ।[১১] নিশ্চয় বলা যেতে পারে, যে এই পার্থক্যের কারণ য়ুরোপীয় মনোভাবের প্রতিফলন।

বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে লেখাগুলি ইঙরাজি থেকে গৃহীত বলে অনুমিত ও আলোচিত হয়েছে, তাদের একটি তালিকা এখানে দেওয়া হল :

১। Mont Blanc.—Shelley. ২। To the People of England.—Shelley.	... কবি-কাহিনী, চতুর্থ সর্গ
৩। Invocation to Misery.—Shelley.	... দুঃখ-আবাহন (সন্ধ্যাসঙগীত)
৪। Autumn : a dirge.—Shelley.	... দুই দিন (সন্ধ্যাসঙ্গীত)
৫। On a Faded Violet.—Shelley.	... বাকি (কড়ি ও কোমল)
৬। An Exhortation.—Shelley.	... কবির প্রতি নিবেদন (মানসী)
৭। Love's Philosophy.—Shelley.	... প্রকাশ (কল্পনা)
৮। To Night.—Shelley. ৯। Hymn to Night.—Longfellow.	... রাত্রি (কল্পনা)
১০। Ode to the Nightingale.—Keats.	... কুহুধ্বনি (মানসী)
১১। Eleanore.—Tennyson.	... বিজয়িনী (চিত্রা)
১২। Ode to Memory.—Tennyson.	... কথা কও কথা কও (কথা)
১৩। A Child Asleep.—E.B. Browning.	... শান্তি (কড়ি ও কোমল)
১৪। Castle of Indolence.—J. Thomson.	... অচলায়তন

প্রভাবিত রচনায় লেখকের ব্যক্তিত্ব-প্রতিষ্ঠা হয়, কারণ লেখক অন্যের ভাবধারা গ্রহণ করে তাকে নিজস্ব দৃষ্টি থেকে পরিবর্তিত করেন। যিনি অন্য কোনো লেখকের রচনার ভাব, বিষয় বা গঠনভঙ্গিকে হুবহু অনুকরণ করেন অথবা তার অনুসরণে আপাতদৃষ্টিতে নতুন রচনা করেন তিনি ব্যাপক অর্থে প্রভাবিত, কারণ অন্য লেখক তার উপরে প্রতিফলিত হয়েছেন : তবে অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ অর্থে তিনি প্রভাবিত নন—অনুকারক। অনুকারককে, প্রভাবিত ব্যক্তি থেকে পৃথক করার কারণ এই, যে অনুকারকের আপাতদৃষ্টিতে মৌলিক রচনায় অন্য লেখকের পুরানো রচনাকে নতুন বেশ দেওয়া ছাড়া অন্য কোন কৃতিত্ব নেই ; কিন্তু প্রভাবিত রচনা লেখকের গুণে মূল রচনা থেকে ভিন্ন এবঙ লেখকের স্বকীয় হয়ে ওঠে। অধিকাঙশ কৃতী লেখক কখনো না কখনো অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হন, কিন্তু অনুকারক কখনো বিশিষ্ট সাহিত্যিক হয়ে ওঠেন না—অন্তত অনুকৃত রচনার গুণে। রবীন্দ্রনাথের আলোচ্য রচনাগুলি (এবঙ তাদের অনুরূপ অন্যান্য রচনা) অনুকরণজাত অথবা প্রভাবিত তা নির্ণয় করা প্রয়োজন। রচনাগুলির কেবল বৈশিষ্ট্য নয়, রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনার সাহিত্যমূল্যে এদের ফল নির্দেশ করাও দরকার।

Shelley-র Mont Blanc কবিতার সঙ্গে 'কবি-কাহিনী'র চতুর্থ সর্গে হিমালয় বর্ণনার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।[১২] পর্বতের দৃশ্য বর্ণনার সঙ্গে তার গাম্ভীর্য জড়িত হয়েছে

এবঙ Shelley তার সঙ্গে দার্শনিক চিন্তাধারাকে যুক্ত করেছেন। কবি-কাহিনীতে হিমালয় বর্ণনার প্রকৃতি এর অনুরূপ। উভয়ত্র বর্ণনা সঙক্ষিপ্ত, গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা প্রবল এবঙ পরিশেষে পর্বত মনুষ্যসমাজ সম্বন্ধে কবির দৃষ্টিভঙ্গীর বাহন। কয়েকটি বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে মিলগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করা হল।

(ক) Far, far above,—still piercing the infinite sky,
Mont Blanc appears,—still, snowy, and serene–

সুনীল গগন
ভেদিয়া তুষারশুভ্র মস্তক তোমার!

(খ) And wind among the accumulated steeps;
A desert peopled by the stroms alone,

সে ঘোর অরণ্য
ঘেরিয়া হুহুহু করি তীব্র শীতবায়ু
দিবানিশি ফেলিতেছে বিষণ্ণ নিশ্বাস!

(গ) Thou hast a voice, great Mountain, to repeal
Large codes of fraud and woe; not understood

ওগো হিমালয়
নীরব ভাষায় তুমি কি যেন একটি
গম্ভীর আদেশ ধীরে করিছ প্রচার!

(ঘ) The glaciers creep
Like snakes that watch their prey,
From their fountains, slow rolling on;

সিন্ধুর বেলার বক্ষে গড়ায় যেমন
অযুত তরঙ্গ কিছু লক্ষ্য না করিয়া

ইঙরাজি কবিতাটির ১০০-১২০ চরণের মূল ভাবটি বাঙলা কবিতার ১৯৫-২০৯ চরণগুলিতে ভাষান্তরিত হয়েছে।

আলোচ্য কবিতাটি Shelley-র প্রতি রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত অনুরাগের পরিচয় বহন করে : Alastor অবলম্বনে কবি-কাহিনীর গঠন, Mont Blanc অনুসারে হিমালয় বর্ণনা এবঙ To the People of England-এর ভাব দিয়ে তার সমাপ্তি। এই ছোট্ট কবিতাটির ব্যাখ্যা না করে এখানেও দুটি উদ্ধৃতি দিয়ে ভাবসাদৃশ্য লক্ষ্য করা সম্ভব।

People of England, ye who toil and groan,
Who reap the harvests which are not your own,
Who weave the clothes which your oppressors wear,
And for your own take the inclement air;

স্বাধীন, সে অধীনেরে দলিবার তরে—
অধীন সে স্বাধীনেরে পুজিবারে শুধু!

সবল সে দুর্বলেরে পীড়িতে কেবল--
দুর্বল, বলের পদে আত্মবিসর্জিতে!

'দুঃখ-আবাহন' কবিতাটি Shelley-র Invocation to Misery অবলম্বনে লেখা। নামে যেমন বিষয়বস্তুতেও তেমনি এদের আশ্চর্য মিল। দুটি কবিতাতে দুঃখ মানুষ হিসাবে কল্পিত এবঙ তাকে একান্ত করে পাবার কামনা প্রকাশিত। আহ্বানের ভাষা পর্যন্ত এক--

Come, be happy!--sit near me, আয় দুঃখ, আয় তুই,
Shadow-vested Misery : তোর তরে পেতেছি আসন,

এবঙ ঘুমের বর্ণনা

There our tent shall be the willow,
And mine arm shall be thy pillow;
Sounds and odours, sorrowfull
Because they were once sweet, and lull
Us to slumber, deep and dull.
জননীর স্নেহে তোরে করিব বহন
দুর্বল বুকের 'পরে করিব ধারণ,
একেলা বসিয়া ঘরে অবিরল একস্বরে
গাব তোর কানে কানে ঘুম পাড়াবার গান
মুদিয়া আসিবে তোর শ্রান্ত দু-নয়ান।

এখানে শব্দগত মিল না থাকলেও ভাবগত সাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট।

বাঙলা কবিতাটি ইঙরাজির অনুবাদ নয়--অনুকরণমূলক রচনা। দুটি কবিতার মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা সচেষ্ট, কিন্তু খুঁটিনাটি বিষয়ে সজাগ দৃষ্টির অভাবে অনুকরণে সামঞ্জস্যের অভাব থেকে গেছে। ইঙরাজিতে উভয়ের সম্বন্ধ প্রেমজ, তাই

Kiss me;--oh! thy lips are cold :
Round my neck thine arms enfold--

এই পরিচয় দীর্ঘদিনের--

Misery! we have known each other,
Like a sister and a brother.

বাঙলা কবিতায় আছে--

জননীর স্নেহে তোরে করিব বহন
দুর্বল বুকের 'পরে করিব ধারণ।

এবঙ-- হৃদয়ে আয়রে তুই হৃদয়ের ধন।

ফলে, কবিতার শেষে--

কাছে আয় একবার, তুলে ধর মুখ তার,
মুখে তার আঁখি দুটি রাখ,

একদৃষ্টে শুধু চেয়ে থাক।
আর কিছু নয়,
নিরালায় এ হৃদয়
শুধু এক সহচর চায়।

পঙক্তিগুলি পূর্বের সঙ্গে সমঞ্জস হয়নি, কারণ পূর্বে সম্বন্ধ মায়ের মত, এবঙ এইখানে তা প্রিয়ার মত। শুধু বাঙলা কবিতাটি থেকে এই অসামঞ্জস্যের কারণ পাওয়া যায় না। ইঙরাজি কবিতার অনুসরণ করেও তা গোপন করার বাসনা থেকে সম্বন্ধকে মায়ের মত করতে হয়েছে, অথচ মূলের অনুসরণ এত বেশি ছিল, যে রবীন্দ্রনাথ গোপনতা সম্বন্ধে শেষ অবধি সমান সতর্ক থাকতে পারেননি। এই অনুমান সম্বন্ধ-পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করে।

কাব্যমূল্যে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ—প্রথম জীবনে রচিত—একটি কবিতার জন্য আলোচনার উদ্দেশ্য এই তথ্যকে তুলে ধরা, যে রবীন্দ্রনাথ চেতনভাবে ইঙরাজি কবিতার অনুসরণে কবিতা লিখেছেন, এবঙ তা গোপন করতে প্রয়াসী ছিলেন।

Autumn : a dirge কবিতার অনুকরণে লেখা 'দুই দিন'-এর মধ্যে অনুকরণ ও ঋণ-গোপন-প্রয়াস স্পষ্টতর। দুই দিন-এর প্রথমে শীতের বর্ণনা আছে, শেষে অন্য ঋতুর। প্রথম বর্ণনাটি Shelley-র হুবহু প্রতিধ্বনি।

The warm sun is failing, the bleak wind is wailling,
The bare boughs are sighing, the pale flowers are dying
And the year
On the earth her death-bed, in a sthroud of leaves dead
Is lying.

The chill rain is falling, the nipped wind is crawling,
The rivers are swelling, the thunder is knelling
For the year;
The blithe swallows are flown, and the lizards each gone
To his dwelling.

আরম্ভিছে শীতকাল, পড়িছে নীহারজাল,
শীর্ণ বৃক্ষশাখা যত ফুলপত্রহীন ;
মৃতপ্রায় পৃথিবীর বুকের উপরে
বিষাদে প্রকৃতিমাতা শুভ্র বাষ্পজালে-গাথা
কুজ্ঝটি বসনখানি দেছেন টানিয়া।
এখনো রয়েছে শীত, বিহঙ্গ গাহে না গীত,
এখনো ঝরিছে পাতা, পড়িছে তুহিন।
বসন্তের প্রাণভরা চুম্বন-পরশে
সব অঙ্গ শিহরিয়া পুলকে আকুল হিয়া
মৃত্যুশয্যা হতে ধরা জাগেনি হরষে।

বাঙলা কবিতাটি প্রায় অনুবাদের কাছাকাছি ; উদ্ধৃত স্তবকগুলির মধ্যে মিল তুলে ধরা নিষ্প্রয়োজন। সেজন্য ভিন্ন ঋতুর বর্ণনা করে কবিতাটির সমাপ্তি হয়েছে, কারণ তা না হলে রচনাটির মৌলিক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা কমে যায়। অথচ শেষ স্তবকের প্রথমে আছে--

শরতে যে শাখা হয়েছিল পত্রহীন
এ দু'দিনে সে শাখা ওঠেনি মুকুলিয়া।

প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবকে যা 'শীত', পঞ্চম স্তবকে তা 'শরত' হল কিভাবে? ইঙরাজি autumn বাঙলায় শরত, অথচ 'শরত' লিখলে ঋণ ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেশি বলে মনে হয়েছে। ঋণ গোপন করার জন্য তাই 'শীত' লিখতে হল। তারপর দুটি স্তবকে মৌলিক রচনা চলেছে ; কবির মনে ঋণ ধরা পড়ার সম্ভাবনা আর জাগেনি। সেই অসাবধানতায় পঞ্চম স্তবকে autumn শরত হয়ে গেছে। এই তথ্য নির্দেশ করে, যে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টত ইঙরাজি কবিতাটি ধরে লিখেছেন--ভাবানুসরণ করেননি বা প্রভাবিত হননি, এবঙ চেতনভাবে তা গোপন করার চেষ্টা করেছেন।

'অনুবাদের কাছাকাছি' বলার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের একটি অনুবাদে। Shelley-র Stanzas written in dejection near Naples-এর অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের প্রথম সঙস্করণে মুদ্রিত করেছিলেন ; ইঙরাজির পঞ্চম স্তবক অনূদিত হয়নি। তাদের অঙশবিশেষ এরূপ :

(ক) Like many a voice of one delight,
The winds, the birds, the ocean floods,
The City's voice itself, is soft like Solitude's.

একই আনন্দে যেন গায় শত প্রাণ—
বাতাসের গান আর পাখীদের গান।
সাগরের জলরব
পাখীদের কলরব
এসেছে কোমল হয়ে স্তব্ধতার সঙ্গীত-সমান।

(খ) I sit upon the sands alone,–
The lightning of the noontide ocean
Is flashing round me, and a tone
Arises from its measured motion,
How sweet! did any heart now share in my emotion.

বিরল বালুকাতীরে
একা বসে রয়েছি রে,
চারিদিকে চমকিছে জলের বিজুলী
তালে তালে ঢেউগুলি করিছে উত্থান—
তাই হতে উঠিতেছে কী একটি তান।

মধুর ভাবের ভরে
হৃদয় কেমন করে,
আমার সে ভাব আজি বুঝিবে কি আর কোন প্রাণ।

নিম্নরেখ রচনাঙশে মূল ও অনুবাদের পার্থক্য রয়ে গেছে।

Autumn ও 'দুই দিন'-এর পার্থক্য এবঙ উদ্ধৃত অনুবাদের সঙ্গে মূলের পার্থক্য কি ভিন্ন ধরনের? পার্থক্যের পরিমাণ কি অনেক? যদি না হয় তবে 'দুই দিন'-এর রচনারীতি সম্বন্ধে পূর্বের মন্তব্য সমর্থনযোগ্য।

Shelley অনেক ছোট ছোট কবিতা লিখেছেন। সম্ভবত সেগুলি পড়ে রবীন্দ্রনাথেরও ছোট কবিতা লেখায় উত্সাহ হয়েছিল। তার ফল Shelley-কে আদর্শ হিশাবে রেখে কবিতা রচনা করা। Shelley-র On a Faded Violet ও রবীন্দ্রনাথের 'বাকি' কবিতা দুটিকে উদাহরণ হিশাবে তুলে ধরা হল।

The odour from the flower is gone
Which like thy kisses breathed on me;
The colour from the flower is flown
Which glossed on thee and only thee.
* *
I weep,—my tears revive it not!
I sigh,—it breathes no more on me;
Its mute and uncomplaining lot
Is such as mine should be.

কুসুমের গিয়েছে সৌরভ,
জীবনের গিয়েছে গৌরব।
এখন যা-কিছু সব ফাঁকি
ঝরিতে মরিতে শুধু বাকি।

মনে হয়, Shelley-র ছোট ছোট যেসব কবিতায় দুঃখের সুর আছে 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' রবীন্দ্রনাথের উপর তা গভীর প্রভাব ফেলেছিল এবঙ তিনি বহু কবিতায় Shelley-র অনুকরণ করেছেন। মোহিতলাল মজুমদার এযুগের একাধিক কবিতায় Shelley-র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রকরণগত মিল লক্ষ্য করেছেন। Edward Thompson লিখেছিলেন,[১৩] 'at first it was the poorer Shelley that ruled him.' Ruled শব্দটি শ্রুতিপ্রিয় না হতে পারে। তবে সত্য। উল্লিখিত মিলগুলি তার প্রমাণ।

এই প্রসঙ্গে আর একটি সাদৃশ্য লক্ষ্য করা অবান্তর নয়। রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুচ্ছে নারীসৌন্দর্য ও প্রেম বর্ণনা প্রধান। Rossetti-র *House of Life*-এর সনেটগুলি—অন্তত প্রথমদিকের সনেটগুলির বর্ণনা ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কড়ি ও কোমলের সনেটগুচ্ছের মিল আশ্চর্য। দেহগত সৌন্দর্য, ভোগবাসনাজাত প্রেম ও চিত্রধর্মী রচনা উভয়ত্র লক্ষণীয়। এমনকি দেহগত প্রেম থেকে দেহমুক্ত কল্পলোকের

প্রেম সম্বন্ধে ধারনার পরিবর্তন দুজন কবির রচনার বৈশিষ্ট্য। *House of Life*-এর বিশেষ কোনো কবিতা কড়ি ও কোমলের কোনো সনেটের আদর্শ হয়ে না থাকলেও অনুমান করা সম্ভব, যে এই সাদৃশ্য প্রভাবজাত। এই যুগের ও ধরনের সাহিত্য রবীন্দ্রনাথ প্রিয় ছিল। ফরাশি সাহিত্যের parnasse গোষ্ঠির কয়েকজন ও তাঁদের সমকালীন কয়েকজন সাহিত্যিক--Gautier, Coppée, Merimée, Daudet প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের প্রিয়, এমন কি তাঁর একাধিক রচনার আদর্শ ছিলেন।

An Exhortation কবিতায় Shelley প্রকৃত কবির স্বরূপ-বর্ণনা করেছেন এবঙ তার কবিধর্ম বজায় রাখার জন্য পার্থিব মোহকে অস্বীকার করার আহ্বান জানিয়েছেন। 'কবির প্রতি নিবেদন'-এ রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য এই। কেবলমাত্র তিক্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা এবঙ মাত্রাবোধের অভাবজনিত দৈর্ঘ্য বাঙলা কবিতাটিকে কিছুটা স্বতন্ত্র করে ফেলেছে। Shelley-র কবিতায় আছে—

Chameleons feed on light and air :
Poet's food is love and fame :

এবঙ
Where light is, chameleons change :
Where love is not, poets do :
Fame is love disguised :

সেজন্য Shelley-র বক্তব্য—

Yet dare not stain with wealth or power
A poet's free and heavenly mind :
If bright chameleons should devour
Any food but beams and wind,
They would grow as earthly soon
As their brother lizards are.
Chidren of a sunnier star,
Spirits from beyond the moon,
Oh, refuse the boon!

বাঙলা কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে আছে—

কোথা তব বিজন ভুবন,
কোথা তব মানসভুবন
তোমারে ঘেরিয়া ফেলি কোথা সেই করে কেলি
কল্পনা, মুক্ত পবন?

তার সঙ্গে Shelley-র বর্ণনা এক। এমনকি চতুর্থ স্তবকের

আকাশের পাখি তুমি ছিলে,
ধরণীতে কেন ধরা দিলে?

কি Shelley-র উদ্ধৃত তৃতীয় স্তবককে মনে আনে না? Shelley যে কল্পনালোক ও

প্রেমের কথা লিখেছেন তার প্রতিধ্বনি শোনা যায় এই কয়েকটি পঙক্তিতে--

হোথা ওঠে নবীন তপন,
হোথা হতে বহিছে পবন।
হোথা চির ভালোবাসা-- নব গান, নব আশা--
অসীম বিরামনিকেতন।

Shelley স্পষ্টত 'refuse the boon' বলেছেন ; রবীন্দ্রনাথ প্রশ্নের আকারে এক বক্তব্য অন্যভাবে প্রকাশ করেছেন :

হেথা, কবি, তোমারে কি সাজে
ধূলি আর কলরোল-মাঝে?

আরো বেশি বয়সে ক্রমাগত চর্চার ফলে ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির উপর রবীন্দ্রনাথের আরো দক্ষতা জন্মেছিল, এবঙ দীর্ঘকালের কাব্যচর্চা তাঁকে গৃহীত কবিতার বাহ্যিক রূপ পরিবর্তনের ক্ষমতা দিয়েছিল। তার চমত্কার উদাহরণ 'কল্পনা' কাব্যের 'প্রকাশ' কবিতাটি। এর ভাববস্তু আদৌ মৌলিক নয়--Shelley-র Love's Philosophy কবিতার অনুকৃতি মাত্র। কেবল দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে এবঙ দেশি বিষয়বস্তুর অবতারণা করে মৌলিক হবার চেষ্টা আছে। Shelley-র ছোট্ট কবিতাটি এই :

The fountains mingle with the river
And the rivers with the Ocean,
The winds of Heaven mix for ever
With a sweet emotion;
Nothing in the world is single;
All things by a law divine
In one spirit meet and mingle
Why not I with thine?

So the mountains kiss high Heaven
And the waves clasp one another;
No sister-flower would be forgiven
If it disdained its brother;
And the sunlight clasps the earth
And the moonbeams kiss the sea :
What is all that sweet work worth
If thou kiss not me?

এই ছোট্ট কবিতাটিতে মানুষের প্রেম মুখ্য বিষয়বস্তু ; তার পটভূমি রচিত হয়েছে কতকগুলি প্রাকৃতিক বর্ণনায়। 'প্রকাশ' এর সমধর্মী। তার

ভ্রমর ফিরেছে মাধবীকুঞ্জে, তরুরে ঘিরেছে লতা
অথবা— শশী যবে নিত নয়নে নয়নে কুমুদীর ভালবাসা
অথবা— নলিনী যখন খুলিত পরাণ চাহি তপনের পানে

বর্ণনাগুলি প্রকৃতপক্ষে

The fountains mingle with the river

এবঙ The winds of Heaven mix for ever

এবঙ The mountains kiss high Heaven

থেকে ভিন্ন প্রকৃতির নয়। কেবল অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত বিষয়বস্তুর জায়গায় পরিচিত বিষয়বস্তু ভারতীয় কবিতা থেকে আহৃত হয়েছে।

ইঙরাজি কবিতাটিতে নিসর্গবর্ণনা ও প্রেমবর্ণনা মিশে গেছে ; নিসর্গসৌন্দর্যের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি স্তবকেই কবি প্রেয়সীকে স্মরণ করেছেন। বাঙলা কবিতায় প্রথমে নিসর্গবর্ণনা এবঙ তার ভিত্তিতে পরে প্রেমবর্ণনা স্থান পেয়েছে। ভাবের দিক থেকে যুক্ত হলেও কবিতায় স্থানের দিক থেকে তারা বিযুক্ত। অর্থাত্

বাহুতে বাহুতে বাঁধিয়া কহিল নয়নে নয়নে চাহি,
'আকাশে পাতালে মরতে আজি তো গোপন কিছুই নাহি।'
কহিল হাসিয়া মালা হাতে লয়ে পাশাপাশি কাছাকাছি,
'ত্রিভুবন যদি ধরা পড়ি গেল তুমি আমি কোথা আছি।'

প্রকৃতপক্ষে

In one spirit meet and mingle
Why not I with thine?

অথবা What is all that sweet work worth
If thou kiss not me?

পঙক্তিগুলির মত—কেবলমাত্র I ও thou মানবসাধারণে পরিণত হয়েছে। গ্রহণের (adaptation) জন্য যেটুকু নেহাত্ প্রয়োজনীয় এই পরিবর্তন তার থেকে বেশি নয়।

'কল্পনা' কাব্যের 'রাত্রি' কবিতাটির উত্স Longfellow-র Hymn to the Night কবিতা ; তবে কয়েকটি বর্ণনায় Shelley-র To Night কবিতার অনুকৃতি লক্ষণীয়।[১৪] Longfellow-র কবিতায় রাত্রি এক মহীয়সী নারীরূপে কল্পিত, কবি যার সম্বন্ধে লিখেছেন

I felt her presence, by its spell of might,
Stoop o'er me from above;
The calm, majestic presence of the Night,
As of one I love.

রাত্রির চিরন্তন শান্তিতে কবি প্রশান্ত, কারণ

Oh holy Night! from thee I learn to bear
What man has borne before!

এবঙ সেজন্য তার আগমন প্রার্থনা করছেন।

'রাত্রি' কবিতায় রাত্রি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কল্পনা এই ধারণার অনুরূপ। মোটামুটি বলা যায়, ইঙরাজি কবিতার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবক যথাক্রমে বাঙলা কবিতার দ্বিতীয়

ও তৃতীয় স্তবকের প্রথমাঙশের অনুরূপ। ইঙরাজি চতুর্থ স্তবকেব ভাব বাঙলা চতুর্থ স্তবকের সঙ্গে একাত্ম। দুটি কবিতার মধ্যে পার্থক্য মূলত দুটি : (ক) ইঙরাজিতে আমি--ভাব প্রধান, বাঙলায় তুমি-ভাব। (খ) ইঙরাজিতে রাত্রি মহীয়সী প্রেয়সীর মত, বাঙলায় সে রাণী। গ্রহণের জন্য এই পরিবর্তন স্বাভাবিক।

বর্ণনাভঙ্গির জন্য রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় Shelley-র সাহায্য নিয়েছেন। কয়েকটি উদাহরণ পাশাপাশি তুলে ধরলে যথেষ্ট হবে।

(ক) Where, all the long and lone daylight,
Thou wovest dreams of joy and fear,
দিবসের ক্ষয়ক্ষীণ বিরাট ভান্ডারে প্রবেশিয়া
নীরবে রাখিছ ভান্ড ভরি।

(খ) Wrap thy form in a mantle gray,
Star-inwrought!
নক্ষত্র-রতন দীপ্ত নীলকান্ত সুপ্তিসিঙহাসনে

'মানসী' কাব্যের 'কুহুধ্বনি' কবিতার প্রসঙ্গে পূর্বে সমালোচকেরা Keats-এর Ode to a Nightingale-কে স্মরণ করেছেন। প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন[১৫]—'এই কবিতাটির উপরে কীট্‌সের নাইটিঙ্গেল কবিতার প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়।' 'মনে হয়' এবঙ 'প্রভাব' কথাগুলি অনুকরণকে লক্ষ্য করেনি, অথচ কবিতাটি অনুকরণমূলক রচনা। ইঙরাজি কবিতাটি সম্বন্ধে Selincourt লিখেছেন[১৬]—'In the song of the bird he [অর্থাৎ Keats] detects, for the time at least, a symbol of the beauty for which there is no death or change; which has charm by reason of its subtle charm to draw the worlds of nature and romance closer to that stern reality in which, worshipper of beauty though he be, he has perforce to bear his part.' ইঙরাজি কবিতার মূল ভাব নিচের পঙ্‌ক্তিগুলিতে ব্যক্ত হয়েছে।

নিখিল করিছে মগ্ন— জড়িত মিশ্রিত ভগ্ন
গীতহীন কলরব কত,
পড়িতেছে তারি 'পর পরিপূর্ণ সুধাস্বর
পরিস্ফুট পুষ্পটির মতো।
এত কান্ড, এত গোল, বিচিত্র এ কলরোল
সঙসারের আবর্ত বিভ্রমে—
তবু সেই চিরকাল অরণ্যের অন্তরাল
কুহুধ্বনি ধ্বনিছে পঞ্চমে।

এমনকি রচনার ভঙ্গি পর্যন্ত এক ; ইঙরাজির Ruth বাঙলায় সীতা হয়েছে। ইঙরাজির সঙ্গে গ্রিক্ আখ্যানের যে সম্বন্ধ, সঙস্কৃত কাহিনীর সঙ্গে বাঙলার সম্বন্ধ তার অনুরূপ। দুটি কবিতার উল্লেখ (allusion) নিচে উদ্ধৃত হল।

Perhaps the self-same song that found a path
Through the sad heart of Ruth, when, sick for home,
She stood amid the alien corn.

প্রচ্ছায় তমসাতীরে শিশু কুশলব ফিরে,
সীতা হেরে বিষাদে হরিষে–
ঘন সহকারশাখে মাঝে মাঝে পিক ডাকে,
কুহুতানে করুণা বরিষে।

Thompson যখন লিখেছেন[১৭] 'That soothing sound which fills an Indian day's quietncess sounded also in Sakuntala's ears, in her garden; as Keats' nightingales's song

found a path
Through the sad heart of Ruth.':

তখন স্পষ্টত অনুকরণ না বললেও তিনি সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

Shelley-র ব্যক্তিগত প্রেমবর্ণনা 'প্রকাশে' রবীন্দ্রনাথের নৈর্ব্যক্তিক প্রেমবর্ণনায় রূপান্তরিত হয়েছে, এখানেও তেমনি Keats-এর ব্যক্তিগত দুঃখসুখবর্ণনা মানবসাধারণের জীবনবর্ণনায় পরিণত হয়েছে। 'রাত্রি' কবিতায় ইঙরাজির 'আমি' 'তুমি'তে পরিবর্তিত হয়েছে, এখানেও তেমনি রূপান্তরের প্রয়োজনে ইঙরাজির মধ্যরাত্রি মধ্যাহ্নে পরিণত। তবে এই কবিতার সম্বন্ধে অনুকরণ শব্দটি যেমন সত্য মধ্যাহ্ন বর্ণনায় কবির কৃতিত্বও তেমনি লক্ষণীয়।

'মানসী'র কবিতাসঙখ্যা ৬৪ ; তাদের মধ্যে 'সঙশোধিত' কবিতার সঙখ্যা ৩, অর্থাত্ কুহুধ্বনি, বধূ ও ব্যক্তপ্রেম। এগুলির রচনাকাল ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের যথাক্রমে ২২শে বৈশাখ, ১১ই জ্যেষ্ঠ ও ১২ই জ্যৈষ্ঠ। সঙশোধনকালের পরিধি সঙ্কীর্ণ—একই বছরের ৫ই থেকে ৭ই কার্তিক। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, যে 'কুহুধ্বনি' ও 'বধূ' অনুকরণমূলক বা প্রভাবজাত রচনা। অনুকরণের ছাপ মুছে ফেলা যদি সঙশোধনের কারণ হয়, তবে অনুমান করা সম্ভব, যে 'ব্যক্তপ্রেম'ও অনুকরণমূলক কবিতা। Browning-এর কোনো কবিতা এর মূল হতে পারে। এই কবিতাটির মূল কোনো ইঙরাজি কবিতায় আছে, একথা কখনো প্রমাণিত হলে সঙশোধনের কারণ সম্বন্ধে আমার অনুমান সত্য হবে। প্রসঙ্গত বলা দরকার, অনুকরণজাত কবিতামাত্রেরই সঙশোধনের প্রয়োজন নেই, কেবল যে রচনাগুলি মূল রচনার অত্যন্ত কাছাকাছি সেগুলিরই পরিবর্তন রবীন্দ্রনাথের কাম্য। কবিতাগুলির অসঙশোধিত পাঠ পাওয়া গেলে সম্ভবত এই অনুমান দৃঢ় হতে পারে।

Browning-এর প্রভাব রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় লক্ষণীয়। মানসী কাব্যের নারীর উক্তি, পুরুষের উক্তি, গুপ্ত প্রেম, ব্যক্ত প্রেম প্রভৃতি কবিতা Browning-এর dramatic monologueগুলিকে স্মরণ করায়। অবশ্য এগুলি Browning-এর প্রভাবজাত এবঙ কোনো কবিতার অনুকরণ না হতে পারে। তবে Browning-এর Life in a Love-এর সঙ্গে মানসীর 'আশঙ্কা' কবিতার ভাবগত সাদৃশ্য নজরে পড়ে।

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, মানসীর 'শেষ উপহার' রবীন্দ্রনাথের মৌলিক রচনা নয়,—তাঁর বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিতের লেখা কোন ইঙরাজি কবিতার অনুবাদ। এই তথ্য মানসী প্রথম সঙস্করণের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন।[১৮] ঐ ভূমিকাটি পরে বর্জিত হয়েছে কেন?

'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতায় ভয়ঙ্কর সমুদ্রের বর্ণনা যেমন নিখুঁত, তার পাশে অসহায় যাত্রীদের আর্ত ক্রন্দন তেমনি বৈপরীত্য ফুটিয়ে তুলেছে। মানসীর অন্যান্য নিসর্গ--কবিতার সঙ্গে এই কবিতাটির ভাবগত পার্থক্য সম্বন্ধে সকলেই সজাগ। বাঙলা কবিতায় সমুদ্রের সুন্দর বর্ণনার অভাবের জন্যও এই কবিতাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সেই কারণেই এর মৌলিকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জেগে ওঠে। Thompson কবিতাটির অত্যন্ত প্রশঙসা করলেও এই বিষয়ে অন্ধ ছিলেন না।[১৯]

'চিত্রা' কাব্যের অন্তর্গত 'বিজয়িনী' কবিতার মূল উত্স Tennyson-এর Eleanore কবিতাটি। বিজয়িনীর ১১৪টি চরণের শেষ ৪৫টি চরণে কবিতাটির মূল ভাব প্রকাশিত ; প্রথম ৬৯টি কেবল নিসর্গবর্ণনা, বা মূলভাবের বিরোধী নয়, কিন্তু তার পরিপুষ্টিতেও বিশেষ সাহায্য করে না। শেষ ৪৫টি চরণের প্রথম পদ্য-অনুচ্ছেদ—অর্থাত্ ১৭টি চরণ আবার শেষাঙশের ভূমিকামাত্র। এই শেষাঙশে সৌন্দর্য ও ভোগবাসনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধারনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন এবঙ এই চরণগুলির ভাব সম্পূর্ণভাবে Eleanore থেকে গৃহীত।

কবিতাটির প্রথমদিকে নিসর্গবর্ণনা অঙশত মৌলিক এবঙ বহুলাঙশে বিভিন্ন উত্স থেকে সঙ্কলিত। Keats-এর কতকগুলি পঙ্‌ক্তিতে মোহিতলাল এরূপ একটি উত্সের সন্ধান দিয়েছেন। তবে এই চরণগুলিতেও রবীন্দ্রনাথ Tennyson-কে বিস্মৃত হননি। কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বর্ণনার মিল নির্দেশ করা যেতে পারে।

(ক) বসন্ত নবীন
সেদিন ফিরিতেছিল ভুবন ব্যাপিয়া

খ) মধ্যাহ্নের জ্যোতি
মূর্চ্ছিত বনের কোলে,

গ) কপোতদম্পতি
বসি শান্ত অকম্পিত চম্পকের ডালে
ঘন চঞ্চুচুম্বনের অবসরকালে
নিভৃতে করিতেছিল বিহ্বল কূজন।

বর্ণনাগুলি মূল থেকে পরিবর্তিত হলেও উত্সকে স্মরণ করায়। নিচে তা উদ্ধৃত হল।

Youngest Autumn, in a bower
Grape-thicken'd, from the light, and blinded
With many a deep-hued bell-like flower.
Of fragrant trailers, when the air

Sleepeth over all the heaven,
And the crag that fronts the Even,
All along the shadowing shore.

পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের স্থান কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে, এই ধারণাটি বিজয়িনী কবিতার অপরূপ নারীর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন। মদন এই নারীকে জয় করতে এসে পরাজিত হল,—রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই Tennyson তার বর্ণনা করেছেন। দুজনেব কবিতাংশ উদ্ধৃত হল।

And the self-same influence
Controlleth all the soul and sense

Of passion gazing upon thee.
Bow-string slacken'd, languid Love,
Leaning his cheek upon his hand,
Droops both his wings, regarding the,

And so would languish evermore,
Serene, imperial Eleanore.

ত্যজিয়া বকুলমূল মৃদুমন্দ হাসি
উঠিল অনঙ্গদেব।
সম্মুখেতে আসি
থমকিয়া দাঁড়াল সহসা। মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকাল-তরে। পরক্ষণে ভূমি 'পরে
জানু পাতি বসি, নির্বাক্ বিস্ময়ভরে
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি। নিরস্ত্র মদনপানে
চাহিল সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।

এমনকি Tennyson-এর

The Langours of thy love-deep eyes
Float on to me. I would I were
So tranced, so rapt in ecstasies
To stand apart, and to adore,
Gazing on thee for evermore.

পঙ্ক্তিগুলি উদ্ধৃত বাঙলা কবিতাংশের সঙ্গে ভাবগত সাদৃশ্য বহন করে। বিজয়িনীর বর্ণনাও Tennyson-এর অনুরূপ। একটি উদাহরণ যথেষ্ট হবে।

For in thee
Is nothing sudden, nothing single;
Like two streams of incense free
From one censer, in one shrine,
Thought and motion mingle,
Mingle ever.

ঘিরি তার চারি পাশ
নিখিল বাতাস আর অনন্ত আকাশ
যেন এক ঠাঁই এসে আগ্রহে সন্নত
সর্বাঙ্গ চুম্বিল তার,

মোহিতলালেব তুলে-ধরা অনেক দৃষ্টান্তের মত এই কবিতাটি অধ্যাপক তারকনাথ সেনের মন্তব্যের বিরোধিতা করে, কারণ বিজয়িনী 'a great piece of his poetry' হিশাবে বিখ্যাত এবঙ Tennyson-এর সাহায্য ছাড়া আলোচ্য কবিতাটির রূপ কল্পনা করা যায় না।

'কথা' কাব্যের প্রথমে 'কথা কও কথা কও' দিয়ে আরম্ভ করা যে কবিতা আছে তা Tennyson-এর Ode to Memory-কে স্মরণ করায়। এই কবিতায় বর্ণনা বা পঙ্‌ক্তিগত মিল বিশেষ নেই ; ভাবগত সাদৃশ্য কিছু আছে। দীর্ঘ আলোচনার পরিবর্তে পাশাপাশি কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়ে সাদৃশ্য তুলে ধরার প্রয়াস করছি। মনে হয়, ইঙরাজি কবিতাটি রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণ করার উত্‌সাহ দেয়নি, একই ধরনের একটি নতুন কবিতা রচনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কবিতাটির আরম্ভেই Tennyson লিখেছেন—

Thou who stealest fire,
From the fountains of the past,
To glorify the present; oh, haste,
Visit my low desire!

Strengthen me, enlighten me!
I faint in this obscurity,
Thou dewy dawn of memory.

এর সঙ্গে মিল দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথের শেষ স্তবকের। তা উদ্ধৃত হল :

কথা কও, কথা কও।
কোনো কথা কভু হারাওনি তুমি
সব তুমি তুলে লও—
কথা কও, কথা কও।

উদ্ধৃত ইঙরাজি কবিতাটির শেষ তিনটি চরণ একাধিক স্তবকের শেষে আবর্তিত হয়েছে। এর অনুরূপ রবীন্দ্রনাথের

হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার
কথা কও, কথা কও।

চরণগুলি সামান্য পরিবর্তিত হয়ে কবিতায় ধুয়া হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

Elizabeth Barrett Browning রবীন্দ্রনাথের প্রিয় কবি ছিলেন। 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের প্রথম সংস্করণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর Irreparableness কবিতাটির অনুবাদ ('সারাদিন গিয়েছিনু বনে') করেছিলেন। ঐ কাব্যের 'শান্তি' নামের কবিতাটি প্রকৃতপক্ষে E.B. Browning-এর A Child Asleep কবিতার মর্মানুসারী। ইংরাজির তুলনায় বাংলাতে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত আকার এবং বর্ণনাগত সামান্য পার্থক্য আছে। ইংরাজিতে স্বর্গীয় ভাবের কথা, বাংলায় পরিচিত পার্থিব বর্ণনা। ভাবের দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়ত্র শিশুর ঘুম প্রায় মৃত্যুর মত প্রশান্ত। কয়েকটি সদৃশ উদ্ধৃতি তুলে ধরে কবিতাটির আলোচনা শেষ করছি।

(ক) Softly, softly! make no noises!
Now he lieth dead and dumb;
থাক্ থাক্ চুপ কর্ তোরা, ও আমার ঘুমিয়ে পড়েছে।

(খ) Dare ye look at one another,
And the benediction speak?
Could he not break out in weeping, and
Confess yourselves too weak?
আবার যদি জেগে ওঠে বাছা কান্না দেখে কান্না পাবে যে।
কত হাসি হেসে গেছে ও, মুছে গেছে কত অশ্রুধার,
হেসে কেঁদে আজ ঘুমাল, ওরে তোরা কাঁদাসনে আর।

(গ) Sleeping near the withered rose gay
Which he pulled the day before.
কত রাত গিয়েছিল হায় কোলেতে শুকানো ফুলমালা
নতমুখে উলটি পালটি চেয়ে চেয়ে কেঁদেছিল বালা।

ঘ) Speak not! he is consecrated;
Breathe no breath across his eyes :
শ্রান্ত দেহ, নিস্পন্দ নয়ন, ভুলে গেছে হৃদয়-বেদনা।
চুপ করে চেয়ে দেখো ওরে, থামো থামো হেসো না কেঁদো না।

'অচলায়তন' নাটক সম্বন্ধে Thompson মন্তব্য করেছিলেন[২০]—'Its fable is probably suggested by the Princess, and, more remotely, The Castle of Indolence and The Faerie Queen.' ৩রা আষাঢ়, ১৩৩৪ তারিখে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে লিখেছেন[২১]—'Castle of Indolence এবং Faerie Queen আমি পড়িনি—Princess-এর সঙ্গে অচলায়তনের সুদূরতম সাদৃশ্য আছে বলে আমার বোধ হয় না। আমাদের নিজেদের দেশে মঠ-মন্দিরের অভাব নেই—আকৃতি ও প্রকৃতিতে অচলায়তনের সঙ্গে তাদেরই মিল আছে।' কিন্তু অচলায়তনের সঙ্গে মঠ-মন্দিরের সাদৃশ্য অথবা Castle ও Church-এর বৈসাদৃশ্য এ আলোচনার বিষয় নয়, এই নাটকটির সঙ্গে ইংরাজি রচনাগুলির গঠনগত সাদৃশ্য আলোচ্য। The Princess-এর

সঙ্গো অচলায়তনের সাদৃশ্য না থাকতে পারে, তবে The Castle of Indolence-এর সঙ্গো এই নাটকের আকারগত সাদৃশ্য অস্বীকার করা কঠিন। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১) গ্রন্থের দ্বাদশ পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'আলস্যে কাল কাটাবার এমন জায়গা আর পাবে? তুমি যে Thomson-এর Castle of Indolence পড়েছ—এখানটা তার একটা জীবন্ত ছবি।' এই বাক্যদুটি ঐ গ্রন্থপাঠের প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের সত্যবাদিতা কেমন?

James Thomson-এর The Castle of Indolence দুটি সর্গে বিভক্ত। প্রথম সর্গে যাদুকর Indolence-এর প্রভাবে কিভাবে প্রাসাদের সর্বত্র শ্লথতা ও অবসাদ বিরাজমান, কিভাবে কয়েকজন পথিক আকৃষ্ট হয়ে এসে মধুর দৃশ্য ও গন্ধে মোহিত হয়ে পড়ল এবঙ শেষে কিভাবে তারা কারাগারে বন্দী হয়ে কাল কাটাল তার বর্ণনা আছে। দ্বিতীয় সর্গে Knight of Arms and Industry-এর দ্বারা Indolence-এর পরাজয় ও castle-এর ধ্বঙস বর্ণিত হয়েছে। অচলায়তনের অধিবাসীরা অলস নয়, তবে তাদের জীবনপ্রবাহ Castle-এর অধিবাসীদের মতই বহির্জগত্ থেকে বিচ্ছিন্ন ; মহাপঞ্চক একদিক থেকে Indolence-এর ভূমিকা নিয়েছে। অচলায়তনেও পঞ্চকের কারাবাস এবঙ পরিশেষে দাদাঠাকুরের হাতে মহাপঞ্চকের পরাজয় ও গৃহের ধ্বঙস বর্ণিত হয়েছে। এই গঠনগত সাদৃশ্য উপেক্ষণীয় নয়। প্রকৃতপক্ষে নাটকটির মন্ত্র, ধর্মাচার ইত্যাদি বর্ণনা যেমন রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* গ্রন্থ থেকে আহৃত, তেমনি গঠন এই ইঙরাজি কাব্য থেকে গৃহীত।

Shelley-র Alastor-এর অনুকরণে রবীন্দ্রনাথের 'কবি-কাহিনী' গঠিত, এই তথ্যটি প্রমথনাথ বিশী কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ প্রমাণের দ্বারা তুলে ধরেছেন,[২২]—বাহ্য প্রমাণের প্রয়োজন হয়নি। উপন্যাসের গঠনে রবীন্দ্রনাথ কখনো কখনো বিদেশি রচনার সাহায্য নিয়েছেন। ড. সুকুমার সেন R. L. Stevenson-এর *Prince Otto* উপন্যাসের সঙ্গো 'ঘরে-বাইরে'র সাদৃশ্য তুলে ধরেছেন।[২৩] সেখানে আভ্যন্তরীণ প্রমাণ এত স্পষ্ট যে রবীন্দ্রনাথ ইঙরাজি রচনাটি পড়েছেন কি না, অথবা কবে পড়েছেন সে সম্বন্ধে তথ্য--সন্ধান নিষ্প্রয়োজন ছিল। তবে 'অচলায়তন' সম্বন্ধে আলোচনার অসুবিধা এই, যে রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে ঋণ অস্বীকার করেছেন, অথচ কবি-কাহিনী বা ঘরে-বাইরে সম্বন্ধে তা করেননি। (কারণ, তার পূর্বেই তিনি লোকান্তরিত হয়েছেন।) রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সত্যতা সম্বন্ধে ধারনা করার আগে দুটি বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

(১) বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র সঙ্গো Scott-এর Ivanhoe-র সাদৃশ্য দেখা গেলে বঙ্কিমচন্দ্র Ivanhoe পাঠ অস্বীকার করেছিলেন। তবু সন্দেহ জেগে আছে। তত্কাল-প্রসিদ্ধ হারানচন্দ্র রক্ষিতের 'দুলালী' উপন্যাস V. Hugo-র *Le Roi s'amuse* অবলম্বনে লেখা বলে মনে হলে হারানচন্দ্র ফরাশি রচনাটি সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতা জানান। হারানচন্দ্রের অজ্ঞতাকে বিশ্বাস করা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ কি এই ঐতিহ্যের বিরোধিতা করেন?

(২) বর্তমান প্রবন্ধের ষষ্ঠ অনুচ্ছেদের প্রথমাংশ নির্দেশ করে, যে রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য নিজগুণে সত্য বলে স্বীকৃত হবার দাবি রাখে না।

'অচলায়তনে'র গঠনে ইঙরাজি থেকে রবীন্দ্রনাথের ঋণ উত্সাহী গবেষকের আলোচনার বিষয়।

---

১. ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—রবীন্দ্রকাব্যপরিক্রমা।
২. T N. Sen–Western Influence on the Poetry of Tagore, *Rabindianath Tagore a centenary volume* (Sahitya Akademi)
৩. ড. শীতাংশু মৈত্র—রবীন্দ্রনাথ ও পাশ্চাত্য।
৪. মোহিতলাল মজুমদার—কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, ২য় খন্ড।
৫. চিঠিপত্র, ৯ম খন্ড, প. ৯৫।
৬. চিঠিপত্র, ৫ম খন্ড, প ১১১-২।
৭. তদেব, প. ২৯৮।
৮. তদেব, প. ২৯৬।
৯. রবীন্দ্রনাথ ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে Eliot, Pound-এর কবিতাব অনুবাদ করেছেন, এবঙ সমকালীন ইঙরাজি কাব্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেছেন। (দ. 'আধুনিক কাব্য', বৈশাখ ১৩৩৯।) তাতে রোমান্টিকতায় আসক্তি এবঙ এই রকম রচনায় বীতরাগ প্রকাশিত। প্রবন্ধ থেকে স্পষ্ট, যে রবীন্দ্রনাথ এযুগের সঙ্গে সবে পরিচিত হচ্ছেন।)
১০. প্রাগুক্ত, প. ২৮।
১১ 'মানসী'তে প্রকৃতির প্রতি ; 'সোনার তরী'তে প্রতীক্ষা, মানসসুন্দবী , 'চিত্রা'য অন্তর্যামী. পূর্ণিমা, শেষ উপহার, জীবনদেবতা, সিন্ধুপারে ; 'ক্ষণিকা'য় আবির্ভাব ; 'কল্পনা'য় অশেষ ; 'পূববী'তে আহ্বান, লিপি।
১২. প্রমথনাথ বিশী সঙক্ষিপ্ত ইঙ্গিত করেছেন, আলোচনা নয়। দ. 'ববীন্দ্রকাব্যনির্ঝর'। Epipsychidion ও 'মানসসুন্দরী'র সাদৃশ্য তিনি লক্ষ্য করলেও আলোচনা না করায় মোহিতলাল তা করতে পেরেছিলেন। তাই এখানে হিমালয়বর্ণনা, কুহুধ্বনি ও অচলায়তন আলোচিত হল।
১৩. Edward Thompson –*Rabindranath Tagore,* p. 304 (2nd ed)
১৪. শেলিব প্রভাবের কথায় তারকনাথ সেন আপত্তি করেন। দ. তাঁর প্রাগুক্ত প্রবন্ধ।
১৫. প্রমথনাথ বিশী—রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ, ১ম খন্ড, প. ৫৯। (৪র্থ মুদ্রণ।)
১৬. E. de Selincourt. (ed.) –Introduction, *The Poems of John Keats,* p. Ix. (1961.)
১৭. প্রাগুক্ত, প. ৬৯।
১৮. দ. (ক) 'গ্রন্থপরিচয়', রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য় খন্ড, (বিশ্বভারতী)। (খ) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্রজীবনী, প. ২৭২। (সঙশোধিত সঙস্করণ।)
১৯. প্রাগুক্ত, প. ৭১।
২০. প্রাগুক্ত, প. ২১৫।
২১. দ. গ্রন্থপরিচয়', রবীন্দ্ররচনাবলী, ১১শ খন্ড। (বিশ্বভারতী।)
২২. প্রমথনাথ বিশী—রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ, ২য় খন্ড, প. ১৬১। (১৬৮)
২৩. ড. সুকুমার সেন—বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খন্ড, প. ৩১০। (১ম সঙস্করণ।)

• প্রান্তিক (নব পর্যায়), ১ম বর্ষ, ২য় সঙখ্যা, কার্তিক-পৌষ ১৩৭৫, প. ৭১-৯৬।

উল্লেখ : কালিসাধন মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্রকাব্যে পশ্চিমালোক। (কলকাতা, তারিখ নেই)

রবীন্দ্রনাথ ও ফরাশি সাহিত্য

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে ফরাশি সাহিত্যের চর্চা ছিল। দেবেন্দ্রনাথ মূল ফরাশি গ্রন্থ থেকে বাঙলা অনুবাদ করেছেন[১] ; সত্যেন্দ্রনাথ[২] ও হেমেন্দ্রনাথের[৩] ফরাশি ভাষায় কিছুটা দখল ছিল ; জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ফরাশিচর্চা ও বাঙলা অনুবাদের কথা বহুজ্ঞাত। রবীন্দ্রনাথের বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে প্রিয়নাথ সেন[৪] লোকেন পালিত[৫] ও আশুতোষ চৌধুরি[৬] ফরাশি সাহিত্যে পারদর্শী ছিলেন। ফরাশি-বিদগ্ধ ইন্দিরা দেবী ও প্রমথ চৌধুরি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসঙ্গী।

অল্প বয়সে ফরাশি ভাষা ও সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণের নিদর্শন পাওয়া যায়, যেমন—

১। তরুণ বয়সে জার্মান শেখার প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—'I myself have tried to get at the wealth of beauty in the literature of European languages, long before I gained a full right to their hospitality.'[৭] এখানে languages শব্দটির বহুবচন লক্ষণীয়। সম্ভবত ফরাশির কথা লেখকের মনে ছিল।

২। ভারতী, ১২৮৮ শ্রাবণ সংখ্যায় 'বিবিধ প্রসঙ্গে' রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, যে Pascal-এর মতে সময় বেশি থাকলে রচনার কলেবর ছোট হয়, এবঙ তা হাতে নেই বলে লেখা বড় হয়েছে।[৮]

৩। আনুমানিক ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রিয়নাথ সেনের গ্রন্থসঙ্গ্রহ থেকে Théophile Gautier-এর *Mademoiselle de Maupin* উপন্যাসের ইঙরাজি অনুবাদ পাঠ তাঁর মনকে আন্দোলিত করেছিল।[৯]

৩। প্রিয়নাথকে লেখা দুটি চিঠিতে (আনুমানিক রচনাকাল ১৮৯৪-৫) 'au revoir' লেখা হয়েছে।[১০]

৫। (১) 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী' (১৮৯১) গ্রন্থে আছে—'ফ্রান্সের প্রবেশদ্বারে একবার একজন কর্মচারী গাড়িতে এসে জিজ্ঞাসা করে গেল আমাদের মাশুল দেবার যোগ্য জিনিষ কিছু আছে কি না—আমরা বললুম না। আমাদের একজন বৃদ্ধ সহযাত্রী ইঙরাজ বললেন : I don't parlez-vous français.' (তারিখ ৮.৯. ১৮৯০)

(২) ঐ গ্রন্থের 'খসড়া'য় আছে—

(ক) 'প্যারিসের কী বর্ণনা করব।..অনেক ঘুরে ঘুরে এক বইয়ের দোকানে গেলুম। সেখানে গোটাকত বই কিনে এক খাবারের জায়গায় খাওয়া গেল।' (৯.৯. ১৮৯০) ফরাশি বই হওয়া স্বাভাবিক ; এ প্রসঙ্গে পরের দুটি উদ্ধৃতি লক্ষণীয়।

(খ) 'Coppée' পড়া গেল।' (১৩.৯.১৮৯০)

(গ) 'ডেকে বসে খানিকটা Alphonse Daudet পড়ছিলুম।' (২৩.৯.১৮৯০)

৬। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে লিখেছেন—'অন্তরে বাহিরে এইরকম একীকরণ করতে না

পারলে কেবলমাত্র বহুদর্শিতা এবঙ সূক্ষ্ম বিচারশক্তি-বলে কেবল রস্ফুকো প্রভৃতির ন্যায় মানবচরিত্র ও লোকসঙসার সম্বন্ধে পাকা প্রবন্ধ লিখতে পারা যায়।'[১১] Duc de la Rochefoucauld-র (১৬১৩-৮০) *Maximes* বিখ্যাত রচনা।

৭। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী লিখেছেন[১২]— 'আমি লরেটো ইস্কুলে ফরাসী শিখতুম বলে, একবার আমার জন্মদিনে ইস্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি টেবিলের উপর তখনকার দিনের বিখ্যাত ফরাসী কবি কপ্পে, মেরিমে, ল্যকঁত্ দ লীল, লা ফঁতেন প্রভৃতির রচনাবলী সুন্দর করে বাঁধিয়ে সোনার জলে তাদের নাম ও আমার নাম লিখিয়ে সাজিয়ে রেখেছিলেন।'

৮। 'আমি লোকেনের ওখেন থেকে তার একখানা Amiel's Journal ধার করে এনেছি—যখনি সময় পাই সেই বইটা উল্টে-পাল্টে দেখি।'[১৩] (মার্চ ১৮৯৪)

৯। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে লেখা পত্রাঙশ : 'মীরাতে আমাতে সদাসর্বদা যে--সকল টেট-আ-টেট হয়ে থাকে..।'[১৪] (১. ৮. ১৮৯৪)

১০। 'ভ্রমণকারী একটি ফরাসী, সেই জন্যে সে ভ্রমণ করতেও জানে এবঙ লিখতেও জানে।'[১৫] (অক্টোবর ১৮৯৪) ফরাশি-সাহিত্য-প্রীতি এ থেকেই পরিস্ফুট।

কেবল একটি দ্বিভাষিক অভিধান ও ব্যাকরণের সাহায্যে নতুন ভাষা আয়ত্ত করার অসাধারণ ক্ষমতা প্রিয়নাথ সেনের ছিল।[১৬] অতএব, কোন বন্ধুকে ফরাশি শিখতে অনুরূপ পদ্ধতি নেবার পরামর্শ দেওয়া প্রিয়নাথের পক্ষে স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের দুটি পত্রাঙশ উল্লেখযোগ্য।

১১। জগদীশচন্দ্র বসুকে ১৭.৯.১৯০০ তারিখে লেখা : 'চুপচাপ বসে একখানা ফরাসী ব্যাকরণ নিয়ে ওলটাচ্ছিলুম।'[১৭]

১২। প্রিয়নাথ সেনকে লিখেছেন—

(ক) 'তোমার ফরাসী বহি পাঠাই..।'[১৮] (আনুমানিক কাল ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি।)

(খ) 'ব্যাকরণ ঘেঁটে ফরাসী শেখা আমার কম্ম নয়—একখানা বই দিয়ো। আমার লাইব্রেরীতে যে যে ফরাসী গ্রন্থের তর্জ্জমা আছে তারই কোন একটার original পেলে সুবিধা হয়। Gautier-এর *Capitaine Fracasse,* Daudet-র *Jack, Maupassant*-র *Pierre et Jean, No Relation,* Goncourt-এর *Sister Philomène* ইত্যাদি'।[১৯] (৯.১০.১৯০০)

রবীন্দ্রনাথ ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে প্রিয়নাথের সাহায্যে ফরাশি ভাষা শিখতে চেষ্টা করেছেন।

এই সময় ফরাশি সাহিত্য-পাঠে তাঁর ঝোঁকের আরো কয়েকটি নিদর্শন—

১। প্রিয়নাথের কাছে তিনি Molière-এর খোঁজ করছেন। তখন রবীন্দ্রনাথ Molière-এর *Le Bourgeois Gentilhomme* পড়েছেন এবঙ Fasnach সম্পাদিত Molière-এর *L'Avare* নাটকের খোঁজ করেছেন।[২০] সম্ভবত ইঙরাজি অনুবাদে পড়া চলেছে।[২১]

২। বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়) ১৩০৮ বৈশাখ সঙখ্যায় Joseph Joubert (১৭৫৪-১৮২৪)-এর Pensées থেকে প্রচুর অনুবাদসহ একটি প্রবন্ধ রচনা করেন।[২২] রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত Matthew Arnold-এর মাধ্যমে Joubert পড়েন, তবে মূল ফরাশি রচনাও সামনে রাখেন। প্রমাণ—'অনুবাদে আমরা সাহস করিয়া 'প্রকৃতি' শব্দটা ব্যবহার করিয়াছি। মূলে যে কথা আছে তাহার ইঙরাজি প্রতিশব্দ soul।'

৩। বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়) ১৩০৮ শ্রাবণে 'হিন্দুত্ব' প্রবন্ধের শেষে সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটির সঙ্গে Ernest Renan-র (১৮২৩-১৮৯২) মত মিলিয়ে পড়তে অনুরোধ করেছেন। ওই সঙখ্যায় 'সাহিত্যপ্রসঙ্গে' 'নেশন কি' শীর্ষক রচনায় Renan-র বক্তব্য অনূদিত ও আলোচিত হয়েছে।

ফরাশি তিনি কিছুটা শিখেছিলেন, তার পরিচয় আছে কয়েকটি রচনায় :

১। 'সেই মোটা ফ্রেঞ্চ বই আমার পূর্বগামীরূপে বোলপুরে রওনা হয়ে গেছে।[২৩]

২। 'Sabot একরকম কাঠের তলা দেওয়া জুতো য়ুরোপের অনেক দেশে সাধারণ লোকদের মধ্যে চলিত আছে। এ কথাটা তোমার ডিকসনারিতে পাওনি সেজন্য সঙ্কলনকারীকে দন্ডনীয় করা চলবে না—কেননা ও কথাটার প্রয়োগ ইঙরাজি সাহিত্যে বিরল।'[২৪] (১৭. ৪. ১৯৩৪) শব্দটি ফরাশি।

৩। পরিচয় ১৩৪৬ ভাদ্র থেকে পৌষ সঙখ্যায় ইন্দিরা দেবী অনূদিত ও রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'রেনে গ্রুসের ভারতবর্ষ' প্রকাশিত হয়। René Grousset (১৮৮৫-১৯৫২) প্রাচ্য-বিশেষজ্ঞ খ্যাতনামা ফরাশি ঐতিহাসিক ছিলেন।

৪। তাঁর ফ্রান্স প্রবাসে একদা সহকারী সুজান কার্পেলেস লিখেছেন—'ফরাসী উনি খুব ভালই বুঝতেন।'[২৫]

পরিণত বয়সে ফরাশি ভাষা তাঁর কিছুটা আয়ত্ত হলেও তিনি ইঙরাজি অনুবাদের মাধ্যমে ফরাশি সাহিত্য বেশি পডতেন। প্রমথ চৌধুরিকে লেখা দুটি চিঠি থেকে তার প্রমাণ মিলবে :

১। 'তোমাকে একখানি ফরাসী বই পাঠাচ্চি।..এর শেষ পরিচ্ছেদ, যার বিষয়বস্তু হচ্ছে—'Education, Morale, Sociale et Artistique'—ঐটেই আমার সবচেয়ে কৌতূহলের বিষয়। তর্জমা নয় কিন্তু এর ভাবার্থটা কি পাওয়া যাবে না?'[২৬]

২। 'ফরাসী চিঠিগুলি আমাকে তর্জমা করে পাঠাতে পারবে কি জবাব দিতে হবে। দেরি কোরোনা।'[২৭]

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে ফরাশি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার ব্যবস্থা হয় এবঙ Benoit নামে এক ফরাশি অধ্যাপক আসেন।[২৮] Sylvain Lévi-ও শান্তিনিকেতন এবঙ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগ রক্ষা করেছেন। Romain Rolland-এর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা সুবিদিত।[২৯] তাঁর একাধিকবার ফ্রান্স ভ্রমণ, Bergson-র সঙ্গে সাক্ষাত্কার, Henri Barbousse-এর সঙ্গে যোগাযোগ প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

Victor Hugo-র রচনা থেকে রবীন্দ্রনাথ যে ছয়টি কবিতার বাঙলা কাব্যানুবাদ

করেন তাদের তালিকা এই :

ক্রমিক সঙখ্যা	অনুবাদের শিরোনাম	প্রথম প্রকাশ	গ্রন্থনা[৩০]	মূলের শিরোনাম	মূল কাব্যগ্রন্থ
১	কবি	ভারতী ১২৮৮ আষাঢ়	প্রভাত সঙ্গীত	—	Les Contemplations
২	বিসর্জন	ওই	প্রভাত সঙ্গীত	15 Février 1843	
৩	তারা ও আঁখি	ওই	প্রভাত সঙ্গীত	Hier au soir	
৪	সূর্য্য ও ফুল	ওই	প্রভাত সঙ্গীত/ আলোচনা	Unité	
৫	—	ভারতী ১২৯১ শ্রাবণ	কড়ি ও কোমল / শিশু	Épitaphe	
৬	জীবন মরণ	আলোচনা ১২৯১	—	Quia Pulvis Es	

অনুবাদের বৈশিষ্ট্য-নির্দেশের জন্য মূলের পাশাপাশি সেগুলিকে দেখা প্রয়োজন :

১। মূলের পাশাপাশি 'কবি'র অঙশবিশেষ এরূপ :

Le poète s'en va dans le champs : il admire,
Il adore : il écoute en lui-même une lyre :

ওই যেতেছেন কবি কাননের পথ দিয়া,
কভু বা অবাক কভু, ভকতি-বিহ্বল হিয়া,
নিজের প্রাণের মাঝে
একটি যে বীণা বাজে,
সে বীণা শুনিতেছেন হৃদয় মাঝারে গিয়া।

নিম্নরেখ বাঙলা চরণগুলি ফরাশির হুবহু অনুবাদ নয়,—ফরাশি দ্বিতীয় চরণের ব্যাখ্যা। অনুবাদের শেষে ছাড়া অন্য কোথাও বড় পার্থক্য নেই।

Comme les ulémas quand paraît le muphti,
Lui font des grands saluts et courbent jusqu'à terre

মহর্ষি গুরুরে দেখি অমনি ভকতি ভরে
সসম্ভ্রমে শিষ্যগণ যেমন প্রণাম করে,
তেমনি কবিরে দেখি গাছেরা দাঁড়াল নুয়ে,
লতা-শ্মশ্রুময় মাথা ঝুলিয়া পড়িল ভুঁয়ে।

ইসলামি বিষয়ের পরিবর্তে অনুবাদে অন্যরূপ হিন্দু সম্বন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এখানে মূলের সঙ্গে পার্থক্য নেই—তার দেশীয়করণ হয়েছে মাত্র।

২। Quia Pulvis Es ও 'জীবনমরণ'-এর অঙশবিশেষ এরূপ[৩১]—

Ceux-ci partent, ceux-là demeurent.
Sous la sombre acquilon, dont le·mille voix pleurent,
Poussière et genre humain, tout s'envole à la fois.

ওরা যায়, এরা করে বাস ;
অন্ধকার উত্তর বাতাস
বহিয়া কত না হাহুতাশ
ধূলি আর মানুষের প্রাণ
উড়াইয়া করিছে প্রয়াণ।

স্তবক-গঠন ও চরণদৈর্ঘ্য ছাড়া ফরাশি ও বাঙলায় কোনো পার্থক্য নেই। বাঙলা অনুবাদ মূলানুগ এবঙ চমত্কার, কেবল কয়েকটি চরণ পরে ceux qui partent-এর অনুবাদে 'গেলদের' লেখার হাস্যকর ছেলেমানুষি ছাড়া।

অনুবাদগুলির কালসীমা জুন ১৮৮১ থেকে জুলাই ১৮৮৪। সবগুলি কবিতা কেবল *Les Contemplations* (১৮৫৬) কাব্য থেকে অনূদিত। এই সময়ে ফরাশি কাব্যটি ইঙরাজিতে পুরো অনূদিত হয়নি। Hugo-র কোনো ইঙরাজি অনুবাদ-সঙ্কলন থেকে বাঙলায় অনুবাদ হলে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে একাধিক ফরাশি গ্রন্থের কবিতার স্থানলাভের সম্ভাবনা থাকত। হয়ত রবীন্দ্রনাথ মূল ফরাশি থেকে অনুবাদ করেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থসঙগ্রহে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *Les Contemplations* কাব্যটির অস্তিত্ব[৩২] এই অনুমানের সমর্থক।

রবীন্দ্রনাথ মূলকে অটুট রেখে অনুবাদ করেছেন, ফরাশি কাব্যটির ব্যবহার করেছেন, অথচ তখনো ফরাশি ভাষা জানেন না। এই অনুবাদ-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণার জন্য নিচের তথ্যগুলি জানা দরকার।

১. প্রিয়নাথ সেন অনেকগুলি মৌলিক কবিতা লেখা ছাড়া Hugo-র কয়েকটি কবিতার অনুবাদও করেছেন। যেমন—

(ক) হুগোর কবিতা (৩টি কবিতা) — সমালোচনী ১৩০৯ ফাল্গুন
(খ) ভিক্টর হুগো হইতে — সমালোচনী ১৩১০ জ্যৈষ্ঠ
(গ) ভিক্টর হুগো হইতে — সাহিত্য ১৩১৮ পৌষ

Victor Hugo থেকে কবিতার অনুবাদে প্রিয়নাথের আগ্রহ ছিল। একাধিক কবিতার মূল আছে *Les Contemplations* কাব্যে।

২. সাহিত্য ১৩০০ ভাদ্র সঙখ্যায় 'গী দ্য মোপাসাঁ' প্রবন্ধে প্রিয়নাথ লিখেছেন— 'অনুবাদে আমাদের আগ্রহ নাই।..বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবি আশ্চর্য প্রতিভাবলে, অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবির কয়েকটি কবিতার চমত্কার

অনুবাদ করিয়াছেন..কোনটি অনুবাদ, কোনটি মূল, তুমি বলিতে পারিবে না।' একটি পাদটীকায় আছে—'প্রভাতসঙ্গীতে 'তারা ও আঁখি' এবঙ 'সূর্য ও ফুল' দেখ।

উল্লিখিত প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গ অবান্তর। প্রিয়নাথের এই মন্তব্যের পিছনে সমালোচক হিশাবে নিজের সৃষ্টিকেই প্রশঙসা করার ইচ্ছা সক্রিয় কি? অনুমান করা স্বাভাবিক, যে প্রিয়নাথের সঙ্গে মিলিতভাবে রবীন্দ্রনাথ অনুবাদগুলি করেন ; অন্তত প্রিয়নাথ বাঙলা গদ্যে ফরাশির অনুবাদ করেন এবঙ রবীন্দ্রনাথের মূলানুগত্য বজায় রাখেন। সেজন্য রচনাগুলির কৃতিত্ব শুধু রবীন্দ্রনাথের প্রাপ্য নয়, প্রিয়নাথেরও পাওনা। Victor Hugo-র বহু কবিতার—বিশেষত *Les Contemplations* ও *Les Rayons et les Ombres* কাব্যের অনেক কবিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বহু রচনার মিল আশ্চর্য।

রবীন্দ্রনাথের একটি সমালোচনা যৌবনে ফরাশি সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচিতি নির্দেশ করে। সাহিত্য, ১২৯৮ আশ্বিনে প্রমথ চৌধুরি Prosper Merimée-র *Le Vase Etrusque* গল্পটির বাঙলা অনুবাদ 'ফুলদানি' প্রকাশ করলে সাধনা, ১২৯৮ অগ্রহায়ণ সঙখ্যার 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা'য় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'প্রসিদ্ধ লেখক প্রস্পর মেরিমে প্রণীত এই গল্পটি যদিও সুন্দর কিন্তু ইহা বাঙ্গালা অনুবাদের যোগ্য নহে। বর্ণিত ঘটনা ও পাত্রপাত্রীগণ বড় বেশি য়ুরোপীয়—ইহাতে বাঙ্গালী পাঠকের রসাস্বাদনের বড়ই ব্যাঘাত করিবে। এমনকি সামাজিক প্রথার পার্থক্যহেতু মূল ঘটনাটি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ মন্দই বোধ হইতে পারে। বিশেষত মূল গ্রন্থের ভাষামাধুর্য অনুবাদে কখনই রক্ষিত হইতে পারে না, সুতরাঙ রচনার আব্রুটুকু চলিয়া যায়।'

আপত্তির কারণ দুটি—(১) ফরাশি ও বাঙ্গালি সমাজের পার্থক্যের জন্য মূল গল্পটি এদেশে খারাপ মনে হয়। (২) মূলের ভাষামাধুর্য অনুবাদে বজায় রাখা অসম্ভব। সুতরাঙ অনুবাদটি নিন্দনীয়। আলোচনা দরকার। (১) 'বোধ হইতে পারে' অস্পষ্ট। প্রাক্-বিবাহ প্রেম ও প্রেমিকের ঈর্ষার অসামাজিক সম্বন্ধকে নিন্দা করার যুক্তি রবীন্দ্রনাথ মাত্র ৯ বছর পরে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে 'চোখের বালি' ও 'নষ্টনীড়' লেখার সময় মনে রাখেননি। তখন নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'তমস্বিনী' উপন্যাসের আলোচনায় লিখেছেন—'বাঙ্গালা উপন্যাসে তিনি উন্মুক্ত Realism-এর অবতারণা করতে চাচ্ছেন। তাতে আমি কিছুই আপত্তি করিনে। কিন্তু সেটা পারা চাই।'[৩৩] সমালোচনাকে লেখক নিজেই পরে অস্বীকার করেছেন। (২) দ্বিতীয় যুক্তিটির দুটি অর্থ সম্ভব, যেমন—(ক) মূলের ভাষাগত গুণ অনুবাদে বজায় রাখা অসম্ভব বলে অনুবাদকর্ম অনুচিত ; অথবা (খ) আলোচ্য অনুবাদের মূলের ভাষাগত গুণ বজায় নেই। অথচ (ক) এই আলোচনাটির বহু পূর্ব থেকে অনেকদিন পরে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ নিজে সঙস্কৃত, ইঙরাজি, ফরাশি, জার্মান ও ইতালীয় রচনার বাঙলা অনুবাদ করেছেন। এই বক্তব্যের সঙ্গে তাঁর নিজের অনুবাদকর্মের সঙ্গতি নেই বলে মন্তব্যটি তাঁর পক্ষে অসমীচীন। তাছাড়া, অনুবাদের নানা উদ্দেশ্য আছে,—'মূলের ভাষাগত 'গুণ' নির্দেশ করাই তার একমাত্র কাজ নয়। (খ) ১৯০০ খ্রিস্টাব্দেও রবীন্দ্রনাথ ফরাশি ভাষা ভাল জানতেন না। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিশ্চয় মূলের সঙ্গে

মিলিয়ে অনুবাদটি পড়েননি, অথচ তার ভাণ করেছেন।

তাঁর অযৌক্তিক বক্তব্য অগ্রাহ্য। প্রমথ চৌধুরি এই সমালোচনা মেনে নেননি।[৩৪] এই দুর্বল বক্তব্যের কারণ কি? নিজের গল্প-রচনাব তাগিদে রবীন্দ্রনাথ এই সময় প্রচুর বিদেশি গল্প পড়েছেন[৩৫], Merimée-কে 'প্রসিদ্ধ লেখক' বলেছেন, অথচ তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ গল্পের প্রশংসা করতে পারেননি। তিনি কি তখনি Merimée-র আরো গল্প পড়েছেন? পরে তাঁর গল্প-রচনাশৈলীতে Merimée-র প্রভাব বিশেষভাবে স্মরণীয়।

সাহিত্যে অনুকরণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব 'অধ্যাপক' (১৩০৫ ভাদ্র) ও 'দর্পহরণ' (১৩০৯ ফাল্গুন) গল্পদুটি থেকে জানা যায়। দুটি গল্প নায়কের মুখে বলা, দুজন নায়ক নিজেকে ব্যঙ্গ করছে, দুজনে সাহিত্যখ্যাতি প্রত্যাশী, এবঙ কেউ মৌলিক সৃষ্টিক্ষমতার অধিকারী নয়। 'অধ্যাপক'-এ মহীন্দ্রকুমারের প্রবন্ধপাঠের পর বামাচরণ 'বুঝাইয়া দিলেন যে, আমেরিকার সুবিখ্যাত লাউয়েল সাহেবের প্রবন্ধ হইতে আমার প্রবন্ধের যে অঙশ চুরি সে-অঙশ অতি চমত্কার, এবঙ যে-অঙশ আমার সম্পূর্ণ নিজের সেটুকু পরিত্যাগ করিলেই ভালো হইত। তিনি যদি বলিতেন, লাউয়েল সাহেবের সহিত নবীন প্রবন্ধলেখকের মতের এমনকি ভাষারও অবিকল ঐক্য দেখা যাইতেছে, তাহা হইলে তাঁহার কথাটা সত্যও হইত অথচ অপ্রিয়ও হইত না।' তার নাটক সম্বন্ধে সমালোচকের 'আমার এই নাটকের অনেকগুলি দৃশ্য এবঙ মূল ভাবটি গেটে-রচিত টাসো নাটকের অনুকরণ, এমন কি অনেক স্থলে অনুবাদ', বক্তব্যে লেখকের মনে হয়েছে 'সাহিত্যরাজ্যে চুরি বিদ্যা বড়ো বিদ্যা, এমন কি ধরা পড়িলেও।' এই ব্যঙ্গ স্পষ্ট। 'দর্পহরণে'র গল্পকার হরিশ বলেছে—'ইঙরেজি গল্পের বই দেদার পড়িতে লাগিলাম। অনেকগুলা ভাঙিয়া-চুরিয়া একটা প্লট দাঁড় করাইলাম। প্লটটা খুবই চমত্কার হইয়াছিল, কিন্তু মুশকিল এই হইল, বাঙলা-সমাজে সে-সকল ঘটনা কোনো অবস্থাতেই ঘটিতে পারে না। অতি প্রাচীনকালের পাঞ্জাবের সীমান্তদেশে গল্পের ভিত্তি ফাঁদিলাম. ।' এখানেও চৌর্যবৃত্তিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে এবঙ মূল থেকে সামান্য পরিবর্তন মৌলিক সৃষ্টি হিশাবে গুরুত্ব পায়নি। এগুলি কি গল্পকারের প্রতিচ্ছবি? মহীন্দ্রের মত রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন চন্দননগরের গঙ্গাতীরে সাহিত্যচর্চা করেছেন,[৩৬] প্রচুর য়ুরোপীয় ছোটগল্প পড়েছেন এবঙ 'ভিখারিণী' গল্পে প্রাচীন কাশ্মীরের পটভূমিতে একটি ফরাশি উপন্যাসের কাহিনী পরিবেশন করেছেন। এগুলির উপস্থিতি তাঁর নিজের যুক্তিতে অপ্রশঙসনীয়।

Rousseau-র ভাবশিষ্য Bernardin de Saint-Pierre (১৭৩৭-১৮১৪) ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে *Etudes de la Nature*-এর চতুর্থ খণ্ডে *Paul et Virginie* নামে যে ছোট উপন্যাস প্রকাশ করেন তার একাধিক বাঙলা অনুবাদের মধ্যে 'অবোধবন্ধু' পত্রে ১২৭৫--৭৬ শনে প্রকাশিত ফরাশি থেকে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মূলানুগ অনুবাদ 'পৌলভর্জিনী' বালক রবীন্দ্রনাথের মনকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল 'জীবনস্মৃতি'তে তার পরিচয় আছে।[৩৭] ফরাশি কাহিনী এই : মরিশাস দ্বীপের সমুদ্রবেষ্টিত পার্বত্য উপত্যকায় Paul ও Virginie নামে দুটি পিতৃহীন সরল শিশু পরস্পরকে ও প্রকৃতিকে ভালবেসে বড়

হয়ে ওঠে। পরে পারিতে ধনী আত্মীয়ার কাছে শিক্ষালাভের জন্য গিয়ে কঠোর সমাজপরিবেশে Virginie দুঃখ পেয়ে ফিরবার পথে জাহাজডুবিতে মারা পড়ল। ভগ্নহৃদয় Paulও দুমাস পরে মারা গেল। গ্রন্থকারের বক্তব্য, বিশ্বকর্তার সৃষ্টিতে সবই সুন্দর—প্রকৃতি মধুর, প্রেম মনোহর। মানুষের হাতে সবই বিকৃত হয়ে যায়।

এই ভাব এবঙ কাহিনী তরুণ রবীন্দ্রনাথের অন্তত দুটি রচনায় অনুসৃত হয়েছে :

১। ভিখারিণী (ছোটগল্প)—ভারতী, ১২৮৪ শ্রাবণ-ভাদ্র

২। বনফুল (কাহিনীকাব্য)—জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব, ১৮৭৮

'ভিখারিণী'র অমরসিংহ ও কমলদেবী সমাজের বাইরে কাশ্মীরে পার্বত্য উপত্যকায় নিজেদের প্রেম ও প্রকৃতির শোভায় আনন্দে দিন কাটাত। পিতার আদেশে বিয়ের পূর্বে অমর যুদ্ধযাত্রা করল, এবঙ মোহনলালের সঙ্গে কমলদেবীর বিয়ে হল। দুঃখাহত দুজনের দেখা হল কমলদেবীর মৃত্যুশয্যায়। 'বনফুলে' কমলা-নীরদের প্রণয় মুখ্য বিষয়। কমলার স্বামী বিজয়ের আঘাতে নীরদের মৃত্যু হলে শোকাহত কমলাও মারা গেল। উভয়ত্র ঘটনাস্থল মানবসমাজের বাইরে হ্রদ বা নদীর ধারে পার্বত্য প্রকৃতির মধ্যে, এবঙ প্রধান চরিত্র দুটি অনাথ ও নিষ্কলুষ কিশোর-কিশোরী যারা নিজেদের ও প্রকৃতির প্রেমে মুগ্ধ। কাহিনীর শেষে একের মৃত্যু ও অপরের শোক বা মৃত্যু ঘটেছে। শুভ্র প্রকৃতিপ্রেম ও পঙ্কিল মানবসমাজের আঘাত দুটি রচনাতেই বর্তমান।[৩৮] রচনাদুটি ভাবের এবঙ কাহিনী-বিন্যাসের দিক থেকে ফরাশি উপন্যাসটির অনুসরণ করেছে। সামান্য পার্থক্য 'ভিখারিণী'তে নায়িকার পরিবর্তে নায়কের বিদেশযাত্রা, 'বনফুলে' নায়কের প্রথমে মৃত্যু এবঙ উভয়ত্র নায়িকার বিয়ে, *Paul et Virginie*-তে যার আভাস মাত্র ছিল। 'ভিখারিণী'তে ডাকাতদের অত্যাচার দাসব্যবসায়ীদের ভয়ে ভীত Paul ও Virginie-কে মনে করায়।

বালক, ১২৯২ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সঙখ্যায় প্রকাশিত 'মুকুট' গল্পের অঙশবিশেষের সঙ্গে একটি ফরাশি নাটকের মিল যথেষ্ট। François Coppée-র (১৮৪২-১৯০৪) *Le Luthier de Crémone* (১৮৭৬) নামে একাঙ্ক কাব্যনাট্যের কাহিনী রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোনো ফরাশিবিদ্ বন্ধুর কাছে শোনেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য—(ক) কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথের Coppée-র রচনা পড়ার প্রমাণ পূর্বে আছে। (খ) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ Coppée-র বহু নাটক, গল্প ও কবিতার অনুবাদ করেছিলেন।[৩৯] ফরাশি নাটকটির কাহিনীর সঙক্ষিপ্তসার এরূপ : Crémone Taddeo Ferrari তাঁর শিষ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাদ্যযন্ত্রনির্মাতার সঙ্গে তাঁর মেয়ে Giannina-র বিয়ে ও তাঁর সম্পত্তি দেবেন, স্থির করেন। Giannina ভালবাসে Sandro-কে, কিন্তু কুঁজো Filippo নিপুণতর যন্ত্রনির্মাতা ও সঙ্গীতশিল্পী। Filippo পূর্বে Ferrari-র তালাবন্ধ ঘর থেকে নির্মীয়মাণ যন্ত্রের জন্য শ্রেষ্ঠ বার্নিশ চুরি করেছিল। সে তার সার্থকতার সম্ভাবনা এবঙ Sandro-র ঈর্ষা জানে। Giannina-র কাছে নতুন যন্ত্র বাজিয়ে সে দক্ষতার পরিচয় দিলে যখন মেয়েটি প্রেমের ব্যর্থতার আশঙ্কায় কাঁদে, তখন সে তার সঙ্গীতের মনোহারিত্বে মুগ্ধ।

পরে সব জানতে পেরে তাদের অজ্ঞাতে তাদেব সুখের জন্য দয়ার্দ্র Filippo এক সুযোগে বাক্স ঠিক রেখে তাদের বেহালা-বদল করে। পরদিন বিচারকদের কাছে বাক্সদুটি নিয়ে যাবার সুযোগে Sandro জয়ী হবার জন্য বেহালা বদল করে, পরে Filippo-র ক্ষমাপ্রার্থী হয়, এবঙ পূর্বের বদলের কথা জানতে পারে। ইতিমধ্যে বিজয়ী ঘোষিত হলে Filppo পূর্বপরিকল্পনামত পুরস্কার নিয়ে তা Sandro-কে দান করে, এবঙ বিদেশ-যাত্রার সঙ্কল্প জানায়।

'মুকুটে'র দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে তিন রাজকুমারের ধনুর্বিদ্যা পরীক্ষার কাহিনীতে চন্দ্রনারায়ণের স্থান গৌণ, অন্য দুজনের প্রতিযোগিতা মুখ্য। রাজধরের তীর চুরির বিষয়টি এই কাহিনীতে অত্যন্ত গুরু। বাক্স ঠিক রেখে বেহালা-বদল ও তূণ ঠিক রেখে তীর-বদল, তালাবন্ধ ঘর থেকে বার্নিশ চুরি ও তীর চুরি, প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে পরাজিতকে পুরস্কার দান, এবঙ Sandro ও রাজধরের নীচতায় দুটি কাহিনী সমান্তরাল। বাঙলা গল্পে ফরাশি নাটকের কাহিনীটি অনুসৃত হয়েছে। বাঙলা গল্পটি দ্বিধাবিভক্ত, কারণ পরের কাহিনী মোটামুটি ঐতিহাসিক ভিত্তিতে রচিত, পূর্বের অঙশ কাল্পনিক, এবঙ শেষাঙশ ও প্রথমাঙশের মধ্যে আবশ্যিক যোগাযোগ নেই। দ্বিতীয়াঙশে অপেক্ষাকৃত গুরু বলে প্রথমাঙশেও চন্দ্রনারায়ণের স্থান আছে ; ফরাশিতে মাত্র দুজন প্রতিযোগী ছিল বলে এখানে তার ভূমিকা অত্যন্ত সঙক্ষিপ্ত। দুটি বিচ্ছিন্ন কাহিনী এখানে যুক্ত। দ্বিতীয় কাহিনী ঐতিহাসিক, এবঙ প্রথমটি ফরাশির অনুকরণজাত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'এমন কর্ম আর করব না' প্রহসন ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এবঙ প্রায় বিশ বছর পরে 'অলীকবাবু' নামে প্রচারিত হয়। Molière-এর *L'Étourdi* ও *Les Precieuses Ridicules* নাটকদুটি ভেঙে ওই আপাতমৌলিক রচনা লেখা। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—'অলীকবাবু জ্যোতিকাকামশায়ের লেখা..অত তো পাকা লিখিয়ে ছিলেন, কিন্তু ফরাশি ছায়া থেকে মুক্ত হতে পারেন নি।..রবিকাকা তো অনেক অদলবদল করে দিয়ে তা ফরাশি গন্ধ থেকে মুক্ত করলেন। এখানেই হল রবিকাকার আর্ট। আর করলেন কী হেমাঙ্গিনীর প্রার্থীর সঙখ্যা বাড়িয়ে দিলেন।..রবিকাকা সেখানে অনেকগুলো লোক এনে ফেললেন।'[৪০] তাছাড়া দুটি স্বরচিত গান ঢোকালেন। রবীন্দ্রনাথ বিদেশি বিষয়বস্তুকে আপাতদৃষ্টিতে মূল থেকে পৃথক করে ফেলার কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন।

'মালিনী'র (প্রথম প্রকাশ ১৮৯৬, স্বতন্ত্র গ্রন্থনা ১৯১২) কাহিনী যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* গ্রন্থের একটি কাহিনী থেকে সামান্য পরিবর্তিত, তা রবীন্দ্রনাথ লেখেননি। গ্রন্থের 'সূচনা'য় জানিয়েছেন—'মালিনী নাটিকার উত্পত্তির একটা বিশেষ ইতিহাস আছে, সে স্বপ্নঘটিত।' এবঙ 'অবশেষে এই স্বপ্নের স্মৃতি নাটিকার আকার নিয়ে শান্ত হল।' সন্দেহ দূর করতে তিনি 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' ও 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র সঙ্গে নাটকটির মিলের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ঋণ-গোপন। সঙস্কৃত 'কুনাবদান' কাব্য থেকে 'রাজা'র (১৯১০) কাহিনী গ্রহণের

বৃত্তান্তও রবীন্দ্রনাথ লেখেননি।

স্বপ্ন সর্বদা রবীন্দ্রনাথকে ঋণমুক্ত করতে সাহায্য করেছে। অন্য নিদর্শন 'রাজর্ষি' (গ্রন্থনা ১৮৮৭)। 'জীবনস্মৃতি'তে (১৯১২) আছে—'গল্প ভাবিবার ব্যর্থ চেষ্টার টানে গল্প আসিল না, ঘুম আসিয়া পড়িল। স্বপ্নে দেখিলাম..জাগিয়া উঠিয়াই মনে হইল, এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প।..এমন স্বপ্নে-পাওয়া গল্প এবঙ অন্য লেখা আমার আরও আছে। এই স্বপ্নটির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের পুরাবৃত্ত মিশাইয়া রাজর্ষি গল্প মাসে মাসে বালকে বাহির করিতে লাগিলাম।' উপন্যাসটির আধুনিক সঙস্করণের 'সূচনা'তে 'স্বপ্নে দেখলুম'-এর পরে আছে—'এই স্বপ্নের বিবরণ 'জীবনস্মৃতি'তে পূর্বেই লিখেছি, পুনরুক্তি করতে হল।' 'মালিনী' ও 'জীবনস্মৃতির' গ্রন্থনা ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে। আগে 'কাব্যগ্রন্থাবলি'তে 'মালিনী'র কোন 'সূচনা' ছিল না, এবঙ 'রাজর্ষি'র 'সূচনা'র জন্ম ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের পরে। অনুমেয়, ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে স্বপ্নের প্ল্যান রবীন্দ্রনাথের মাথায় এসেছিল। 'মালিনী' বা 'রাজর্ষি'র স্বপ্নাদ্য উত্পত্তি অবিশ্বাসযোগ্য। 'রাজর্ষি'র উত্স স্বপ্ন নয়,—ফরাশি বিপ্লবের পটভূমিতে Victor Hugo-র লেখা *Quatre-Vingt-Treize* (১৮৭৩) উপন্যাস। দুয়ের গঠনগত সাদৃশ্যে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ স্পষ্ট। প্রসঙ্গত 'অলীকবাবু'তে রবীন্দ্রনাথের পরিবর্তন-কুশলতা এবঙ তার উদ্দেশ্য মনে রাখা প্রয়োজন।

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় কথাসাহিত্য রচনার পদ্ধতি সম্বন্ধে উপদেশ চাইলে 'রবীন্দ্রনাথ বললেন সেরা বিদেশি উপন্যাস বাঙলায় অনুবাদ করতে। লাইন ধরে অনুবাদ নয়..বিদেশি উপন্যাস পড়ে মূল কাহিনীটিকে নিজের ভাষায় বেশ সাবলীল ভঙ্গীতে লিখতে হবে। বিদেশি উপন্যাসের মধ্যে যে-সব ঘটনা বা চরিত্রাদি আমাদের দেশের পাঠকসমাজ ঠিক উপলব্ধি করতে পারবে না, তা বাদ দিলেও দোষ হবে না।'[৪১] তখন সৌরীন্দ্রমোহন Hugo থেকে 'বন্দী' এবঙ Daudet-র রচনা অবলম্বনে 'মাতৃঋণ' ও 'নবাব' লেখেন। মণিলাল ও সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ যথাক্রমে 'ভাগ্যচক্র' ও 'জন্মদুঃখী'। উপদেশটি রবীন্দ্রনাথের নিজের রীতির আভাস দেয় কি?

Quatre-Vingt-Treize উপন্যাসের[৪২] তৃতীয় খন্ড *En Vendée* থেকে 'রাজর্ষি'র কাহিনী গৃহীত। 'বালক' পত্রে ১২৯২ আষাঢ় থেকে মাঘ সঙখ্যায় 'রাজর্ষি'র প্রথম ২৬টি পরিচ্ছেদ প্রকাশিত এবঙ পরের অঙশ গ্রন্থনার সময় যুক্ত হয়। ফরাশি উপন্যাসের প্রধান তিনটি চরিত্র অভিজাত বৃদ্ধ Lantenac, পূর্বজীবনে পাদরি Cimourdain ও যুবক Gauvain, Lantenac ও Cimourdain ছিলেন যথাক্রমে royalist ও republican। Lantenac পরিবারের বঙশধর ও Cimourdain-র শিষ্য Gauvain নব্যপন্থী। দুজনের প্রতি আকর্ষণে Gauvain চঞ্চল ; ফলে শেষে তাঁর মৃত্যু হল—তা-ও Cimourdain-র বিচারে। René-Jean, Gros Alain ও Georgette এই তিনটি শিশুর উপস্থিতি Lantenac-কে প্রভাবিত করে কাহিনীর মোড় ফিরিয়েছে। Gauvain-র বিপরীতমুখী দুটি আকর্ষণ নিয়ে দুটি স্বতন্ত্র চরিত্র গঠন করলে ফরাশি ও বাঙলা উপন্যাস-

-দুটির চরিত্র প্রধান চরিত্রগুলির সম্বন্ধের ছক হবে নিচের মত।

Quatre-vingt-treize			রাজর্ষি		
René-Jean, Gros Alain & Georgette			হাসি ও তাতা		
+			+		
Cimourdain— x —Lantenac			রঘুপতি — x — গোবিন্দমাণিক্য		
: :		: :	: :		: :
=	Gauvain I	x	=	নক্ষত্ররায়	x
:		:	:		:
?	Gauvain II	=	?	জয়সিংহ	=

(ব্যবহৃত চিহ্নগুলির অর্থ : '+' সমদলভুক্তি ও প্রভাববিস্তার ; 'x' বিরোধ ; '=' সহানুভূতি ; '?' বিপরীতমুখী মনোভাব।)

Cimourdain ও Lantenac যথাক্রমে রঘুপতি ও গোবিন্দমাণিক্য হয়েছেন এবঙ Gauvain-র চরিত্র ভেঙ্গে নক্ষত্ররায় ও জয়সিঙহের সৃষ্টি । 'রাজর্ষি'র হাসি ও তাতা ফরাশি উপন্যাসের René-Jean, Gros Alain ও Georgette-এর স্থান নিয়েছে। Lantenac রাজবঙশীয়, গোবিন্দমাণিক্য রাজা; Gauvainও রাজবঙশীয় বলে জয়সিঙহের দেহে রাজরক্ত আছে ; Cimourdain পূর্বজীবনে ধর্মপ্রচারক এবঙ রঘুপতি রাজপুরোহিত। কর্তব্যচ্যুতির জন্য Cimourdain-র বিচারে Gauvain-র মৃত্যুদন্ড হয়েছে ; ফরাশি উপন্যাসটি Gauvain-র মৃত্যু ও তার অব্যবহিত পরে Cimourdain-র আত্মহত্যায় সমাপ্ত। জয়সিঙহের মৃত্যুতে শোকাহত রঘুপতির দেশত্যাগে বাঙলা উপন্যাসের মূল কাহিনীর সমাপ্তি ঘটেছে। কাহিনীর গঠন ও চরিত্রসৃষ্টিতে 'রাজর্ষি' *Quatre-vingt-treize* উপন্যাসের হুবহু প্রতিলিপি।

জয়সিঙহের মৃত্যুর পরে বাঙলা উপন্যাসের কাহিনী আরো অগ্রসর হয়েছে, যদিও প্রকৃত দ্বন্দ্ব এবঙ ফরাশির অনুসরণ ১৫শ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। অনেক পরে লেখা 'সূচনা'য় আছে : 'বস্তুত উপন্যাসটি সমাপ্ত হয়েছে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে। ফসল-ক্ষেতের যেখানে কিনারা সেদিকটাতে চাষ পড়েনি, আগাছায় জঙ্গাল হয়ে উঠেছে। সাময়িক পত্রের অবিবেচনায় প্রায়ই লেখনীর জাত নষ্ট হয়। বিশেষ যেখানে শিশু পাঠকই লক্ষ্য সেখানে বাজে বাচালতার সঙ্কোচ থাকে না।' ১৫শ পরিচ্ছেদের পরে অসঙযমের কারণ, রবীন্দ্রনাথের কথায় 'বালক' পত্র ও শিশু পাঠক। প্রকৃত কারণ হল ফরাশি উপন্যাসের অনুকরণকে চাপা দেওয়া, যেহেতু অসঙ্যত রচনার অধিকাঙশ পত্রে প্রকাশিত নয়, স্বতন্ত্র গ্রন্থে প্রথম মুদ্রিত। 'মুকুটে'র মত এখানে ঐতিহাসিক কাহিনী শেষদিকে গুরুত্ব পেয়েছে, প্রথমে নয়। ২৩শে বৈশাখ ১২৯৩ তারিখে ত্রিপুরারাজকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস জানতে চেয়েছেন। উপন্যাস-রচনা তখন সমাপ্তির মুখে। কৈলাসচন্দ্র সিঙহের 'ত্রিপুরার ইতিহাস' থেকে উপন্যাসের উপসঙহারে উদ্ধৃতি আছে। ঐ গ্রন্থটি ১২৯২ শনের পরে প্রকাশিত।

ফরাশির সঙ্গে তুলনায় উপন্যাসের অসঙযমটুকু মৌলিক। তবে এখানেও ফরাশির ছাপ মুছে যায়নি। বিজয়গড় La Tourgue-কে মনে আনে। উভয়ত্র গোপন সুরঙ্গপথে আক্রান্ত ব্যক্তি দুর্গ থেকে পালিয়েছে। খুড়াসাহেব ও Halmalo-র চরিত্রে কিছু সাদৃশ্য আছে--অন্তত সুরঙ্গপথেব প্রসঙ্গে। চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে মুক্তির পূর্বে বন্দী সা সুজার আলবোলার কথা বন্দী Lantenac-এর নস্যিদানির কথা অনুসারে তৈরি। সা সুজাকে রঘুপতির মুক্তিদান গোপনপথে Lantenac-কে Gauvain-র মুক্তিদানের অনুরূপ। এসব মিল এবঙ 'সূচনা'তে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের প্রসঙ্গ নির্দেশ করে, যে ববীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল এই অনুকবণ সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন।

পরে এই কাহিনী নিয়ে লেখা 'বিসর্জন' (১৮৯০) নাটকে 'রাজর্ষি'র ১৯শ থেকে ৩৯শ, এবঙ ৪১শ থেকে ৪৪শ পরিচ্ছেদগুলি বর্জিত হওয়ায় ফরাশি উপন্যাসের সঙযম ও নাট্যগুণ এখানে অনেকখানি বজায় আছে। ফরাশি উপন্যাসের দ্বন্দ্ব ও সমাপ্তি এখানে অব্যাহত। অপর্ণা, গুণবতী, চাঁদপাল ও নয়নরায় প্রভৃতি নতুন চরিত্রের সৃষ্টি করে লেখক মৌলিক হবার চেষ্টা করলেও উল্লিখিত কারণে 'বিসর্জনে'র নাট্যগুণ ও কবিত্ব রবীন্দ্রনাথের নয়--Victor Hugo-র।

'বালকে' ১২৯২ জ্যৈষ্ঠ থেকে রবীন্দ্রনাথের ছোট ছোট হাস্যরসাত্মক 'হেঁয়ালি নাট্য' প্রতি মাসে প্রকাশিত, এবঙ পার্ক স্ট্রিটে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে পরে অভিনীত হত।[৪৫] 'বালক' এবঙ 'ভারতী ও বালক' পত্রদুটি থেকে এরূপ রচনাগুলি 'হাস্যকৌতুক' (১৯০৭) গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। সাময়িক পত্রে প্রথম রচনাব (বর্তমান নাম 'রোগের চিকিত্সা') ভূমিকায় ছিল : 'ইঙরেজদের শারাড্ নামে একপ্রকার খেলা আছে আমরা বাঙ্গালায় তাহাকে হেঁয়ালি নাট্য বলিলাম। তাহার মর্মটা বলিয়া দিই। দুই তিন জন লোকে ষড়যন্ত্র করিয়া এমন একটা কথা বাহির করিতে হইবে যাহা দুই তিন ভাগে ভাঙ্গিয়া ফেলা যাইতে পারে। প্রত্যেক ভাগের একটা অর্থ থাকা চাই। মনে কর 'পাগোল' শব্দ। এই শব্দকে পা এবঙ গোল এই দুই ভাগে ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগের একটা অর্থ পাওয়া যায়। তারপর উপস্থিতমত মুখে মুখে একটা নাটক বানাইয়া লইতে হইবে ; সেই নাটকের মধ্যে কোন স্থানে কথায় কথায় পা শব্দ এবঙ গোল শব্দ, এবঙ পাগল শব্দের ব্যবহার করিতে হইবে, পরে শ্রোতারা আন্দাজ করিয়া বলিয়া দিবেন কোন্ শব্দ অবলম্বন করিয়া এই নাট্যাভিনয় করা হইল।' রবীন্দ্রনাথ হয়ত ইঙরাজিতে charade-এর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, তবে এরূপ রচনা মূলে ফরাশি। ফরাশিতে charade প্রায়ই কবিতা, কদাচিত্ ছোট নাটিকা (অর্থাত্ charade en action)। রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা charade en action-র সঙ্গে হুবহু এক। 'হাস্যকৌতুকে'র ভূমিকায় নতুন করে লেখা হয়েছে—'য়ুরোপে শারাড (charade) নামক এক-প্রকার নাট্য-খেলা প্রচলিত আছে, কতকটা তাহারই অনুকরণে এগুলি লেখা হয়।..আশাকরি সেই হেঁয়ালির সন্ধান করিতে বর্তমান পাঠকগণ অনাবশ্যক কষ্ট স্বীকার করিবেন না।' এখানে 'ইঙরেজদের'-এর পরিবর্তে 'য়ুরোপে' এবঙ 'অনুকরণে' শব্দগুলির ব্যবহার

লক্ষণীয়। হেঁয়ালির উত্তরগুলি গ্রন্থিত হয়নি, তবে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হত, যেমন রোগের চিকিত্সা, ছাত্রের পরীক্ষা, অভ্যর্থনা নামের লেখাগুলির উত্তর ছিল যথাক্রমে হাসপাতাল, মারপিট ও আগুন। এগুলির রচনাপদ্ধতিতে ফরাশি থেকে অনুকরণ আছে।

ফরাশি থেকে কবিতার দুটি গঠন সনেট ও রঁদো (rondeau) রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় গ্রহণ করেছিলেন। 'কড়ি ও কোমলে'র 'হাসি' ও 'চরণ' সনেটের নবম-দশম চরণদুটি সমিল। তখনকার প্রথাবদ্ধ ফরাশি রীতিতে ষট্‌ক সর্বদা দুটি ত্রিপদিকার সমন্বয়: যদিও তার প্রথম দুটি চরণ সমিল, তবু তা কখনো একটি স্বতন্ত্র দ্বিপদিকার সৃষ্টি করে না। 'চরণে' ফরাশি রীতি বজায় আছে, কিন্তু 'হাসি' তে ষট্‌ক একটি দ্বিপদিকা ও একটি চতুষ্পদিকার সমন্বয় বলে এই গঠনটি ফরাশি রীতির অনুগামী নয়। তাছাড়া ফরাশি সনেটের অষ্টকে দুটিমাত্র মিল ব্যবহৃত হয়, বাঙলা সনেট দুটিতে তিনটি মিলের ব্যবহার আছে। রবীন্দ্রনাথ ফরাশি রীতিকে কিছু পরিবর্তিত করে বাঙলায় গ্রহণ করেছিলেন।

Clément Marot, Vincent Voiture, Alfred de Musset প্রভৃতি কবিরা ফরাশি কবিতায় যে rondeau-কে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা তিনটি স্তবকে ১৫টি (=৪+৫+৬) চরণে ও দুটি মিলে গঠিত। কবিতার আরম্ভে থাকে ছোট্ট ধুয়া (refrain) যা দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকের শেষে পুনরাবৃত্ত হয়, মাঝে থাকে তার ব্যাখ্যা। কবিতাগুলির ভাব প্রায়ই হাল্কা। রবীন্দ্রনাথ 'গীতালি'র (১৯১৪) অনেক কবিতায় এই গঠনটিকে অনুসরণ করেছেন। উনিশ শতকের শেষদিকে ইঙলন্ডের Yellow Book Group-এর কবিরা বিশেষত Austin Dobson (১৮৪০-১৯২১) বহু ফরাশি গঠনের ব্যবহার করেন, এবঙ রবীন্দ্রনাথ তাঁদের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।[৪৪] 'গীতালি'র ৮, ৩৯, ৫২ সঙখ্যক ও অন্যান্য বহু কবিতায় rondeau-র সামান্য পরিবর্তিত রূপ লক্ষণীয়। কবিতাগুলির গঠন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাও rondeau-কে স্মরণ করায়,[৪৫] যদিও তাঁর মতে মিলটি আকস্মিক, যেমন আকস্মিক ছিল 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্যে ইঙরাজি গ্রাম্যগাথার সঙ্গে মিল![৪৬] 'আকস্মিকে'র পরিমাণ বেড়ে গেলে তার নামও বদলায়।

'মানসী' কাব্যের 'নারীর উক্তি'তে (রচনা ১৮৮৭) নারী পুরুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে, যে গৃহিণী হবার পরে পুরুষের হৃদয়ে তার স্থান নেই। পূর্বে সে ছিল বাঞ্ছিতা ; বিরহের শেষে মিলনব্যাকুলতা, শরতে প্রেমের আকর্ষণ—সবই তার চিহ্ন। এখন কেবল বাইরের সোহাগ অবশিষ্ট আছে ; তাই কি যথেষ্ট? হৃদয়হীন প্রেমবিলাসে নারী তৃপ্ত নয়।

কবিতাটির উত্স Francois Coppée-র *Les Récits et les Elégies* (১৮৭৮) কাব্যের L'Exilée অঙশে Réponse নামের সনেট, যার অনুবাদ এরূপ : তুমি সেদিন বলেছিলে, 'কিন্তু তাকে আমি এত সামান্য দেখেছি!' আর আমি? আমি কি তোমাকে খুব বেশি দেখেছি? আমার সমস্ত হৃদয় এক মুহূর্তেই তোমাকে দিয়েছি ; তুমি কি আমাকে এমন করে ভালবাসতে পার না? ডানার এক ঝাপটায় প্রাসাদশিখরে উঠে

যেতে ঈগলের কতক্ষণ লাগে? আসন্ন ঝড়ের মেঘে কালো দিগন্তকে উদ্ভাসিত করতে আলোর, এবঙ আমাদের মুগ্ধ করতে প্রেমের কতক্ষণ লাগে? অল্প দেখাতেই তুমি আমাকে মুগ্ধ করেছ, এবঙ অন্ধকার ভবিষ্যত্‌কে অগ্রাহ্য করে আমি তোমার জন্য জীবন উত্‌সর্গ করেছি। ভালোবাসার জন্য এতো জানার দরকার কি? যে আগুন হৃদয়ে আছে তাকে রাখার জন্য তোমার একটি দৃষ্টিই কি যথেষ্ট নয়?

কবিতাদুটিতে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই, কারণ নারীর প্রশ্নটি উভয়ত্র এক—তার ভালবাসা গভীর, পুরুষের আকর্ষণ এত লঘু ও স্বল্পজীবী কেন? বিবাহপূর্ব ও বিবাহোত্তর জীবনের তুলনা এবঙ দেশি বিষয়ের অবতারণা করে বাঙলায় মৌলিকত্ব সৃষ্টির প্রয়াস আছে। তবু মূল প্রশ্নে বিষয় ও উত্থাপনরীতির মিল লক্ষণীয়।

Puisque, pour allumer le feu qui me penêtre
Chère ame, un seul regard de vos yeux a suffi ?
মনে কি করেছ বঁধু, ও হাসি এতই মধু
প্রেম না দিলেও চলে শুধু হাসি দিলে।

Coppée-র ছোট্ট কাব্যনাট্য *Le Passant* (১৮৬৯) বাঙলাদেশে আদৃত হয়েছিল।[৪৭] সুন্দরী Silvia রূপজীবিনী ও ঐশ্বর্যশালিনী ; তার বৃত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ সঙ্গীতশিল্পী নিরাশ্রয় যুবক Zanetto আশ্রয় ও গুণগ্রাহিতার জন্য তার কাছে আসার পথে দুজনের দেখা এক বাগানে,—তখনো তারা পরস্পরকে চেনে না। দুজনে পরস্পরের গুণে মুগ্ধ। আশ্রয়লাভ ও সঙ্গীতনিবেদনের আশায় যুবক সেখানে থাকতে চায়। Silviaও মনে মনে তা কামনা করে, কিন্তু নিজের বৃত্তির সঙ্কোচে সে আবেদন প্রত্যাখ্যান করল। বৃত্তি নয়, সৌন্দর্য ও গুণগ্রাহিতাই Silvia-র বৈশিষ্ট্য।

'চিত্রা' কাব্যের 'আবেদনে'র (রচনা ১৮৯৫) মালাকর যে শিল্পীর রূপান্তর তা বলা বাহুল্য। Silvia ও Zanetto-র বদলে রাণী ও ভৃত্য বসালেই *Le Passant* 'আবেদন' হয়,—খুব বেশি পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। ফরাশির এই কথোপকথন :

Zanetto.—Quoi ! pas un écuyer ?
Silvia.— Non.
Zanetto.—Pas même de page ?
Silvia.— Non.

রাণী-ভৃত্য সম্বন্ধের অনুরূপ। মহাভারতের কাহিনীর সঙ্গে 'বিদায়-অভিশাপে'র যে পার্থক্য আলোচ্য রচনা দুটির উপসঙহারের পার্থক্য তার বেশি নয়।

'চিত্রা' কাব্যের '১৪০০ সাল' (রচনা ১৮৯৬) কবিতায় কবি কল্পনা করেছেন, যে শতবর্ষ পরের পাঠক তাঁর কাব্যে আনন্দ পাচ্ছেন। ঋতুচক্রের আবর্তনে কবি যে সুখ-দুঃখ অনুভব করছেন শতবর্ষ পরেও তার প্রবাহ অব্যাহত থাকবে। দূর ভবিষ্যতের যে পাঠক--পাঠিকাকে কবি অনুরাগ জানাতে বা তাঁর আনন্দের ভাগ দিতে পারলেন না, তাদের কাছে তিনি আনন্দ-অভিবাদন পাঠালেন, যাতে তাঁর আনন্দ কাব্যের মধ্য দিয়ে তাদের

মনে ধ্বনিত হয়।

Coppée-র *Promenades et Intérieurs* কাব্যে ১০ চরণে তৈরি স্তবকের ৩৯টি কবিতা আছে। প্রথম ও শেষ কবিতা দুটি পাঠকদের লক্ষ্য করে লেখা। যুগ্মভাবে পড়লে তাদের সঙ্গে বাঙলা কবিতাটির ভাবের অবিকল সাদৃশ্য দেখা যাবে। ফরাশি কবিতা দুটির বাঙলা অনুবাদ এরূপ : 'পাঠক, তোমাদের জন্য লেখা এই কবিতাগুলিতে তুচ্ছ মুহূর্তগুলি মূর্ত হয়েছে। হে ক্ষমাশীল করুণ-মধুর পাঠক, তোমাদের কাছে শীত--বসন্ত ও দুঃখ-সুখের আবর্তন তোমাদের দ্রুত মনে হয় : তোমাদের জন্য এই কবিতা। যাত্রাপথে বন্ধুর অধিকারে আমি তোমাদের বলছি, এই কবিতাগুলিতে সাধারণ স্মৃতি, আলোর মুহূর্ত ও মনের ভাব ধরে রেখেছি। সহজে শুধু আনন্দের আকর্ষণে এদের জন্ম। ছোট্ট ফুলগুলিকে ধরে না রাখলেই বোধহয় ভাল হত, কারণ এগুলি যেসব মুহূর্তের প্রতিচ্ছবি তা আমাকেই মুগ্ধ করেছিল। তারা কি তোমাদের মনোহর হবে?

আমার আনন্দে তৈরি কবিতাগুলি আমারই মত স্বপ্নমুগ্ধ। পাঠক, তুমি কি আমায় অবহেলা করে পড়ছ!'

দুটি কবিতায় ভবিষ্যতের পাঠককে সম্বোধন করে কবিতার অবতারণা, জীবনের সাধারণ সুখ-দুঃখের ছাপ রাখার চেষ্টা এবঙ রচনাগুলির দীর্ঘজীবনের আশা বর্তমান। ফরাশি কবি সন্দেহে দোলায়িত, বাঙ্গালি কবি অপেক্ষাকৃত সবল। ফরাশি রচনাটিকে আদর্শ করে বাঙলা কবিতা লিখলে যে পার্থক্য অনুকারকের স্বভাবের জন্যই অবশ্যম্ভাবী এটুকু পার্থক্য তার বেশি নয়। প্রকৃতি বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের মৌলিকত্ব স্পষ্ট হলেও কবিতার শেষে রচনার রীতিগত মিল দুর্লক্ষ্য নয়।

'বলাকা'র গতিবাদের সঙ্গে Henri Bergson-র *Évolution Créatrice*-এর গতিতত্ত্বের মিল বর্তমানে পরিচিত। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নীরবতার অর্থ সম্ভবত এই, যে ধারণা হবে বক্তব্য তাঁর নিজের।[৪৮] সত্যসন্ধান কয়েকটি তথ্যের অপেক্ষা রাখে।

১। রবীন্দ্রনাথ এলাহাবাদ থেকে প্রমথ চৌধুরিকে লিখেছেন—'কেবলি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি—বের্গসঁর ফিলজফির লাইনে, স্থিতি নেই বল্লেই হয়..।'[৪৯] আনুমানিক কাল আশ্বিন ১৩২১।

২। 'বলাকা'র ৮ সঙখ্যক কবিতা 'চঞ্চলা' (রচনা—এলাহাবাদ, রাত্রি, ৩রা পৌষ ১৩২১) নামে সবুজপত্র ১৩২১ পৌষ সঙখ্যায় প্রকাশিত হয়। কবিতাটি গতিবাদের পরিচিত উদাহরণ। 'বলাকা'র ৬, ৭, ৮ সঙ্খ্যক কবিতাগুলির রচনাকাল পরস্পরের কাছাকাছি এবঙ তাতে নতুন তত্ত্বটি প্রকাশ পেয়েছে। কবিতাগুলিতে Bergson-র প্রভাব এবঙ তাকে চাপা দেবার চেষ্টা স্পষ্ট।

'চঞ্চলা' প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথ এলাহাবাদ থেকে ২০.১২.১৯১৪ তারিখে 'সবুজপত্রে'র সম্পাদক প্রমথ চৌধুরিকে লিখেছেন—'চঞ্চলা' নামে এক কবিতা মণিলালকে পাঠিয়েছি—যদি সেটা অচলা হয় তাকে ঝেড়ে ফেলতে কিছুমাত্র দ্বিধা কোরো না।'[৫০] নিজের সম্ভাব্য-প্রকাশ রচনার মূল্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এতখানি বিনয়ের

কারণ---

১। Bergson তত্ত্ব এখানে প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

২। রোমান্টিকদের পুরোধা Alphonse de Lamartine-এর (১৭৯০-১৮৬৯) *Meditations poétiques* (১৮২০) কাব্যের Le Lac কবিতার সঙ্গে 'চঞ্চলা'র মিল আশ্চর্য।

বোধহয় প্রমথ চৌধুরির ফরাশি-বিদ্যা-নৈপুণ্যে রবীন্দ্রনাথের আস্থা তাঁকে আবরণ--উন্মোচনের সম্ভাবনায় বিচলিত করছিল।

৪ চরণের ১৮টি স্তবকে লেখা Le Lac কবিতার অনুবাদ এরূপ : সময় নিরন্তর নতুন তট ও অনন্ত রাত্রির দিকে বয়ে চলেছে। কালপ্রবাহকে কি একদিনের জন্যও বাঁধতে পারি না? বছর শেষ হয়ে এল। হে হ্রদ, আমি তোমার তটে সেই পাথরের উপরে দাঁড়িয়েছি, যেখান থেকে সে তোমার ফেনাগুলি দেখত। উত্তুঙ্গ পাহাড়ের নিচে তুমি এভাবেই মর্মর ধ্বনি করতে, তটের উপর আছড়ে পড়তে, এবঙ তার সুন্দর পায়ের উপবে ফেনা ছড়িয়ে দিতে। তোমাব কি মনে আছে, এক সন্ধ্যায় আমরা নৌকা বেয়েছিলাম : জলেব উপরে, আকাশের নিচে, দাঁড়ের ছন্দিত মধুর শব্দ ছাড়া কিছু শোনা যাচ্ছিল না। হঠাত্‌ তটভূমি এক অজ্ঞাত ধ্বনি উচ্চারণ করল, তরঙ্গপ্রবাহ স্থির হল, এবঙ শোনা গেল : 'হে কাল, আবর্তন বন্ধ কর। সুন্দর সময়, গতি থামাও। সুন্দরতম দিনগুলির মধুর আনন্দ আস্বাদ করতে দাও। যে হতভাগারা তোমায় ডাকছে, তাদের জন্য বয়ে যাও : সুখীদের ভোলো। বৃথা আমি ডাকছি : তুমি বয়ে যাচ্ছ। রাত্রিকে যখন বলি 'ধীরে যাও', তখনি ভোরের আলো ফুটে ওঠে। আমাদের ভালবাসাতে--আনন্দিত মুহূর্তগুলি উপভোগ করতে দাও।' মানুষের ঠাঁই নেই, সময়ের তীর নেই। সে বয়ে যায়, আমরা চলে যাই। ঈর্ষিত সময়, মাতাল মুহূর্ত যখন প্রেমের ধারায় আনন্দবর্ষণ করে তখন দুঃখদিনের মত চলে যাও। আমরা তাদের ধরে রাখতে পারি না? একেবারে চলে যায়? সব নষ্ট হয়? যে সময় আমাদের আনন্দ দিয়েছে, সেই তা ফিরিয়ে নিয়েছে; আর কি তা ফিরিয়ে দেবে না? চিরন্তন শূন্যতা, অতীত, অন্ধকার গুহা! যে দিনগুলি তোমরা নিয়ে গেছ, তাতে তোমাদের প্রয়োজন কি? আমাদের সেই মহত্‌ আনন্দকে কি ফিরিয়ে দেবে না? হে হ্রদ, মূক পর্বত, গুহা, অন্ধকার অরণ্য, কাল তোমাদের স্পর্শ করে না, অথবা আবার সজীব করে। তোমরা এবঙ সুন্দরী প্রকৃতি! আমাদের সেই রাত্রিকে মনে রেখো। সুন্দর হ্রদ, তোমার শান্তি ও বিক্ষোভে, চারিদিকের পর্বতদৃশ্যে, কালো পাইনগাছগুলির মধ্যে তাকে মনে রেখো। এই কম্পিত সজল হাওয়ায়, তটে জলের কলস্বর ও প্রতিধ্বনিতে, রুপোলি তারায় উজ্জ্বল আলোয় তাকে মনে রেখো। বিষণ্ণ বাতাস, লতার দীর্ঘশ্বাস, তোমার সুগন্ধি হাওয়া,—যা কিছু শোনা যায়—সবাই বলুক : 'তারা ভালোবেসেছিল।'

'চঞ্চলা' কবিতায় সময়ের নিরন্তর গতি, তাকে বেঁধে রাখার প্রয়াস এবঙ জলস্রোতের সঙ্গে তার তুলনা ফরাশি কবিতাটির মত। ফরাশি কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের

'চঞ্চলা'র আদর্শ হিসাবে সক্রিয় ছিল। 'চঞ্চলা'র দুমাস আগে লেখা 'ছবি' কবিতার ছবিটি কার, সে বিষয়ে অনেক অনুমান আছে। বোধহয় Le Lac-এ Lamartine-যে Elvire-এর স্মৃতি বর্ণনা করেছেন, তা এখানে পাত্রান্তরিত হয়েছে।

'কঙ্কাল' গল্পটির সূত্রপাত অনিবার্যভাবে Théophile Gautier-এর (১৮১১-১৮৭২) *La pied du momie*-কে মনে আনে।[৫১] ফরাশি গল্পের প্রথমে প্রত্নতাত্ত্বিক নায়ক একটি মমির কাটা পা টেবিলে রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। তখন পায়ের অধিকারী তিন হাজার বছর আগের মিশরের ফ্যারাওয়ের সুন্দরী মেয়ে Hermonthis পায়ের খোঁজে সেখানে এসে উপস্থিত। সে পায়ের আশায় নায়কের চারিদিকে ঘুরে বেড়াল এবঙ পা ফেরত্ পেয়ে তার পূর্বজীবনের কাহিনীর সূত্রপাত করল। 'কঙ্কাল' গল্পে একটি মৃত যুবতীর প্রেত তার কঙ্কালের খোঁজে সেখানে উপস্থিত হয়ে পূর্বজীবনের কাহিনীর সূত্রপাত করেছে। দুটি গল্প আরম্ভ করার পদ্ধতি এক। অবশ্য রচনার পরের অঙশে উভয়ের যোগাযোগ নেই।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যে তাঁর শোবার ঘরে একটি কঙ্কাল টাঙানো ছিল এবঙ এক রাত্রে ঘুমের ঘোরে গল্পটির কল্পনা তাঁর মাথায় এসেছিল।[৫২] 'ছেলেবেলা'র একটি বর্ণনার সঙ্গে এই বক্তব্যের মিল আছে। উল্লিখিত সাদৃশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের জোর কতটুকু?

Alphonse Daudet-র (১৮৪০-১৮৯৭) *Lettres de Mon Moulin* (১৮৬৮) গ্রন্থের *Les Étoiles* গল্পের নায়ক Provence-এর এক তরুণ রাখাল এক পার্বত্য উপত্যকায় একটি কুকুর নিয়ে একা বাস করে এবঙ মনিবের ভেড়ার পাল চরায়। সুন্দরী মনিবকন্যা Stéphanette তার কাছে অপ্রাপণীয়া, কিন্তু পরম বাঞ্ছিতা। সপ্তাহের খাবার নিয়ে হঠাত্ মেয়েটি একদিন সেখানে একা এল, কিন্তু পাহাড়ি নদীর আকস্মিক জলোচ্ছ্বাসে ফিরে যেতে না পেরে তার একমাত্র ঘরে রাতের আশ্রয় নিল। মাঝরাতে অনিদ্রাকাতর Stéphanette বারান্দায় এলে নায়ক তার কাছে রাত্রির সৌন্দর্য বর্ণনা করে। রাত্রির সৌন্দর্য হল নক্ষত্রের শোভা। দিনে মানুষ সজীব, মানুষ যখন ঘুমায় তখনি বস্তুপৃথিবী প্রাণবন্ত। তারাদের যাত্রাপথ ও প্রেমের বর্ণনায় নায়কের প্রেম ইঙ্গিতে মূর্ত হয়েছে বর্ণনার শেষে। ভোর হলে নির্বাক নায়িকা চলে গেল, এবঙ মধুর রাত্রের স্মৃতি নিয়ে নায়ক একা পড়ে রইল।

প্রায় কাহিনীহীন এই গল্পটি রাত্রির সৌন্দর্য বর্ণনায় কবিতার মত। 'একরাত্রি' গল্পের প্রধান কাহিনী এর অনুরূপ,[৫৩] এবঙ উভয়ত্র কাহিনী সামান্য ও গীতি-উচ্ছ্বাস প্রধান। বাঙলা গল্পটির প্রধান বৈশিষ্ট্য অসঙযম,—তৃতীয় অনুচ্ছেদে শুরু হয়ে তা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। নায়কের কলকাতা-প্রবাসে শিক্ষা ও রাজনীতি-চর্চার সঙ্গে সুরবালার কাহিনীর কোনো যোগাযোগ নেই। অবান্তর অঙশ বর্জিত হলে মূল গল্প *Les Étoiles*-এর সামান্য-পরিবর্তিত বাঙালি রূপ মাত্র। এই অবান্তর অঙশের প্রয়োজন কি? 'পোষ্টমাষ্টার' থেকে 'একরাত্রি'র অব্যবহিত পূর্বের 'ত্যাগ' পর্যন্ত ১১টি গল্পে নানা ত্রুটি

আছে, কিন্তু কাহিনী-গঠনের অনুরূপ অসঙ্‌যম আর নেই। অবান্তর প্রসঙ্গের উপস্থিতি ফরাশি ঋণ গোপন করার প্রয়াস।

Daudet সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের প্রিয় লেখক ছিলেন। তাঁর *Contes du Lundi* (১৮৭৩) গ্রন্থের *La Siége de Berlin* গল্পের[৫৪] কাঠামোর সঙ্গে 'ঠাকুর্দা' গল্পের মিল আশ্চর্য। ফরাশি গল্পের চরিত্র তিনটি--অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ Le Colonel Jouve, তাঁর নাতনি, ও নায়ক যুবক ডাক্তার, যে গল্প বলেছে। ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয় যুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা পারি নগরীর এই গল্পে জার্মান সৈন্য যখন পারি অবরোধ করেছে তখনও বৃদ্ধের মনে আঘাত না দেবার জন্য তাঁকে মিথ্যা খবর দেওয়া হচ্ছে, যে ফরাশি সৈন্যেরা বার্লিন অবরোধ করেছে, এবঙ পারিতে আনন্দোত্‌সবের আয়োজন চলেছে। দাদুর ভাবালুতার (sentiment) প্রতি নাতনির অতিসচেতনতা ও ভালবাসা সব ঘটনার পিছনে সক্রিয়। এই ভালবাসা মিথ্যা সঙ্‌বাদ পরিবেশনে নায়ককে আকৃষ্ট করেছে। 'ঠাকুর্দা'র পটভূমিকা দেশি ও সেখানে যুবক-যুবতীর সম্বন্ধ প্রথমে বিরোধমূলক এবঙ ফরাশি গল্পের শেষে কঠোর বাস্তবের আঘাতে বৃদ্ধের মৃত্যু—এটুকুই দুটি রচনার পার্থক্য। প্রাচীনের প্রতি বৃদ্ধের মোহ, সেই ভাবালুতার সমর্থনে নাতনির উত্‌সাহ এবঙ নায়ক-নায়িকার অদ্ভুত যোগাযোগ দুটি গল্পে এক ভাবে আকার পেয়েছে।

Merimée থেকে প্রমথ চৌধুরির অনুবাদ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অযৌক্তিক মন্তব্য আলোচিত হয়েছে। এই মন্তব্যের প্রকৃত কারণ অজ্ঞাত। বোধহয় তিনি তখনই Merimée-র রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, কারণ তিনি তখন সমানে বিদেশি গল্পের বই পড়ছেন—সম্ভবত নিজের গল্প রচনার প্রস্তুতি হিশাবে। 'ক্ষুধিত পাষাণ' রচনার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ আরব্যোপন্যাসের কাহিনী পড়েছেন,[৫৫] কিন্তু চিঠিপত্রেও Merimée-র *La Venus d'Ile* গল্পটির কথা লেখেননি, অথচ তাঁর রচনায় ওই গল্পটির ছায়া পড়েছে। কেবল ফরাশি গল্পটি নয়, Edger Allan Poe-র *The Fall of the House of Usher* (১৮৩৯) গল্পটির সঙ্গেও এর মিল লক্ষণীয়। Venus মূর্তির নিষ্ঠুর সৌন্দর্য, প্রাণসঞ্চার, পদশব্দ, সর্বত্র ভীতি সঞ্চার, অন্ধমোহে গল্পের কথক অর্থাত্‌ নায়কের প্রবল আকর্ষণ, এবঙ শেষে স্থানত্যাগ কাহিনীর বুনোটে দুটি গল্পের ঐক্য নির্দেশ করে। ভৌতিক গল্প রচনায় ফরাশিতে Merimée-এর জুড়ি নেই, যদিও তিনি ভূতে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর একটি ভৌতিক গল্প *Le Vision de Charles XI*-এর প্রথমে Shakespeare-এর Hamlet থেকে যে উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়েছে, 'ক্ষুধিত পাষাণে'র আরম্ভেই তার সাক্ষাত্‌ বিস্ময়কর।'[৫৬]

এই মিল বিষয়বস্তু ও তার প্রকৃতি নির্মাণে। Merimée-এর অনুকরণ ও প্রভাব রয়েছে আরো অন্তত দুটি গল্পে—'মণিহারা' ও 'ভাইফোঁটা'য়। 'মণিহারা'র শেষ ৯টি অনুচ্ছেদে গল্পটিকে আগাগোড়া কল্পিত ও মিথ্যা বলা হয়েছে। এই নতুন শৈলীর সাক্ষাত্‌ তাঁর আর বিশেষ কোনো গল্পে পাওয়া যায় না, একমাত্র 'ভাইফোঁটা'র একটি ঘটনা ছাড়া। বিভ্রান্ত সমালোচকদের কাছে তার ব্যাখ্যা মেলেনি এবঙ গল্পটি লঘু হয়ে উঠেছে।

এর প্রকৃত কারণ Merimée-র অনুসরণ। Merimée-র শেষ জীবনের বহু গল্পে যেমন *Djoumane, La Chambre Bleue, It Viccolo di Madama Lucrezia*-তে এই রীতি উদ্ভাবিত ও ব্যবহৃত হয়েছে, এবঙ তা প্রায়ই ভৌতিক কল্পনাকে ভেঙ্গে দিয়েছে। অকস্মাৎ আঘাতে ভূতের গল্পের আমেজ ভাঙলেও একটি মার্জিত কৌতুক পাঠককে মুগ্ধ করে।

'মণিহারা'র প্রায় ১৬ বছর পরে লেখা 'ভাইফোঁটা' গল্পের শেষ দিকে সত্যধন স্বপ্ন দেখেছে, যে সুবোধ সন্ধ্যায় তার ঘরে ঢুকেছে, তার উদ্ধত কথায় রেগে সে লাঠি মেরে সুবোধকে হত্যা করেছে এবঙ রক্তস্রোত দেখে বিহ্বল হয়ে গেছে! ঠিক তার পরেই জেগে উঠলে সত্যধনের মনোভাব সম্পূর্ণ বদলে গেছে। মূল কাহিনী বা মনের পরিবর্তনে নয়, এই অন্তর্বর্তী কাহিনীর সূত্রপাত পুরোপুরি ফরাশি গল্পের ধাঁচে। *Djoumane* গল্পের সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রের পাশে কফি খাবার আগেই ঘুমিয়ে পড়ে আজগুবি স্বপ্নে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেই জেগে উঠে। *La Chambre Bleue*-তে মদের ধারাকে রক্তস্রোত মনে করে নায়কের ভয়, আদর্শ আশঙ্কা, এবঙ শেষে হোটেলের কাউন্টারে ভয় থেকে উদ্ধার—এসব ঐ রীতির অনুবর্তন। *It Viccolo di Madama Lucrezia*-তে দু হাজার বছর আগের সম্রাট-দুহিতার প্রেতের সঙ্গে নায়কের অন্ধকার গলিতে প্রেম ও প্রহার, এবঙ পরে নিজের ঘরে দিনের বেলায় একটি বাস্তব মেয়ের বেশে তার আবির্ভাবে হতবুদ্ধি অবস্থায় চমকের ধাক্কা অদ্ভুত কৌতুকের সৃষ্টি করে। এসব কি 'ভাইফোঁটা'র অন্তর্বর্তী কাহিনীর সঙ্গে রচনারীতির মিল দেখায় না?

সমালোচকদের ধারণা, Maupassant-র সঙ্গে গল্পকার রবীন্দ্রনাথের কোনো মিল নেই। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের তিনটি গল্প লক্ষণীয়—

১। সম্পত্তি সমর্পণ —সাধনা ১২৯৮ পৌষ
২। সমস্যাপূরণ —সাধনা ১৩০০ অগ্রহায়ণ
৩। দুরাশা —ভারতী ১৩০৫ বৈশাখ

সবগুলি গল্পের শেষে আকস্মিক আঘাতের চমক ও ব্যঙ্গ আছে এবঙ প্রথম ও শেষ গল্পদুটিতে হতাশা ব্যঞ্জিত। Maupassant-র গল্পগুলির (যেমন *La Parure*) সঙ্গে আকস্মিক আঘাত, ব্যঙ্গ ও হতাশার সুরে এই গল্পগুলির উপর প্রভাব কি দুর্লক্ষ্য?

Maurice Maeterlinck-এর (১৮৬২-১৯৪৯) ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *Alladine et Palomides, Interieur* এবঙ *La Mort de Tintagiles* এই 'trois petits drames pour marionnetes এর শেষটির A. S. Utro কৃত প্রথম ইঙরাজি অনুবাদ *The Death of Tintagiles* ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত এবঙ ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে পুনঃপ্রকাশিত হয়।[৫৭] Maeterlinck-এর প্রিয়তম এই প্রতীক একাঙ্ক mystic নাটকটির কাহিনীর চুম্বক এরূপ : দূর দিগন্তপারের কালো দুর্গের রাণীর আদেশ অমোঘ। রহস্যময় উপায়ে তা পালিত হয় ; তাঁকে কেউ দেখেনি। তাঁর অশ্রুত আদেশে

অনাথ বালক Tintagiles সমুদ্রপার থেকে দিদি Ygraine ও Bellangère-এর কাছে এসেছে। তারা ভাইয়ের ভবিষ্যতের জন্য উদ্বিগ্ন। Tintagiles অসুস্থ, কিন্তু বাইরের প্রকৃতির আলো-হাওয়া তাকে হাতছানি দেয়। Bellangère হঠাত্ দুর্গের কাছে চাপা কণ্ঠস্বর শুনে ভাইয়ের সম্বন্ধে আশঙ্কিত হলে Ygraine তাকে রক্ষা করতে কৃতসঙ্কল্প হয়। সে রাত্রে ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ করে দুবোন ভাইকে মাঝখানে নিয়ে ঘুমায় এবঙ তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী অভিজ্ঞ বৃদ্ধ Aglovale পাহারা দেয়। রাত্রে অদ্ভুত পদশব্দে ঘরের বন্ধ দরজা জানালা আপনা থেকে খুলে যায়, কিছুতেই তা বন্ধ হয় না, এবঙ অদৃশ্য আগন্তুকের উদ্দেশ্যে Aglovale-এর নিক্ষিপ্ত তলোয়ার ভেঙ্গে যায়। তারা প্রার্থনা করে, এবঙ দরজা আপনি আয়ত্তে আসে। পরে রাণীর তিন জন দূত এসে তাদের নিদ্রাবেশে Tintagiles-কে নিয়ে চলে যায় ; কেবল যাত্রাপথে দূর থেকে ভেসে-আসা Tintagiles-এর ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে দু বোন জেগে ওঠে। Bellangère ভয়ে মূর্চ্ছিত হয়, এবঙ দুর্গে এসে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শুনে Ygraine এক ভারি কালো লোহার দরজার পরপার্শ্বে মুক্তিকামী Tintagiles-এর অস্তিত্ব জানতে পারে। দরজা খোলার ব্যর্থ চেষ্টার সময় রাণী বালকের মৃত্যু নিয়ে আসে।

'ডাকঘর' (১৯১২) নাটকের সঙ্গে *La Mort de Tintagiles*-এর মিল অসাধারণ। ফরাশি নাটকের রাণী, Aglovale, Tintagiles ও Ygraine বাঙলায় যথাক্রমে রাজা, কবিরাজ, অমল ও মাধব দত্তে বেশ পরিবর্তন করেছে, এবঙ দুর্গের ছায়া ডাকঘরের উপরে পড়েছে। অসুস্থতা ও প্রকৃতির আকর্ষণে দুটি বালকের ব্যবহার এক রকম, মাধব ও Ygraine স্নেহে একই ভাবে আন্দোলিত হয়েছে--দু জনের কাছেই বালকের আগমন নূতন। রাজা ও রাণী দুজনেই মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত, এবঙ দুজনেই অদৃশ্য। Aglovale-এর মত কবিরাজও অমলকে রক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছে। স্নেহ ও মৃত্যুর দ্বন্দ্ব দুটি রচনারই মুখ্য বিষয়। 'ডাকঘর' স্পষ্টত একটি অনুকরণমূলক রচনা।

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে Maeterlinck লঘু সুরের ১৬টি পূর্বপ্রকাশিত প্রবন্ধ *The Double Garden* (মূল নাম *Le Double Jardin*) গ্রন্থে সঙ্গ্রহ করেন। গ্রন্থনার পূর্বেই ইঙলন্ড ও আমেরিকায় প্রবন্ধগুলি আদৃত এবঙ অল্প পরেই ইঙরাজিতে অনূদিত হয়। এই গ্রন্থের News of Spring রচনাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী' (১৯১৬) নাটকের মিল আশ্চর্য।[৫৮] এই প্রবন্ধে বসন্তের পরিচয় আছে একটি উদ্যান বর্ণনার মাধ্যমে। শীত জীর্ণতা ও বার্ধক্য, এবঙ বসন্ত সৌন্দর্য ও তারুণ্যের প্রতীক হয়েছে। বসন্তের অবসানে ও আগমনে বাগানে গাছ ও ফুলের বর্ণনা, তাদের চরিত্র ও প্রাসঙ্গিক বর্ণনা রচনাটির বর্ণনীয় বিষয়।

বড় বড় গাছগুলির সম্বন্ধে--'They have too much experience, they are too old to forget and too old to learn. Their hardened reason refuses to admit the light when it does not come at the accustomed time.' এবঙ তারা 'rugged old people too wise to enjoy

unforseen pleasures. They are wrong.' তাদের পাশেই 'is a whole world of plants that know nothing of the future but give themselves to it. They live but for a season, they have no past and no traditions and they know nothing, except that the hour is fair and they must enjoy it.' বাঙলা নাটকে এরা যথাক্রমে দাদা ও নবযৌবনের দলে পরিণত হয়েছে। চন্দ্রহাসের দলের আনন্দোত্সব এবঙ Maeterlinck-এর running round the garden of its (বসন্তের) holidays একই বস্তু। 'ফাল্গুনী'তে শীত-বুড়োর আবরণ উন্মোচন করে যুবক বসন্তের আবির্ভাব যেমন বর্ণনীয় বিষয়, Maeterlinck-এর প্রবন্ধের বিষয়ও তেমনি। তিনি লিখেছেন—'But I am looking for Winter and the print of its footsteps. Where is it hiding ? It should be hiding ; and how dares this feast of roses and anemones, of soft air and dew, of bees and birds display itself with such assurance during the most pitiless month of winters reign?' এমনকি 'ফাল্গুনী'র শেষ দৃশ্যে দাদার উত্সবে যোগদান এই রচনাঙশকে মনে করায়—'The fruit-trees alone have long relected the example of the vegetables among which they lived urged them to join the general rejoicing, but the rigid attitude of their elders from the North, of the grandparents born in the dark forests, preached prudence to them. But now they awaken : they too can resist no longer and make up their minds to join the dance of perfumes and of love.'

'ফাল্গুনী' নাটকের কোনো গল্প নেই এবঙ প্রায় কোনো চরিত্রই নির্দিষ্ট আকার পায়নি বলে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'এই নাট্যকাব্যে নবযৌবনের দল যেখানে কথাবার্তা কহিতেছে সেখানে চন্দ্রহাস, দাদা ও সর্দার ছাড়া আর কাহারও নাম নির্দিষ্ট নাই। দলের অন্য সকলে যে যেটা খুশি বলিতে পারে এবঙ তাহাদের লোকসঙখ্যারও সীমা করিয়া দেওয়া হয় নাই।' তাঁর সমস্ত গদ্যনাটকের মধ্যে এখানেই গানের সঙখ্যা সর্বাধিক অর্থাত্ ৩৪; এমনকি নাটকের এক চতুর্থাঙশ আছে 'সূচনা'তে, যার প্রয়োজন সন্দেহজনক। সঙক্ষেপে, কথোপকথনে লেখা বলেই 'ফাল্গুনী' নাটক, নইলে তার নাট্যত্ব কোথাও ধরা পড়ে না ; এবঙ বক্তব্য বেশি নেই বলে গান দিয়ে মন ভোলানোর অপচেষ্টা। এই বিষয়টি সমালোচকদের বিস্মিত করেছে, কারণ তাঁরা জানেন না, যে এর উত্স অন্যের লেখা প্রবন্ধ। প্রবন্ধ থেকে বক্তব্য গৃহীত বলে রবীন্দ্রনাথ কাহিনী, চরিত্র, দ্বন্দ্ব কিছুই সৃষ্টি করতে পারেননি, শুধু স্বকীয়তা প্রচারের উদ্দেশ্যে সর্দার ও বাউল চরিত্রে নিজের trade mark বিজ্ঞাপিত করেছেন।

এখানে রূপক-সাঙ্কেতিক নাটকগুলির আরম্ভ অর্থাত্ 'শারদোত্সব' থেকে রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি নাটকের কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হল :

ক্রমিক সঙখ্যা	নাম	প্রকাশকাল	উত্স
১	শারদোত্সব	১৯০৮ সেপ্টেম্বর	?
২	মুকুট	১৯০৮ ডিসেম্বর	'মুকুট' গল্প ও *Le Luthier de Crémone*
৩	প্রায়শ্চিত্ত	১৯০৯	'বউ ঠাকুরাণীর হাট'
৪	রাজা	১৯১০	'কুশাবদান' (সঙস্কৃত কাব্য)
৫	ডাকঘর	১৯১২ জানুয়ারি	*La Mort de Tintagiles*
৬	মালিনী	১৯১২ মার্চ	বৌদ্ধ কাহিনী (*Sanskrit Buddhist Literature of Nepal.*)
৭	অচলায়তন	১৯১২ জুলাই	*Castle of Indolence*
৮	ফাল্গুনী	১৯১৬	*News of Spring* (ফরাশি)
৯	গুরু	১৯১৮	অচলায়তন ও *Castle of Indolence*
১০	অরূপরতন	১৯২০	রাজা ও কুশাবদান
১১	ঋণশোধ	১৯২০	শারদোত্সব
১২	মুক্তধারা	১৯২২	?
১৩	গৃহপ্রবেশ	১৯২৫	শেষের রাত্রি
১৪	চিরকুমার সভা	১৯২৬	প্রজাপতির নির্বন্ধ ও *Princess*[৫৯]
১৫	শোধবোধ	১৯২৬	কর্মফল

উপরের তালিকার ১৫টি নাটকের মধ্যে ৪টি রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো পূর্বরচনার নাট্যরূপ বা পরিবর্তিত রূপ, ৫টি অন্য লেখকের কাহিনী থেকে গৃহীত, এবঙ ৪টি অন্যের রচনা থেকে গৃহীত নিজের পূর্বতন রচনার রূপান্তর। মাত্র দুটি রচনার কাহিনী নিজের বা অন্যের পূর্বরচনা থেকে গৃহীত বলে এখনো জানা যায়নি। আরো লক্ষণীয় :

(ক) প্রথম আটটি রচনার অধিকাঙশের উত্স অন্য লেখকের রচনা।

(খ) পরের সাতটি নাটকের মধ্যে একটি ছাড়া সবগুলি নিজের কোনো না কোনো পূর্বরচনার রূপান্তর, যদিও সেই রচনাগুলির কোন কোনটি অন্যের রচনা থেকে গৃহীত। এ থেকে অনুমান করা সম্ভব :

১। রবীন্দ্রনাথ নাটকের কাহিনী-নির্মাণে দক্ষ ছিলেন না ; প্রায়শ অন্যের রচনা থেকে তা আহরণ করেছিলেন।

২। 'শারদোত্সব' ও 'মুক্তধারা'র উত্সও অন্য কোনো লেখকের কোন কোন রচনায়

পাওয়া খুব স্বাভাবিক। 'শারদোত্‌সব' সম্বন্ধে অনুমানের কারণ আরো জোরালো,—(ক) এখানে কাহিনী-অঙশ সামান্য, এবঙ (খ) এই পর্যায়ে বিদেশি রচনা থেকে ঋণ রবীন্দ্রনাথের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

Anatole France-এর (১৮৪৪-১৯২৪) রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচিতি এবঙ সেগুলির প্রতি তাঁর আকর্ষণের পরিচয় পাওয়া যায় নিচের তথ্যগুলি থেকে।

১। ৫. ১০. ১৯০০ তারিখে রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথ সেনকে লিখেছেন—*Le Crime de Sylvestre Bonnard* নামক Anatole France-এর ফরাশি বই যদি তোমার কাছে বা কোন দোকানে থাকে আমাকে পাঠাতে পার?'[৬০]

২। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—'এই উপন্যাসটি (অর্থাত্‌ *Le Crime de Sylvestre Bonnard*) কবির খুবই প্রিয় ছিল, তাঁহার কথামত আমরাও এই বই পড়িয়াছিলাম।'[৬১]

৩। 'বাতায়নিকের পত্রে'[৬২] Anatole France-এর রচনা থেকে তিনটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তার সমর্থনসূচক আলোচনা করেছেন।

অনুমান করা স্বাভাবিক, Anatole France-এর অন্যান্য বিখ্যাত রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল।

Anatole France-এর উপন্যাস *Thaïs* (১৮৯০) ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে প্রথমে এবঙ তারপরে বহুবার ইঙরাজিতে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। কাহিনীর সঙক্ষিপ্তসার এরূপ : চতুর্থ শতকের সম্ভ্রান্তবঙশীয় ইন্দ্রিয়বিলাসী Paphnuce সন্ন্যাসী হয়ে Thebaid-এর মরুভূমিতে সুন্দরী নটী Thaïs-এর স্বপ্ন দেখে তাকে উদ্ধারের জন্য আলেকজান্দ্রিয়াতে আসেন। Thaïs সন্ন্যাসিনী হলে Paphnuce মরুভূমিতে মেয়েদের এক মঠে তাঁকে রেখে গেলেও তাঁর চিন্তা দূর করতে পারেন না, এবঙ বোঝেন, যে তাঁর কাজে কেবল কামনা ও অহঙ্কার প্রকাশ পেয়েছে। স্বেচ্ছারোপিত তপশ্চর্যায় মরণোন্মুখ Thaïsকে ভোগজীবনে ফেরাবার জন্য Paphnuce গেলেন, কিন্তু তাঁর সাক্ষাত্‌ পেলেন না। আলোকোজ্জ্বল Thaïs যখন স্বর্গে গেলেন তখন কামনাক্রান্ত Paphnuce পড়ে রইলেন।

রবীন্দ্রনাথের 'চন্ডালিকা' (১৩৪০) নাটকে বৌদ্ধ ভিক্ষু আনন্দের মহত্ত্ব ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ চন্ডালিকা মায়ের বশীকরণবিদ্যার সাহায্যে তাকে পেতে চাইল। লালসায় উদ্দীপ্ত করে যখন সে সঙযম ও ভোগের দ্বন্দ্বে ম্লান আনন্দের সাক্ষাত্‌ পেল, তখনি আত্মবিলোপী প্রেমে তার কামনার ও নাটকের সমাপ্তি ঘটেছে। দুটি কাহিনীর মৌলিক সাদৃশ্য দুর্লক্ষ্য নয়। লালসাময়ী নারীকে দু জন সন্ন্যাসী উদ্ধার করে যখন নিজেরা ভোগবাসনার কাছে পরাস্ত, তখন রমণী কামনা থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে। এই সাদৃশ্যের পাশে নাটকটির ভূমিকা অদ্ভুত। সেখানে রবীন্দ্রনাথ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* গ্রন্থের একটি কাহিনীকে নাটকটির উত্‌স বলে স্বীকার করে তার সঙক্ষিপ্তসার লিখেছেন। 'ভূমিকা'র শেষে আছে—'ভগবান বুদ্ধ তাঁর অলৌকিক

শক্তিতে শিষ্যের অবস্থা জেনে একটি বৌদ্ধমন্ত্র আবৃত্তি করলেন। সেই মন্ত্রের জোরে চন্ডালীর বশীকরণবিদ্যা দুর্বল হয়ে গেল এবঙ আনন্দ মঠে ফিরে এলেন।' নাটকে এই অঙশ বর্জিত হয়েছে।

আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি সাজানো হল :

ক) একটি বৌদ্ধকাহিনী 'চন্ডালিকা'র উত্‌স হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে।

খ) পূর্বে 'মালিনী' ও 'রাজা' নাটকে অনুরূপ ঋণ স্বীকৃত হয়নি।

গ) বৌদ্ধ কাহিনীর শেষাঙশ 'চন্ডালিকা'য় বর্জিত।

ঘ) Thaïs উপন্যাসের সঙ্গো সমস্ত 'চন্ডালিকা'র—এমনকি শেষাঙশেরও মিল স্পষ্ট।

ঙ) Anatole France রবীন্দ্রনাথের প্রিয় লেখক ছিলেন।

তথ্যগুলি থেকে এরূপ সিদ্ধান্তে আসা যায়—

১। 'ক' ও 'খ'-এর বৈসাদৃশ্যে 'ক'-এর পিছনে ঋণ স্বীকার ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যের সক্রিয়তা অনুমেয়। (সম্ভবত দেশি অপেক্ষা বিদেশি ঋণ স্বীকার করা রবীন্দ্রনাথ অগৌরবজনক বলে মনে করতেন।)

২। 'গ' অপেক্ষা 'ঘ'-এর সঙ্গো নাটকের মিল বেশি।

৩। যেহেতু 'ক' ও 'গ'-এর কাহিনী এক, সেজন্য উপরের দুটি সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সেই কাহিনীর পক্ষে 'চন্ডালিকা'র ভাবগত উত্‌স হবার সম্ভাবনা সন্দেহজনক।

৪। 'ঙ'-র ভিত্তিতে 'ঘ'-এর সঙ্গো রবীন্দ্রনাথের পরিচিতি স্বাভাবিক।

Thaïs-কে 'চন্ডালিকা'র আদি ও ভাবগত, এবঙ বৌদ্ধ গল্পকে কেবল বাইরের কাহিনীগত উত্‌স বলে অনুমান করা সঙ্গত। রবীন্দ্রনাথের ঋণ-স্বীকৃতি ও নীরবতার কারণ সহজে অনুমেয়।

Théophile Gautier-এর *Mademoiselle de Maupin* (১৮৩৫-৬) উপন্যাসের নায়ক কবি D'Albert প্রেমের সঙ্গে প্রেমে পড়ে তার অদেখা সুন্দরী প্রেয়সীর কল্পনামূর্তি নির্মাণ করেছে। স্নিগ্ধ স্নেহপ্রবণ সুন্দরী Rosette-কে সে ভালবাসে অথচ তাকে নিজের কল্পনামূর্তি বলে জানে না। উজ্জ্বল সুন্দরী Mademoiselle de Maupin পুরুষের ছদ্মবেশে Théodore নামে দুজনের সঙ্গো ঘনিষ্ঠ হলে D'Albert যেমন কল্পনামূর্তির সঙ্গো মিলিয়ে তাকে প্রেয়সী মনে করতে চায়, তেমনি Rosette--এর সঙ্গে তার যোগাযোগে ঈর্ষিত হয়ে ওঠে। তারপর উপন্যাসের নানা ঘটনায় সৌন্দর্যসন্ধানী নায়ক-নায়িকাকে কেন্দ্র করে নগ্ন দেহসৌন্দর্য-বর্ণনা ও প্রেমোল্লাস স্থান পেয়েছে। দুজন সুন্দরীর মধ্যে Maupin উগ্র, চঞ্চল ও বন্ধনহীন ; Rosette প্রেমবন্ধন কামনা করে। শেষে D'Albert ছদ্মনামে Maupinকে প্রেমপত্র পাঠায়, এবঙ বন্ধুমহলে তার উপস্থিতিতে একটি পুরুষবেশী মেয়েকে কেন্দ্র করে লেখা নাটকের অভিনয় করায় : সমস্ত ঘটনার প্রকৃত উদ্দেশ্য Mademoiselle de Maupin-র স্বরূপ উদ্‌ঘাটন। সে রাত্রে গোপনে দুজনের মিলনের পরে Maupin নায়ককে তার সন্ধানে বিরত হবার জন্য চিঠি দিয়ে, দূরে পাড়ি দেয়, এবঙ D'Albert ও Rosette পড়ে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের কিছু রচনায দুই নারী তত্ত্ব তুলে ধরা হয়েছে। অনেকগুলি উদাহরণের মধ্যে 'উর্বশীর' কবি-কৃত ব্যাখ্যা এবঙ 'বলাকা'র ২৩ সঙখ্যক কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। 'দুই বোন' (১৯৩৩) উপন্যাসের আরম্ভে আছে--'মেয়েরা দুই জাতের, কোনো কোনো পন্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি। এক জাত প্রধানত মা, আর-এক জাত প্রিয়া।' 'কোনো পন্ডিত' সম্ভবত Gautier। তাঁর *Mademoiselle de Maupin* উপন্যাসের Rosette ও Maupinকে রবীন্দ্রনাথ যথাক্রমে মা ও প্রিয়া মনে করেছেন। Rossette ও Maupin-র চরিত্রধর্ম বজায় রেখে যথাক্রমে শর্মিলা ও উর্মিলার সৃষ্টি। শশাঙ্ক D'Albert-এর দ্বিধাবিভক্ত মনকে অনুসরণ করেছে। শেষে উর্মিলাও Maupin-র মত চিঠি রেখে দূরে পাড়ি দিয়েছে। সর্বাঙশে মিল না থাকলেও মূল ঐক্যের জন্য 'দুই বোন' ফরাশি উপন্যাসটিকে মনে আনে। 'দুই বোনে'র শর্মিলা যে অস্বাভাবিক হয়েছে, তা এই তত্ত্বের হুবহু অনুসরণের ফল। বোধহয় তাকে অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক করে তোলার আগ্রহে রবীন্দ্রনাথের পরের সৃষ্টি 'মালঞ্চে'র (১৯৩৪) জন্ম। চিরন্তন ত্রিভুজের গল্প, তবে নীরজা কিছুতেই সরলাকে মেনে নিতে পারেনি, শর্মিলা যেভাবে উর্মিলাকে স্বীকার করেছিল। অবশ্য আদিত্য শশাঙ্কের মতই দ্বিধাবিভক্ত-চিত্ত, শান্ত নীরজার থেকে চঞ্চল সরলা তার কাছে বেশি আকর্ষণীয়। অর্থাত্ 'মালঞ্চ' অনেক পরিমাণে লেখকের মনে 'দুই বোনে'র প্রতিক্রিয়া।

'উর্ব্বশী' (১৮৯৫) কবিতার মধ্যে Swinburne-এর একটি রচনার অনুকরণ আছে,[৬৩] এমনকি Austin Dobson (১৮৪০-১৯২১)-এর ছায়াও দুর্লক্ষ্য নয়,[৬৪] তবে কবিতাটির প্রাথমিক উত্স সম্ভবত উল্লিখিত ফরাশি উপন্যাস, কারণ নারীর দুই রূপের বর্ণনা এখানে মুখ্য বিষয়।

কলাকৈবল্যবাদের গোড়াপত্তন ফরাশিদেশে : Gautier-এর *Mademoiselle de Maupin* উপন্যাসের দীর্ঘ ভূমিকা এই মতবাদের আন্দোলনকে জোরালো করে। ভূমিকায় হিতবাদীদের ব্যঙ্গ করে Gautier সাহিত্যে l'art pour l'art প্রচারে যত্ন করেন। প্রিয়নাথ সেনের গ্রন্থসঙ্গ্রহ থেকে এর ইঙরাজি অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে পড়েন। তাঁর একাধিক রচনায় উপন্যাসটির প্রসঙ্গ আছে ; যেমন—

১। প্রিয়নাথ সেনকে আনুমানিক ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে লেখা তিনটি পত্র।[৬৫]
২। সাহিত্যের প্রাণ : ১২৯৯ আষাঢ়[৬৬]
৩। সৌন্দর্য ও সাহিত্য : ১৩১৪ বৈশাখ[৬৭]

রবীন্দ্রনাথের মনে উপন্যাসটি পড়ার প্রতিক্রিয়া যে জোরালো হয়েছিল তা প্রায় ২৩ বছর ধরে লেখা তাঁর বিভিন্ন রচনার প্রসঙ্গে বোঝা যায়। তাঁর রচনায় এর ছাপ থাকা স্বাভাবিক।

চিঠিগুলিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের মতামত জানাননি; সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভালো লাগার খবর এবঙ নিজের আলোচনার ইচ্ছা জানিয়েছেন। লোকেন পালিতকে পত্রাকারে

লেখা 'সাহিত্যের প্রাণ' প্রবন্ধে Gautier সম্বন্ধে যে বক্তব্য স্থান পেয়েছে তা ১৫ বছর পরে 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য' প্রবন্ধে পুনরুক্ত হয়েছে। সৌন্দর্য বিশ্বপ্রকৃতিতে, সর্বত্র প্রকাশমান নয়, তা লুকিয়ে আছে, এবঙ সৌন্দর্যসন্ধানী নায়ক-নায়িকা অল্প সময়ের জন্য হঠাত্‌ তাকে খুঁজে পেল, উপন্যাসটিতে রবীন্দ্রনাথ এই ধারণার পরিচয় পেয়েছেন এবঙ তাকে সমর্থন করতে পারেননি। কিন্তু উপন্যাসটির রচনাপদ্ধতি, চরিত্রসৃষ্টি, সৌন্দর্যবর্ণনা প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি কোনো মন্তব্য করতে চাননি এবঙ সাহিত্যালোচনার নতুন তত্ত্ব সম্বন্ধে নীরব রয়েছেন। এমনকি তাঁর আলোচনার সত্যতা সম্বন্ধেও তিনি নিশ্চিত নন। এজন্য অনুমান করা সম্ভব, Gautier-এর মতবাদকে তিনি সমর্থন করেছেন।

আলোচনায় কলাকৈবল্যবাদের দুটি সূত্র স্মরণীয়—

১। সাহিত্য লোকশিক্ষা বা সামাজিক নীতিপ্রচারের বাহন নয়।

২। সৌন্দর্যসৃষ্টিই সাহিত্যের লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যদৃষ্টিতে এই সূত্রগুলি সমর্থিত হয়েছে।

সমর্থন লক্ষ্য করার পূর্বে নিচের তথ্যগুলি জানা দরকার :

১। প্রিয়নাথ সেন Gautier-র ভক্ত ছিলেন। 'চিরকুমার সভা'র প্রসঙ্গে তিনি Gautier-কে স্মরণ করেছিলেন।[৬৮] সাহিত্য-প্রসঙ্গে প্রিয়নাথ ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক যোগাযোগ বর্তমান প্রবন্ধের প্রথম পর্ব থেকে স্পষ্ট হয়েছে।

২। রবীন্দ্রনাথ (ক) বহু জায়গায় *Mademoiselle de Maupin*-র কথা লিখেছেন ; (খ) Gautier-র *Le Capitaine Fracasse* অনুবাদে পড়েছেন এবঙ মূলে পড়ার আগ্রহ জানিয়েছেন ; এবঙ (গ) একটি গল্পে Gautier-র অনুসরণ করেছেন।

৩। প্রিয়নাথ অন্তত দুটি প্রবন্ধে কলাকৈবল্যবাদের সমর্থন করে লিখেছেন—

(ক) 'রস্কিন', (প্রদীপ, ১৩০৭ বৈশাখ-অগ্রহায়ণ প্রবন্ধে) (১) 'ললিতকলায় সুনীতি কুনীতি নাই ; যদি থাকে, তবে তাহাই সুনীতি যাহা সুন্দর, যাহা অসুন্দর তাহাই কুনীতি।' (২) 'সৌন্দর্যের জন্যই ললিতকলা ইহাই Art for Art কথার প্রকৃত অর্থ। এই সৌন্দর্য-সম্ভোগ-জনিত আনন্দের ন্যায় তীব্র মধুর অথচ পবিত্র আনন্দ জগতে আর নাই।[১]

(খ) 'কাব্য-কথা' (মানসী, ১৩২৭ ভাদ্র) প্রবন্ধে (১) 'কাব্যের উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা ইহা একটি পুরাতন সাহিত্যিক বৈধর্ম্ম্য—heresy—অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ফরাশি কবি এবঙ সমালোচক Baudelaire যাহাকে heresie de l'enseignment বলিয়াছেন।' (২) 'বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবি ইতস্তত না করিয়া অসঙ্কোচে পরিষ্কার ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, যে কাব্যের উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা নয়।' (এখানে রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করা হয়েছে।)

'রাস্কিন' প্রবন্ধ পড়ে রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথকে লিখেছেন—'প্রদীপে রাস্কিনের সমালোচনা উপলক্ষে কাব্য ও নীতি সম্বন্ধে যা লিখেছ আমি তার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি।..তোমার প্রবন্ধের অপরাঙশের জন্য উত্‌সুক আছি।'[৬৯]

অন্য প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য-বিতর্কে 'চিত্রাঙ্গদা'র সমর্থনে

রবীন্দ্রনাথের পক্ষে প্রিয়নাথের বক্তব্য। রবীন্দ্রনাথের কলাকৈবল্যবাদে সমর্থন স্পষ্ট।

উপরের তথ্যগুলি মনে রেখে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি সাহিত্যালোচনা বিচার করা যেতে পারে :

১। 'সৌন্দর্য ও প্রেম' (প্রথম প্রকাশ ১২৯১ আষাঢ়, বর্তমানে 'আলোচনা'য় গ্রন্থিত) প্রবন্ধে সৌন্দর্যের কারণ, কবির কাজ, কবিতা ও তত্ত্ব, তত্ত্বের বার্ধক্য, সৌন্দর্যের কাজ প্রভৃতি অঙশের মোট বক্তব্য--অঙ্গা-সামঞ্জস্য সৌন্দর্যস্রষ্টা ; কবির কাজ সৌন্দর্যসৃষ্টি; স্বল্পজীবী, নীরস, ও সঙ্কীর্ণ বলে তত্ত্ব নয় সৌন্দর্যই কাব্যের বিষয়,--তা আনন্দজনক। অতএব, বক্তব্যে কলাকৈবল্যবাদ সমর্থিত হয়েছে; রচনাকাল *Mademoiselle de Maupin* পাঠের অব্যবহিত পরে।

২। 'নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যে প্রকাশেই কবিত্ব আছে, এবঙ সৌন্দর্যসৃষ্টি শিক্ষানিরপেক্ষ নয়। সৌন্দর্যের গঠনকে লক্ষ্য করা হয়েছে বলে এই বক্তব্য পূর্ববর্ণিত আদর্শের অনুসারী। 'সঙ্গীত ও কবিতা'র Lessing-এর Lacoon--এর সঙ্গো রবীন্দ্রনাথের ভাবগত পরিচয় ও তার সমর্থন জানা যায়। কলাকৈবল্যবাদীর ধারণা Lessing-এর বিপরীতমুখী নয়। দুটি প্রবন্ধ পরে 'সমালোচনা' (১৮৮৮) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৩। 'সাহিত্য' (১৯০৭) গ্রন্থের অধিকাঙশ প্রবন্ধ লেখকের এই আদর্শকে সমর্থন করে। ১৩১০ কার্তিকে প্রকাশিত 'সাহিত্যের সামগ্রী' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'সারবান সাহিত্যে উপস্থিত প্রয়োজন মিটে, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় সাহিত্যে স্থায়িত্বের সম্ভাবনা বেশি' বক্তব্যে Gautier-র প্রতিধ্বনি শোনা যায়। 'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধে (১৩১৩ পৌষ) সুন্দরকেই সাহিত্যের বাস্তব বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

নীতি ও সৌন্দর্যের সঙ্গো সাহিত্যের যে সম্বন্ধ এই রচনাগুলিতে তুলে ধরা হয়েছে, তা পূর্বোক্ত কলাকৈবল্যবাদীর ধারণার সঙ্গো অভিন্ন। অন্তত ২৩ বছর ধরে (১২৯১ থেকে ১৩১৩ শন পর্যন্ত) সাহিত্যালোচনায় রবীন্দ্রনাথ যে ধারনার পরিচয় দিয়েছেন তার জন্ম *Mademoiselle de Maupin* উপন্যাসের ভূমিকা। সেজন্যে, রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে নীরব।

নতুন আদর্শটির সঙ্গো পরিচিতির পরে রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬)। প্রথম সঙস্করণের কাব্যটি কবিবন্ধু আশুতোষ চৌধুরি সম্পাদনা করেছিলেন। দীর্ঘকাল পরে 'জীবনস্মৃতি'তে (১৯১২) রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন--'ফরাশি কাব্যসাহিত্যের রসে তাঁহার বিশেষ বিলাস ছিল। আমি তখন কড়ি ও কোমলের কবিতাগুলি লিখিতেছিলাম। আমার সেই-সকল লেখায় তিনি ফরাশি কোনো কোনো কবির ভাবের মিল দেখিতে পাইতেন।' এই ধারনার পিছনে কোনো সত্য না থাকলে ২৬ বছর পরে তা লেখার প্রয়োজন ছিল না। এই কাব্যের বহু সনেটে নগ্ন দেহের বর্ণনায় সৌন্দর্যসৃষ্টি লক্ষ্য করার বিষয়। মধ্য-উনিশ শতকের কলাকৈবল্যবাদী ফরাশি কবিদের মধ্যেও তা ছিল। আর্টের প্রতি এই কারণহীন আকর্ষণ 'কড়ি ও কোমলে' রবীন্দ্রনাথের

ওই ফরাশি মনোভাবটিকে নির্দেশ করে। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী'তে ২৫.৯.১৮৯০ তারিখে French Exhibition-এর কারোলু ডুর্‌ঁয়া অঙ্কিত একটি নগ্ন নারীদেহের চিত্রের দীর্ঘ প্রশংসামূলক আলোচনা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন।

'ফুলদানি' গল্পের নায়িকার একাধিক পুরুষের সঙ্গে প্রেমসম্পর্ককে রবীন্দ্রনাথ সহজভাবে নিতে পারেননি, একথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। অনেক পরে লেখা তাঁর 'নষ্টনীড়' গল্পে দেবরের প্রতি নায়িকার প্রেমাসক্তি অসামাজিক ; এবং সেজন্যেই 'নষ্টনীড়' সম্বন্ধে 'ফুলদানি'র বিরুদ্ধ-সমালোচনার রবীন্দ্রনাথ-কৃত যুক্তি প্রয়োজ্য। অতএব, দুটি গল্প-রচনার মাঝখানে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছিল। 'নষ্টনীড়ে'র এই কাহিনী যে উদ্দেশ্যমূলক এবং পূর্বপরিকল্পিত তার পক্ষে তিনটি প্রমাণ আছে।

১।। 'নষ্টনীড়ে'র প্রায় ৮ বছর আগে লেখা 'মধ্যবর্তিনী' গল্পে দুই নারী এবং এক পুরুষের ত্রিধা প্রেমের দ্বন্দ্বে সংসার নষ্ট হয়েছে। 'নষ্টনীড়ে' দুই পুরুষ ও এক নারীর দ্বন্দ্বের পরিণতিও অনুরূপ। দুটি গল্পের তুলনা পাশাপাশি করা যেতে পারে।[৭০]

(ক) উপসংহারে দুটি গল্প এক ধরনের :

'মধ্যবর্তিনী'

(শৈলবালার মৃত্যুর পরে।)

হরসুন্দরীও একটি কথা বলিল না, নিবারণও একটি কথা বলিল না। উহারা পূর্বে যেরূপ পাশাপাশি শয়ন করিত এখনও সেইরূপ পাশাপাশি শুইল, কিন্তু ঠিক মাঝখানে একটি মৃত বালিকা শুইয়া রহিল, তাহাকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারিল না।

'নষ্টনীড়'

...ভূপতি যখন দ্বারের কাছ পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিল তখন হঠাৎ চারু ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল, 'আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। আমাকে এখানে ফেলে রেখে যেও না।'

* *

ভূপতি চারুকে আসিয়া কহিল, 'না, সে আমি পারিব না।'

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত রক্ত নামিয়া চারুর মুখ কাগজের মতো শুষ্ক সাদা হইয়া গেল, চারু মুঠা করিয়া খাট চাপিয়া ধরিল।

তত্‌ক্ষণাৎ ভূপতি কহিল, 'চলো চারু, আমার সঙ্গেই চলো।'

চারু কহিল, 'না, থাক্‌।'

(খ) চরিত্রের ছকে গল্প দুটি পরস্পর-সদৃশ।
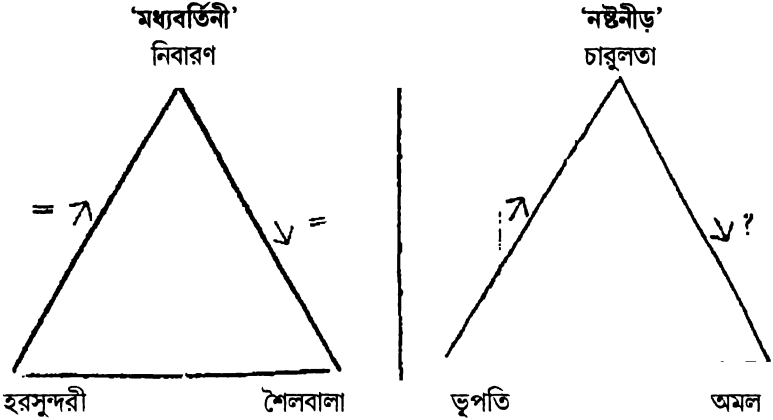
(ব্যবহৃত চিহ্নগুলির অর্থ : '← ' আকর্ষণের লক্ষ্য ; '=' সামাজিক সম্বন্ধ ; '?' অসামাজিক সম্বন্ধ।)

দুটি ছকে পার্থক্য এই, যে নিবারণ-শৈলবালার সম্বন্ধ সমাজ-স্বীকৃত, এবঙ অন্য গল্পে অনুরূপ স্থান নিয়েছে যে দুটি চরিত্র অর্থাত্‌ চারুলতা ও অমল, তাদের প্রেমজ সম্বন্ধ সমাজ-অস্বীকৃত। কয়েক বছরে রবীন্দ্রনাথের পরিণতি এই অসামাজিক সম্বন্ধকে সাহিত্যে বিশ্লেষণ করার ইচ্ছা ও সাহস।

২॥ 'নষ্টনীড়' 'চোখের বালি' উপন্যাসের সমকালীন রচনা। দুটি বৈশিষ্ট্য উভয়ত্র বর্তমান।

(ক) কাহিনীর বুনোট ভাল হলেও কয়েক জায়গায় এক ধরণের বিচ্যুতি আছে, ঘটনাপ্রবাহে যা প্রয়োজনীয়, কিন্তু অবশ্যম্ভাবী বা স্বাভাবিক নয়, বরঙ তাকে আরোপিত বলে মনে হয় : যেমন 'নষ্টনীড়ে' অমলের হঠাত্‌ বিদেশযাত্রা, এবঙ 'চোখের বালি'তে অন্নপূর্ণার কাশীযাত্রা।

(খ) দুটিরই বিষয়বস্তু ত্রিধা প্রেমদ্বন্দ্ব, এবঙ 'নষ্টনীড়ে'র মত 'চোখের বালি'তেও দুই বন্ধুর (মহেন্দ্র ও বিহারী) সঙ্গে বিনোদিনীর প্রেমাকর্ষণ সমাজস্বীকৃত নয়।

৩। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'তমস্বিনী' উপন্যাসে যে বাস্তবতা ছিল এই সময় রবীন্দ্রনাথ তার উদ্দেশ্যকে প্রশঙসা করেছেন।

বাস্তবতা বলতে বোঝায় প্রকৃত বা বাস্তব ঘটনাকে সোজাসুজি দেখা—কল্পনার রঙ চড়িয়ে নয়, এবঙ কোনো সম্ভাব্য ঘটনাকে পাশ না কাটিয়ে যা কিছু দর্শনীয় আছে তাকে লক্ষ্য করা—যদিও তার মধ্যে এমন বিষয় থাকতে পারে, যা ক্লান্তিকর বা কুত্‌সিত। আদর্শবাদ ও রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মধ্য-উনিশ শতকে একজন ফরাশি কথাশিল্পী এই আদর্শে নৈর্ব্যক্তিক বস্তুনিষ্ঠতায় খুঁটিনাটি বিশ্লেষণপূর্ণ

কথাসাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। Prosper Merimée (১৮০৩-১৮৭০), Gustave Flaubert (১৮২১-১৮৮২), Émile Zola (১৮৪০-১৯০২) প্রভৃতি লেখকেরা এই গোষ্ঠিভুক্ত। রবীন্দ্রনাথ যে Merimée-র লেখার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বর্তমান প্রবন্ধেই তার পরিচয় আছে ; Zola-র রচনাও তিনি পড়েছেন। অনুমান করা সম্ভব, Flaubertও তাঁর অপরিচিত ছিলেন না। 'নষ্টনীড়' ও 'চোখের বালি'তে এই ফরাশি বাস্তবতার প্রভাব ফুটে উঠেছে। বোধ হয় সেজন্যে 'রাজর্ষি' ও 'নৌকাডুবি'র মত দুটি কাঁচা, ঘটনাপ্রধান ও বাঁধা রাস্তার উপন্যাসের মধ্যে হঠাৎ 'চোখের বালি' ও 'নষ্টনীড়' লেখা হতে পেরেছিল।

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনের *Western Influence in Bengali Literature* (১৯৩২) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি রচনার পাশাপাশি পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রসঙ্গ আছে। ওই গ্রন্থ সম্বন্ধে একটি আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন--'Then again, the human mind being one, parallel developments along similar lines can be traced in different literatures not suggestive of mutual influence but denoting independent pursuit of truths which are universal. This is specially true of great minds whose highest realizations often present a remaıkable harmony of kinship even though they may be widely seperated by distance and time.'[৭১] অর্থাৎ 'Great minds' কখনো প্রভাবিত বা অনুকারক নন? এবঙ রবীন্দ্রনাথ নিজেকে এই শ্রেণীর অন্তর্গত বলে গণ্য করেন।

---

১. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' 'আত্মজীবনী'তে Fénelon-এর কবিতার বাঙলা অনুবাদ করেছেন। তিনি দার্শনিক Victor Cousin-এর *Du Vrai, du bien et du beau* গ্রন্থ মূল ফরাশিতে পড়েছেন। দ. (ক) যোগীন্দ্রনাথ বসু--'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর', প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৩। (খ) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর--'পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি', প্রবাসী, মাঘ ১৩১৮।

২. I.C.S. পরীক্ষায় ফরাশি ভাষা ও সাহিত্য তাঁর একটি নির্বাচিত বিষয় ছিল। দ. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়--'সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর', প. ১২ (২য় সঙ)। ভারতী পত্রে ১২৯৩, ১৩১৭ শনে ফরাশি থেকে তাঁর অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

৩. দ. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়--জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, প. ২৯। (কলকাতা, ১৩২৬।)

৪. দ. প্রিয়নাথ সেন--প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি (কলকাতা,১৯৩৩)। এতে নিদর্শন আছে। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রমথ চৌধুরি গ্রন্থসঙগ্রহে তাঁর ব্যক্তিগত সঙ্গ্রহের এক হাজারেরো বেশি ফরাশি বই আছে।

৫. লোকেন্দ্রনাথ লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাশি সাহিত্য পড়েছেন। দ. দেবীপদ ভট্টাচার্য--'হেনরি মর্লি ও তাঁর কয়েকজন ছাত্র', বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫৩ কার্তিক-পৌষ, প. ১৫৮।

৬. দ. (ক) আশুতোষ চৌধুরি--'কাব্যজগত', ভারতী ১২৯৩ শন। এই ক্রমশ প্রকাশিত প্রবন্ধে ফরাশি সাহিত্যের আলোচনা, এবঙ Chénier ও Gautier থেকে অনুবাদ আছে। (খ) প্রমথ চৌধুরি তাঁর কাছে ফরাশি শেখেন। দ. প্রমথ চৌধুরি--আত্মকথা, প. ৭৮। (কলকাতা, ১৩৫৩।) (গ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে তিনি ফরাশি শেখান। দ. মন্মথনাথ ঘোষ--'দ্বিজেন্দ্রলাল', পঞ্চপুষ্প, ভাদ্র ১৩৩৯, প. ৩৫২। (ঘ) রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। দ. দেবীপদ ভট্টাচার্য--'আশুতোষ চৌধুরি', দেশ, ১৩৫৩ সাহিত্য সঙ্খ্যা।

৭ R. N. Tagore.–*Talks in China* (1924), in *Contemporary Indian Philosophy* (ed.–S. Radhakrishnan & Muirhead)

৮. পরে গ্রন্থিত 'বিবিধ প্রসঙ্গে' (১৮৮৩) আলোচ্য অংশ বর্জিত হয়েছে।

৯. রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি রচনা দ. (ক) প্রিয়নাথ সেনকে আনুমানিক ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে লেখা তিনটি চিঠি। (খ) 'সাহিত্যের প্রাণ', ১২৯৯ আষাঢ়। (গ) 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য', ১৩১৪ বৈশাখ।

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর--চিঠিপত্র, ৮ম খন্ড, পত্রসংখ্যা ১৮ ও ২৪।

১১. লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র-প্রবন্ধ 'সাহিত্য', সাধনা, বৈশাখ ১২৯৯।

১২. ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী--রবীন্দ্রস্মৃতি, প. ৪৫। (কলকাতা, ১৩৬৭।)

১৩. ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ১১৭। একদা বইটি বাঙ্গালি পাঠকদের প্রিয় ছিল। দ. (ক) শিবনাথ শাস্ত্রী--'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিশেষত্ব কোথায়', প্রবাসী, চৈত্র ১৩১১। (খ) নিত্যকৃষ্ণ বসু--'সাহিত্য-সেবকের ডায়ারী', সাহিত্য, ফাল্গুন ১৩১০। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন--'লেফাফাটি চিঠির একটি প্রধান অঙ্গ--ওটা একটা মস্ত আবিষ্কার। বোধহয় ফরাশি জাতিকে এ জন্যে ধন্যবাদ দিতে হয়।' (পত্রসংখ্যা ১৯৮।) এই গ্রন্থে Amiel-এর *Journal Intime*-এর প্রভাব ছিল। দ. অজিতকুমার চক্রবর্তী--'ছিন্নপত্র', প্রবাসী, পৌষ ১৩১৯।

১৪. ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ১৩৬। (ফরাশি শব্দ tête-à-tête.)

১৫. তদেব, পত্রসংখ্যা ১৬৫।

১৬. Nagendranath Gupta.–*Reflections and Reminiscences*, pp. 60, 66 (Kolkata, 1947.)

১৭. চিঠিপত্র, পঞ্চম খন্ড, প. ৭।

১৮. প্রাগুক্ত, প. ৩৭।

১৯. প্রাগুক্ত, প. ১৪৯। ৬.৫.১৯০০ তারিখে প্রিয়নাথ রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন- 'তোমার ফরাশি ভাষা জানা থাকলে..।' অর্থাত্ রবীন্দ্রনাথ তখনো ফরাশি ভালো জানেন না। এই বছর তিনি ফরাশি ভাষা শেখার চেষ্টা করছেন, ওই ভাষায় তাঁর অধিকার নিপুণ বা বিস্তৃত করা নয়।

২০. দ. চিঠিপত্র, অষ্টম খন্ড, পত্রসংখ্যা ১১৯। 'যশস্বী জুর্দ্যাঁ' Molière-এর *Le Bourgeois Gentilhomme* নাটকের M. Jourdain। ১২২ সংখ্যক পত্রে L'Avare-র প্রসঙ্গ আছে।

২১. তদেব, পত্রসংখ্যা ১২২। তার তারিখ ১৭. ৮. ১৯০০। ৬.৮.১৯০০ তারিখে প্রিয়নাথ সেন রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন--'Molière-এর অনুবাদ পাইয়াছ কি?'(দ. ওই গ্রন্থে প্রিয়নাথের পত্র, প. ২৫৮।) অতএব, রবীন্দ্রনাথ অনুবাদে Molière পড়েছেন।

২২. সাময়িকপত্রের ওই সংখ্যায় 'জুবেয়ারে'র ঠিক পরে Hugo থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনূদিত কবিতা 'ভালোবেসো চিরকাল' প্রকাশিত হয়। কোনোটিতেই লেখকের নাম ছাপা হয়নি। 'জুবেয়ার' প্রবন্ধটি পরে 'আধুনিক সাহিত্যে' (১৯০৭) গ্রন্থিত হয়।

২৩. প্রাগুক্ত, প. ৬৬।

২৪. চিঠিপত্র, নবম খন্ড, প. ২৩০।

২৫. পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (অনু.)--ফরাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ, প. ৮৭।

২৬. প্রাগুক্ত, প. ২২৪-৬। দ. প্রমথ চৌধুরি--'নব বিদ্যালয়', সবুজপত্র, বৈশাখ, আষাঢ়, আশ্বিন ১৩২৫। এই পত্রাকার প্রবন্ধে গ্রন্থটির মর্ম আছে।

২৭. প্রাগুক্ত, প. ২৬৫।

২৮. প্রাগুক্ত, প. ৩৯।

২৯. দ. A. Aronson & K. Kripalani (ed.)–*Tagore and Rolland.*

৩০. বইগুলির আধুনিক সংস্করণে এই কবিতাগুলি বর্জিত হয়েছে। পত্রে প্রকাশের সময় সর্বত্র শিরোনাম ছিল না।

৩১. জ্যোতিবিন্দ্রনাথ ঠাকুর এর অনুবাদ করেন। সমালোচনী, ১৩০৮ আষাঢ় সঙখ্যা এবঙ 'ফরাসী প্রসূন'-এ (১৯০৪) গ্রন্থিত অন্যান্য অনূদিত কবিতার মধ্যে এটি ছাড়া অন্য কোথাও পত্র ও গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাঠভেদ নেই। রবীন্দ্রনাথের আগের অনুবাদের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরে পরিচিতি কি তার কারণ? পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ Hugo থেকে আর কবিতার অনুবাদ করেননি, যদিও ঠিক আগে তা করেছিলেন, এবঙ তাদের অধিকাঙশ *Les Contemplations* কাব্য থেকে গৃহীত।

৩২. দ. চিত্তরঞ্জন দেব–'রবীন্দ্রনাথের লাইব্রেরী', সাময়িকী, দৈনিক যুগান্তর, ১২. ৫. ১৯০৪ 'সাধনা' পত্রে হাইনের কবিতার অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন–'মূল জার্মান হইতে অনুবাদিত।' 'ভারতী' পত্রে বিক্তর উগো থেকে অনুবাদে কোথাও এমন কথা নেই। এই তথ্যের সহায়তা ছাড়াই এ বিষয়ে সত্য অনুমান করা সম্ভব।

৩৩. 'পত্রাবলী', বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩০৫ বৈশাখ, প. ৫৯৮।

৩৪. প্রমথ চৌধুরি–আত্মকথা, প. ৯৪-৯৫। (কলকাতা, ১৩৫৩।)

৩৫. দ. ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসঙখ্যা ৩৮ ও ১৩৮। আগে Daudet ও Coppée পড়ার প্রসঙ্গ আছে। চিঠিপত্র, ৮ম খন্ড, প. ১৫তে *German Popular Stories*-এর কথা আছে। রবীন্দ্রনাথ Mark Twain-এর গল্প বাড়িতে পড়ে শুনিয়েছেন। Edgar Allan Poe-র গল্পের সঙ্গেও তিনি পরিচিত ছিলেন। দ. সুখময় মুখোপাধ্যায়–'এডগার অ্যালান পো', রবীন্দ্রসাহিত্যের নবরাগ।

৩৬. রবীন্দ্রনাথ ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের বর্ষাকালে কিছুদিন চন্দননগরে বাস করেন। পুলিনবিহারী সেন লিখেছেন–'আপদ গল্পের নীলকান্ত যে বাল্যকালে-দেখা শখের যাত্রার ছেলের দলের স্মৃতিতে রচিত চরিত্র, ইহা বর্তমান সঙ্কলয়িতাকে লিখিত একটি পত্রে শ্রীঅমিয়কুমার সেন,ছেলেবেলা হইতে বিভিন্ন অঙশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চন্দননগরের বাগানবাড়ি গল্পের পটভূমি, শরতেব ভাই সতীশকে রবীন্দ্রনাথ বলে চিনে নিতে কষ্ট হয় না, ইহাও তিনি দেখাইয়াছেন।' দ. তথ্যপঞ্জী, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, প. ৬১-৬২। এই যুক্তি কি বিদেশি গল্পগুলির সম্বন্ধেও প্রযোজ্য নয়?

৩৭ 'জীবনস্মৃতি'তে 'ঘরের পড়া' অধ্যায়ে আছে–'এই অবোধবন্ধু কাগজেই বিলাতি 'পৌলবর্জিনী' গল্পের সরস বাঙলা অনুবাদ পড়িয়া কত চোখের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই।..আর সেই মাথায়--রঙিন-রুমাল-পরা বর্জিনীর সঙ্গে সেই নির্জন দ্বীপের শ্যামল বনপথে একটি বাঙালি বালকের কী প্রেমই জন্মিয়াছিল!' প্রিয়রঞ্জন সেন ভুল করে রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের অনুবাদের কথা লিখেছেন। দ. P. R. Sen.–'Influence of Western Literature in the Development of Bengali Novel', *Journal of the Department of Letters,* Vol XXII, p 9. (Calcutta University.)

৩৮. সভ্য মানবসমাজে মনুষ্যপ্রকৃতি বিকৃত বলে Virginie পারি প্রবাসে আঘাত পেয়েছে। সে প্রকৃতি--পালিতা। 'ভিখারিণী'র ব্যবসায়ী মোহনলাল এবঙ ঈর্ষাকাতর ও ক্রূরবুদ্ধি বিজয় এই সমাজের প্রতিভূ ; সেজন্য তাদের সঙস্পর্শে কমলদেবী এবঙ কমলা আহত হয়েছে।

৩৯. Coppée জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রিয় লেখক ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর বহু রচনার অনুবাদ করেছেন, যেমন–(ক) ৩টি কাব্যনাট্য : পথিক, দেশোদ্ধারের রত্নালঙ্কার, কর্তব্য সাধন কর ; (খ) ৭টি কবিতা : চিরদিন, বুদ্ধদেবের পাখী, পত্র, অসির ফসল, অশ্রু, মানী প্রজা, রাত্রি-জাগরণ ; (গ) ৩টি গল্প : পরিচ্ছদ পরিচারিকা, মমতাময়ী, ভালো অপরাধ। গল্পগুলি ছাড়া অন্যান্য রচনা 'ফরাসী-প্রসূন'-এ (১৯০৪) গ্রন্থিত হয়েছে।

৪০. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাণী চন্দ–ঘরোয়া, প. ৮৭-৮৮। (কলকাতা,১৩৫৮।) রবীন্দ্রনাথ এই স্মৃতিকাহিনী পড়েছিলেন। স্মৃতিকাহিনীতে তথ্যগত সামান্য বিচ্যুতি আছে। ঠিক হবে–(ক) Molière-এর একটি নয় দুটি নাটক ভেঙ্গে 'অলীকবাবু' লেখা। (খ) অলীকবাবু হেমাঙ্গিনীকে

বিয়ে করতে পারেনি। (৩) হেমাঙ্গিনীর চরিত্র ফরাশি নাটক থেকে গৃহীত নয়।

৪১ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়--রবীন্দ্রস্মৃতি, প. ১২৭। (কলকাতা, ১৯৫৮।)

৪২. F. L Benedict ও J. H Friswell কৃত ইঙরাজি অনুবাদ *Ninety-three* লন্ডন থেকে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৩৩৬-৩৭ শনে 'বিচিত্রা' পত্রে যোগেশচন্দ্র চৌধুরি এর বাঙলা অনুবাদ 'যুগ-সন্ধি' প্রকাশ করেন।

৪৩ চিঠিপত্র, পঞ্চম খন্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠায় ১৬. ৬. ১৮৯৩ তারিখে প্রমথ চৌধুরিকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি দ্রষ্টব্য।

৪৪. এই দলভুক্ত John Davidson (১৮৫৭-১৯০৯) ফরাশি কাব্যনাট্যকার François Coppéeর নাটক *Pour la Couronne* (১৮৯৫)-এর প্রথম স্বকৃত ইঙরাজি অনুবাদ *For the Crown* (১৮৯৬) প্রকাশ করেন। Austin Dobson-এর *Rose-Leaves* কাব্যের *Urceus Exit* নামের triolet-এর (একটি ফরাশি গঠন) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার মিল যথেষ্ট। Dobson-এর

I intended an ode
And it turned to a sonnet

চরণগুলি রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনাটি গেল ফাটি হাজার গীতে' মনে আনে।

৪৫. 'First, there is refrain, then the amplification of it : then the refrain is repeated, and the amplification also, but the later is modified.' Edward Thompson.–*Rabindranath Tagore . poet and dramatist*, p 227 (1948)

৪৬ তদেব, প. ৩২।

৪৭ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভাবতী', ১৩০৯ আশ্বিন সঙখ্যায় এর অনুবাদ 'পথিক' প্রকাশ করেন। প্রশঙসামূলক আলোচনার মধ্যে 'মানসী', ১৩২১ ভাদ্র সঙখ্যায় প্রিয়নাথ সেনের 'কাব্যকথা' এবঙ ভারতী ১৩২৩ জ্যৈষ্ঠ সঙখ্যায় 'ঊনবিঙশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসী সাহিত্য' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৪৮ 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় কবিতাগুলির কবি-কৃত ব্যাখ্যায় বের্গসঁর কোনো প্রসঙ্গ নেই। তিনি এমন কথাও বলেছেন–'গতিই আমাব ও ভারতীয় চিন্তাধারার এক প্রধান কথা। বলাকাতে সেই গতিরই জয়গান করা হয়েছে। এখানে দেশি বিদেশি প্রভাবের বিচারে কোনো লাভ নেই।' দ. ক্ষিতিমোহন সেন--বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা, প. ৬৯ (২য় সঙ)। শিশিরকুমার মৈত্র প্রভৃতি কয়েকজনের প্রবন্ধে 'বলাকা'য় Bergson-এর প্রভাব আলোচিত হলেও এমন সমালোচকের অভাব নেই যাদের 'বেদ-এ আছে' মনোভাব অপরিবর্তিত ; উল্লিখিত গ্রন্থটি তার উদাহরণ।

৪৯.. প্রাগুক্ত, প. ১৮৯-১৯০। তারিখহীন পত্রটিতে 'সবুজপত্রে'র প্রাপ্তিস্বীকার এবঙ তাতে যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরির প্রবন্ধের প্রসঙ্গ আছে। 'সবুজপত্র'. ১৩২১ ভাদ্র সঙখ্যায় প্রমথ চৌধুরির 'ইউরোপে কুরুক্ষেত্র' প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছিল। অতএব. রবীন্দ্রনাথের চিঠি ১৩২১ আশ্বিনে (অর্থাত্ সেপ্টেম্বর ১৯১৪) লেখা বলে অনুমান করা সম্ভব। Chicago থেকে ২১. ১. ১৯১৩ তারিখে রবীন্দ্রনাথ মীরা দেবীকে লিখেছিলেন--'Dr. Eucken এবঙ Bergson এঁরা দুজনে এখন য়ুরোপের মধ্যে সর্বপ্রধান দার্শনিক।' দ. চিঠিপত্র, চতুর্থ খন্ড, প. ৪৮।

৫০. প্রাগুক্ত, প. ২৯২।

৫১. সীতা দেবী (অনু.)–'সুন্দরীর চরণ-কমল', প্রবাসী, ১৩২৫ অগ্রহায়ণ।

৫২. দ. (ক) সীতা দেবী–'পুণ্যস্মৃতি', প. ৪০০-১; (খ) 'জীবনস্মৃতি' : নানাবিদ্যার আয়োজন' ; (গ) 'ছেলেবেলা', ৭ম অধ্যায়।

৫৩. ড. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই বিষয় এবঙ *Lettres de Mon Moulin*র *Ballades en Prose*-এর সঙ্গে 'লিপিকা'র রীতিগত মিল সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। দ. 'কথাকোবিদ

রবীন্দ্রনাথ' (১৩৭৩), প. ৩২-৩৪, ৭১-৭৭।

৫৪. ফরাশি থেকে এর একাধিক বাঙলা অনুবাদ হয়েছে, যেমন-- (ক) চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়--'বার্লিন অবরোধ', প্রবাসী, ১৩২১ পৌষ ; (খ) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর--'বার্লিনের অবরোধ', প্রবাসী, ১৩৩১ শ্রাবণ।

৫৫. 'ছিন্নপত্রাবলী', পত্রসঙখ্যা ১৪৯।

৫৬. গল্পটির অনুবাদের জন্য দ. মৃদুলকান্তি বসু (অনু.)--'একাদশ শার্লের চকিত দর্শন', নীলকণ্ঠ, শারদ সঙখ্যা ১৩৯০, প. ৩৯-৪৬।

৫৭. বাঙলা অনুবাদের জন্য দ. সুবোধ চট্টোপাধ্যায় (অনু.)--'তাঁতাজিলের মৃত্যু', ভারতী, ১৩২৩ শন।

৫৮. *Calcutta Review* (Vol. 44), 1932 September সঙখ্যায় বিনায়ক সান্যাল *Foreign Influence in the Poetry of Rabindranath* প্রবন্ধে এ বিষয়ে সঙক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। এই প্রবন্ধ এবঙ *Calcutta Review* (Vol 47), 1933 April সঙখ্যায় জয়ন্ত কুমার দাশগুপ্তের *Western Influence on the poetry of Rabindranath* প্রবন্ধে বহু ইঙরাজ লেখকের রচনা থেকে রবীন্দ্রনাথের 'হরণ' আলোচিত হয়েছে। আমি Maeterlinck-এর *The Double Garden* কেবল ইঙরাজি অনুবাদে পড়েছি।

৫৯. 'চিরকুমার সভা' ও তার পূর্বরূপ 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' প্রকৃতপক্ষে Tennyson-এর *The Princess* কাব্য থেকে গৃহীত। কাব্যটির কাহিনীগত গঠন মোটামুটি অব্যাহত রেখে, তাকে পুরুষদের দিক থেকে দেখে (কারণ ইঙরাজিতে মেয়েদের দিক থেকে দেখা হয়েছে) এবঙ তার সঙ্গে সঙস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতা জুড়ে দেশি রূপ দিলে 'চিরকুমার সভা'র সৃষ্টি।

৬০. চিঠিপত্র, ৮ম খন্ড, প. ১৪৫, পত্রসঙখ্যা ১৩১।

৬১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়--'রবীন্দ্রজীবনী', ১ম খন্ড (১৩৬৭), প. ৪৫৫। এই উদ্ধৃতির পূর্বে আছে ---'অনেকগুলি ফরাসি উপন্যাসের তর্জমাও করিতেছেন ; আনাতোল ফ্রাঁসের ক্রাইম্ অব্ সিলভেষ্টার বনার্ড উপন্যাসের মূল ফরাসীর খোঁজ করিতেছেন--ইচ্ছা, মূল ফরাসীর সঙ্গে মিলাইয়া তর্জমাটা পড়েন।' এই তথ্য কতখানি বিশ্বাসযোগ্য জানি না, কারণ (ক) এখানে প্রিয়নাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত পত্রাঙশের উপর নির্ভর করা হয়েছে, অথচ তাতে মূল ফরাশির সঙ্গে মিলিয়ে তর্জমা পড়ার কোনো ইচ্ছা প্রকাশিত হয়নি। (খ) অনেকগুলি ফরাশি উপন্যাসের তর্জমা করার কথা কপোলকল্পিত, কারণ এ বক্তব্যের পক্ষে কোনো প্রমাণ দেওয়া হয়নি, এবঙ রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস তর্জমা করার মত ফরাশি জানতেন না। শুধু বোঝা যায়, তথ্য ছাড়াও জীবনী লেখা যায়, অবশ্য কল্পনার অধিকার সুদূরবিস্তৃত হলে।

৬২. ১৩২৬ আষাঢ়ে প্রকাশিত এই প্রবন্ধটি পরে 'কালান্তরে' (১৯৩৭) সঙগৃহীত হয়।

৬৩. মোহিতলাল মজুমদার 'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে Swinburne-এর *Atalanta in Calydon*-এর Chorus-এর সঙ্গে এবঙ বিনায়ক সান্যাল ও জয়ন্ত কুমার দাশগুপ্ত যথাক্রমে Swinburne-এর আফ্রোদিতি-বর্ণনা ও *Hymn to Proserpine*-এর সঙ্গে 'উর্বশী'র মিল নির্দেশ করেছেন।

৬৪. তাঁর *Old World Idylls* কাব্যের Une Marquise কবিতার সঙ্গে 'উর্বশী'র কিছু মিল লক্ষ্য করার মত, যেমন--

You were neither Wife nor Mother,
Belle Marquise

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।

ইঙরাজি কবিতাটির (Marquise চরিত্র Molière-এর *Le Bourgeois Gentilhomme* থেকে গৃহীত) মানবসম্বন্ধাতীত সুন্দরী নারী।

৬৫. প্রাগুক্ত, পত্রসঙখ্যা ৮, ২৫ ও ৩২। সম্পাদকেরা পত্রগুলিকে ১৮৮৩ ও ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত বলে অনুমান করেছেন। ৮ম পত্রের সময় উপন্যাসটি পড়া চলেছে, ২৫শ পত্রে পড়া শেষ হবার খবর আছে, এবঙ ৩২শ পত্রে আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশিত হয়েছে। পত্রগুলির কালপরিধি নিশ্চয় বিস্তৃত নয়। সেক্ষেত্রে রচনাকালকে দুটি বছরে বিস্তৃত বলে অনুমান করা হয়েছে কেন? প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রজীবনী', ১ম খন্ডে (৩য় সঙ), ১৫৫ পৃষ্ঠায় এই উপন্যাস পাঠের সময় ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ, এবঙ ২১৮ পৃষ্ঠায় ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ লিখেছেন। 'রবীন্দ্রজীবনী' একটি উপাদেয় বই, কারণ কালবিচারে লেখক নিরঙ্কুশ।

৬৬. 'সাধনা'য় প্রকাশিত এই প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লোকেন পালিতের আলোচনার ফল।

৬৭. প্রবন্ধটি পরে 'সাহিত্যে' (১৯০৭) গ্রন্থিত হয়েছে।

৬৮. প্রাগুক্ত, প. ২৪৯। রবীন্দ্রনাথকে লেখা প্রিয়নাথের ৮ম পত্র দ্রষ্টব্য।

৬৯. প্রিয়নাথ সেন—'প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি' (১৩৪০), পরিশিষ্ট, প. ৭৮। 'ছিন্নপত্রাবলী'তে ১.৩.১৮৯৫ তারিখে লেখা ১৯৫ সঙখ্যক চিঠিটি প্রসঙ্গত স্মরণীয়, কারণ সেখানে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এরূপ : ভাবের নূতনত্ব বা আকর্ষণ কাব্যে প্রধান নয় যেহেতু তা পুরানো, এবঙ রচনাশৈলীর আকর্ষণীয়তা ও দক্ষতাই কাব্যের প্রাণ। এই style-কেন্দ্রিক বক্তব্য লেখকের কলাকৈবল্যবাদী মনোভাবের সূচক।

৭০. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অজ্ঞাত কারণে এরূপ তুলনার বিরোধিতা করে লেখেন—'রবীন্দ্রনাথের সাধারণ ছোটগল্পের সুরের সঙ্গে 'নষ্টনীড়ের' সুরের মিল কম; ইহার মধ্যে প্রেমের যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে, তাহা ইতিপূর্বে তাঁহার আর কোনো গল্পের মধ্যে প্রকাশ পায় নাই।' দ. 'রবীন্দ্রজীবনী', ২য় খন্ড (১৩৫৫), প. ৬২।

৭১. *Calcutta Review* (Vol 46)-এর 1933 January সঙখ্যায় Rabindranath Tagore—*Western Influence in Bengali Literature : a review* (প. ১৩) দ্রষ্টব্য।

প্রবন্ধটি দুটি পর্বে **প্রান্তিক** (নবপর্যায়) পত্রে প্রথম বর্ষে এভাবে প্রকাশিত হয়েছিল—৩য় সঙখ্যা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৫, প. ১৩৯-১৬৬ (Le lac পর্যন্ত) ; ৪র্থ সঙখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৬, প. ২০৩-২৪৯ ('কঙ্কাল' থেকে)।

(পুনর্মুদ্রণে কখনো সামান্য সঙশোধন আছে।)

ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ, ত্রিপুরা ও ফরাশি সাহিত্য

সাহিত্যচর্চায় রবীন্দ্রনাথের একজন গুরু তাঁর নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। ফরাশি থেকে বাঙলায় দুটি অনুবাদ 'পুরুবিক্রম' ও 'সরোজিনী' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজের মৌলিক রচনা বলে চালিয়েছেন, ধরা পড়েননি। তাতে সাহস পেয়ে 'অলীকবাবু'কেও তেমনি মৌলিক বলে চালাতে সফল হয়েছেন। তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ ফরাশি সাহিত্যের খবর পেতেন, রবীন্দ্রনাথ ফরাশি ভাষা সামান্য শিখেছিলেন, ইঙরাজি অনুবাদে ফরাশি রচনা পড়তেন, এবঙ এমন কয়েকটি রচনার আদলে মৌলিক রচনার অভ্যাস করেছিলেন।

'অবোধবন্ধু' পত্রে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য স্যাঁ পিয়ের রচিত ফরাশি উপন্যাস *Paul et Virginie*-র অনুবাদ 'পৌলভর্জিনী' নামে প্রকাশ করেন। (পৌষ ১২৭৫—পৌষ ১২৭৬)। 'জীবনস্মৃতি'তে (১৯১২) রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন--'এই অবোধবন্ধু কাগজেই বিলাতি পৌলবর্জিনী গল্পের বাঙলা অনুবাদ পড়িয়া কত চোখের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই।..আর সেই মাথায়-রঙিন-রুমাল-পরা বর্জিনীর সঙ্গে সেই নির্জন দ্বীপের শ্যামল বনপথে একটি বাঙালি বালকের কী প্রেমই জন্মিয়াছিল!' লিখতে ভুলে গেছেন, যে তাঁর 'ভিখারিণী' (১২৮৪) গল্প ও 'বনফুল' (১৮৭৮) কাব্যের উত্স 'পৌলভর্জিনী'।

ফরাশি উপন্যাসটির কাহিনীতে মরিশাস দ্বীপের সমুদ্রবেষ্টিত পার্বত্য উপত্যকায় পোল ও বির্জিনি নামে দুটি পিতৃহীন বালক-বালিকা পরস্পরকে ও প্রকৃতিকে ভালবেসে বড় হয়ে উঠছিল। পরে বির্জিনি পারি শহরে ধনী আত্মীয়ার কাছে শিক্ষালাভের জন্য যায়, এবঙ ফেরার পথে জাহাজডুবিতে মারা যায়। ভগ্নহৃদয় পোলের মৃত্যু হয় দু মাস পরে। তাঁর গুরু রুসোর মত ঔপন্যাসিকেরও বক্তব্য, বিশ্বকর্তার সৃষ্টিতে সবই সুন্দর-- প্রকৃতি মধুর, প্রেম মনোহর। মানুষের হাতে সব বিকৃত হয়ে যায়।

'ভিখারিণী'র অমরসিঙহ ও কমলদেবী সমাজের বাইরে, কাশ্মীরের পার্বত্য উপত্যকায় নিজেদের প্রেম ও প্রকৃতির শোভায় আনন্দমগ্ন ছিল। পিতার আদেশে বিয়ের পূর্বে অমর যুদ্ধযাত্রা করল এবঙ নীচ মোহনলালের সঙ্গে কমলদেবীর বিয়ে হল। দুঃখাহত দুজনের দেখা হল কমলদেবীর মৃত্যুশয্যায়। 'বনফুলে' কমলার স্বামী বিজয়ের আঘাতে তার বাল্যপ্রণয়ী নীরদের মৃত্যু হলে শোকাহত কমলাও মারা গেল। উভয়ত্র ঘটনাস্থল সমাজের বাইরে হ্রদ বা নদীর ধারে পার্বত্য প্রকৃতি ; প্রধান চরিত্র দুটি আত্মমগ্ন, প্রকৃতিপ্রেমিক, অনাথ, নিষ্কলুষ কিশোর-কিশোরী ; সমাপ্তিতে একের মৃত্যুতে অন্যের মৃত্যু বা গভীর শোক। সভ্য সমাজে মনুষ্যপ্রকৃতি বিকৃত বলে প্রকৃতি-লালিতা বির্জিনি পারিতে দুঃখ পেয়েছে। 'ভিখারিণী'র ব্যবসায়ী মোহনলাল এবঙ 'বনফুলে'র ঈর্ষাকাতর ও ক্রূরবুদ্ধি বিজয় সভ্য সমাজের প্রতিভূ। তাদের সঙস্পর্শে যথাক্রমে কমলদেবী ও কমলা আহত হয়েছে। ভাব ও কাহিনীবিন্যাসে এগুলি 'পৌলবর্জিনী'র অনুকরণ। সামান্য পার্থক্য হল 'ভিখারিণী'তে নায়িকার পরিবর্তে নায়কের বিদেশযাত্রা, 'বনফুলে' প্রথমে নায়কের মৃত্যু, এবঙ দুটিতেই নায়িকার বিয়ে, ফরাশিতে যার

আভাসমাত্র ছিল। 'ভিখারিণী'তে ডাকাতদের অত্যাচারে, দাসব্যবসায়ীদের ভয়ে ভীত পোল ও বির্জিনির কথা মনে পড়ে।

কাহিনীনির্মাণক্ষমতা ক্রমশ আয়ত্ত হলে, বিশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ বোধহয় পূর্বস্মৃতি রোমন্থন করে 'অধ্যাপক' (ভাদ্র ১৩০৫) ও 'দর্পহরণ' (ফাল্গুন ১৩০৯) গল্পে পূর্বের রচনাপদ্ধতি সম্বন্ধে, কল্পিত গল্পচোর নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন। 'অধ্যাপক'-এ বামাচরণ 'বুঝাইয়া দিলেন যে, আমেরিকার সুলেখক সুবিখ্যাত লাউয়েল সাহেবের প্রবন্ধ হইতে আমার প্রবন্ধটির যে-অংশ চুরি সে-অংশ অতি চমত্কার এবং যে-অংশ আমার সম্পূর্ণ নিজের সেটুকু পরিত্যাগ করিলেই ভালো হইত।' তাছাড়া 'আমার এই নাটকের অনেকগুলি দৃশ্য এবং মূল ভাবটি গেটে-রচিত টাসো নাটকের অনুকরণ, এমনকি অনেক স্থলে অনুবাদ।' তবে ভরসার কথা 'সাহিত্যরাজ্যে চুরিবিদ্যা বড়ো বিদ্যা, এমনকি ধরা পড়িলেও।' আবার--'যাঁহারা পুরাতত্ত্বের মর্যাদা লঙ্ঘন করিতে চাহেন না তাঁহারা বলিতেন, ইতিহাসে এরূপ ঘটে নাই। আমি বলিতাম, সে ইতিহাসের দুর্ভাগ্য! ঘটিলে ঢের বেশি সরস ও সত্য হইত।" 'দর্পহরণে' হরিশ বলেছে--'ইংরেজি গল্পের বই দেদার পড়িতে লাগিলাম। অনেকগুলা গল্প ভাঙিয়া-চুরিয়া একটা প্লট দাঁড় করাইলাম। প্লটটা খুবই চমত্কার হইয়াছিল, কিন্তু মুশকিল এই হইল, বাঙলা-সমাজে সে-সকল ঘটনা কোনো অবস্থাতেই ঘটিতে পারে না।' অতিপ্রাচীন কালের পাঞ্জাবের সীমান্তপ্রদেশে গল্পের ভিত্তি কাঁদিলাম।'

শেষ বক্তব্যের সময় কি 'ভিখারিণী' গল্পের স্মৃতি ছিল? এবং ঐতিহাসিক কাহিনীর প্রসঙ্গে 'মুকুট-রাজর্ষি'র?

দীর্ঘ চর্চায় ঋণগোপনে তাঁর ক্ষমতা ক্রমশ সমৃদ্ধ হয়েছে। স্তাবকদের প্রশংসাতেও তা বোঝা যায়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন--'অলীকবাবু জ্যোতিকাকা মহাশয়ের লেখা..অত তো পাকা লিখিয়ে ছিলেন, কিন্তু ফরাসী ছায়া থেকে মুক্ত হতে পারেন নি।..রবিকাকা তো অনেক অদলবদল করে দিয়ে তা ফরাসী গন্ধ থেকে মুক্ত করালেন। এখানেই হল রবিকাকার আর্ট। আর করলেন কী হেমাঙ্গিনীর প্রার্থীর সংখ্যা বাড়িয়ে দিলেন।' (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাণী চন্দ--ঘরোয়া (১৩৫৮), প. ৮৭-৮৮।) সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন--'রবীন্দ্রনাথ বললেন সেরা বিদেশী উপন্যাস বাঙলায় অনুবাদ করতে। লাইন ধরে অনুবাদ নয়।..বিদেশী উপন্যাস পড়ে মূল কাহিনীটিকে নিজের ভাষায় বেশ সাবলীল ভঙ্গীতে লিখতে হবে। বিদেশী উপন্যাসের মধ্যে যেসব চরিত্রাদি আমাদের দেশের পাঠকসমাজ ঠিক উপলব্ধি করতে পারবে না, তা বাদ দিলেও দোষ হবে না।' (সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়--রবীন্দ্রস্মৃতি (১৯৫৮), প. ১২৭।)

এসব উপদেশ অভিজ্ঞতা ছাড়া কি দেওয়া যায়? কখনো ধরা পড়লে ঋণ অস্বীকার করা কি কঠিন?

২

১২৯২ শনে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি থেকে ছোটদের জন্য 'বালক' নামে মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। সম্পাদিকা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী : কর্মাধ্যক্ষ ও প্রধান লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছোটদের জন্য গল্প লিখতে হবে, কিন্তু মাথায় ভাল প্লট আসছে না। উপায় কি?

সাহসী যে, জয় তার করায়ত্ত। অভিজ্ঞতাও আছে। তখন নবপ্রতিষ্ঠিত ফরাশি লেখক ফ্রাঁসোয়া কপ্পে-র (১৮৪২-১৯০৮) রচনা এদেশে অল্পজ্ঞাত হলেও রবীন্দ্রনাথের কাছে পরিচিত। পরে তিনি লিখেছেন—'Coppé পড়া গেল।' ('য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' (১৮৯১) গ্রন্থের খসড়ায় ১৩.৯. ১৮৯০ তারিখের কথা।) ভাইঝি ইন্দিরাকে কপ্পের বই উপহার দিয়েছেন। (ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী—রবীন্দ্রস্মৃতি (১৩৬৭), প. ৪৫।) পরে কপ্পের কয়েকটি রচনার অনুসরণ তিনি করেছেন। তাঁর একটি কাব্যনাট্য *Le Luthier de Crémone*-এর (ক্রেমোন শহরের বেহালানির্মাতা, ১৮৭৬) কাহিনীর সঙক্ষিপ্তসার এরূপ :

১৮শ শতকে ক্রেমোন শহরের শ্রেষ্ঠ বেহালানির্মাতা তাদ্দেয়ো ফেবারি তাঁর একমাত্র মেয়ে জিয়ান্নিনার বিয়ে দেবার কথা ভাবছেন। তাঁর দুজন সেরা ছাত্র সাঁদ্রো ও ফিলিপ্পো : দুজনেই বিবাহপ্রার্থী। ফিলিপ্পো কুঁজো কিন্তু কুশলী নির্মাতা, পরিশ্রমী, উদার এবঙ সঙ্গীতশিল্পী। জিয়ান্নিনা তার বন্ধুত্ব কামনা করে, কিন্তু ভালবাসে সুদর্শন সাঁদ্রোকে, যে বেহালানির্মাণে অপেক্ষাকৃত অদক্ষ এবঙ ফিলিপ্পোর প্রতি ঈর্ষাকাতর। ফেরারি বলেছেন, যে জিয়ান্নিনা তাঁর যথেষ্ট বিত্তের অধিকারিণী হবে। তিনি জামাতা হিশাবে চান কুশলী ও পরিশ্রমী বেহালানির্মাতা, এবঙ মেয়ের ব্যক্তিগত পছন্দ সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ নেই। একটি প্রতিযোগিতায় প্রার্থীরা স্বনির্মিত বেহালা জমা দিলে, বিচারে শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী পুরস্কার পাবেন। পুরস্কারবিজয়ীর সঙ্গে তিনি মেয়ের বিয়ে দেবেন। ফিলিপ্পো ও সাঁদ্রো বেহালা তৈরি করেছেন। ফেরারির ঘর থেকে চুরি করে ফিলিপ্পো যে সেরা বার্নিশ ব্যবহার করেছেন তা দুষ্প্রাপ্য : তাঁর নির্মাণও ভাল। সাঁদ্রো নিজের সম্বন্ধে হতাশ : জিয়ান্নিনাও তার সম্বন্ধে সন্দিহান। তখন জিয়ান্নিনার সঙ্গে আলাপের সময় ফিলিপ্পো নিজের নতুন বেহালায় আনন্দের সুর বাজিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিলে, প্রেমের ব্যর্থতার সম্ভাবনায় সে কাঁদল। তাতে ফিলিপ্পো অবাক হলে, জিয়ান্নিনা সাঁদ্রোর সঙ্গে নিজের গোপন প্রেমের কথা জানাল। দুঃখিত ফিলিপ্পো স্থির করল, যে সে পথের কাঁটা হবে না। প্রতিযোগিতার পূর্বদিন গোপনে ফিলিপ্পো নিজের তৈরি বেহালা সাঁদ্রোর চিহ্নিত বাক্সে এবঙ সাঁদ্রোর তৈরি বেহালা নিজের চিহ্নিত বাক্সে বদল করল : উদ্দেশ্য সাঁদ্রোকে জয়ী করা। এই বদল সাঁদ্রোর অজানা : ফিলিপ্পো আড়ালে থেকে জিয়ান্নিনাকে সুখী করতে চেয়েছে। প্রতিযোগিতায় পাঠাবার ঠিক আগে, জেতার জন্য সাঁদ্রো কৌশলে, অন্যের অগোচরে, তাড়াতাড়ি আবার বাক্স ঠিক রেখে বেহালা বদল করে। ফলে, প্রতি বাক্সে ঠিক বেহালা রইল। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে ফিলিপ্পো পুরস্কার পেল। কিন্তু পুরস্কার সাঁদ্রোর হাতে অর্পণ করে, তার শুভকামনা করে ফিলিপ্পো নিজে বিদেশযাত্রার সঙ্কল্প করল।

গল্পের মাঝখানে বেহালা-বদলের প্লটের রূপান্তর করা এবঙ তা আড়াল করতে গল্পকে বিস্তৃত করা সম্ভব। ছদ্ম-ঐতিহাসিক অবয়বও ঋণগোপনে সহায়ক হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরায় কাহিনী স্থাপন করে 'মুকুট' গল্প লিখলেন। 'বালক' পত্রে তার প্রকাশ হল এভাবে--

সঙখ্যা (প্রিষ্ঠা)	প্রকাশের তারিখ	পরিচ্ছেদ
বৈশাখ ১২৯২ (প. ২৩-৩৩)	১৩.৪.১৮৮৫	প্রথম থেকে পঞ্চম
জ্যৈষ্ঠ ১২৯২ (প. ৬৪-৭১)	১৩. ৫. ১৮৮৫	ষষ্ঠ থেকে একাদশ, পরিশিষ্ট

'মুকুট' গল্পের কাহিনীর সঙক্ষিপ্তসার এরূপ--

ত্রিপুরারাজ অমরমাণিক্যের তিন ছেলে চন্দ্রকুমার, ইন্দ্রকুমার ও রাজধর তাঁদের পিতৃগুরু ও সেনাপতি বৃদ্ধ ইশা খাঁ-র ছাত্র। তাঁকে সেনাপতি নাম ধরে ডাকায় রাজধর বিরক্তি প্রকাশ করে রাজার কাছে প্রতিকার প্রার্থনা করায় সকলেই তাকে পরিহাস করেন। পরে রাজকুমারদের ধনুর্বিদ্যা পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। বিষয়টি লঘু করার জন্য তাঁর দাদারা একত্রে শিকারে যাওয়া স্থির করেন। ধনুর্বিদ্যায় চন্দ্রকুমার অপারদর্শী, মেজ ইন্দ্রকুমার সুদক্ষ, এবঙ ছোট রাজধর কূটবুদ্ধি। রাজধর ইন্দ্রকুমারের ঘরে গিয়ে তাঁর স্ত্রী কমলাদেবীকে পরামর্শ দেন শিকারের রাত্রে তাঁকে আটকাতে, এবঙ সেই কাজে সাহায্য করতে ধনুর্বাণ লুকাবার জন্য ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রাগারে ঢোকেন। দুষ্ট অভিসন্ধি সন্দেহ করে কমলাদেবী তাঁকে ঐ ঘরে তালাবন্ধ করেন। তখন রাজধর নিজের নামাঙ্কিত একটি তীর ইন্দ্রকুমারের তূণীরে এমনভাবে রাখেন, যেন সেটি তাঁর হাতে প্রথমে ওঠে, এবঙ ইন্দ্রকুমারের নামাঙ্কিত একটি তীর নিজে তুলে নেন। ইন্দ্রকুমার ঘরে এলে কমলাদেবী তাঁর প্রতিজ্ঞা আদায় করে রাজধরকে মুক্তি দেন। ইন্দ্রকুমার তাঁকে পরিহাস করেন। পরীক্ষার দিন মাঠে দূরে লক্ষ্যবস্তু স্থাপিত হয়েছে : বিচার ও পুরস্কারদানের জন্য রাজা ও সেনাপতি উপস্থিত হয়েছেন। সকলের তীরনিক্ষেপের পরে দূর থেকে দেখা গেল, কেবল ইন্দ্রকুমারের তীর লক্ষ্যভেদ করেছে। কিন্তু রাজধরের আপত্তিতে কাছে গিয়ে দেখা গেল, শুধু রাজধরের নামাঙ্কিত তীর লক্ষ্য বিদ্ধ করেছে। সকলে সন্দেহ করেন, ইশা খাঁ আবার পরীক্ষার প্রস্তাব করেন, কিন্তু তাতে রাজধর আপত্তি করেন। রাজধর পুরস্কার পেয়ে তা ইন্দ্রকুমারকে দিতে চাইলে, তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

এখানে পঞ্চম পরিচ্ছেদের সমাপ্তি হয়েছে। তার পরে আছে--

রাজধরের চালাকি বুঝে ইন্দ্রকুমারের ঘৃণা হল। তিনি শত্রু আরাকানরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে চাইলে রাজা তিন রাজকুমারকেই পাঠান। রাজধর সসৈন্য পৃথক থাকেন। দ্বিতীয় দিনেও যুদ্ধ নিষ্ফল হলে, যুদ্ধের নিয়ম ভেঙে রাত্রে, অন্যের অজ্ঞাতে, অতর্কিত আক্রমণে রাজধর আরাকানপতিকে বন্দী করেন। তিনি রাজধরকে মুকুট উপহার দিয়ে সন্ধি করেন। পরদিন যুদ্ধে চন্দ্রকুমার ও ইন্দ্রকুমার প্রায় জয়লাভের অবস্থায় এলে হঠাৎ যুদ্ধ বন্ধ হল। রাজধর হাসিমুখে মুকুট নিয়ে ফিরলে সকলে তাঁকেই দোষী সাব্যস্ত করেন। অপমানিত রাজধর আরাকানপতির কাছে গোপন বার্তা পাঠালে তিনি

প্রত্যাবর্তনরত অসতর্ক চন্দ্রকুমার, ইন্দ্রকুমার ও ইশা খাঁ-কে যুদ্ধে আহত-নিহত করেন। দু ভাই নদীতীরে মৃত্যুকালে সঙলগ্ন হলেন। বিজেতারা ত্রিপুরার অঙশবিশেষ অধিকার করেন। রাজধর তিন বত্সর রাজত্ব করে আত্মহত্যা করলে ইন্দ্রকুমারের ছেলে কল্যাণমাণিক্য রাজা হন।

দুটি কাহিনীর মিল এরূপ--

Crémone	...	ত্রিপুরা
Ferari	...	ইশা খাঁ
Filippo	...	ইন্দ্রকুমার
Sandro	...	রাজধর
বেহালানির্মাণ পরীক্ষা	...	ধনুর্বিদ্যা পরীক্ষা
বাক্স ঠিক, বেহালা বদল	...	তূণীর ঠিক, তীব বদল
বিজয়ীর (Filippo) পুরস্কারদান	...	বিজয়ীর (রাজধর) পুরস্কারদান

'মুকুটে'র দ্বন্দ্ব ভ্রাতৃবিরোধ থেকে, যার সমাপ্তি পরীক্ষায়। পঞ্চম পরিচ্ছেদে তা সমাপ্ত। তার পরবর্তী কাহিনীর সঙ্গে, একই চরিত্রগুচ্ছের উপস্থিতি ছাড়া পূর্বের যোগ আবশ্যিক নয়। ফরাশি কাহিনীও পুরস্কারদানে সমাপ্ত। 'মুকুটে'র নাট্যরূপে (৩১. ১২. ১৯০৮) দশম পরিচ্ছেদের কাহিনী পরিবর্তিত হয়। ইশা খাঁ যুদ্ধে মারা যান, এবঙ চন্দ্রকুমারের মৃত্যুকালে তাঁর সঙ্গে যখন ইন্দ্রকুমারের দেখা হল, তখন ইন্দ্রকুমারের পদতলে রাজধর মুকুট রাখলেন। একাদশ পরিচ্ছেদ ও পরিশিষ্ট বর্জিত। এতেও দুটি বিচ্ছিন্ন দ্বন্দ্ব নাটকে স্থান পেয়েছে। ফরাশি ঋণ গোপন থাকেনি।

প্রচ্ছন্ন রাখার ইচ্ছা থেকেই ঐতিহাসিক অবয়ব দানের প্রয়াস। রবীন্দ্রনাথের আকরগ্রন্থ কৈলাসচন্দ্র সিঙহ লিখিত 'ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায় থেকে প্রাসঙ্গিক অঙশ নিচে উদ্ধৃত হল। তা থেকে দেখা যাবে, 'মুকুটে'র পঞ্চম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত তার সঙ্গে ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নেই,—বিকৃতিসহ বাহ্য ও ক্ষীণ যোগ আছে পরবর্তী অঙশের সঙ্গে। অর্থাত্ এখানে ইতিহাসের বিলম্বিত অনুপ্রবেশের কারণ ঋণগোপনের চেষ্টা।

'ত্রিপুরেশ কিয়ত্কালমাত্র শান্তিভোগ করিয়াছিলেন। বিজাতীয় শত্রুদমন জন্য পুনরায় তাঁহাকে অস্ত্রধারণ করিতে হইয়াছিল। বঙ্গীয় শাসনকর্তা সেখ ইসলাম খাঁ ঢাকা নগরীতে রাজধানী স্থাপন করিয়া ১০১৯ ত্রিপুরাব্দে ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। অমরমাণিক্য ইষা খাঁ নামক একজন সেনাপতিকে বৃহত্ এক দল সৈন্যের সহিত তদভিমুখে প্রেরণ করিলেন। ইষা খাঁ সম্মুখীন হইয়াও সুসময়ের অপেক্ষায় বিপক্ষগণের আক্রমণে ক্ষান্ত ছিলেন। ত্রিপুরার প্রধান মন্ত্রী এই সঙবাদ শুনিয়া আরও একদল সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরণ করিয়া লিখিলেন, তিনি এই পত্র পাইবার পর সময়ের অপেক্ষা না করিয়া যেন সঙ্গ্রামে প্রবৃত্ত হন। ঐ সময় অমরমাণিক্যের পত্নী ইষা খাঁকে পাদোদক প্রেরণ করিলেন এবঙ বলিয়া পাঠাইলেন ইষা খাঁ তাহা গ্রহণ করিয়া শীঘ্র শত্রুবিনাশ পূর্বক রাজধানীতে

প্রত্যাগমন করে। ইষা খাঁ রাজ্ঞীর স্নেহসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া সেই পাদোদক গ্রহণ করিলেন। তিনি সমস্ত সৈন্যকে পশ্চাতে রাখিয়া স্বয়ঙ দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী ও অল্পমাত্র পদাতি সঙ্গে লইয়া বিপক্ষগণকে আক্রমণ করেন। মুসলমানেরা প্রথম উদ্যমেই পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। ইষা খাঁ জয়ী হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজা ও রাজ্ঞী উভয়েই তাঁহাকে বহুবিধ পুরস্কার দিলেন। কথিত আছে তত্পরে উদয়পুরে ভূতের দৌরাত্ম্য হইয়াছিল, এবঙ মহারাজ অমরমাণিক্য তন্নিবারণ জন্য একটি নর বলি দিয়াছিলেন।

অমরমাণিক্য পুনরায় অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইয়া আরাকান আক্রমণ করেন। তিনি ক্রমশঃ কয়েকটী প্রদেশ অধিকার করিয়া লইলেন। অনন্তর আরাকানপতি পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া পর্টুগিজদিগের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন এবঙ তাহাদিগের সাহায্যবলে ত্রিপুরেশকে আক্রমণ করিলেন। প্রথম যুদ্ধে ত্রিপুরপতি পরাজিত হইলেন। কিন্তু তিনি ভগ্নোত্সাহ হইলেন না ; পুনরায় তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু আরাকানপতি আগামী বত্সর পর্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার অনুরোধ পত্র লিখিলেন। তিনি তাহাতে সম্মত হইয়া তত্কালে সৈন্যগণের সহিত রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রত্যাগত হইবার অব্যবহিত পরে সঙবাদ পাইলেন যে আরাকানপতি স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া চট্টগ্রাম অধিকার করিয়াছেন। ত্রিপুরাপতি আশু তাহার প্রতিহিঙসা লওয়া কর্তব্য বিবেচনা করিলেন। তিনি নিজে ক্লান্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার তিন পুত্রকে বৃহত্ একদল সৈন্যের সহিত প্রেরণ করেন। ত্রিপুর সৈন্যগণ চট্টগ্রামে উপস্থিত হইলে আরাকানপতি ভয়প্রযুক্ত সন্ধির প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলেন, এবঙ তত্সহ একটী বহুমূল্য গজদন্ত নির্মিত রাজমুকুট উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

যে একতাশূন্য হইয়া সোণার ভারত ছারখার হইয়াছে, যে একতাহীনতায় আমাদিগকে যবনপদানত হইতে হইয়াছিল, সেই একতা এক্ষণে অমরের কুমারদিগের মধ্যে তিরোহিত হইল। একতাশূন্য হইয়া কুমারগণ যে কেবল চট্টগ্রামাদি হারাইয়াছিলেন এমত নহে, তাহাতেই ত্রিপুরার সর্বনাশের সূত্রপাত হইল। কুমারেরা সকলেই মুকুট গ্রহণ করিবেন বলিয়া বিরোধ করিতে লাগিলেন। আরাকানপতি এই সঙবাদ শ্রবণে উপযুক্ত সময় বুঝিয়া পরমাহ্লাদিত চিত্তে ত্রিপুরসৈন্যদিগকে আক্রমণ করেন। কুমারদিগের মধ্যে ঐক্য না থাকায় তাঁহারা সহজেই পরাজিত হইয়া ২জন সসৈন্যে পলায়ন করিলেন এবঙ এক জন স্বীয় বাহন হস্তী কর্তৃক নিহত হইলেন। মগেরা পলায়িত ত্রিপুর কুমারদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। কুমারেরা আপনাদিগকে নিতান্ত অপমানিত বোধ করিয়া পুনর্বার মগদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা সেবারেও অশ্বারোহিগণের অবাধ্যতায় পরাজিত হন। মগেরা রণমদে মত্ত হইয়া ত্রিপুর সৈন্যদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া, অবশেষে রাজধানী উদয়পুরে উপস্থিত হইল। অমরমাণিক্য নিতান্ত ভীত হইয়া দেওঘাট নামক স্থানে পলায়ন করিলেন। মগেরা অবাধে উদয়পুর লুণ্ঠন করিয়া ত্রিপুরার সর্বস্বাপহরণ পূর্বক প্রস্থান করিল। তদাবধি ফেণীনদী ত্রিপুরার দক্ষিণ সীমা ধার্য হইয়া

চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানগুলি আরাকান রাজ্যভুক্ত হইল।

অমরমাণিক্য রাজ্যের তদানীন্তন অবস্থা চিন্তা করিয়া দুঃখে ম্রিয়মান হইলেন। তিনি মনু নদীর জলে স্নাত হইয়া অহিফেণভক্ষণে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন, এবঙ তাঁহার পত্নীও সহমৃতা হইলেন।

১০২১ ত্রিপুরাব্দে (১৬১১ খ্রিস্টাব্দে) অমরমাণিক্যের পুত্র রাজধর মাণিক্য সিঙহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে অপরিমিত ভূমি দান করিতে লাগিলেন। অমাত্যগণ এতদ্দর্শনে নিতান্ত বিস্মিত হইয়া একদা তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি এই মাত্র উত্তর দিয়াছিলেন 'শেষ অবস্থায় আমার অদৃষ্টে কি আছে তাহা কে বলিতে পারে।' রাজধর সমরোত্সাহ পরিত্যাগ করিয়া কেবল দৈবকার্যে লিপ্ত হইলেন। তিনি একটী উত্কৃষ্ট বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন ; সর্বদা তাহাতে বিষ্ণুর উপাসনা করিতেন। তিনি আট জন গায়ক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা সর্বদা তাঁহাকে বিষ্ণুর গুণানুকীর্তন শ্রবণ করাইত।

বঙ্গীয় মুসলমান শাসনকর্তা রাজধর মাণিক্যের এইরূপ অবস্থা শ্রবণে, ত্রিপুরা আক্রমণের জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু মন্ত্রী এবঙ সৈনিকদের অধ্যবসায়ে মুসলমানেরা পরাজিত হইয়াছিল। রাজধর ৩ বত্সর মাত্র রাজত্ব করিয়া গোমতী নদী জলে নিমগ্ন হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন।

১০২৩ ত্রিপুরাব্দে (১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে) রাজধরের পুত্র যশোধর সিঙহাসনে অধিরূঢ় হইলেন।..'

ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত, প. ৩০-৩৪।

৩

মনে করা যাক, একশ বছর আগে কোন বাঙ্গালি লেখক উপন্যাস লিখতে চাইছেন : ভাল গল্প সাজাতে পারছেন না বলে বিদেশি গল্প-উপন্যাস পড়ছেন। পড়তে পড়তে এই কাহিনী ভাল লাগল :

রাজতন্ত্রের পতনের পর ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে অরাজকতার মধ্যে নানা দলের সাধারণতন্ত্রীদের অন্তঃকলহ এবঙ তাদের সঙ্গে রাজতন্ত্রীদের সঙ্ঘাত চলছে। সাধারণতন্ত্রীরা প্রধানত পারি শহরে, এবঙ রাজতন্ত্রীরা ব্রিতানি প্রদেশে শক্তিশালী। ব্রিতানি প্রদেশের ভাঁদে অঞ্চলে ঐ বছরের মাঝামাঝি সময়ে এক যুদ্ধভগ্ন সাধারণতন্ত্রী সেনাদলের হাতে মিশেল্ নামে জঙ্গলে-পালানো, হৃতসর্বস্ব এক চাষি-বৌ রনেজ্যাঁ, গ্রোজাল্যাঁ ও জর্জেত্ নামে তার দুটি শিশুপুত্র ও এক শিশুকন্যার সঙ্গে ধরা পড়ে এবঙ গৃহীত হয়। পারির এক সাধারণতন্ত্রী বিপ্লবী দলে রোবস্পিয়েরে, দাঁতঁ, মারাত্ প্রভৃতি ব্যক্তিরা ছিলেন। ব্রিতানির এক অভিজাত পরিবারে জাত, শিক্ষিত, উদারচিত্ত যুবক গোভ্যাঁ তাঁদের পক্ষে রাজতন্ত্রীদের দমনের জন্য সসৈন্যে ব্রিতানিতে যান। তখন জার্সি দ্বীপ থেকে রাতের অন্ধকারে জাহাজে এক বৃদ্ধ ঐ অঞ্চলে রাজতন্ত্রীদের পক্ষে যুদ্ধে

সৈন্যদের অধিনায়ক হিশাবে এলেন। তিনি উত্‌সাহী, দক্ষ, দাম্ভিক, অভিজ্ঞ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সুবক্তা, কঠোর, অথচ উদার, ব্রিতানির অভিজাত মার্কুইস্ দ্য লাঁত্‌নাক্, এবঙ তাঁর সঙ্গী ব্রিতানিবাসী নাবিক আল্‌মালো। লাঁত্‌নাক্ তাকে যুদ্ধে উত্‌সাহ দিলেন এবঙ লা তুর্গ্ দুর্গের দিকে যাত্রা করলেন : কথাপ্রসঙ্গে আল্‌মালো দুর্গের গোপন সুরঙ্গপথের কথা বললেও লাঁত্‌নাক্ তা অবিশ্বাস করেন। ইতিমধ্যে লাঁত্‌নাকের গোপন আগমন প্রকাশিত এবঙ তাঁকে মারার জন্য সাধারণতন্ত্রীদের পুরস্কার বিজ্ঞাপিত হয়েছে। ভিখারি-ফকির তেল্‌মার্শ্ চিনতে পেরে বিপদ্‌গ্রস্ত লাঁত্‌নাক্‌কে গোপন আশ্রয় দেয়। সাধারণতন্ত্রী সৈন্যদের পরিচালক গোভ্যাঁ লাঁত্‌নাকের ভাইপো এবঙ শৈশবে লা তুর্গে পালিত। ব্রিতানির যে সৈন্যদল পূর্বোক্ত সাধারণতন্ত্রী সৈন্যদের হত্যা ও মিশেল্‌কে আহত করে শিশুদের আশ্রয় দিয়েছে, ইতিমধ্যে লাঁত্‌নাক্ তাদের সঙ্গে মিলিত হন। পারির জনপ্রিয় সাধারণতন্ত্রী বক্তাদের মধ্যে বৃদ্ধ সিমুর্‌দ্যাঁ পূর্বজীবনে ছিলেন একদা গৃহশিক্ষক, পরে ধর্মযাজক : তিনি অবিবাহিত, জ্ঞানী, গম্ভীরস্বভাব, সন্দেহবাতিকগ্রস্ত, নিষ্পাপ, একগুঁয়ে ও নির্মম। গোভ্যাঁ তাঁর প্রিয়তম, পুত্রোপম, প্রাক্তন ছাত্র। লাঁত্‌নাকের গৃহে প্রাক্তন যাজকও ছিলেন তিনি। বিপ্লবী দল পরে ব্রিতানিতে সিমুরদ্যাঁকে সর্বাধিনায়ক করে পাঠালে, দীর্ঘকাল পরে গুরু-শিষ্যের দেখা হয়। রাজতন্ত্রীদের বহু গ্রাম্য সৈন্য অদক্ষ হলেও জঙ্গলাকীর্ণ ব্রিতানির ভূগোল জানত, বিশেষত বনাঞ্চলে লুকিয়ে থেকে অতর্কিত আক্রমণে পটু ছিল। সাধারণতন্ত্রী সৈন্যেরা সঙখ্যায় কম হলেও দক্ষ, তাদের অস্ত্র বেশি, কিন্তু অপরিচিত বনাঞ্চলে যুদ্ধে অনভিজ্ঞ। ছোট শহর দেল্-এ যুদ্ধে সাধারণতন্ত্রীদের কামানে রাজতন্ত্রীরা ছত্রভঙ্গ হলে মাত্র কয়েক জন সৈন্য ও তিনটি শিশুকে নিয়ে লাঁত্‌নাক্ লা তুর্গ্ দুর্গে আশ্রয় নেন। তাদের এক অতর্কিত আক্রমণ থেকে ছদ্মবেশে নবাগত সিমুর্‌দ্যাঁ আঘাত সহ্য ও নিজের জীবন বিপন্ন করে গোভ্যাঁকে বাঁচান। সিমুর্‌দ্যাঁ যখন চিকিত্‌সাধীন, তখন একদিকে তেল্‌মার্শের চিকিত্‌সায় সুস্থ হয়ে মিশেল্ সন্তানসন্ধানে লা তুর্গের দিকে যাচ্ছে, অন্যদিকে গোভ্যাঁ লাঁত্‌নাক্‌কে বন্দী করার পরিকল্পনা করছে। দয়াশীল গোঁভ্যাঁ ও নির্মম সিমুরদ্যাঁর মধ্যে আলোচনায় আদর্শের বিরোধ দেখা দিল। উঁচু প্রাচীরঘেরা দুর্ভেদ্য লা তুর্গ দুর্গ গোভ্যাঁর পূর্বপুরুষদের সম্পত্তি : লাঁত্‌নাক্‌ও এখানে থাকতেন। দুর্গপ্রাচীর অতিক্রম করার জন্য সাধারণতন্ত্রীদের আনানো লম্বা মই মাঝপথে চাষিরা পুড়িয়েছে, কিন্তু অন্যপথে তাদের গিলোটিন যন্ত্র এসে পৌঁছেছে। দু মাস পরে দুর্গে লাঁত্‌নাক্ সহ উনিশ জন সৈন্য ও শিশুরা থাকে : বাইরে কয়েক হাজার সাধারণতন্ত্রী সৈন্য। তাদের কামানের গোলা প্রাচীরের কিছুটা ভেঙেছে। সিমুর্‌দ্যাঁ অন্য ব্যক্তিদের মুক্তির শর্তে লাঁত্‌নাক্ সিমুর্দ্যাঁর বিনিময়-প্রস্তাব করলে, লাঁত্‌নাক্ তা প্রত্যাখ্যান করলেন। শিশুদের নিরাপত্তার বিনিময়ে রাজতন্ত্রীদের মুক্তির প্রস্তাব সাধারণতন্ত্রীরা অগ্রাহ্য করল। দুর্গের উপরতলায় যে ঘরে শিশুরা আছে, তার বাইরে বারুদ ও আগুনের পল্‌তে রাখা হয়েছে, যাতে তাদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে ভয় দেখিয়ে শত্রুকে নিরস্ত করা যায়। গোভ্যাঁর সৈন্যেরা ভগ্নপ্রাচীর দিয়ে দুর্গপ্রবেশ করে

অল্প যুদ্ধের পর লাঁত্‌নাক্‌কে বন্দী করল। এই সময় হঠাত্‌ লাঁত্‌নাকের ঘরে গুপ্তদ্বার খুলে আল্‌মালো লাঁত্‌নাক সহ হতাবশিষ্ট বন্দীদের সুরঙ্গপথে নিয়ে জঙ্গলে পালাল, কিন্তু গুপ্তপথ বন্ধ করা গেল না। এই সময় মিশেল্‌ পৌঁছে দেখল, যে দুর্গে আগুন লেগেছে, উপরে তিনটি শিশু আর্তনাদ করছে, কিন্তু লম্বা মইয়ের অভাবে সকলে অসহায়। লাঁত্‌নাক্‌ দূরের জঙ্গল থেকে আলো দেখে ও অস্পষ্ট চিত্‌কার শুনে বিপদ অনুমান করে, সুরঙ্গপথে একা ফিরলেন, নিজের জীবন বিপন্ন করে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় শিশুদের বাইরে আনলেন, এবঙ শেষে সিমুর্‌দ্যাঁর হাতে বন্দী হলেন। সিমুর্‌দ্যাঁ কোর্ট-মার্শালের বিচার-প্রহসনে পরদিন গিলোটিনে লাঁত্‌নাকের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করেছেন। তখন লাঁত্‌নাকের মহত্ত্ব ও সিমুর্‌দ্যাঁর নিষ্ঠুরতা, দুজনের ভিন্ন আদর্শ, রক্ত ও প্রীতির সূত্রে দুজনের প্রতি আনুগত্য--এসব দ্বন্দ্বে গোভ্যাঁর মন ব্যাকুল। মধ্যরাত্রে যখন গিলোটিন স্থাপিত হল, তখন গোভ্যাঁ দরজা খুলে বন্দীগৃহে গিয়ে লাঁত্‌নাকের সঙ্গে আলাপ করেন। ভূমিশয্যা থেকে লাঁত্‌নাক্‌ তাঁকে স্বাগত জানান, গোভ্যাঁর শৈশবের কথা বলেন, আদর্শের পার্থক্য বোঝান, এবঙ জানান, যে নস্যিদানির অভাবে তাঁর অসুবিধা হচ্ছে। গোভ্যাঁ হঠাত্‌ নিজের পোষাক তাঁর গায়ে জড়িয়ে দিয়ে, লাঁত্‌নাক্‌কে ঠেলে ঘরের বাইরে বের করলেন : অল্পালোকে তাঁকে গোভ্যাঁ মনে করে রক্ষীরা চলে যেতে দিল। পরদিন সিমুর্‌দ্যাঁ এসে বন্দী গোভ্যাঁর কাছে সব শোনেন, এবঙ নতুন বিচারে, মানসিক যন্ত্রণায়, তাঁর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দেন। মধ্যরাত্রে দুজনে একসঙ্গে খেতে খেতে নিজেদের মতপার্থক্য আলোচনা করলেন। পরদিন সকালে দুজনের নমস্কার বিনিময়ের পর যখন গিলোটিনে গোভ্যাঁর শিরচ্ছেদ হল, তখনি দুর্গশীর্ষ থেকে নিজের পিস্তলের গুলিতে নিহত সিমুর্‌দ্যাঁর দেহ ভূপতিত হল।

বাঙালি লেখকটি মৌলিক সাহিত্যরচনা ও ব্রাহ্ম আদর্শ প্রচারে উত্‌সাহী। উপরের কাহিনীকে 'মৌলিক' বানাতে হলে কি কি করণীয়? সম্ভাব্য উত্তরগুলি হল--(ক) স্থান ও ব্যক্তির দেশি নাম ; (খ) রাষ্ট্রীয় অবস্থার পার্থক্যের জন্য ছদ্ম-ঐতিহাসিকতা আমদানি (সম্ভব হলে অল্পজ্ঞাত স্থানের অজানা ইতিহাস, কারণ তাতে গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা কম) ; (গ) এই পরিপ্রেক্ষিতে আদর্শের রূপান্তর (যেমন, রাজনৈতিক আদর্শের বদলে ব্রাহ্ম ধর্মাদর্শ) ; (ঘ) অনুকরণের সঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক ঘটনার অতিরিক্ত বর্ণনা ; (ঙ) উত্‌স থেকে পার্শ্ব-চরিত্রের লোপ বা রূপান্তর (হলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা কমে যায়); এবঙ (চ) বিচ্ছিন্ন প্লট বা গল্পের জট নির্মাণের প্রয়োজন হলে বিচ্ছিন্ন ঘটনার অনুকরণ। তবু, দরকার হলে, পরে অন্য ব্যাখ্যা দেওয়া চলে, যেমন--স্বপ্নে এমন দেখা গেছে, ইত্যাদি। স্মরণীয়, তখন হিন্দু পুনরুত্থানবাদী জোয়ার এসেছে ; ব্রাহ্ম আন্দোলন স্তিমিত। ব্রাহ্মদের মধ্যে দলছুট অনেক। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম হিশাবে, 'আদি ব্রাহ্ম সমাজে'র সম্পাদক হিশাবে লেখক প্রচারের কাজে হাত দিয়েছেন। মূর্তিপূজা বনাম নিরাকারবাদ বিতর্ক কিছু পুরানো : ব্রাহ্মরা নিরাকারবাদী। পূজার পশুবলি বিহিত কি না, এই নিয়ে তর্ক শুরু হয়েছে, ব্রাহ্মরা 'বলি'র বিপক্ষে। এক গল্পে দুটির বিপক্ষে ভাল প্রচার করা যায়।

লেখকের পারিবারিক জমিদারির কোন কর্মচারি যদি 'ব্রাহ্ম সমাজে'র সহ-সম্পাদক হন এবঙ আঞ্চলিক ইতিহাসের বই লেখেন, তবে তাঁকেও উত্‌সাহিত করা ভাল। কৈলাসচন্দ্র সিঙহ 'ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত' (১৮৭৬) লিখেছেন। এবার উপরের সূত্র অনুসারে মৌলিক গল্পের চরিত্র ও ঘটনা তৈরি করা যেতে পারে।

(উত্‌স)		(অনুকরণ)
(ক) Vendée	...	ত্রিপুরা
Lantenac (অভিজাত)	...	গোবিন্দমাণিক্য (রাজা)
Gauvain (অভিজাতবঙশীয় ; বিপ্লবীর শিষ্য)	...	জয়সিঙহ (রাজবঙশীয় ; পুরোহিতের শিষ্য)
Cimourdain (পূর্বে পাদ্রি, পরে শিক্ষক, শেষে বিপ্লবী)	...	রঘুপতি (পুরোহিত, গুরু, পরে রাজদ্রোহী)
René-Jean, Gros Alain, Georgette (শিশুর দল)	...	হাসি, তাতা (শিশুর দল)
Halmalo	...	খুড়াসাহেব
La Tourgue	...	বিজয়গড় দুর্গ
(খ) ১৮শ শতকের কাহিনী।		১৬শ শতাব্দীর ইতিহাস। (তখন অল্পজ্ঞাত ত্রিপুরার ইতিহাস অল্পতরজ্ঞাত)
(গ) রাষ্ট্রীয় আদর্শে সাধারণতন্ত্র বনাম রাজতন্ত্র, বা বিপ্লবে নরহত্যা বনাম স্থিতাবস্থা রক্ষা। (বিপ্লব ও নরহত্যা নিন্দিত।)	...	ধর্মীয় আদর্শে পশুবলি বনাম বলি নিষেধ, এবঙ মূর্তিপূজা বনাম নিরাকার উপাসনা। (মূর্তিপূজা ও পশুবলি নিন্দিত।)
(ঘ) গোভ্যাঁর মৃত্যুতে কাহিনীর সমাপ্তি।	...	জয়সিঙহের আত্মহত্যায় দ্বন্দ্বের অবসান।
(এর পরে অপ্রাসঙ্গিক কাহিনী প্রয়োজন।)		
(ঙ) তিনটি শিশু।	...	প্রথমে দুটি, পরে একটি শিশু।
শিশুমাতা মিশেল্‌।	...	শিশুর কাকা কেদারেশ্বর।
বিপরীতমুখী আকর্ষণে গোভ্যাঁর দ্বন্দ্বজীর্ণ ব্যক্তিত্ব।	...	জয়সিঙহের দ্বন্দ্ব বজায় ; কিন্তু অতিরিক্ত অঙশের জন্য চারিত্রিক দুর্বলতা নিয়ে নক্ষত্ররায়।
সিমুর্দ্যাঁর আত্মহত্যা।	...	রঘুপতির দেশত্যাগ।

(চ) সমাজে জীবনহানি, গৃহে শিশুদের সারল্য--বৈপরীত্য।	...	পশুবলি, গৃহে শিশুদের ভয় ও সারল্য --বৈপরীত্য।
বন্দী লাঁত্‌নাকের নস্যিদানি।	...	বন্দী সুজার আলবোলা।
আল্‌মালো কর্তৃক লাঁত্‌নাকের মুক্তি।	...	একই পদ্ধতিতে সুজার মুক্তি।
লা তুর্গ্ দুর্গ থেকে সুরঙ্গপথে পলায়ন ; সুরঙ্গদ্বার উন্মুক্ত।	...	বিজয়গড় দুর্গে অনুরূপ।
মুক্ত লাঁত্‌নাক্ শিশু থেকে বিচ্ছিন্ন।	...	দেশত্যাগী গোবিন্দমাণিক্য ধ্রুব থেকে বিচ্ছিন্ন।

এরপরে সেই বাঙ্গালি লেখক মৌলিক উপন্যাস লিখলেন। কাহিনীর সঙক্ষিপ্তসার এমন--

ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য সহৃদয়, কিন্তু কর্তব্যে দৃঢ়। দেবীর পূজা উপলক্ষে একদিন মন্দিরে যাবার পথে তিনি হাসি ও তাতা নামে দুটি শিশুকে দেখে খুশি হয়ে উঠলেন। পূজায় বহু পশুবলি হয়েছে। তাদের রক্তস্রোত দেখে শিশুরা আতঙ্কিত হয়ে উঠল, এবঙ পরে একজন জ্বরবিকারে মারা গেল। মৃত্যুতে মর্মাহত গোবিন্দমাণিক্য বলিদান বন্ধ করার আদেশ দেন। দৃঢ়, নির্মম, আদর্শনিষ্ঠ রাজপুরোহিত রঘুপতির সঙ্গো এই নিয়ে তাঁর সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হল। রঘুপতি শিষ্য জয়সিঙহকে দিয়ে দুর্বলচিত্ত ও অনুগত রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায়কে ডেকে এনে রাজরক্ত আনার জন্য আদেশ করলেন। ভ্রাতৃহত্যা পাপ, ভেবে নক্ষত্রকে এড়িয়ে জয়সিঙহ নিজেই সে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জয়সিঙহ রাত্রে দেবীর আদেশ জানতে গেলে রঘুপতি প্রতিমার আড়ালে থেকে দেবীর আদেশের অভিনয় করেন। জয়সিঙহের সন্দেহ হয়, আদেশ দেবীর না রঘুপতির। তাতার সঙ্গো গোবিন্দমাণিক্য বিকালে নদীতীরে বেড়াতেন। একদিন তাঁর সঙ্গো কথা বলায় জয়সিঙহের মনে রঘুপতি-প্রোথিত বিশ্বাস বিচলিত হল। নক্ষত্ররায় রঘুপতির গোপন আদেশ প্রকাশ করে গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গো মিলিত হলেন। অন্তর্দ্বন্দ্বে বিমূঢ় জয়সিঙহ একবার নিজের কর্তব্যনির্ণয়ে রাজপরামর্শ চাইলেন, এবঙ পরে মন্দিরে ফিরে গুরু-অনুগামী হলেন। দেবীপূজায় বলি বন্ধ হওয়ায় প্রজারা ক্ষুব্ধ। রাত্রে গোপনে দেবীমূর্তিকে উল্টোমুখে বসাবার পর, ক্ষুব্ধ জনতাকে আহ্বান করে রঘুপতি তাদের দেখান, যে বলি নিষিদ্ধ হওয়ার দেবী বিমুখ হয়েছেন। ক্রুদ্ধ প্রজাদের কাছে রঘুপতি দেবীর কল্পিত আদেশ প্রচার এবঙ জয়সিঙহের প্রতিবাদস্পৃহা স্তব্ধ করেন। একদিকে এই ক্রুর চক্রান্ত, অন্যদিকে শিশুসাহচর্যে গোবিন্দমাণিক্যের আনন্দ। জয়সিঙহের জন্ম এক রাজবঙশে। ধর্মাদেশ ও নীতি, গুরু ও রাজার মধ্যে দোলায়মান জয়সিঙহ দেবীপ্রতিমার সম্মুখে আত্মহত্যা করে 'রাজরক্ত' এনে গুরুর আজ্ঞাপালন করলেন।

হয়ত এতটা লিখতে পনেরটি পরিচ্ছেদ লেগেছে। উত্সের মত এখানে একইভাবে দ্বন্দ্বের সমাপ্তি হয়েছে। তাতে ঋণ ধরা পড়ার সম্ভাবনা : কাহিনী বাড়াতে হবে। একটি

মাসিকপত্রে আগের লেখা ছাপা হচ্ছিল। সেখানে তিনি আরো লিখে চললেন--

রঘুপতি ও গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্ঘাতের মধ্যে দোদুল্যমান নক্ষত্ররায় নির্দেশমত ধ্রুব-কে (তাতা) চুরি করে রঘুপতির হাতে তুলে দেন। ধরা পড়ায় রাজা তাঁদের নির্বাসনদন্ড দেন, এবঙ নিজে পূর্বে পুরোহিতের একটি আদেশ-লঙ্ঘনের অপরাধে তাঁকেও দন্ড হিশাবে প্রচুর টাকা দেন। রঘুপতি ঢাকা ও রাজমহলে গিয়ে মোগল শাসনকর্তা সা সুজার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের অনুসরণে গিয়ে পথে বিজয়গড় দুর্গে আশ্রয় এবঙ সেখানে খুড়াসাহেবের কাছে গোপন সুরঙ্গপথের সন্ধান পান। পরাজিত, যুদ্ধবন্দী সুজা বিজয়গড়ে দুর্গবন্দী হলেন। তামাক খাবার জন্য আলবোলা না পেয়ে সুজার অসুবিধা হচ্ছিল। রাত্রে গোপন সুরঙ্গপথে রঘুপতি বন্দী সুজাকে পালাতে সাহায্য করেন। তারপর নক্ষত্ররায়কে নিয়ে যাত্রা করলেন।

এসব মৌলিক হলেও উপন্যাসের মূল (অর্থাত্ পূজায় পশুবলি নিয়ে রঘুপতি ও গোবিন্দমাণিক্যের) দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গে অবান্তর। তবে, এখানেও উত্স দৃশ্যমান। লা তুর্গ্ দুর্গ রূপান্তরিত হয়েছে বিজয়গড় দুর্গে ; দুটি দুর্গেই গোপন সুরঙ্গপথ আছে, যার একটি প্রান্ত বন্দীগৃহে, অন্যটি দূরের প্রান্তরে ; উত্সে নস্যিদানির অভাবে, বাঙলায় আলবোলা নেই বলে বন্দীর কষ্ট ; অনুগত আল্মালো যেভাবে লাঁত্নাক্কে মধ্যরাত্রে পালাতে সাহায্য করেছেন, তেমনি মধ্যরাত্রে সুজাকে পালাতে সাহায্য করেছেন অনুগত রঘুপতি। লাঁত্নাক্ বন্দী হয়েছেন রাত্রির প্রথমে ; তাঁর শিরচ্ছেদ হবে সকালে। অতএব, পালাতে হবে মধ্যরাত্রে। সুজার গল্পে মধ্যরাত্রি কেন? উত্সে সুরঙ্গপথ খোলা থাকার ঔপন্যাসিক প্রয়োজন ছিল লাঁত্নাকের প্রত্যাবর্তনের জন্য। বাঙলা কাহিনীতে সুজা ফেরেননি, তবু সুরঙ্গপথ খোলা ছিল। কেন? উত্স কাহিনীতে দুজন সুরঙ্গের গল্প বহুপূর্বে শুনেছেন, কিন্তু তা দেখেননি, তাতে বিশ্বাসও করতেন না। তাই অজান্তে লাঁত্নাক্ সেই ঘরে বন্দী ছিলেন। বাঙলা কাহিনীতে অন্তত দুজন--দুর্গাধিপতি ও খুড়াসাহেব তা জানতেন। তবু বন্দী সুজাকে সেই ঘরে রাখা হল! কেন?--এত 'কেন'র উত্তর মিলবে না : অনুকরণের সময় অত সতর্ক থাকা কঠিন। কামানের গোলায় লা তুর্গের মত বিজয়গড়ের দুর্গপ্রাচীরও ভেঙ্গেছে। অত্যাচারী সেনাদল চলে গেলে পথপার্শ্বে গ্রামগুলির অবস্থা কেমন হয়, উনিশ পরিচ্ছেদে তার বর্ণনা করতে হবে, অথচ তা জানা নেই। তাতে কিছু অসুবিধাও নেই। উত্সের প্রথম খন্ডের শেষে এবঙ তৃতীয় খন্ডের প্রথমে তার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। বাঙলায় সঙক্ষেপে লিখে দিলেই হল। সঙক্ষেপে, কারণ অতিরিক্ত সঙযোজন নিয়েও বাঙলা রচনাটি আয়তনে উত্সের এক-চতুর্থাঙশ মাত্র।

বাঙ্গালি লেখক রচনাটিকে মাসিকপত্রে ক্রমশ প্রকাশ করতে থাকলেন। প্রতিমাসে লিখে সাময়িকপত্রের রসদ যোগাতে হলে এই কাহিনীকে মৌলিক করা কঠিন। অথচ মৌলিক হতেই হবে। চিন্তার জন্য সময় চাই। অতএব, উপরের ছাব্বিশ পরিচ্ছেদের পর অসমাপ্ত অবস্থাতেই লেখা বন্ধ হল। 'বালক' পত্রে প্রকাশনার তথ্য এরূপ--

	সঙখ্যা (প্রিষ্ঠা)	প্রকাশের তারিখ	রচনা
১২৯২	আষাঢ় (প. ১২৭-১৩৩)	১৪.৬.১৮৮৫	১-৩ পরিচ্ছেদ
	শ্রাবণ (প. ১৮২-৮)	১৬.৭.১৮৮৫	৪-৬ ”
	ভাদ্র (প. ২৩৫-২৪৩)	১৬.৮.১৮৮৫	৭-৯ ”
	আশ্বিন-কার্তিক (প. ২৮৩-৩০৪)	১৬.৯.১৮৮৫	১০-১৮ ”
	অগ্রহায়ণ (প. ৩৬৪-৩৭৩)	১৫.১১.১৮৮৫	১৯-২২ ”
	পৌষ (প. ৪১৩-৭)	১৯.১২.১৮৮৫	২৩-২৪ ”
	মাঘ (প. ৪৮৩-৯)	২৭.১.১৮৮৬	২৫-২৬ ”

ভেবেচিন্তে পরে কাহিনী বাড়ান হল এভাবে--

উপকৃত সুজাকে উপঢৌকন দিয়ে রঘুপতি নক্ষত্ররায়ের নামে সনদ ও সৈন্য সঙ্গ্রহ করে যুদ্ধযাত্রা করেন। তাঁর চক্রান্তে ভাইদের আপত্তি নিষ্ফল হয়। গোবিন্দমাণিক্য ধ্রুবকে রেখে পুরোহিত বিল্বনের সঙ্গে রাজ্যত্যাগ করেন। নক্ষত্ররায় ক্রমে অত্যাচারী এবঙ স্মৃতিভারাক্রান্ত রঘুপতি বলিবিমুখ হয়ে উঠলেন। গোবিন্দমাণিক্য ও বিল্বন ভিন্নস্থানে আর্তসেবা করতে থাকেন, আরাকানরাজ ও মোগলদের সহায়তা লাভ করেন, এবঙ পরে দুজনে ধ্রুবের সঙ্গে মিলিত হন। গোবিন্দমাণিক্য পলাতক, ছদ্মবেশী সুজাকে আশ্রয় দেন, এবঙ নক্ষত্ররায়ের মৃত্যুর পরে আবার ত্রিপুরার রাজা হন।

২৭ থেকে ৪৪ সঙখ্যক পরিচ্ছেদের যে কাহিনীর সঙক্ষিপ্তসার লেখা হল, তা মোটামুটি ঐতিহাসিক, তবে তার সঙ্গে উপন্যাসের পূর্ববর্ণিত কাহিনীর আবশ্যিক যোগ নেই। ৪৩ সঙখ্যক পরিচ্ছেদের ঘটনা স্টুয়ার্ট-লিখিত বাঙলার ইতিহাস এবঙ বাকিটা কৈলাসচন্দ্রের বই থেকে সঙ্গৃহীত। 'উপসঙহারে'ও কৈলাসচন্দ্রের বই থেকে উদ্ধৃতি সঙ্কলিত হয়েছে। নিচে ঔপন্যাসিকের ব্যবহৃত আকরগ্রন্থটি থেকে প্রাসঙ্গিক রচনাঙশ পুনর্মুদ্রিত হল। তা থেকে দেখা যাবে, যে ছাব্বিশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বর্ণিত কাহিনী মূলত অনৈতিহাসিক।

'যুবরাজ গোবিন্দদেব ঠাকুর ১০৬৯ ত্রিপুরাব্দে মাণিক্য উপাধি ধারণ করেন। গোবিন্দমাণিক্যের রাজ্ঞী কমলা মহাদেবী তত্‌কালে রমণীকুলের মধ্যে অদ্বিতীয়া ধর্ম্মিষ্ঠা ছিলেন। রাজ্ঞী যে সমস্ত মুদ্রা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার এক পৃষ্ঠে স্বীয় ও অপর পৃষ্ঠে শিব ও গোবিন্দমাণিক্যের নাম অঙ্কিত আছে। তিনি যে দীর্ঘিকা খনন করাইয়া গিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি কমলাসাগর বলিয়া কশবাগ্রামে বিদ্যমান আছে ; তাহার জল অতি উত্‌কৃষ্ট। মহারাজ গোবিন্দের সিঙহাসনে আরোহণে তত্‌কনিষ্ঠ যমজ ভ্রাতা নক্ষত্ররায় নিতান্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। এবঙ সুযোগ পাইয়া বঙ্গাধিপ বা সুজার সাহায্যে তদ্বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। গোবিন্দমাণিক্য ভ্রাতার অভিলাষ শ্রবণে বিবেচনা করিলেন, রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে হয় ভ্রাতৃশোণিতে পৃথিবী রঞ্জিত করিতে হইবে, নয় নিজপ্রাণ হারাইতে হইবে। কিন্তু রাজ্যলোভে ভ্রাতৃবধজনিত পাপে লিপ্ত হওয়া নিতান্ত অযশস্কর। অতএব আত্মরক্ষার জন্য তিনি বিনা যুদ্ধে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আরাকান যাত্রা করেন।

এদিকে নক্ষত্ররায় ছত্রমাণিক্য নামে সিঙহাসনে আরোহণ করিলেন।

সিঙহাসনচ্যুত মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য আরাকানপতি কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইয়া চট্টগ্রামে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সে সময় সম্রাট্ সাজাহানের পুত্র সা সুজা স্বীয় ভ্রাতা আরঙ্গজীব কর্তৃক পরাজিত হইয়া সপরিবারে আরাকান যাইতেছিলেন। তিনি চট্টগ্রামে উপনীত হইলে অজাতশত্রু গোবিন্দমাণিক্য কর্তৃক সাদরে গৃহীত হন। গোবিন্দমাণিক্য পরাক্রান্ত শত্রুকে বিপদ্গ্রস্ত দর্শনে যার পর নাই দুঃখিত হইলেন ; এবঙ যথাসাধ্য তাঁহার তত্কালোপযুক্ত সাহায্য ও সমাদর করিতে ত্রুটী করেন নাই। সুজা গোবিন্দমাণিক্যের আচরণে যথোচিত লজ্জিত হইয়া বারঙবার ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বিদায়কালে সুজা কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ স্বীয় ব্যবহার্য বহুমূল্য 'নিমচা' তরবারি গোবিন্দমাণিক্যকে প্রদান করিয়াছিলেন।

দুর্ভাগা সুজা আরাকানপতির আবাসে উপস্থিত হইলে রাজা রাজপুত্রীর রূপে মোহিত হইলেন। কিন্তু সুজা জীবিত থাকিতে তাঁহার বাসনা পূর্ণ হওয়া দুষ্কর জানিয়া, রাজ্য-মধ্যে প্রচার করিলেন, যে সুজা কৌশলক্রমে তাঁহার রাজ্যাধিকারের জন্য আসিয়াছেন। অতএব আশু তাহাকে বধ করা উচিত ; কিন্তু বিনা যুদ্ধে রক্তপাত করা বৌদ্ধদিগের ধর্মবিরুদ্ধ কার্য, সুতরাঙ সুজাকে নৌকায় বন্ধন করিয়া জলমগ্ন করিলেন। সুজার পত্নী স্বামীর মৃত্যু শ্রবণে বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহার কন্যাদ্বয়ও বিষপানে পাপাত্মা আরানকানরাজের অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে আরাকানরাজ সুজার তৃতীয় কন্যাকে বিবাহ করেন।

মহারাজ ছত্রমাণিক্য ৭ বত্সর রাজ্যশাসন করিয়া জগত্রাম ও নরহরি নামে দুই পুত্র রাখিয়া মানবলীলা সঙবরণ করেন। তখন গোবিন্দমাণিক্য পুনর্বার ত্রিপুরার সিঙহাসন আরোহণ করেন।

দুর্ভাগা সুজার প্রতি আরাকানপতির নৃশঙস আচরণ মনে করিয়া গোবিন্দমাণিক্য দুঃখ প্রকাশ করিতেন। সুজার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তিনি তরবারের বিনিময়ে বহুতর অর্থ দ্বারা কুমিল্লা নগরীতে একটী উত্কৃষ্ট মসজিদ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাহা অদ্যাপি সুজা মসজিদ বলিয়া বর্তমান আছে।

গোবিন্দমাণিক্যের যত্নে মেহেরকুল আবাদ হইয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মণগণকে বিস্তর ভূমি তাম্রপত্র সনন্দ লিখিয়া দান করেন। মহারাজ গোবিন্দ কুমিল্লার দক্ষিণে বাতিসা গ্রামে একটি দীর্ঘিকা খনন করাইয়ছিলেন। তিনি আরও অনেক সত্কার্যের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন ; কিন্তু সম্পাদন করিতে পারেন নাই। এই জন্য অনুতাপ করিয়া ১০৭৯ ত্রিপুরাব্দে (১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে) মানবলীলা সম্বরণ করেন।'

ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত, প. ৩৮-৫১।

বোধহয় স্পষ্ট হয়েছে, যে 'উত্স' Victor Hugo লিখিত *Quatre-vingt-treize* ('কাত্র্-ভ্যাঁ-ত্রেজ্' অর্থাত্ তিরানব্বই, ১৮৭৩) নামে উপন্যাস, যার ভিত্তি ফরাশি বিপ্লবের পরে সেদেশের অবস্থা, এবঙ 'অনুকরণ' অর্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজর্ষি'

উপন্যাস। F. L. Benedict ও J. H. Friswell-কৃত ইঙরাজি অনুবাদ *Ninety-three* লন্ডন থেকে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পরে আরো অনুবাদ প্রকশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ইঙরাজি অনুবাদেই উপন্যাসটি পড়ে থাকতে পারেন। বিক্তর উগো-র *Les Contemplations* (১৮৫৬) কাব্য থেকে ১২৮৮ ও ১২৯১ শনে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে অন্তত ছয়টি কবিতা 'ভারতী' ও 'আলোচনা' মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। উগো-র সম্বন্ধে আকর্ষণ ও তাঁর রচনার সঙ্গে পরিচিতি ইতিপূর্বেই রবীন্দ্রনাথের হয়েছিল।

তাঁর ১৮৭৮-৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিলাতপ্রবাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পরে লিখেছেন— 'আমি তখন লন্ডন য়ুনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছি ; ইঙরেজি সাহিত্য পড়াচ্ছেন হেন্‌রি মর্লি'।..সাহিত্য তাঁর মনে, তাঁর গল্প বলার সুরে, প্রাণ পেয়ে উঠত..রসের কিছুই লোকসান হত না।' (চতুর্থ অনুচ্ছেদ, চতুর্দশ অধ্যায়, 'ছেলেবেলা'।) Henry Morley (১৮২২-১৮৯৪) লিখিত *Studies in Literature* গ্রন্থের *Victor Hugo's Ninety-three* প্রবন্ধটি তাঁকে অনুপ্রাণিত করে থাকতে পারে। (দেবীপদ ভট্টাচার্য—'হেনরি মরলি', রবীন্দ্র-চর্যা (১৯৭৩), প. ২৮-৩১।)

'বালক' পত্রে 'রাজর্ষি'র শেষ কিস্তি প্রকাশের তারিখ ২৭. ১. ১৮৮৬। তার অন্তত কয়েক দিন আগে রচনাটি লেখা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার রাজার কাছে প্রাসঙ্গিক ইতিহাস জানতে চেয়ে চিঠি লেখেন ৫.৫.১৮৮৬ (২৩. ১. ১২৯৩ শন) তারিখে,—শেষ কিস্তি রচনার চার মাস পরে। উদ্দেশ্য ঐ ইতিহাসের ভিত্তিতে উপন্যাস রচনা। রাজা তথ্যসহ উত্তর লেখেন ৩১. ৫. ১৮৮৬ (১৮.২.১২৯৩ শন) তারিখে। তা অনুসরণ করলে প্রকাশিত 'রাজর্ষি' বাতিল করে নতুন বই লিখতে হয়। তাতে রবীন্দ্রনাথ অরাজি। কৈলাসচন্দ্রের বই থেকে 'উপসঙহারে' উদ্ধৃতি আছে : রাজার পাঠানো তথ্য 'পরিশিষ্ট' তৈরি করেছে। ১১. ২. ১৮৮৭ তারিখে (মাঘ ১২৯৩) বর্ধিত কলেবরে গ্রন্থটি প্রকাশিত হল। প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্য বাতিল হল, বা কিছুটা অবান্তর সঙযোজন হল। আপাতদৃষ্টিতে এদুটি (উপসঙহার ও পরিশিষ্ট) উপন্যাসে অর্থহীন। আসলে, এগুলি পাঠক ঠকানোর জন্য ছদ্মবেশ ধারণের কৌশল (camouflage) মাত্র। কৌশল কেন? উত্তর--মৌলিকত্বের দাবি ছাড়ব না। একশ বছরের বেশি সময় এই ছদ্মবেশ রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে।

৪

'প্রবাসী' মাসিকপত্রে ১৩১৮-১৯ শনে ধারাবাহিক প্রকাশিত হবার পর গ্রন্থিত 'জীবনস্মৃতি' ২৫.৭. ১৯১২ তারিখে প্রকাশিত হল। তাতে আছে—'দুই-এক সঙখ্যা বালক বাহির হইবার পর একবার দুই-এক দিনের জন্য দেওঘরে রাজনারায়ণ বাবুকে দেখিতে যাই। কলিকাতায় ফিরিবার সময় রাত্রের গাড়িতে ভিড় ছিল, ভালো করিয়া ঘুম হইতেছিল না—ঠিক চোখের উপর আলো জ্বলিতেছিল। মনে করিলাম, ঘুম যখন হইবেই না তখন এই সুযোগে বালকের জন্য একটা গল্প ভাবিয়া রাখি। গল্প ভাবিবার ব্যর্থ

চেষ্টার টানে গল্প আসিল না, ঘুম আসিয়া পড়িল। স্বপ্ন দেখিলাম, কোন্-এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর বলির রক্তচিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সঙ্গো তাহার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'বাবা, এ কী! এ-যে রক্ত!' বালিকার এই কথায় তাহার বাপ অন্তরে ব্যথিত হইয়া অথচ বাহিরে রাগের ভান করিয়া কোনোমতে তার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে—জাগিয়া উঠিয়াই মনে হইল, এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প। এমন স্বপ্নে-পাওয়া গল্প এবঙ অন্য লেখা আমার আরও আছে। এই গল্পটির সঙ্গো ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের পুরাবৃত্ত মিশাইয়া রাজর্ষি গল্প মাসে মাসে লিখিতে লিখিতে বালকে বাহির করিতে লাগিলাম।' (দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ, 'বালক' অধ্যায়।) কিন্তু গোবিন্দমাণিক্য ও নক্ষত্ররায় নামদুটি ছাড়া তাতে ২৬ অধ্যায় পর্যন্ত ত্রিপুরার 'পুরাবৃত্তে'র কিছুই নেই।

প্রথম সঙস্করণে 'রাজর্ষি'র কোন ভূমিকা ছিল না। 'সূচনা' যুক্ত হয়েছে 'রবীন্দ্ররচনাবলী'র দ্বিতীয় খন্ডে (পৌষ ১৩৪৬=১৯৩৯) সঙ্কলনের সময়। তাতে আছে--'এ আমার স্বপ্নলব্ধ উপন্যাস।' বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—'রাজনারায়ণ ছিলেন দেওঘরে। তাঁকে দেখতে যাব বলে বেরনো গেল।..জাগা অনিবার্য ভেবে একটা গল্পের প্লট মনে আনতে চেষ্টা করলুম। ঘুম এসে গেল। স্বপ্নে দেখলুম—একটা পাথরের মন্দির। ছোটো মেয়েকে নিয়ে বাপ এসেছেন পূজো দিতে। সাদাপাথরের সিঁড়ির উপর দিয়ে বলির রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। দেখে মেয়েটির মুখে কী ভয়! কী বেদনা! বাপকে সে বার বার করুণস্বরে বলতে লাগল, বাবা এত রক্ত কেন!..জেগে উঠেই বললুম, গল্প পাওয়া গেল। এই স্বপ্নের বিবরণ 'জীবনস্মৃতি'তে পূর্বেই লিখেছি, পুনরুক্তি করতে হল।'

অর্থাত্‌ রবীন্দ্রনাথ পূর্ববর্ণিত গল্পটি যথাসম্ভব বজায় রেখে মৌলিকতা প্রতিষ্ঠা করেছেন। খেয়াল করেননি, যে 'জীবনস্মৃতি'তে যে ঘটনা ফেরার পথে ঘটেছে, 'সূচনা'য় তা ঘটেছে যাবার পথে। বর্ণনা অসত্য হলে এমনই হয়।

'রাজর্ষি'র 'সূচনা'য় রবীন্দ্রনাথ আরো লিখেছেন—'কিন্তু মাসিক পত্রের পেটুক দাবি সাহিত্যের বৈধ ক্ষুধার মাপে পরিমিত হতে চায় না। ব্যঞ্জনের পদসঙখ্যা বাড়িয়ে যেতে হল।

বস্তুত উপন্যাসটি সমাপ্ত হয়েছে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে। ফসল-খেতের যেখানে কিনারা সেদিকটাতে চাষ পড়ে নি, আগাছায় জঙ্গল হয়ে উঠেছে। সাময়িক পত্রের অবিবেচনায় প্রায়ই লেখনীর জাত নষ্ট হয়। বিশেষ যেখানে শিশু পাঠকই লক্ষ্য সেখানে বাজে বাচালতার সঙকোচ থাকে না।'

'রাজর্ষি'র প্রথমাঙশ অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের নাটক 'বিসর্জন' (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭=১৫.৫.১৮৯০) লেখা। নাটকটি ১৩০৩, ১৩১০, ১৩৩৩ ও ১৩৩৮ শনে বারবার পরিবর্তিত হয়। নাটকটির প্রচলিত সঙস্করণে 'রাজর্ষি'র ১ থেকে ১৮ এবঙ ৪০ সঙখ্যক পরিচ্ছেদগুলি রক্ষিত হয়েছে, অন্যগুলি বর্জিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যে পঞ্চদশ

পরিচ্ছেদে গ্রন্থের প্রকৃত সমাপ্তি হয়েছে। সমাপ্তিতে আছে গোভ্যাঁর মত জয়সিঙহের মৃত্যু। সিমুর্দ্যাঁর মত রঘুপতির পরিণতি আছে ৪০ পরিচ্ছেদে। তা-ও নাটকে স্থান পেয়েছে। বর্জনে রবীন্দ্রনাথ উগো-র অনুগামী। অসঙযম না থাকায়, সঙহতি ও নাট্যগুণের সৃষ্টি হয়েছে। অতএব, গুণসঞ্চারের কৃতিত্ব উগো-র। রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অপর্ণা, গুণবতী, চাঁদপাল, নক্ষত্ররায় প্রভৃতি নতুন চরিত্র এনে নতুন মৌলিকতা সৃষ্টি!

তবে, উপন্যাসে অসঙযমের কারণ কি? রবীন্দ্রনাথের মতে দুটি—'সাময়িকপত্রের অবিবেচনা' এবঙ 'শিশু পাঠক'। গ্রন্থনার সময় যুক্ত আরো আঠারটি পরিচ্ছেদ ও উপসঙহার তো 'বালক'-এ প্রকাশিত হয়নি। অতএব, সাময়িকপত্রের ব্যাখ্যা অসত্য। তাঁর 'বাজে বাচালতার সঙ্কোচ' থাকলে কি গ্রন্থে বর্জন সম্ভব ছিল না, নাটকে তিনি যেমন করেছেন? ভরসা এই, 'শিশু পাঠকেরা' বুড়ো লেখকের প্রতিবাদ করতে আসে না! অর্থাত্ দ্বিতীয় ব্যাখ্যাও ঠিক নয়। প্রকৃত কারণ camouflage তৈরি করা। চুরির অভিযোগ থেকে 'রাজর্ষি' বাঁচলে, 'বিসর্জন' আপনি বাঁচবে। কারণ, 'বিসর্জন' তো 'বাজর্ষি' ভেঙ্গে লেখা। তাই সব গোলমাল ও ব্যাখ্যা 'রাজর্ষি'কে নিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন—'এমন স্বপ্নে-পাওয়া গল্প এবঙ অন্য রচনা আমার আরও আছে।' বলার কারণ, প্রয়োজন হলে অন্যত্র একই camouflage তৈরি করা। তার একটি উদাহরণ 'মালিনী' নাটক। রচনাটি রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যগ্রন্থাবলী'তে (১৫.৩.১৩০৩=১৮৯৬) প্রথম প্রকাশিত হয় ; স্বতন্ত্র গ্রন্থনা ২৩. ১২. ১৯১২ তারিখে। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র চতুর্থ খণ্ডে (শ্রাবণ ১৩৪৭=১৯৪০) 'মালিনী'র সঙ্গে 'সূচনা' যুক্ত হয় : পূর্বে কিছু ছিল না। 'মালিনী'র কাহিনীর রবীন্দ্র-পঠিত উত্স হল রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনূদিত ও সম্পাদিত *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* (১৮৮২) গ্রন্থের ১২১ পৃষ্ঠা, যেখানে 'মহাবস্ত্ববদান' অঙশে রাজকন্যা মালিনীর কথা আছে। 'কথা' (১. ১০. ১৩০৬) গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপনে' আছে—'এই গ্রন্থে যে-সকল বৌদ্ধ কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সঙ্কলিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্য সম্বন্ধীয় ইঙরাজি গ্রন্থ হইতে গৃহীত।' 'কথা'র 'বিজ্ঞাপন' প্রকাশিত হয়েছিল বলে পরে কিছু করা কঠিন ; কিন্তু 'মালিনী'তে তেমন কিছু ছিল না, এবঙ এই নাটকটি 'কথা'র আগে ছাপা। তাই ঋণ--প্রতিরোধে 'মালিনী'কে স্বপ্নাদ্য মাদুলি দিয়ে 'সূচনা'য় লেখা হল—'মালিনী নাটিকার উত্পত্তির একটা বিশেষ ইতিহাস আছে, সে স্বপ্নঘটিত।' 'জীবনস্মৃতি'র সঙ্গে বেশ মিলে গেল। 'রাজর্ষি'তে রেলগাড়িতে স্বপ্ন দেখেছেন। এবার অন্যত্র স্বপ্ন দেখতে হবে। তাই 'তখন ছিলুম লন্ডনে।' সব আয়োজন সম্পূর্ণ। এবার—

'এমন সময় স্বপ্ন দেখলুম, যেন আমার সামনে একটা নাটকের অভিনয় হচ্ছে। বিষয়টা একটা বিদ্রোহের চক্রান্ত। দুই বন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু কর্তব্যবোধে সেটা ফাঁস করে দিয়েছেন রাজার কাছে। বিদ্রোহী বন্দী হয়ে এলেন রাজার সামনে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে তাঁর বন্ধুকে যেই তাঁর কাছে এনে দেওয়া হল দুই হাতের শিকল তাঁর মাথায় মেরে বন্ধুকে দিলেন ভূমিসাত্ করে।'

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয়বার বিলাতপ্রবাসে তাঁর স্বপ্ন দেখা হয়ে গেল। পরে সুবিধামত লেখা যাবে। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে সুবিধা হল। তিনি লিখেছেন--'অনেক কাল এই স্বপ্ন আমার জাগ্রত মনের মধ্যে সঞ্চরণ করেছে। অবশেষে অনেক দিন পরে এই স্বপ্নের স্মৃতি নাটিকার আকার নিয়ে শান্ত হল।'

কিন্তু ৩.৩.১৮৯৩ তারিখের একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন--'আমার সঙ্গো 'নেপালীজ বুদ্ধিষ্টিক লিটারেটার' থেকে আরম্ভ করে সেক্সপীয়র পর্যন্ত কত রকমেরই যে বই আছে তার আর ঠিকানা নেই।' (৮৬ সঙখ্যক পত্র, ছিন্নপত্রাবলী।) অর্থাৎ তিনি রাজেন্দ্রলালের বইটি আগেই পড়েছেন, তা অবলম্বনে কবিতাও লিখেছেন, কিন্তু 'মালিনী' মৌলিক, যদিও কাহিনীতে মিল আছে। কারণ তা স্বপ্নাদ্য!

মৌলিক সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার জন্য স্বপ্নকে এভাবে কাজে লাগানোর অদ্ভুত পরিকল্পনা, বোধ হয়, রবীন্দ্রনাথের মাথায় ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আসে। দেখা গেছে, ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'কথা'য় স্বপ্ন নেই। 'রাজা' (পৌষ ১৩১৭=ডিসেম্বর ১৯১০) নাটকের কাহিনীর উত্স সঙস্কৃত 'কুশাবদান' কাব্য। সেখানে ঋণ সম্বন্ধে তিনি কিছু লেখেননি বটে, কিন্তু তা গোপন করার জন্য স্বপ্নের কথা বলেননি। ১৯০০থেকে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্বপ্ন একেবারে অনুপস্থিত। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ধারাবাহিক প্রকাশিত 'জীবনস্মৃতি'তে স্বপ্নের প্রথম দেখা মিলল। তারপর থেকে সে বন্ধুকৃত্য করার সুযোগ ছাড়েনি। ১৯১১ থেকে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কাজ করে চলেছে। কি আশ্চর্য!

রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' (১৯১১) নাটকের প্রসঙ্গো Edward Thompson লিখেছেন—'Its fable is probably suggested by the *Princess,* and more remotely, *The Castle of Indolence* and *The Faerie Queen.'* (*Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist,* second edition, p. 304.)। এই প্রসঙ্গো রবীন্দ্রনাথ ৩.৩.১৩৩৪ তারিখে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন--'Castle of Indolence এবঙ Faerie Queen আমি পড়িনি—Princess-এর সঙ্গো অচলায়তনের সুদূরতম সাদৃশ্য আছে বলে আমার বোধ হয় না।' ('গ্রন্থপরিচয়', রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী সঙস্করণ), একাদশ খন্ড।) এই অস্বীকৃতির পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের একটি প্রাচীনতর পত্রাঙশ উদ্ধারযোগ্য--'আলস্যে কাল কাটাবার এমন জায়গা আর পাবে? তুমি যে Thompson-এর *Castle of Indolence* পড়েছ—এখানটা তার একটা জীবন্ত ছবি।' (য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র (১৮৮১), দ্বাদশ পত্র।) শেষোক্ত রচনাটির সঙ্গো 'অচলায়তনে'র গঠন ও ভাব-গত সাদৃশ্য অস্পষ্ট নয়।

হেমন্তবালা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ ২৪.৪.১৯৩১ তারিখে লিখেছিলেন—'বিদেশের উপাদান নিয়ে আমি কখনো কিছু লিখিনি। বাইরে থেকে মালমশলা ধার নিয়ে লেখা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।' (চিঠিপত্র, নবম খন্ড, প. ৯৫।)

সাহিত্যসৃষ্টিতে অন্যের কাছে ঋণ, অন্যের দ্বারা প্রভাব স্বাভাবিক ও সুস্থ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে স্পর্শকাতর। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনের লেখা গবেষণাগ্রন্থ

Western Influence in Bengali Literature-এর আলোচনায় তিনি লিখেছেন--'Originality in literature lies in its capacity to absorb the universal in all literatures and arts and gives it a unique expression characteristic of its particular genius and traditions. Then again, the human mind being one, parallel developments along similar lines can be traced in different literatures not suggestive of mutual influence but denoting independent persuit of truths which are universal. This is specially true of the production of great minds whose highest realizations often present a remarkable harmony of kinship even though they may be widely separated by distance and time.' (*Calcutta Review* : January 1933, p 13.)

নিজের মৌলিকতা প্রমাণে তাঁর প্রাণপণ প্রয়াসে স্বপ্নের গপ্পো ও বিভিন্ন কথার অসঙ্গতি দেখে, যদি কোন নিন্দুক রবীন্দ্রনাথের সত্যবাদিতায় সন্দেহ প্রকাশ করেন, আমাদের দুর্ভাগ্য, তা প্রতিরোধের জন্য কোন অস্ত্র তিনি আমাদের জন্য রেখে যাননি।

উল্লেখ ঃ

প্রতাপনারায়ণ বিশ্বাস-রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বসাহিত্য, প. ১৮০।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ফরাশি কবিতার তর্জমা

বিভিন্ন ভাষা থেকে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮২-১৯২২) অনূদিত কবিতাগুলি তিনটি কাব্যে সঙ্গৃহীত হয়েছে। সাময়িকপত্রে প্রকাশিত ফরাশি থেকে তাঁর কয়েকটি অনুবাদ এখনো গ্রন্থিত হয়নি।[১] ফরাশি থেকে[২] কবিতার অনুবাদগুলির তালিকা :

গ্রন্থ	কবিতার সংখ্যা	কবি	কবিতার সংখ্যা
তীর্থসলিল (১৯০৮)	১০	M.D. Valmore	৭
তীর্থরেণু (১৯১০)	২০	V. Hugo	৬
মণিমঞ্জুষা (১৯১৫)	৩৯	L.de Lisle	৫
এখনো অগ্রন্থিত	৪	F. Mistral	৫
		A. de Musset	৪
		C. Baudelaire	৪
		P. Verlaine	৩
		Hérédia	৩
		M. Maeterlinck	৩
		Voltaire	২
		M. J. Chenier	২
		Béranger	২
		Ronsard, La Fontaine, Gautier, Prudhomme, A. Chenier প্রভৃতি ২১ জন কবি (প্রত্যেকটি একটি করে)	২১
		অজ্ঞাতনামা	৬
	৭৩		৭৩

ওই তিনটি বইতে যে সব বিদেশি ভাষা থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি কবিতা অনূদিত হয়েছে, নিচে তাদের তালিকা থেকে সত্যেন্দ্রনাথের ক্রমবর্ধমান ফরাশি কাব্যপ্রীতি বোঝা যাবে।

কাব্যগ্রন্থ	মোট কবিতা	ফরাশি	ইংরাজি	ফার্শি	জার্মান	জাপানি	চিনা	ফরাশি : শতাংশ
তীর্থসলিল	১৮১	১০	৩৮	৯	৮	৫	৮	৬
তীর্থরেণু	২০৪	২০	৩১	২৩	১৬	১৬	১০	১০
মণিমঞ্জুষা	১৫৭	৩৯	২১	৭	৯	১০	৪	২৫
(মোট)	৫৪২	৬৯	৯০	৩৯	৩৩	৩১	২২	

ইঙরাজি থেকে সর্বাধিক কবিতা অনূদিত হয়েছে : ফরাশির স্থান তার পরেই। কিন্তু ইঙরাজি থেকে অনুবাদের সঙ্খ্যা ক্রম-হ্রাসমান, ফরাশি ক্রম-বর্ধমান। ফরাশি কাব্যে সত্যেন্দ্রনাথের আগ্রহ হয়েছিল সর্বাধিক। তার সপক্ষে আরো দুটি নিদর্শন : (১) 'তীর্থসলিল' ও 'রঙ্গমল্লী' নামে অনুবাদ-করা গ্রন্থদুটি সত্যেন্দ্রনাথ যথাক্রমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উত্সর্গ করেন। তাঁরা দুজনেই ফরাশি থেকে বাঙলা অনুবাদ করেছিলেন। (২) সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় Alphonse Daudet-র *Jack* উপন্যাসটি 'মাতৃঋণ' শিরোনামে বাঙলায় অনুবাদ করেন।[৩] উত্সাহ ও বই দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন।[৪]

ফরাশি থেকে সত্যেন্দ্রনাথের অনূদিত কবিতাগুলি থেকে তাঁর নির্বাচনপদ্ধতি বোঝা কঠিন। Marceline Desbordais Valmore (১৭৮৪-১৮৫৯) উনিশ শতকের অপ্রধান কবি : Pierre de Ronsard (১৫২৪-১৫৮৫) নবজাগরণের যুগের প্রধান কবি-ব্যক্তিত্ব। Voltaire-এর (১৬৯৪-১৭৭৮) দুটি এবঙ Paule Verlaine-এর (১৮৪৪-১৮৯৬) তিনটি কবিতার অনুবাদ আছে। এঁদের কবিস্বভাব ও রচনার প্রভেদ দুস্তর। যাঁদের একাধিক কবিতা অনূদিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে বোল্‌তের ও Maurice Maeterlinck (১৮৬২-১৯৪৯) কবি হিশাবে খ্যাত নন। বাল্‌মোর ও Marie Joseph Chenier (১৭৬৪-১৮১১) অপ্রধান সাহিত্যিক। নীতিবাগীশ La Fontaine (১৬২১-১৬৯৫) ও কলাকৈবল্যবাদী Théophile Gautier (১৮১১-১৮৭২) পাশাপাশি রয়েছেন। ক্লাসিকপন্থী André Chenier (১৭৬২-১৭৯৪) এবঙ রোমান্টিকদের পুরোধা Victor Hugo (১৮০২-১৮৮৫) কেউ পরিত্যক্ত হননি। মনে হয়, কোনো নির্দিষ্ট নির্বাচনরীতি সক্রিয় ছিল না। কবির গুরুত্ব, যুগবিশেষের প্রতি আগ্রহ, রচনারীতি বা আদর্শের কোনো ঐক্য নির্বাচনে ক্রিয়াশীল নয়। Frédéric Mistral (১৮৩০-১৯১৪) ও মেত্‌র্‌লিঙ্ক্ যথাক্রমে ১৯০৪ ও ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান। তাঁদের কবিতা নির্বাচনের একমাত্র কারণ বোধহয় তা-ই। সেজন্য মিস্ত্রালের চারটি কবিতা একসঙ্গে অনূদিত হয়ে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়[৫] এবঙ গ্রন্থনার সময় আরো একটি যুক্ত হয়। 'মণিমঞ্জুষা' প্রকাশের কিছুদিন আগে মেত্‌র্‌লিঙ্ক নোবেল পুরস্কার পান। এই কারণে, তাঁর কবিখ্যাতি কম হলেও, তাঁর কবিতা ঐ কাব্যে বাদ পড়েনি, যদিও পূর্বপ্রকাশিত অনুবাদগ্রন্থগুলিতে তাঁর কবিতা স্থান পায়নি। এখানে অনুবাদের কারণ সাময়িক গুরুত্ব। সাময়িক আগ্রহ, বৈচিত্র্যসৃষ্টি, হঠাত্ কোনো কবিতা পড়ে ভালো লাগা— এ সব কারণ বিভিন্ন কবিতা নির্বাচনের পশ্চাতে সক্রিয় ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 'তীর্থসলিল' কাব্যে 'জাতীয় সঙ্গীত' অঙশে আটটি এবঙ 'নারীবন্দনা' অঙশে দশটি অনূদিত কবিতা আছে। Rouget de Lisle (১৭৬০-১৮৩৬) রচিত La Marseillaise-এর অনুবাদ 'জাতীয় সঙ্গীত' অঙশের অন্তর্ভুক্ত ; নইলে কাব্যগত উত্কর্ষ কবিতাটির নির্বাচনের সপক্ষতা করে না। একে কৌতূহলমাত্র বলা যায়। এই তথ্যও পূর্বসিদ্ধান্তের অনুকূল।

সত্যেন্দ্রনাথ ফরাশি ভাষা জানতেন, তবে বোধহয় তাতে দক্ষতা অর্জন করেননি। সম্ভবত তিনি বাড়িতে কারো সাহায্য ছাড়া নিজে বই পড়ে ভাষা শেখেন।[৬] ভালো করে আয়ত্ত করার পূর্বেই তিনি তা থেকে অনুবাদে হাত দেন।[৭] এজন্য তিনি পদে পদে বাধা পেয়েছেন। H.E.Berthon সম্পাদিত *Specimens of Modern French Verse* (London, 1899) বইটি তাঁর গ্রন্থসংগ্রহে ছিল। এ বই থেকে তিনি অন্তত তিনটি কবিতার অনুবাদ করেছেন—Baudelaire-এর *Harmonie du soir,* Verlaine-এর *Art Poétique* এবঙ Léconte de Lisle-এর *Midi*। বইতে উদ্ধৃত উক্ত কবিতার পৃষ্ঠাপ্রান্তগুলি অনুবাদে কণ্টকিত। তাতে বহু ফরাশি শব্দের ইঙরাজি প্রতিশব্দ পেন্সিলে লেখা আছে[৮]। দুটি কবিতার পৃষ্ঠাপ্রান্ত থেকে কয়েকটি অনুবাদ নির্বাচন করা হল। 'আর্মনি দু সোয়ার' কবিতার পাশে লেখা আছে frémit : moan, néant : nothing, luit : shines ইত্যাদি ১৩টি শব্দের অনুবাদ। 'মিদি' কবিতার পাশে ৪৪টি ফরাশি শব্দের ইঙরাজি প্রতিশব্দ লেখা আছে—lointaine : distant, lourds : heavy, lente . slow, épais . thick, songe : dream ইত্যাদি।[৯] এত সাধারণ ফরাশি শব্দের ইঙরাজি অনুবাদ সত্যেন্দ্রনাথের ফরাশি ভাষাজ্ঞানের অগভীরতা নির্দেশ করে। ওই তিনটি কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৩১৬-১৭ শনে।[১০] তখনো মাধ্যম--ভাষা হিসাবে ইঙরাজি উপস্থিত ; সরাসরি অনুবাদ নেই। 'তীর্থসলিল' ও 'তীর্থরেণু' সত্যেন্দ্রনাথের অপূর্ণ ফরাশি ভাষাজ্ঞানের সাক্ষ্য বহন করছে।

তাঁর গ্রন্থসংগ্রহের ভিত্তিতে সত্যেন্দ্রনাথের ফরাশি ভাষাজ্ঞান ও সাহিত্যপাঠ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। এই সংগ্রহে ফরাশি ভাষায় লেখা সমস্ত, এবঙ ফরাশি ভাষা সম্বন্ধে লেখা গ্রন্থের সঙখ্যা এরূপ :

ফরাশি সাহিত্য : সৃষ্টি	১৭৭
ফবাশি সাহিত্য : আলোচনা	৫
ফরাশি ভাষা	৮
ফরাশি ভাষায় নানা বিষয়	১১
	২০১

সাহিত্যগ্রন্থগুলির অন্তত ৭৫টি, আলোচনার প্রতিটি, এবঙ ভাষা সম্বন্ধে ৭টি বই ইঙরাজিতে লেখা, অথবা ইঙরাজি-ফরাশি দ্বিভাষিক। অন্য বইগুলির দুটিতে আর্বি ও পার্শি ব্যবহৃত হয়েছে। এদের মোট সঙখ্যা ৯০। তাহলে কেবল ফরাশি গ্রন্থের সঙখ্যা অনধিক ১১১।

সত্যেন্দ্রনাথ সব বই যে সতর্ক হয়ে কেনেননি, তার প্রমাণ একই বইয়ের একাধিক মুদ্রণের পাশাপাশি উপস্থিতি। কখনো এক বইয়ের ফরাশি মূল ও ইঙরাজি অনুবাদ পাশাপাশি আছে : হয়ত তিনি স্বাধীনভাবে ফরাশি মূল পড়তে পারতেন না। যেমন—

(ক) Hugo-এর গ্রন্থাবলী ফরাশি ও ইঙরাজি পৃথক সঙস্করণে ৭০ খণ্ড আছে।

(খ) Marguerite Audous-এর *Marie Clair* উপন্যাস মূল ও অনুবাদে পৃথকভাবে আছে।[১১]

(গ) Pascal-এর *Pensées* মূল ও ইঙরাজি অনুবাদে দু খন্ড আছে।

বাঁধাইয়ের দোষে পাতাগুলি যুক্ত রয়েছে, এমন অবস্থায় একাধিক ফরাশি বই আছে। নিশ্চয় সেগুলি সম্পূর্ণভাবে বা অঙশত অপঠিত।[১২] ফরাশি ভাষায় দখলের অভাবে তিনি প্রায়ই পৃষ্ঠাপ্রান্তে শব্দানুবাদ করে বই পড়তেন। *Specimens of Modern French Verse*-এ Baudelaire-র *L'Homme et la Mer* ও *Les Chats* কবিতাদুটি এভাবে পড়া। তাদের অনুবাদ করা হয়েছে বলে জানা যায়নি। Auguste Dorchain সম্পাদিত *Les chefs-d'oeuvre lyriques de P. de Ronsard et son école* গ্রন্থে[১৩] রঁসার-এর পাঁচটি ও du Bellay-এর দুটি কবিতা চিহ্নিত ; অন্যগুলি চিহ্নহীন। অনুবাদ পাওয়া গেছে মাত্র একটির। কিন্তু Francis Traver সম্পাদিত *Fables de la Fontaine* ভালোভাবে পড়ার চিহ্ন[১৪] আছে সর্বত্র ইঙরাজি প্রতিশব্দ লিখে রাখায়। বহু বই সম্পূর্ণ চিহ্নমুক্ত। বোধহয় কখনো পড়েননি। ফরাশি গ্রন্থসঙ্গ্রহ সত্যেন্দ্রনাথের ফরাশি সাহিত্যে পারদর্শিতা নির্দেশ করে না। তাঁদের কয়েকটি কবিতা শব্দানুবাদ করে পড়া সত্ত্বেও তিনি রঁসার ও লা ফঁতেনের একটি করে কবিতার বাঙলা অনুবাদ করেছেন। *Anthologie des Poètes Français Contemporaines* গ্রন্থেও কেবল অনূদিত কবিতাগুলিতে দাগ আছে। অন্য কবিতাগুলি কি তাঁর পক্ষে পাশে অনুবাদ না করে পড়া সম্ভব ছিল? বইটি দ্বিভাষিক নয়।

সত্যেন্দ্রনাথ ফরাশির মাধ্যমে আর্বি শেখেন, এই তথ্য প্রচারিত হয়েছে। তাঁর সঙ্গ্রহে Charles Schier প্রণীত *Grammaire Arabe* ও G. Nofal-এর লেখা দ্বিভাষিক (ফরাশি—আর্বি) *Guide de la Conversation* বইদুটি বোধহয় তার ভিত্তি। তবে এর জন্য ফরাশি ভাষায় গভীর জ্ঞান প্রয়োজনীয় নয়। তাছাড়া, তাঁর আর্বিতে দক্ষতা কেমন ছিল তা-ও অনুসন্ধানসাপেক্ষ।

যেখানে ভাষাজ্ঞানই অপরিণত সেখানে কোনো কবির মূল রচনার সঙ্গে পরিচয় অন্তরঙ্গ হতে পারে না।[১৫] সেই অবস্থায় কবিতা-নির্বাচনে শৃঙ্খলার অভাব স্বাভাবিক। যেসব কবির একাধিক কবিতা অনূদিত হয়েছে, তাদের রচনার তালিকা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

	তীর্থসলিল	তীর্থরেণু	মণিমঞ্জুষা	অগ্রন্থিত	মোট
Valmore			৭		৭
Hugo	২	৩			৫
Mistral			৫		৫
de Lisle		১	৪		৫

	তীর্থসলিল	তীর্থরেণু	মণিমঞ্জুষা	অগ্রন্থিত	মোট
de Musset		১	৩		৪
Baudelaire		৪			৪
Verlaine		২	১		৩
Maeterlinck			৩		৩
Hérédia			৩		৩
Béranger	২				২
Voltaire	১	১			২
M. J. Chenier			১	১	২
	৫	১২	২৭	১	৪৫

উপরের তালিকা কোনো কবির প্রতি অনুবাদকের কোনো আকর্ষণের সাক্ষী নয়। সত্যেন্দ্রনাথের অনূদিত কাব্যগুলিতে কালানুক্রমিকভাবে ফরাশি কবি ও কবিতার সঙখ্যা হল ৮ : ১০, ১৪ : ২০, এবঙ ২০ : ৩৯। যুগ্মসঙখ্যাগুলির প্রথমটি কবি, এবঙ দ্বিতীয়টি মোট অনুবাদ নির্দেশ করছে। অর্থাত্ প্রথমে কবিতা নির্বাচিত হয়েছে বিভিন্ন কবির রচনা থেকে, কারো প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল না। পরে ক্রমশ কবিতার তুলনায় কবিদের সঙখ্যা কমেছে, অর্থাত্ বিশেষ কবিদের প্রতি অনুবাদকের আগ্রহ বেড়ে গেছে। 'তীর্থসলিল' কাব্যে যেখানে মাত্র দুজন কবির একাধিক কবিতা অনূদিত হয়েছে সেখানে 'মণিমঞ্জুষা'তে এমন কবির সঙখ্যা ছয়। প্রথমদিকে অনুবাদকের ফরাশি সাহিত্যপাঠ প্রাথমিক স্তরে ছিল। অবশ্য তা পরেও বেশি উন্নত হয়নি। তার প্রমাণ—(ক) উগো ও বোদলের প্রথম দুটি বইতে নির্বাচিত, কিন্তু তৃতীয় বইতে অনুপস্থিত, এবঙ (খ) তৃতীয় গ্রন্থে মিস্ত্রাল ও মেতর্‌লিঙ্ক্ কেবল নোবেল পুরস্কার লাভের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গ্রহে তরু দত্তের *A Sheaf Gleaned in French Fields* বইটি ছিল।[১৬] সত্যেন্দ্রনাথ মনোযোগ দিয়ে বইটি পড়েছেন।[১৭] তিনি যে সব ফরাশি কবিতার বাঙলা অনুবাদ করেন তাদের কয়েকটির ইঙরাজি অনুবাদ ওই বইতেও আছে, যেমন—Sully Prudhomme-এর *Sonnet—A Dream* ও 'স্বপ্ন', M. D. Valmore-এর *The Solitary Nest* ও 'বিরহে', V. Hugo-র *Morning Serenade* ও 'সঙ্কেত গীতিকা', এবঙ Léconte de Lisle-এর *Autumn Sunset* ও 'সূর্য্যের মৃত্যু'।[১৮] বোধহয় সত্যেন্দ্রনাথ অনুবাদকর্মে ও তথ্যপঞ্জী সঙ্কলনে এই বই থেকে সাহায্য পেয়েছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদের মাধ্যম-ভাষা ছিল ইঙরাজি; তাঁর অনুবাদে মূল থেকে বহু

পরিবর্তন হয়েছে। অনেক পরিবর্তনের কারণ সম্ভবত এই মাধ্যম-ভাষার অস্তিত্ব। একাধিক অনুবাদে তিনি অপেক্ষাকৃত কঠিন ফরাশি বাক্য এড়িয়ে গেছেন। এই প্রসঙ্গে নিচে 'বাঘের স্বপন' কবিতার আলোচনা দ্রষ্টব্য। একজন লিখেছেন[১৯], যে সত্যেন্দ্রনাথ গম্ভীর কবিতা লিখতে পারতেন না কিন্তু লিখতে চাইতেন, এবঙ অনুবাদের দ্বারা সে অভাব পূর্ণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই ধারণা তথ্যানুগ নয়। Ronsard-এর *Sonnet pour Hélène* এবঙ Léconte de Lisle-এর *Midi* প্রভৃতি গম্ভীর কবিতার সঙ্গে অজ্ঞাতনামা লেখকের 'গরু ও জরু' এবঙ La Fontaine-এর 'যুগ্মপত্নীর প্রেম' নামে নিতান্ত লঘু কবিতাও তাঁর নির্বাচনে স্থান পেয়েছে। এমন কি গুরুগম্ভীর ফরাশি কবিতা তাঁর অনুবাদে লঘু হয়ে উঠেছে। 'বাঘের স্বপন' ও 'প্রাচীন প্রেম' তার নিদর্শন। এ সম্বন্ধে সমালোচকদের মন্তব্য[২০] কটু হলেও সত্য।

তরু দত্তের ইঙরাজি অনুবাদকাব্য থেকে সত্যেন্দ্রনাথ সাহায্য পেয়েছেন : কিন্তু মূল ফরাশি কবিতা না পড়ে তিনি তরু দত্তের ইঙরাজি থেকে বাঙলায় অনুবাদ করেননি। V. Hugo-র *Les Chants du Crépuscule* কাব্যের *Autre Chanson* কবিতাটির সত্যেন্দ্রকৃত অনুবাদ 'সঙ্কেত-গীতিকা' আলোচ্য। কবিতাটি তরু দত্তের গ্রন্থে *Morning Serenade* নামে অনূদিত হয়েছে *A Sheaf Gleaned in French Fields*-এ। নিচে মূল কবিতা এবঙ দুটি অনুবাদের প্রথম স্তবক উদ্ধার করা হল।

মূল ফরাশি

Laube naît, et ta porte est close!
Ma belle pourquoi sommeiller?
A l'heure où s'éveille la rose
Ne vas-tu pas te reveiller?
O ma charmante
Écoute ici
L'amant qui chante
Et pleure aussi!

ইঙরাজি অনুবাদ

Still barred thy doors!—The far east glows,
The morning wind blows fresh and free,
Should not the hour that wakes the rose
Awaken also thee?
No longer sleep
Oh listen now!
I wait and weep,
But where art thou?

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ

ভোর হয়ে গেছে, এখনো দুয়ার বন্ধ তোর।

সুন্দরী! তুমি কত ঘুম যাও সজনী!
গোলাপ জেগেছে, এখনো তোমার নয়নে ঘোর?
টুটিল না ঘুম?--দেখ চেয়ে, নাই রজনী।
প্রিয়া আমার,
শোনো, চপল!
গাহে কে! আর
কাঁদে কেবল!

ফরাশিতে আট চরণের স্তবক : প্রথম চারটি চরণ দীর্ঘ, শেষ চারটি হ্রস্ব। তাদের মিলবিন্যাস--কখ কখ গঘ গঘ। উপরে দেখা গেল--(১) স্তবক-গঠন দুটি অনুবাদেই মূলানুগ বলে ইঙরাজি থেকে সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ করার প্রশ্ন ওঠে না। (২) মূলের দ্বিতীয় চরণ ইঙরাজিতে অনুপস্থিত, অথচ বাঙলায় হুবহু অনুবাদ আছে। (৩) ফরাশির সঙ্গে শেষ চারটি বাঙলা পঙক্তির মিল প্রায় সম্পূর্ণ ; ইঙরাজিতে কেবল দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ অনূদিত হয়েছে। শিরোনামে সত্যেন্দ্রনাথ কারো অনুসরণ করেননি। অতএব, ফরাশি থেকে বাঙলায় অনুবাদ করা হয়েছে, ইঙরাজি থেকে নয়। কোনো সমালোচক এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করেছেন--'সত্যেন্দ্রনাথ হুগোর 'সঙ্কেত-গীতিকা' নামে যে অপূর্ব কাব্যানুবাদ করেছেন তার মূল Hugo-র ফরাসী কবিতা নয়, তরু দত্তের অপূর্ব ইঙরাজি কাব্যানুবাদ।'[২১] এই বক্তব্যে ভুল দুটি : (১) সত্যেন্দ্রনাথ ইঙরাজি থেকে নয়, উগো-র ফরাশি থেকে অনুবাদ করেছেন। (২) ইঙরাজি অনুবাদটি আদৌ তরু দত্তের করা নয়, তাঁর বড় বোন অরু দত্তের লেখা। ফরাশি কবিতায় স্তবকের শেষ চারটি পঙক্তি ধুয়া, এবঙ ইঙরাজি অনুবাদের তিনটি স্তবকে তা অপরিবর্তিত, অথচ বাঙলাতে তার সামান্য অদল-বদল করা হয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ কদাচিত্ মূলানুগ, প্রায়ই পাঠ পরিবর্তিত এবঙ রচনাঙশ আধা-মৌলিক। কয়েকটি নির্বাচিত কবিতা নিয়ে তাঁর অনুবাদ-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে।

লেকঁত্ দে লিলের *Le Rêve du Jaguar* কবিতার অনুবাদ 'বাঘের স্বপন' ১৩১৯ ফাল্গুন সঙখ্যায় প্রকাশিত হওয়ার পরে সত্যেন্দ্রনাথ 'মণিমঞ্জুষা' কাব্যে সঙ্কলন করেন। ফরাশি ও বাঙলার চরণসঙখ্যা যথাক্রমে ২২ ও ২৬। সত্যেন্দ্রনাথ অনুবাদের সঙ্গে মৌলিক রচনা জুড়ে দিয়েছেন। অনুবাদে মূল কবিতার ৯ ও ১৩ সঙখ্যক পঙক্তি সম্পূর্ণভাবে, এবঙ ৪, ১১, ১২ ও ২২ সঙখ্যক পঙক্তি অঙশত পরিত্যক্ত হয়েছে। অনুবাদের ২১, ২২ ও ২৪ সঙখ্যক চরণ সম্পূর্ণভাবে এবঙ ৩, ৪, ৫, ১১, ১৭, ২৩, ২৫ ও ২৬ সঙখ্যক চরণ অঙশত সত্যেন্দ্রনাথের মৌলিক রচনা। বর্জনের তুলনায় সঙযোগের পরিমাণ বেশি, এবঙ তা আয়তনবৃদ্ধির কারণ। মূলের আবর্তিত মিলবিন্যাস (কখ খক খগ ঘগ ইত্যাদি) অনুবাদে সহজ (কক খখ গগ ইত্যাদি) হয়েছে। মূল ও অনুবাদের অঙ্শবিশেষ (উভয়ের ১১-১৮ সঙখ্যক চরণ) উদ্ধার করা হল।

Un souffle rauque et bref, dune *brusque secousse,*
Trouble les grands lézards, *chauds de feux de midi,*
Dont la fuit étincelle à travers l'herbe rousse.
En un creux du bois sombre interdit au soleil
Il s'affaisse, allongé sur quelque roche plate;
D'un large coup de langue il se lustre la patte;
Il cligne ses yeux d'or hébétés de sommeil :
Et dans l'illusion de ces feroces inertes,

[অর্থ : 'যে মধ্যাহ্নরৌদ্র লালচে ঘাসকে উজ্জ্বল করে তোলে তাতে উত্তপ্ত গিরগিটিগুলিকে একটি ছোট্ট, তীক্ষ্ণ নিঃশ্বাস হঠাত্ ভয়ার্ত চমক দেয়। সে বনের মধ্যে সূর্য থেকে লুকানো একটি অন্ধকার ফাঁকা জায়গায় শুয়ে পড়ে এবঙ একটি চ্যাপ্টা পাথরের উপর নিজেকে ছড়িয়ে দেয় ; জিভের লম্বা টানে সে থাবার ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়ে আনে ; ঘুমের ঝোঁকে তার সোনালি দুটি চোখের তারা বন্ধ হয়ে আসে ; এবঙ তার সুপ্ত শক্তির ভারে']

তপ্ত হাওয়ার তীব্র নিশাস!—*শুঁটের মত শিটে—*
গিরগিটিটা শিউরে ওঠে *চলতে পাতার পিঠে।*
গহন সে বন ; যেখানটিতে দিনে দুই পহরে
লতা-পাতার নিবিড় ছাতা সূর্য্য আড়াল করে,—
লটপটিয়ে সেথায় বাঘা পড়ল নিয়ে মাটি ;
জিব্ দিয়ে সাফ্ করলে বারেক সামনেরি থাবাটি ;
তারপরে হায়, তন্দ্রাভরে মিটির *মিটির চোখ,—*
সোনালী দুই চোখের তারায় লাগলো ঘুমের ঝোঁক।

উপরের কবিতাঙশে বাঁকা হরফের ফরাশি চরণগুলি বাঙলাতে আদৌ অনূদিত হয়নি, এবঙ বাঁকা হরফের বাঙলা চরণগুলির কোনো ফরাশি মূল নেই। ১৭ সঙখ্যক ফরাশি চরণটি অনুবাদে দুই (১৭-১৮ সঙখ্যক) চরণে পরিণত হওয়ায় নতুন কথা জুড়তে এবঙ পরের ফরাশি চরণকে বাঙলায় আরো পরে লিখতে হয়েছে। ঐ ফরাশি চরণটি চিহ্নিত করার কারণ, তা স্বস্থানে নয়, পরে অনূদিত হয়েছে। ১৩ সঙখ্যক ফরাশি চরণ অর্থের দিক থেকে পূর্বের চরণের সঙ্গে যুক্ত ; বাঙলায় তার বদলে নতুন চরণ এসেছে এবঙ তা পরের চরণের সঙ্গে যুক্ত। অর্থাত্ একসঙ্গে দুটি পরিবর্তন আছে। চরণটি পরিত্যাগের কারণ বোধহয় এই, যে অপেক্ষাকৃত কঠিন শব্দযোজনা ও বাক্যগঠনের জন্য অর্থ বোঝা আলোচ্য অনুবাদকের পক্ষে শ্রমসাধ্য। শব্দ প্রয়োগে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল : (ক) ফরাশিতে il সর্বনাম বাঘকে বুঝিয়েছে, —শিরোনাম ছাড়া কোথাও jaguar শব্দ প্রযুক্ত হয়নি। বাঙলাতে শব্দটির অনুবাদ 'সে' নয়, 'বাঘ'ও নয়—'বাঘা'। বাঘ কুকুরে রূপান্তরিত হয়েছে। (খ) ফরাশি s'affaisse, allongé-র অনুবাদ হয়েছে শিশুসুলভ 'লটপটিয়ে'। অর্থাত্ ফরাশি বর্ণনাটির নির্যাস (spirit)—শ্লথতা ও গাম্ভীর্য—

অনুবাদে একবারেই নেই। রূপকল্পের প্রয়োগে অপেক্ষাকৃত সাবধানতা আছে। মূল ও অনুবাদ বর্ণনাপ্রধান। মূলে ৫টি রূপকল্প আছে, অনুবাদে ৬টি ; কিন্তু অনুবাদে সেগুলি অবিকৃত থাকেনি, যদিও তাদের একটিতেও বিদেশি বা অপরিচিত (l'air lourd, les lianes..bercent, feux de midi, fuite étincelle ও les yeux d'or) ভাব নেই। যেমন l'air lourd (ভারি হাওয়া)-এর জায়গায় সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন 'হাওয়ার ডানা' ; অর্থাত্ সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব প্রকাশিত হয়েছে। শুধু les yeux d'or-এর অনুবাদে 'সোনালি দুই চোখের তারা'য় রূপকল্পের পরিবর্তন হয়নি।

Pierre de Ronsard-এর *Sonnets pour Hétène* গুচ্ছে Quand vous serez bien vieille দিয়ে শুরু করা একটি বিখ্যাত সনেট আছে, 'তীর্থসলিল' কাব্যে 'প্রাচীন প্রেম' নামে সত্যেন্দ্রনাথ যার অনুবাদ করেছেন। অনুবাদটি আদৌ সনেট নয়—একাধিক স্তবকে বিধৃত ১৭ চরণের কবিতা। অপ্রয়োজনে মূলের গঠন পরিবর্তনের স্বাধীনতা নিশ্চয় অনুবাদকের নেই। মনে স্বাধীন রচনার আকাঙ্ক্ষা এবঙ মূলের গঠন রক্ষা করার পক্ষে উপযুক্ত ভাষাসঙ্যম না থাকা এই পরিবর্তনের কারণ। মূলের ষটক ও তার অনুবাদ পাশাপাশি রাখলে তা বোঝা যাবে।

Je serai sous la terre *et fantôme sans os,*
Par les ombres myrteux je prendrai mon repos :
Vous serez au foyer une vieille accroupie,
Regrettant mon amour et votre fier dédain.
Vivez, si men croyez, n'attendez à demain:
Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie.

(অর্থ : 'মাটির তলে অস্থিহীন প্রেত হয়ে আমি থাকব, myrtil গাছের ছায়ায় আমার বিশ্রাম নেব ; তুমি ন্যুব্জদেহিনী বৃদ্ধা হয়ে বসবে আগুনের ধারে, আমার প্রেম ও তোমার অহঙ্কারী ঘৃণার জন্য অনুতপ্ত হয়ে। আমায় যদি বিশ্বাস করো—বেঁচে থাকো, আগামীকালের জন্য অপেক্ষা কোরে না ; আজ থেকেই জীবনের গোলাপগুলি কুড়িয়ে যাও।')

মাটির তলে *মাটি হয়ে ঘুমিয়ে আমি র'ব,*
গাছের ছায়ে *নিশির কায়ে, ছায়া যখন হব*
তোমার গর্ব্ব, আমার প্রীতি,
মনে তোমার পড়বে নিতি,
দিয়ো তখন--দিয়ো মোরে--দিয়ো প্রণয় তব ;
তুমি যখন প্রাচীন হবে, আমি—ধূলি হব।

বাঁকা হরফের ফরাশি এবঙ নিম্নরেখ বাঙলা চরণগুলি সম্বন্ধে বক্তব্য 'বাঘের স্বপন'--এর অনুরূপ। এখানে মূলের ৫টি চরণ বর্জিত, এবঙ অনুবাদের ৫টি চরণ অর্থাত্ ৮৩ শতাঙশ রচনা মৌলিক। অথচ রচনাটি অনুবাদ! মূলের শেষ দুটি চরণের অর্থ, 'আমাকে বিশ্বাস কর, বেঁচে থাক, কাল পর্যন্ত অপেক্ষা কোরো না। আজ থেকেই জীবনের গোলাপগুলি কুড়িয়ে নাও।' শেষ দুটি চরণে ভাব পূর্ণতা পেয়েছে। বাঙলা অনুবাদে তার

কোনো চিহ্ন নেই।

কবিতা কি তা বোঝানোর জন্য Alfred de Musset একবার *Impromptu* নামে একটি ছোট কবিতা লিখেছিলেন। কবিতাটির শিরোনামের নিচে de Musset লিখেছেন, 'En réponse à cette question qu'est-ce que la poésie?' [অর্থ : 'কবিতা কি, এই প্রশ্নের উত্তরে লেখা।'] সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদের নাম 'কবির কারবার'। মূলের ১২টি চরণ অনুবাদে ১৪টি হয়েছে। একটিমাত্র ফরাশি চরণ Faire un perle d'une larme বাঙলায় যথাযথ অনূদিত হয়েছে—'নয়নের জলে মুকুতা রচনা করে'। মূলের ৫, ১০, ১১ ও ১২ সঙখ্যক চরণের সঙ্গে অনুবাদের যথাক্রমে ৩, ৯, ১৩ ও ১৪ সঙখ্যক চরণগুলির মিলের আভাসমাত্র আছে : মিলের আভাসমাত্র, কিন্তু অনুবাদ নয়। অন্যত্র এটুকু মিলও দুর্লভ ; আদৌ ফরাশির অনুবাদ নয়, এমনকি তার সঙ্গে সঙ্গতিহীন চরণেরও অভাব নেই অনুবাদে। যেমন--

এমনি করিয়া কাটে জীবনের দিন,
খেয়ালে, স্বপনে, চিত্ত ভাবনাহীন।

ফরাশি কবিতার পক্ষে এই দুটি চরণ অবান্তর, কারণ এখানে কবিতার প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনো কথা নেই। ফরাশি কবিতাটির প্রকৃতি প্রথম চারটি চরণ থেকে বোঝা যাবে।

Chasser tout souvenir et fixer la pensée;
Sur une bel axe d'or la tenir balancée,
Incertaine, inquiète, immobile pourtant;
Éterniser peut-être un rêve d'un instant;

[অর্থ : 'সমস্ত স্মৃতি অন্বেষণ করা ও চিন্তাকে স্থির করা ; স্থির হলেও সেই চঞ্চল অস্থিরতার ভারসাম্য একটি সোনালি axis-এর উপর বজায় রাখা ; বোধহয় ক্ষণিকের স্বপ্নকে চিরন্তন করা',] ফরাশি কবিতাটি মূল উদ্দেশ্য থেকে কখনো বিচ্যুত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ফরাশি কবিতাটির ভাব অবলম্বন এবঙ তাকে পরিবর্তিত করে, সত্যেন্দ্রনাথ আধা-মৌলিক কবিতা লিখেছেন, এবঙ তাকেই অনুবাদ বলেছেন।

মূল শিরোনাম অনুবাদে যথাসম্ভব অপরিবর্তিত রাখা বাঞ্ছনীয়। এদিক থেকে সত্যেন্দ্রনাথ অপেক্ষাকৃত সাবধানী, যদিও ত্রুটিহীন নন। *Le Rêve du Jaguar, Harmonie du Soir, Un Songe, Les Djinns,* ও *Le Mort du Soleil* কবিতাগুলির অনুবাদের নাম যথাক্রমে বাঘের স্বপন, সন্ধ্যার সুর, স্বপ্ন, জিন, ও সূর্যের মৃত্যু। অনুবাদগুলি যথাযথ। *Midi, Chanson d'automne* ও *Rapelle-toi*-র অনুবাদ করা হয়েছে—গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে, শিশিরের গান, ও জাগরণী। এখানে পরিবর্তন সামান্য, এবঙ কবিতার বিষয়বস্তু অনুসারে তা নিন্দনীয় নয়। শুদ্ধ অনুবাদ হবে গ্রীষ্ম, শরতের গান, এবঙ জেগে ওঠো। কিন্তু অনেক অনুবাদে আদৌ মূলানুগত্য নেই। *Impromptu, Desirs d'hiver, Sonnet pour Hélène, Humble Espoir, Art Poétique, Pantoum Malais, Voyage,* ও *L' Homme entre deux âges et ses deux Maitresses*-এর অনুবাদ সত্যেন্দ্রনাথ করেছেন যথাক্রমে কবির কারবার, শীতের হাহাকার, প্রাচীন প্রেম,

শেষ আশা, নব্য অলঙ্কার, অতুলন, কা বার্তা, ও যুগ্মপত্নীর প্রেম। এই শিরোনামগুলি সত্যেন্দ্রনাথের দেওয়া,—অনুবাদ নয়।

কয়েকটি অনুবাদ-কবিতা অবলম্বন করে আলোচনার জন্য নিচে একটি সারণী দেওয়া হল। তার নিচে সারণীটির ব্যাখ্যা আছে।

অনুবাদের নাম	ফরাশি নাম	পঙক্তিসঙখ্যা		মূল থেকে অনুবাদে		গঠন		শিরোনাম
		মূলে (ক)	অনুবাদে (খ)	বর্জিত পঙক্তি (গ)	নতুন পঙক্তি (ঘ)	মূল (ঙ)	অনুবাদ (চ)	(ছ)
গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে	Midi	৩২	৩২	৬	৮			o
বাঘের স্বপন	Le Rêve du Jaguar	২২	২৬	৫½	১০½			*
সূর্যের মৃত্যু	Le Mort du Soleil	১৪	১৪	৪	৪	সনেট	✓	*
শিশিরের গান	Chanson d'automne	১৮	১৮	৪½	৪½	⊥	✓	o
নব্য অলঙ্কার	Art Poétique	৩৬	৩৬	৮	১৩½			×
জাগরণী	Rappelle-toi	২৭	২৭	১৩½	১০½	⊥	✓	o
কবির কারবার	Impromptu	১২	১৪	৮	১০			×
শীতের হাহাকার	Desirs d'hiver	১৬	১৬	১০	১১			×
শেষ আশা	Humble Espoir	৯	৯	৪½	৪			×
প্রাচীন প্রেম	Sonnet pour Hélène	১৪	১৭	৬	৭½	সনেট	×	×
জিন	Les Djinns	১২০	১২০	২৯	৩১	⊥	✓	×
অতুলন	Pantoum Malais	১৬	১৬	—	১	পাঁতুঁ	✓	*
সন্ধ্যার সুর	Harmonie du Soir	১৬	১১	২	২	পাঁতুঁ	✓	*
কা বার্তা	Le Voyage	৩২½	১৬	৩২½	১৬			×
স্বপ্ন	Un Songe	১৪	২৪	৪	১৩	সনেট	×	*
যুগ্মপত্নীর প্রেম	L'Homme entre deux âges et ses deux maîtresses	৩১	৮	৩১	৮			×

(১) ৭৩টি কবিতার মধ্যে ১৬টি অর্থাৎ প্রায় ২২ শতাংশ কবিতা গৃহীত হয়েছে। 'তীর্থসলিল' থেকে দুটি এবং অন্য দুটি কাব্যের প্রতিটি থেকে ৭টি করে কবিতা গৃহীত, কারণ প্রথম কাব্যে ফরাশি থেকে অনুবাদের পরিমাণ ন্যূনতম এবং পরে, তা বেড়ে গেছে। খ্যাত (Hugo), অখ্যাত (Séverin) কবি, এবং দীর্ঘ (জিন) ও হ্রস্ব (শেষ আশা), বিশেষ গঠনযুক্ত (সন্ধ্যার সুর) ও সাধারণ গঠনের (নব্য অলঙ্কার), মূলানুগ ও আধা-মৌলিক (যুগ্মপত্নীর প্রেম)—সব ধরনের কবিতা নির্বাচিত হয়েছে। সেজন্য এই তথ্যপঞ্জীর ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত তাঁর অনূদিত সমস্ত ফরাশি কবিতা সম্বন্ধে সাধারণভাবে সত্য হতে পারে।

(২) অনূদিত শিরোনাম সম্বন্ধে 'ছ' স্তম্ভে * চিহ্ন শুদ্ধ অনুবাদ, × চিহ্ন সম্পূর্ণ পরিবর্তন, এবং ০ চিহ্ন সামান্য পরিবর্তন বোঝায়। 'ঙ' স্তম্ভে ফাঁকা ঘরের কবিতাগুলির গঠনে কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। ⊥ চিহ্নিত ঘরের কবিতায় বিশেষ ধরনের স্তবক ব্যবহৃত হয়েছে : অন্যত্র গঠনের নাম লেখা আছে। 'চ' স্তম্ভটি 'ঙ'-এর সঙ্গে প্রতিতুলনীয়। এখানে √ চিহ্ন মূলের গঠন রক্ষা, এবং × গঠনের পরিবর্তন নির্দেশ করে।

(৩) বর্জিত ও নতুন পঙক্তির সংখ্যা সমান না হলেও কখনো কখনো 'ক' ও 'খ' স্তম্ভের পঙক্তিসংখ্যা সমান রয়েছে, কারণ একটি ফরাশি পঙক্তির বাঙলা অনুবাদে সর্বত্র একটি পূর্ণ বাঙলা পঙক্তি লাগে না, কম বা বেশিও দরকার হয়। এজন্য 'গ' ও 'ঘ' স্তম্ভে সংখ্যার পার্থক্য সর্বত্র বা সমানভাবে 'ক' ও 'খ' স্তম্ভে উপস্থিত নয়।

(৪) অনুবাদের পঙক্তিসংখ্যা মূলের সঙ্গে সর্বত্র সমান নেই, এবং আয়তন মূলের তুলনায় প্রায়ই বেড়ে গেছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ৪২৯½ টি ফরাশি পঙক্তি ৪০৯টি বাঙলা পঙক্তিতে অনূদিত হওয়ায় পঙক্তিসংখ্যা কমেছে। কিন্তু 'কা বার্তা' ও 'যুগ্মপত্নীর প্রেম' খাঁটি অনুবাদ নয়, প্রভাবিত মৌলিক রচনা। 'গ' ও 'ঘ' স্তম্ভের সঙ্গে পূর্বের স্তম্ভদুটিকে মিলিয়ে দেখলেই তা বোঝা যাবে। এই দুটি কবিতা বাদ দিলে ৩৬৬টি ফরাশি পঙক্তির বাঙলা অনুবাদ হয়েছে ৩৮৫টি বাঙলা পঙক্তিতে। মূল থেকে অনুবাদের পরিমাণ প্রায় ৬ শতাংশ বেড়ে গেছে। সত্যেন্দ্রনাথের যথেষ্ট সংযমের অভাব ছিল, বা তিনি মূলানুগত্যে উৎসাহী ছিলেন না।

(৫) যতগুলি পঙক্তি মূল ফরাশি থেকে বর্জিত হয়েছে, বাঙলায় যুক্ত হয়েছে তার থেকে অনেক বেশি পঙক্তি। ১০৫টি ফরাশি পঙক্তি অনুবাদে বর্জিত এবং ১৩০টি মৌলিক পঙক্তি যুক্ত হয়েছে। এই হিশাবে, পূর্বলিখিত কারণে, 'কা বার্তা' ও 'যুগ্মপত্নীর প্রেম' বর্জিত। অতএব, বর্জনের তুলনায় রচনার পরিমাণ ২৪ শতাংশ বেশি এবং অনুবাদের প্রায় ৩৪ শতাংশ মৌলিক রচনা। তাছাড়া মূল কবিতাগুলির প্রায় ৩০ শতাংশ আদৌ অনূদিত হয়নি।

(৬) 'কা বার্তা' ও 'যুগ্মপত্নীর প্রেম' কবিতাদুটি খাঁটি অনুবাদ নয়। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে *Le Voyage à maxime du camp* নামে একটি দীর্ঘ কবিতা Baudelaire রচনা করেন। আট ভাগে বিভক্ত এই কবিতার ষষ্ঠ ও অষ্টম অংশ অবলম্বনে 'কা বার্তা'

রচিত। La Fontaine-এর *Fable* প্রথম খন্ডের ১৭ সঙখ্যক কবিতা অবলম্বনে 'যুগ্মপত্নীর প্রেম' লেখা। মূলের সব পঙক্তি এই দুটি অনুবাদে বর্জিত এবঙ অনুবাদের চরণগুলি অনুবাদকের মৌলিক রচনা। উভয়ের মধ্যে পঙক্তিগত কোনো যোগাযোগ নেই। মূলের গঠন অনুবাদে বজায় নেই। শিরোনামও পৃথক। অনুবাদগুলি আয়তনে মূলের অর্ধেক বা এক-চতুর্থাঙশ। La Fontaine-এর কবিতার শেষে যে belles de la leçon-এর কথা আছে, অনুবাদে তার আভাসমাত্র নেই। এমনকি ফরাশিতে কোনো পত্নীর কথাই নেই ; maîtress পত্নী নয়। প্রকৃতপক্ষে এগুলি অনুবাদ নয়, ভিন্ন কবির দ্বারা অনুপ্রাণিত মৌলিক রচনা। এখানে ফরাশি কবিতার ভাব অবলম্বনে সত্যেন্দ্রনাথ মৌলিক কবিতা লিখেছেন। Sully Prudhomme-এর *Un Songe* কবিতার অনুবাদ 'স্বপ্ন' প্রায় এক পর্যায়ের। পার্থক্য শুধু এই, যে এখানে মূল শিরোনাম এবঙ কিছু কিছু পঙক্তিগত মিল বজায় আছে, যদিও অনূদিত কবিতার ৫৪ শতাঙশ (২৪টি চরণের মধ্যে ১৩টি) মৌলিক।

(৭) 'সূর্যের মৃত্যু', 'প্রাচীন প্রেম', 'স্বপ্ন' 'অতুলন' ও 'সন্ধ্যার সুর' এই পাঁচটি কবিতার মূলের গঠন বিশিষ্ট। প্রথম তিনটি সনেট। অনুবাদে সনেটের গঠন বজায় রাখতে যথেষ্ট ভাষাসঙযমের প্রয়োজন। 'প্রাচীন প্রেম' ও 'স্বপ্ন' অনুবাদে সনেট নয়। 'সূর্যের মৃত্যু'তে কোনো পরিবর্তন হয়নি। অন্য দুটি কবিতার গঠনকে পাঁতুঁ (Pantoum) বলে। এগুলি অনুবাদের কারণ কাব্যগৌরব নয়—গঠনবৈশিষ্ট্য। বাঙলা সাহিত্যে তা সম্পূর্ণ নতুন। প্রমাণ, সত্যেন্দ্রনাথ 'তীর্থরেণু' কাব্যের (যাতে এই দুটি কবিতা সঙ্কলিত হয়েছ) গ্রন্থশেষে তথ্যপঞ্জীতে 'পান্তুম্'-এর ব্যাখ্যা করেছিলেন। বইটির অন্য কোনো কবিতা বা গঠন সম্বন্ধে এরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। এটি সত্যেন্দ্রনাথের বহিরঙ্গ-বিলাসিতার উদাহরণ এবঙ সেই কারণেই মূলের গঠন অনুবাদে বজায় আছে। 'অতুলন' কবিতাটি 'শিশিরের গানে'র মত বেশ ভালো অনুবাদ।

(৮) ১৬টি কবিতার শিরোনামের মধ্যে ৮টি সম্পূর্ণ এবঙ ৩টি অঙশত পরিবর্তিত। পরিবর্তনের পরিমাণ প্রায় ৬৭ শতাঙশ।

শিরোনাম বা কবিতার অনুবাদে সত্যেন্দ্রনাথের স্বাধীনতার উদাহরণে আর একটি তথ্য উল্লেখযোগ্য। 'সাহিত্য' ১৩০৮ ফাল্গুন সঙখ্যায় সত্যেন্দ্রনাথ 'দেখিবে কি' শিরোনামে Voltaire-এর একটি ছোট কবিতার অনুবাদ করেন। 'তীর্থসলিল' কাব্যে অন্তর্ভুক্তির সময়ে কবিতাটির পরিবর্তিত শিরোনাম হয়, 'দেখে যাও।' দুটি পাঠে চতুর্থ চরণের পাঠভেদ সামান্য।

অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ যে যথেষ্ট মূলানুসারী ছিলেন না, জনৈক সমালোচক সেই তথ্যটির আভাসমাত্র দিয়েই তাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন।[২২] তাতে অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয় না।

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ-কবিতাগুলির প্রশঙসায় রবীন্দ্রনাথ মুখর হয়ে উঠেছেন।[২৩] অনুবাদ হিসাবে সে প্রশঙসার যোগ্যতা সঙশয়াতীত নয়। উপরের তথ্য তার সাক্ষ্য বহন

করছে। তবে অনুবাদগুলি যে অনেক জায়গায় মৌলিক রচনা বলে পাঠকের ভ্রান্তি জন্মায়[২৪] তার কারণ আছে।

(১) সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর বিকাশপর্বের[২৫] অন্যান্য কবিতার মতো অনুবাদে প্রচুর তদ্ভব, দেশি ও স্বরচিত শব্দের প্রয়োগ করেছেন। উদাহরণ হিসাবে 'বাঘের স্বপন' কবিতায় ১২টি (নাবাল্, নাম্না, মাকোষা, শুঁয়া, হুকু, শুঁটে, শিটে, পহর, নিশাস, লট্‌পটিয়ে, মিটির মিটির, হাম্বা) এবঙ 'জবু ও গবু' কবিতায় ২৫টি (জুড়ি, চালা, দুখী, ঝক্কি, মাড়ে, বন্ন, ছত্তর, বচ্ছর, ঝি, দাগা, থাকমণি, গা, বাজু, সিঁথি, পৈঁচে, দুধুলি, গাই, বাছুর, হদ্দমুদ্দ, জাবনা, জাবর, বছর, কসাই, হে, গো) শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। এরূপ প্রায় সর্বত্র হয়েছে।

(২) হাল্কা ভাবের অনুবাদে প্রায়ই স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ হয়েছে। 'বাঘের স্বপন' ও 'প্রাচীন প্রেম'[২৬] কবিতাদুটি থেকে উপরের উদ্ধৃতি তার নিদর্শন। 'গবু ও জবু' থেকে একটি উদাহরণ—

দুধুলি গাই / দেবো তারে / দেবো বাছুর / সুদ্ধ॥
থাকব সুখের / জন্যে আমি / করব হদ্দ / মুদ্দ॥

লৌকিক ছন্দ বিদেশি কবিতাকে দেশি রূপ দিয়েছে বটে, তবে তা সত্যেন্দ্রনাথের সীমিত ছন্দনৈপুণ্য ও মূলাতিক্রমী স্বভাব ফুটিয়ে তুলেছে।

(৩) অনুবাদের বহুলাঙশ আদৌ অনুবাদ নয়, মৌলিক রচনা।

(৪) বহু অনুবাদ-কবিতার শিরোনাম পরিবর্তিত হয়েছে। পরিবর্তিত শিরোনামগুলিতে প্রায়ই বাঙালির পরিচিত বিষয়বস্তু বা ভাবের প্রয়োগ হয়েছে, যেমন—ঝিঁঝি, দুয়ো সুয়ো, মল্লদেব, ঢাকাই কলের গান, ও মহাশঙ্খ। বিদেশি কবিতা থেকে অনুবাদের দেশীয়করণে শিরোনামের গুরুত্ব অবশ্যস্বীকার্য।

(৫) প্রতিরূপ নির্মাণে কুশলী সত্যেন্দ্রনাথের দক্ষতা অনুবাদের ভাষায় বারবার লক্ষণীয়। *Midi* কবিতার La terre est assoupie en sa robe de feu পঙক্তিটির অনুবাদ সত্যেন্দ্রনাথ করেছেন—'জড়ায়ে অনল-শাড়ী বসুন্ধরা মূরছিয়া পড়ে।' Robe-এর বাঙলা হয়েছে 'শাড়ী'। কবিতাটিতে অন্যত্র আছে Et la source est tarie où bouvaint les troupeaux। [অর্থ : 'এবঙ যে ঝর্ণায় ভেড়ার পাল জলপান করত তা শুকিয়ে গিয়েছে।'] চরণটির প্রথমে বাঙালি পাঠকের অপরিচিত কিছু নেই বলে অনুবাদ মূলানুগ হয়েছে—'লুপ্ত ধারা গ্রাম-নদী।' কিন্তু troupeaux সুপরিচিত নয়, অন্তত বাঙলার গ্রামে। সত্যেন্দ্রনাথ শব্দটির অর্থ জানতেন,[২৭] কিন্তু দেশীয়করণের জন্য এর পরিবর্তে পরিচিত জীবের আমদানি করেছেন—'বত্‌স-গাভী পানীয় না পায়।' বলা বাহুল্য, এতে কবিতার ক্ষতি হয়নি, অনুবাদের উত্‌কর্ষ বেড়েছে।

Charles Baudelaire-এর *Harmonie du Soir*-এর সত্যেন্দ্রকৃত অনুবাদ 'সন্ধ্যার সুর'। মোহিতলালও ঐ নামে কবিতাটির অনুবাদ 'হেমন্ত গোধূলি' কাব্যে করেছেন। বুদ্ধদেব বসু করেছেন 'শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা' বইতে 'সান্ধ্য সুর'

নামে। মোহিতলাল ফরাশি জানতেন না : বোধ হয়, বুদ্ধদেবও : অনুবাদ হয়েছে ইঙরাজির মাধ্যমে। মোহিতলালের অনুবাদ এক কথায় 'কদর্য'। অন্য দুটি অনুবাদের কোনোটি প্রশঙসনীয় নয় ; ভাববস্তু বা আক্ষরিক অর্থ কোথাও বজায় নেই। এঁদের তুলনায় চন্দননগরের ইন্দুমতী ভট্টাচার্যের করা অনুবাদ গুণে-মানে অনেক ভালো।[২৮] দুটি উদাহরণ--

(ক) Le ciet est triste et beau comme un grand reposoir.

[অর্থ : 'ম্লান ও সুন্দর বিরাট বেদীর (অথবা বিশ্রামস্থানের) মতো আকাশ।']

সুন্দর-ম্লান, বেদী সুমহান সীমাহীন নীলাকাশ। — সত্যেন্দ্রনাথ
অস্ত-গগন মৃত্যুসদনে পেতেছে রূপের ফাঁদ! -- মোহিতলাল
বেদীর মতো আকাশে নামে বিষাদঘন মায়া। -- বুদ্ধদেব[২৯]
আকাশ বেদীর মত রম্য আর ক্লিষ্ট বেদনায়। — ইন্দুমতী

(খ) শেষ চরণের comme un ostensoir-এর [অর্থ : 'বেদীর মতো'] অনুবাদ হয়েছে 'স্মৃতিটি' (সত্যেন্দ্রনাথ), 'বিকট মূরতি' (মোহিতলাল) অথবা 'তর্জনীর ছোঁওয়া' (বুদ্ধদেব)। বলা বাহুল্য, যথাযথ না হলেও সত্যেন্দ্রনাথ মূলের নিকটতম। অন্যেরা যে কি তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তবে, সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদে এমন শব্দগুচ্ছ আছে যার অর্থ বোধহয় তিনি ছাড়া কেউ করতে পারতেন না। Valse mélancolique et langoureux-এর [অর্থ : 'বিষণ্ণ ও আবেশ-জড়ানো ভাল্‌জ্‌ নাচ'] অনুবাদে তিনি লিখেছেন--'সান্দ্র ফেনিল মূর্চ্ছা শিথিল' ইত্যাদি। তা অর্থহীন।[৩০]

কবিজীবনের প্রথমদিকে 'তীর্থসলিল' ও 'তীর্থরেণু' কাব্যে সত্যেন্দ্রনাথ বেশি অনুবাদ করেছেন ; অবশ্য পরে 'মণিমঞ্জুযা' ও অগ্রন্থিত কিছু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। সাময়িকপত্রে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ ফরাশি থেকে অনূদিত কবিতা 'দেখিবে কি' দিয়ে। মনে হয়, অনুবাদ দিয়ে তিনি নিজের শক্তির অনুশীলন করতে চেয়েছেন। তাহলে তাঁর মৌলিক রচনায় তাঁর অনুবাদের প্রভাব দুর্লক্ষ্য না হতে পারে।[৩১]

Leconte de Lisle-এর *Midi* কবিতার অনুবাদ 'গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে' ভারতী' পত্রে ১৩১৭ জ্যৈষ্ঠ সঙখ্যায় প্রকাশিত হয়। সেই মাসের 'প্রবাসী'তে সত্যেন্দ্রনাথের মৌলিক কবিতা 'চম্পা' মুদ্রিত হয়েছে। পাশাপাশি পড়লে এদের মিল দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। কয়েকটি উদ্ধৃতি পাশাপাশি তুলে দিলাম।

(ক) Tout se tait. L'air flamboie et brûle sans haleine;
La terre est assoupie en sa robe de feu. —*Midi.*

[অর্থ : 'সমস্ত নিঃশব্দ। নিরুদ্ধ নিঃশব্দ বাতাস উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। এখন পৃথিবী আগুনের পোশাক পরে ঘুমিয়ে পড়েছে।']

মৌন বিশ্ব ; দহে বায়ু তুষানলে নিশ্বসি' নিশ্বসি ;
জড়ায়ে অনল-শাড়ী বসুন্ধরা মূরছিয়া পড়ে। —গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে

বিষণ্ণ যখন বিশ্ব নির্মম গ্রীষ্মের পদানত। —চম্পা

(খ) Et la source est tarie où bouvaient les troupeaux

La lointaient forêt, dont la lisière est sombre. —Midi.

[অর্থ : 'এবঙ যে ঝর্ণায় ভেড়ার পাল জল পান করত, তা শুকিয়ে গিয়েছে ; দূরের বন যার প্রান্তভাগ কালো']

লুপ্ত ধারা গ্রাম-নদী ; বত্‌স গাভী পানীয় না পায়

সুদূর কানন-ভূমি (দেখা যায় যার প্রান্তদেশ) —গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে

বনানী শোষণ-ক্লিষ্ট মর্মরি' উঠিল একবার, —চম্পা

(গ) Pacifiques enfants de la terre sacrée,

Ils épuisent sans peur la coupe du soleil. —Midi

[অর্থ : 'পবিত্র ধরার শান্ত শিশুরা সূর্যের পাত্র থেকে নির্ভয়ে নিঃশেষে পান করছে।']

নির্ভয়ে করিছে পান তপনের অবিশ্রান্ত কর,

মাতৃক্রোড়ে শান্ত শিশু পিয়ে যথা পীযূষের ধারা। —গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে

উগ্রমদ্যসম রৌদ্র—যার তেজে বিশ্ব মুহ্যমান,—

বিধাতার আশীর্বাদে আমি তা সহজে পান করি। —চম্পা

(ঘ) Et retourne à pas lents vers les cités infimes,

Le coeur trempé sept fois dans le néant divin. -Midi

[অর্থ : 'এবঙ ক্লান্তপদে ফিরে যাও তুচ্ছ শহরের দিকে, তোমার হৃদয়কে সাতবার স্বর্গীয় শূন্যতায় অবগাহন করিয়ে।']

শেষে ক্লিন্ন জনপদে লঘুকরে করিবে বর্ষণ,

মর্ম তব সিক্ত করি' সপ্তবার নির্বাণ-সাগরে। —গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে

মূর্চ্ছে দেহ, মোহে মন,—মুহুর্মুহু করি অনুভব!

সূর্যের বিভূতি তবু লাবণ্যে দিতেছে তনু ভরি'; —চম্পা

উপরের পঙক্তিগুলিতে অনুবাদ ও মৌলিক রচনার মিল আশ্চর্য। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, সতর্কতা ও রসবোধ একত্রে ক্রিয়াশীল হওয়ায় 'গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে' সত্যেন্দ্রনাথের ফরাশি থেকে অনূদিত কবিতাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

কবিতার গঠনরীতির দিক থেকেও অনুরূপ মিল দুর্লক্ষ্য নয়। 'প্রবাসী' ১৩১৭ আষাঢ় সঙখ্যায় ভিক্তর উগো-র Les Djinns কবিতার সত্যেন্দ্র-কৃত অনুবাদ 'জিন' প্রকাশিত হয়। দু বছর পরে প্রকাশিত 'কুহু ও কেকা' কাব্যে (১৩১৯) সত্যেন্দ্রনাথ 'গ্রীষ্মের সুর' নামে একটি কবিতা মুদ্রিত করেন। ফরাশি কবিতাটিতে পনেরটি স্তবক আছে ; প্রতিটি স্তবকের পঙক্তিগুলি পরস্পর সমদীর্ঘ, তবে ভিন্ন স্তবকের পঙক্তিদৈর্ঘ্য তার সঙ্গে অসমান। প্রথম থেকে ক্রমশ স্তবকগুলির পঙক্তিদৈর্ঘ্য বেড়ে গিয়ে অষ্টম স্তবকে দীর্ঘতম এবঙ পরবর্তী স্তবকগুলিতে ক্রমশ হ্রস্ব হয়েছে। এভাবে সমগ্র কবিতাটি একটি দীর্ঘ বরফির আকার

পেয়েছে। 'গ্রীষ্মের সুর' অনেক স্তবকে গঠিত, এবঙ প্রতিটি বরফি আকৃতির।

'কুহু ও কেকা' কাব্যে সত্যেন্দ্রনাথ 'পাল্কীর গান' নামে একটি কবিতা প্রকাশ করেছেন। অনেকটা ঐ কবিতার ছন্দে তিনি 'ভারতী' ১৩২১ আষাঢ় সঙখ্যায় 'পিয়ানোর গান' ('অভ্র--'আবীর' কাব্যে সঙ্কলিত) এবঙ 'প্রবাসী' ১৩২৩ কার্তিক সঙখ্যায় 'দূরের পাল্লা' ('বিদায় আরতি' কাব্যে সঙ্গৃহীত) নামে দুটি কবিতা রচনা করেন। এই কবিতাগুলিতে দ্বিপর্বিক চরণ বা একপর্বিক পঙক্তি ব্যবহৃত হয়েছে।[৩২] এইভাবে হ্রস্ব চরণে দীর্ঘ কবিতা রচিত হয়ে তা বাঙলা কাব্যে একটি নতুনত্বের স্বাদ এনেছিল। সম্ভবত এই আদর্শ সত্যেন্দ্রনাথ উগো-র পূর্বোক্ত কবিতা ও তার অনুবাদ থেকে পেয়েছিলেন। উদাহরণ--

Murs, ville,
Et port,
Asile,
De mort.

–Les Djinns.

Dans la plaine
Naît un bruit,
Cest l'haleine
De la nuit.

–Les Djinns.

নিরজন নিদপুর নিকেতন মৃত্যুর —জিন	পাল্কী চলে পাল্কী চলে গগন তলে আগুন জ্বলে --পাল্কীর গান
আকাশ জুড়ে একি আভাস নিশার 'পরে ঘন নিশাস —জিন	গঙ্গা ফড়িঙ লাফিয়ে চলে বাঁধের দিকে সূর্য ঢলে —দূরের পাল্লা
	টুক টুক পদ্ম লক্ষ্মীর সদ্ম —পিয়ানোর গান

এই আলোচনাপ্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যগঠনে ফরাশি প্রভাবের উল্লেখ করা খুব

অসমীচীন হবে না, যদিও তা অনুবাদের আওতায় পড়ে না। উগো-র *Odes et ballades* কাব্যের *Les Pas d'armes du roi Jean* কবিতার পঙক্তিগঠনও অনুরূপ। যেমন--

Ça qu'on selle,
Ecuyer,
Mon fidèle
Destrier.

অনুবাদের জন্য সত্যেন্দ্রনাথ উগো-র কিছু কিছু কবিতা পড়েছিলেন। মূল ও অনুবাদে উগো-র গ্রন্থাবলী দুসেট তাঁর সংগ্রহে ছিল। ছন্দ ও স্তবক-গঠনে উগো-র মৌলিকতা ও বৈচিত্র্য বহুবিদিত। সত্যেন্দ্রনাথ তাতে আকৃষ্ট হয়ে কয়েকটি কবিতার রূপচর্চা করেছেন। তাঁর 'হসন্তিকা' কাব্যে 'রাত্রি-বর্ণনা' নামে একটি হাসির কবিতা আছে। উগো-র *Odes et ballades* কব্যের *La Chasse du burgrave* কবিতা ও 'রাত্রি-বর্ণনা' থেকে দুটি উদ্ধৃতি পাশাপাশি তুলে ধরলে সত্যেন্দ্রনাথের গঠনগত ঋণ ধরা পড়বে।

Puis je te donne un cor d'ivoire
Voire
Un dais new à pas velours
Lourds,
[উচ্চারণ : 'পুই জ ত দন অ্যাঁ কর্ দিভোয়ার্
ভোয়ার্
অ্যাঁ দে নফ্ আ পা দ ভেলুর্
লুর্']
পালকী-আড়ায় দূরে গীত গায় উড়ে
তুড়ে!
আঁধারে হা-ডু-ডু খেলে কান করি উচা
ছুঁচা!

ফরাশি কবি La Fontaine-এর *Fables* গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই পশুপাখিদের নিয়ে লেখা। তাদের নাম et শব্দ দিয়ে যুক্ত, যেমন *La Cigate et la Fourmi, Le Corbeau et le Renard, Le Loup et le Chien* ইত্যাদি। প্রতি কবিতার শেষেই কোনো না কোনো নীতি-উপদেশ আছে। সত্যেন্দ্রনাথ *Fables de la Fontaine* থেকে একটি কবিতার অনুবাদ করেছেন 'যুগ্মপত্নীর প্রেম' নামে। 'মানসী' ১৩১৬ কার্তিক সঙখ্যায় 'মরাল ও পেঁচক' নামে তিনি যে মৌলিক কবিতা প্রকাশ করেন তার নাম, রচনারীতি ও নীতিমূলকতায় লা ফঁতেনের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।[৩৩]

অনুবাদ-কাব্যগুলির শেষের তথ্যপঞ্জী থেকে ফরাশি সাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে অস্তিবাচক ধারণা হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও সেখানে সাধারণ জ্ঞানের অতিরিক্ত বিশেষ কিছু নেই,[৩৪] ভাষার চমক দেবার চেষ্টা আছে মাত্র। যেমন, 'তীর্থসলিল' কাব্যের

'রহস্যের চাবি'তে Ronsard প্রসঙ্গে la Pléiadeকে 'সাতভাই চম্পা' লেখা হয়েছে। তথ্য যেখানে অপেক্ষাকৃত বেশি সেখানেও জ্ঞানের বিস্তৃতি বা গভীরতা নেই। Berthon সম্পাদিত *Specimens of Modern French Verse* বই থেকে তিনি 'আর্মনি দু সোয়ার' কবিতার অনুবাদ করেছেন। ঐ বইতে কবিতাটির 'notes' (প. ২৫৯) এবঙ 'তীর্থরেণু' কাব্যের শেষে (প ।।✓.৵.) 'পান্তুম্'-এর সম্বন্ধে তথ্য[৩৫] একসঙ্গে লক্ষ্য করা দরকার :

'This sort of poem is known by the name of Pantoum. It is of Oriental origin, and was first brought under the notice of French poets by V. Hugo, who gave, in the notes to his Orientales, a prose translation of Malay 'pantoum'. Some years afterwards, Ch. Asselineau wrote the first 'pantoum' in French. Théodore de Banville, and other contemporary writers, have since attempted to acclimatise this artificial kind of poem. Its structure is the following : the stanzas are of four lines : the second and the fourth line in each stanza become respectively the first and the third lines of the following stanza. Besides. two distinct themes must run parallel to each other through the whole poem, one in the first and second lines of each stanza, one in the third and fourth. It will be seen that this condition has not been complied with in the present poem. It is, therefore, not a perfect 'pantoum.'

'ইতালির যেমন সনেট, মলয় উপদ্বীপের তেমনি পান্তুম্। পান্তুম্ অর্থে গান বা গীতিকবিতা। পান্তুমের প্রতি শ্লোকের দ্বিতীয় এবঙ চতুর্থ চরণ পরবর্তী শ্লোকের প্রথম এবঙ তৃতীয় চরণরূপে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক শ্লোকে চারি চরণ থাকা আবশ্যক, এবঙ সাধারণত চারি শ্লোকে একটি পান্তুম্ সম্পূর্ণ হয়। তদ্ভিন্ন প্রতি শ্লোকের প্রথম ও দ্বিতীয় পঙক্তিগুলির সঙ্গে তৃতীয় ও চতুর্থ পঙক্তিগুলির বর্ণিতব্য বিষয়ের, সঙ্গামস্থলে গঙ্গা--যমুনার মত একেবারে পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও, সম্পূর্ণ পার্থক্য থাকাই নিয়ম। মধুসূদন যেমন বঙ্গভাষায় প্রথম সনেট লেখেন, ভিক্তর হুগো তেমনি ফরাসী ভাষায় প্রথম পান্তুমের অনুবাদ করেন। হুগো মৌলিক পান্তুম্ রচনা না করিলেও তত্কৃত অনুবাদ প্রকাশিত হইবার পর হইতে ফরাসী সাহিত্যে পান্তুমের প্রভাব ক্রমশ বিস্তৃতিলাভ করিয়া আসিয়াছে। পরবর্তী অনেক কবি অনেকগুলি সুন্দর মৌলিক পান্তুম্ রচনা করিয়া স্বদেশের ছন্দোবিদ্যা ও কাব্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।'

দেখা যাচ্ছে, সত্যেন্দ্রনাথের তথ্যের উত্স সম্পাদক Berthon-এর লেখাটুকু। এখানে মধুসূদনের সনেট রচনার কথা পাঠকের কাছে অপ্রাসঙ্গিক এবঙ লেখকের কাছে রঙ বদলানো। ওই খানে উগো-র পাঁতুঁর উত্সনির্দেশ আছে। তা দেখে তিনি উগো-র *Les Orientales* কাব্যের শেষে *Nourmahal-la-Rousse* কবিতার উগো-কৃত টীকায়

Pantoum Malais পড়েছেন[৩৬] এবঙ তাকে 'অতুলন' নামে অনুবাদ করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'পান্তুম্ অর্থে গান বা গীতিকবিতা।' এই তথ্য সম্পাদক লেখেননি ; কিন্তু উগো উক্ত কবিতার প্রসঙ্গে তার সূত্রপাতে লিখেছেন, 'Nous terminons ces extraits par un pantoum ou chant malais d'une delicieuse originalité.' [অর্থ : 'আমরা চমত্কার মৌলিক একটি মালয়ি পাঁতুঁ বা গান দিয়ে এই উদ্ধৃতিগুলি সমাপ্ত করছি।'] সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষ পড়াশুনার পরিচয় এখানে নেই। একটি তথ্য প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। Berthon-এর শেষ বাক্যে দেখা গেল 'আর্মনি দু সোয়ার' ভালো পাঁতুঁ নয়। সেজন্য তিনি পরপৃষ্ঠায় (প. ২৬০) Théodore de Banville-এর একটি পাঁতুঁ তুলে ধরে তার গঠনশৈলীর বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু বাঁভিলের কবিতার ইঙরাজি অর্থ লেখা ছিল না, এবঙ বোদলের-এর কবিতার 'notes' ছাপা ছিল। তাই বাঁভিল বর্জিত এবঙ বোদলের অনূদিত হয়েছেন। তরু দত্তের *A Sheaf*-এ পাঁতুঁর অনুবাদ আছে। তা পড়ে সত্যেন্দ্রনাথ প্রথমে উত্সাহিত হতে পারেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচিত রচনাগুলি সত্যেন্দ্রনাথ স্বনামে গ্রন্থিত করেছিলেন। অন্যের রচনার মধ্যে কখনো তাঁর অনুবাদ ঢুকে পড়েছে। 'আগুনের ফুল্‌কি' (১৩২১) উপন্যাসের ভূমিকায় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'এই উপন্যাসের মধ্যে যে গানগুলি আছে, তাহা মূলে গদ্যেই আছে ; আমার প্রিয় সুহৃদ্ কবি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মূল ফরাশির সেই গদ্যময় গানের কথাগুলি সরস কবিতায় অনুবাদ করিয়া দিয়া আমার অনুবাদকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। এই পুস্তকের নামও রাখিয়াছেন তিনিই।'[৩৭] বইটিতে মোট ছয়টি গান আছে : প্রথম পাঁচটি সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ। আঞ্চলিক ভাব ফোটানোর জন্য সত্যেন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গের ভাষা ব্যবহার করেছেন। যেমন--

S'entrassi 'indu Paradisu santu, santu,
E nun truvassi a tia, mi n'esciria.

ফরাশি উপন্যাসে আঞ্চলিক ভাষার কথাগুলির সাহিত্যিক রূপান্তর-ও আছে। তা এই--

Si j'entrais dans la paradis saint, saint,
et si je ne t'y trouvais pas, j'en sortirais.

[অর্থ : 'ঈশ্বরের কৃপায় আমি যদি স্বর্গে যেতে পারতাম এবঙ সেখানে তোমাকে না দেখতাম, তবে আমি সেখান থেকে বেরিয়ে আসতাম..']

থাহে জোদী পুণ্যি
জাই জোদী স্বগ্‌গে,
ফির‍্যা আমু এ'হানে
ক্যাবল্ তোরি লগ্যে।

সত্যেন্দ্রনাথ মেতর্‌লিঙ্কের কবিতাগুলি ফরাশি থেকে অনুবাদ করলেও তাঁর একটি নাটক বোধহয় ইঙরাজি থেকে অনুবাদ করেন। মেতর্‌লিঙ্কের দুটি নাটক *Pellas and Melisanda, and the Sightless* নামের বইতে Laurence Alma Tadema ইঙরাজিতে অনুবাদ করেন। *The Sightless* নাটকটি *Les Aveugles*-এর অনুবাদ।

সত্যেন্দ্র-কৃত তার বাঙলা অনুবাদের নাম 'দৃষ্টিহারা'।[৩৮] নাটকটি পরে 'রঙ্গমল্লী'তে (১৯১৩) সঙ্কলিত হয়। এই সময় ফরাশি ভাষা তিনি ভালো জানতেন না। তাছাড়া মূল নয়--ইঙরাজি অনুবাদটি তাঁর নিজস্ব সংগ্রহে ছিল, যদিও তাঁর ফরাশি থেকে অন্যান্য অনুবাদের মূল রচনা নিজস্ব পুস্তকসংগ্রহে ছিল। অতএব, তিনি ইঙরাজি অনুবাদ থেকেই নাটকটির পুনরনুবাদ করেছিলেন, এই অনুমান সঙ্গত। এছাড়া তিনি নাপোলেঅঁ ও বুস্যো-র রচনা থেকে দুটি গদ্যরচনার অনুবাদ করেন যথাক্রমে 'কর্মীজনের মনের কথা' এবঙ 'ভাবুকের নিবেদন' নামে।[৩৯] সেগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়।

---

১. রচনাগুলি হল--

(ক) ফাবিঞে পিয়েব- 'সমালোচক', মানসী, কার্তিক ১৩১৬ ,

(খ) [ ]--'ছেলে-ভুলান গান', প্রবাসী, পৌষ ১৩১৬ ,

(গ) এম. জে. শেনিয়ে--'দীপক', প্রবাসী, পৌষ ১৩২৫ ,

(ঘ) ভিক্তর উগো--'গান', ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ ,

(ঙ) বুস্যো—'ভাবুকের নিবেদন', প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩১৮ ,

(চ) নাপোলেঅঁ--'কর্ম্মীজনের মনের কথা, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২০।

প্রথম চারটি কবিতা ; শেষ দুটি গদ্যরচনা। 'ছেলে-ভুলানো গান' ও 'গান' কবিতাদুটি সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত যথাক্রমে 'সত্যেন্দ্রনাথের শিশুকবিতা' (১৯৪৫) ও 'বিদায় আরতি' (১৯২৪) কাব্যে সঙ্কলিত হয়েছে।

২ ফরাশি ফ্রান্স ও বেলজিয়াম উভয় দেশেরই ভাষা, এবঙ Maeterlinck, Verhaeren প্রভৃতি বেলজিয় লেখক ফরাশি সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত। এজন্য বেলজিয়ামের কবি ও কবিতা বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

৩. ভারতী, বৈশাখ ১৩১৮--চৈত্র ১৩১৯।

৪ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 'সত্যেন্দ্র স্মরণে' ভারতী, শ্রাবণ ১৩২৯, প. ৪০৫।

৫ মিস্ত্রাল থেকে অনূদিত 'বন্ধু বিরহে', 'ঝিঁঝি', 'মিলন-গীতি' ও 'গোত্র সঞ্জীবন' কবিতাগুলি একত্রে প্রবাসী ১৩২২ আষাঢ় সঙখ্যায় মুদ্রিত হয়। একটি ছোট পরিচিতিতে লেখা হয়েছিল--'১৯০৪ সালে মিস্ত্রাল শাশ্বত সহিত্য সৃষ্টির জন্য নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন।' এগুলি 'মণিমঞ্জুষা' কাব্যে সঙ্কলিত হবার সময় 'চাঁদনী রাতের চাষ' কবিতাটি যুক্ত হয়েছে।

৬. বর্তমানে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থাগারে 'সত্যেন্দ্রনাথ সঙগ্রহে' রক্ষিত তাঁর ব্যক্তিগত পুস্তক-সংগ্রহে আছে *Hugo's French Simplified, Second French Book, Siepman's Primary French Course Vol III, New Conversational First French Reader* প্রভৃতি। এদের থেকে বর্তমান অনুমান করা সম্ভব।

৭. সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'তিনি ফরাশি ও পারস্য ভাষা খুব ভালই জানিতেন।' (দ. 'সত্যেন্দ্র-স্মরণে', ভারতী, শ্রাবণ ১৩২৯, প. ৪০৪।) সৌরীন্দ্রমোহন ফরাশি জানতেন না। সত্যেন্দ্রনাথ অনুবাদের জন্য তাঁকে *Jack* নামে যে উপন্যাস দেন, তা মূল রচনা নয়, ইঙরাজি অনুবাদ। সত্যেন্দ্রনাথ ও সৌরীন্দ্রমোহনের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক ছিল। রচনাটি স্মৃতিকথা এবঙ সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে লেখা। বোধহয় উপরের কথাগুলি যতখানি বন্ধুপ্রশস্তি, ততটা সত্য নয়। 'মণিমঞ্জুষা' প্রকাশের সময় সত্যেন্দ্রনাথের ফরাশি ভাষাজ্ঞান হয়ত অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সৌরীন্দ্রমোহনের বক্তব্য সর্বদা মান্য নয়।

৮. লেখাগুলি সত্যেন্দ্রনাথের, কারণ (ক) সর্বত্র লেখার ছাঁদ এক রকমের ; (খ) শুধু অনূদিত কবিতাগুলির মূলের পৃষ্ঠাপ্রান্তে বিস্তৃত প্রতিশব্দরচনা আছে , এবঙ (গ) কয়েকটি বইতে যে যে কবিতার পাশে 'translated' লেখা আছে, সত্যেন্দ্রনাথ তাদের অনুবাদ করেছেন। যেমন -

(লেখক)	(শিরোনাম)	(সূত্র/ গ্রন্থ, পৃষ্ঠাঙ্ক)	(অনুবাদ)
S Prudhomme	Un Songe	*Oeuvres de Sully Prudhomme*,p 21	স্বপ্ন
F Séverin	L'Humble Espoir	*Anthologie de Poëts Français Contemporaines* (ed. W Walch), p 508	শেষ আশা
M Maeterlinck	Desirs d'Hiver	Do, p 533	শীতের হাহাকার

৯ কোলন চিহ্নের পূর্বের শব্দটি ফরাশি, পরেরটি ইঙরাজি। ফরাশি শব্দ কবিতার অন্তর্গত , মুদ্রিত শব্দের লাইনে সত্যেন্দ্রনাথ পৃষ্ঠাপ্রান্তে ইঙরাজি লিখে মূলের প্রাসঙ্গিক ফরাশি শব্দকে নিম্নরেখাঙ্কিত করেছেন।

১০ প্রকাশের বিবরণ—

(ক) 'সন্ধ্যার সুর' ('পাস্তুম কবিতাগুচ্ছে'র অন্তর্গত),প্রবাসী, পৌষ ১৩১৬ ;

(খ) 'নব্য অলঙ্কার', প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৭ ;

(গ) 'গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নে', ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭।

১৩১৭ শনে সত্যেন্দ্রনাথের ফরাশি ভাষাজ্ঞান অপরিণত।

William Beckford ফরাশিতে *Vathek* নামে একটি উপন্যাস লিখে প্রচার করেন (১৭৮৬), যা মূল ও ইঙরাজি অনুবাদে (১৭৮৭) একদা বহুলপ্রচারিত হয়েছিল। ১৩১৪ শনে 'বেতিক' নামে তার অস্বাক্ষরিত বাঙলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। সুকুমার সেনের 'অনুমান' অনুসারে কোন বাঙলা অনুবাদের মূল ফরাশি রচনা হলে, সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে সেই অনুবাদ করা তখন অসম্ভব ছিল। তিনি ফরাশির মাধ্যমে ফার্শি শিখে থাকলে, তাঁর প্রকৃত ফার্শি শিক্ষা আরো পরবর্তী। তথ্যের পরোয়া না করে সুকুমার সেন ফরাশি ও ফার্শি দেখে 'অনুমান' ও 'মনে' করেছেন, যে গ্রন্থটি সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ। 'মনে করা' ও 'অনুমান করা' পৃথক। অনুমান তথ্যভিত্তিক ও বিশেষ পদ্ধতির অনুসারী, একথা মনে রাখা দরকার। তাঁর আরো একটি অদ্ভুত অনুমান, বাঙলা অনুবাদটির শ্রীহীনতার কারণ মূল রচনা ফরাশিতে লেখা। বইটি যে সাহিত্য পরিষদের 'সত্যেন্দ্রনাথ সঙ্গ্রহে' অনুপস্থিত, এই তথ্যটি তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় মনে হয়নি। দ. (ক) 'একটি অজ্ঞাত অদ্ভুত বই', চতুরঙ্গ, (৪২তম বর্ষ, ১ম সঙখ্যা) বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৮, প. ১, ১৪ ; (খ) 'একটা অদ্ভুত বই নিয়ে দীর্ঘকাল', যুগান্তর, ৭.১০. ১৯৮১, প. ৫।

১১ সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এই উপন্যাসের বাঙলা অনুবাদ করেছিলেন। দ. 'ছন্নছাড়া', প্রবাসী, বৈশাখ-চৈত্র ১৩২৩।

১২. যেমন—

(ক) Pierre de Ronsard.–*Les chefs-d'oeuvre lyriques de P. de Ronsard et son école.* (Paris, 1907; ed. Auguste Dorchain.)

(খ) Banville.–*Oeuvres de Théodore de Banville.*

১৩. বইটি উপহার হিশাবে সত্যেন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন। আখ্যাপত্রের পূর্বপৃষ্ঠায় 'Souvenir reconnaissant' লেখা, এবঙ তার পাশে Suzanne Karpeles-এর সই আছে।

১৪. পারি থেকে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বই। বইয়ের প্রথমে Madame St. Remi নামের স্বাক্ষর আছে। বোধহয় সত্যেন্দ্রনাথ পুরানো বই কিনেছিলেন। তাহলে শব্দানুবাদ সত্ত্বেও, হস্তলিপিবিশারদের পরীক্ষার পূর্বে, সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে বইটি ভালো করে পড়ার সম্ভাবনা কমে যায়।

১৫ সত্যেন্দ্রনাথের ফরাশি ভাষাজ্ঞান সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্যসূত্র :
(ক) সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়--'সত্যেন্দ্র স্মরণে' ভাবতী, শ্রাবণ ১৩২৯ ,
(খ) অমলচন্দ্র হোম--'সত্যেন্দ্রস্মৃতি', নব্যভারত, শ্রাবণ ১৩২৯ ;
(গ) অমলচন্দ্র হোম--'সত্যেন্দ্রস্মৃতি', ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩২৯।

১৬. ভবানিপুর থেকে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত প্রথম সঙস্করণের গ্রন্থ।

১৭ প্রমাণ, গ্রন্থে বিভিন্ন কবিতার পাশে বহু লেখা ও অন্যান্য চিহ্ন।
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সত্যেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সংগ্রহে তরু দত্তের *Le Journal de Mademoiselle d'Arvers* এবঙ *Ancient Ballads and Legends of Hindustan* গ্রন্থদুটিও ছিল। 'তীর্থসলিল' ও 'মণিমঞ্জুষা' কাব্যে তিনি তরু দত্তের লেখা দুটি মৌলিক কবিতাব বাঙলা অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন।

১৮. প্রতি জোড়া নামের প্রথমটি তরু দত্তের অনুবাদ, দ্বিতীয়টি সত্যেন্দ্রনাথের। শেষ কবিতাটি তবুর বড় বোন অরু দত্তের অনুবাদ। দ Harihar Das.–*The Life and Letters of Toru Dutt*, p 345 (1921)-এ E J. Thompson.–*Supplementary Review*. কবিতার নিচে 'A' ছাপা।

১৯. 'সত্যেন্দ্রনাথেব মৌলিক রচনায় অনেক ক্ষেত্রে ভাবের গভীরতা নেই। তিনি সেই ভাবদৈন্য অনুবাদেব মাধ্যমে দূর করতে চেয়েছেন। কবিতা রচনা সম্বন্ধে পথনির্দেশেব কোনও বাসনা হয়ত তাঁব মনেব সঙ্গোপন স্থলে ছিল.।' ড সুধাকর চট্টোপাধ্যায়–অমর অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ. প ৭১ (প্রথম সঙস্করণ)।

২০. (ক) 'তিনি যে সকল বিদেশি কবিতা অনুবাদ করিয়াছেন. সেগুলির নির্বাচনে সাহিত্যিক রসবোধ অপেক্ষা সাহিত্যিক কৌতূহলই জয়ী হইয়াছে। যে সকল কবিতা সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ সেগুলিকে তেমন আদব না কবিযা, অপবিচিত দেশেব, অখ্যাত ভাষার, অখ্যাত কবির প্রতি তিনি অধিকতব আকৃষ্ট হইয়াছেন , অথবা সুকবিতার সঙখ্যা অপেক্ষা কবিদের নামেব সঙখ্যা বাড়াইতে চাহিয়াছেন--যাহাতে তাঁহাব অধ্যযনের পরিধি কত বিস্তৃত তাহাই প্রমাণিত হয়।' মোহিতলাল মজুমদাব--'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত', আধুনিক বাঙলা সাহিত্য, প. ২০০ (দ্বিতীয় সঙস্করণ)।
(খ) 'সত্যেন্দ্রনাথেব অনুবাদ ও নির্বাচন প্রধানত বহির্মুখী এবঙ কৌতূহল-চালিত বলে গূঢ়ানুপ্রবেশ নয়।' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়--'সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ-প্রসঙ্গে', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙলা সাহিত্য পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, প. ১৫৯।

২১ ড. সুধাকর চট্টোপাধ্যায়--অমব অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ, প. ৮৪ (প্রথম সঙস্করণ)।

২২ 'বস্তুত এইসব অনুবাদ-কবিতায় সর্বত্র মূলের সঙ্গে প্রতিশব্দ ও চরণের সঙ্গতি বজায় নেই।' ড. হরপ্রসাদ মিত্র--সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ, (১ম সঙস্করণ), প. ১৪৯।

২৩ সত্যেন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন--'তোমার এই অনুবাদগুলি মূলকে বৃন্তস্বরূপ আশ্রয় কবিযা স্বকীয় রস-সৌন্দর্যে ফুটিয়া উঠিযাছে--আমার বিশ্বাস কাব্যানুবাদের বিশেষ গৌরবই তাই--তাহা একই কালে অনুবাদ এবঙ নূতন কাব্য।' এবঙ 'তোমাব এই অনুবাদগুলি যেন জন্মান্তরপ্রাপ্তি--আত্মা এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে, ইহা শিল্পকার্য নহে, ইহা সৃষ্টিকার্য।' বোধহয় রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন। তবে 'নূতন কাব্য' এবঙ 'সৃষ্টিকার্য' হলে কোনো রচনা অনুবাদ থাকে কি না, তা সন্দেহের অতীত নয়। তাছাড়া, সৃষ্টিকার্য ও শিল্পকার্য পরস্পরবিরোধী হলে সাহিত্য কোথায় দাঁড়াবে?

২৪. কোনো সমালোচক লিখেছেন--'লেখক মহাশয় এগুলিকে 'অনুবাদ' বলিয়া ছাপিয়া না দিলে কেহই তর্জমা বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না।' 'পুস্তক সমালোচনা : তীর্থরেণু', প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৭, প. ৬১৯।

২৫. 'তীর্থসলিল' ও 'তীর্থরেণু' সত্যেন্দ্রনাথের কবিত্বের বিকাশ-পর্বের (১৯০০-১৯১০) অন্তর্গত। 'তত্সম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, ধ্বন্যাত্মক এবঙ স্বনির্মিত বিচিত্র শব্দের ব্যবহার সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের

কাব্যপ্রবাহের 'বিকাশ' ও 'সমৃদ্ধি'-পর্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম।' ড. হরপ্রসাদ মিত্র--সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ, (১ম সংস্করণ), প. ৪০৫।

২৬ Ronsard-এর *Sonnet pour Hélène* আদৌ লঘুরচনা নয়, তবে অনুবাদে তা লঘু হয়ে উঠেছে। উপরের মন্তব্য স্মর্তব্য--'গুরুগম্ভীর ফরাশি কবিতা তাঁর অনুবাদে লঘু হয়ে উঠেছে।'

২৭. H. E. Berthon সম্পাদিত *Specimens of Modern French Verse* বইটির ১১ পৃষ্ঠায় সত্যেন্দ্রনাথ শব্দটি নিম্নরেখাঙ্কিত করে পাশে লিখেছেন flock, অর্থাৎ ভেড়ার পাল।
কোনো গবেষক লিখেছেন 'দ্য লিলের বহুবিশ্রুত Midi কবিতার 'গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে' নামীয় অনুবাদে এর আসল ব্যঞ্জনাটি সত্যেন্দ্রনাথ ধরতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। প্রথমত: অনুবাদেই ক'টি বিসদৃশ ভুল আছে। পঞ্চম স্তবকে 'ঘাস' 'তরু'তে পরিণত; ওই মূলের 'বলদগুলি' 'গাভীগুলি' হয়ে গেছে।' ড. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়--'সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ-প্রসঙ্গে', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙলা সাহিত্য পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, প. ১৬৫-৬। এরূপ বিচ্যুতি বহু, কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বিচ্যুতি বা তাদের সামগ্রিক বিচার ছাড়া এরূপ উল্লেখ অর্থবহ নয়।

২৮ ইন্দুমতী ভট্টাচার্য--সন্ধ্যার সুর। রচনাটির উৎস : Institut de Chandernagor—*Our Message*, p. 16 (Chandernagore, 1968)

২৯ Narayan Mukherjee.—*A Tentative Chronological Checklist of Articles on and Translations from Baudelaire done in Bengal*, Jadavpur Journal of Comparative Literature, Vol VII, 1967, pp, 57-58 প্রবন্ধটির উল্লিখিত পৃষ্ঠায় NG (বুদ্ধদেব বসুর স্নেহভাজন অধ্যাপক নরেশ গুহ?) স্পষ্টত দুটি ইংরাজি অনুবাদের ভিত্তিতে ফরাশি কবিতা থেকে উদ্ধৃতি সহ, বাঙলা অনুবাদগুলির আলোচনায় ভ্রান্তি দেখেও বুদ্ধদেবের অনুবাদকে উৎকৃষ্ট বলেছেন।

৩০. এত বিচ্যুতি ও অর্থহীনতা সত্ত্বেও ড. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদটির প্রশংসা করেছেন। দ. তাঁর প্রাগুক্ত প্রবন্ধ, প. ১৬৫। (আমার জানা নেই, মোহিতলাল সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে কেউ তাঁর রচনাটিরও প্রশংসা করেছেন কি না।)

৩১. প্রবাসী ১৩১৭ আষাঢ় সংখ্যায় Verlaine থেকে সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ 'নব্য অলঙ্কার' মুদ্রিত হয়। কবিতা সম্বন্ধে তাঁর মৌলিক প্রবন্ধ 'নব্য কবিতা'র প্রথম প্রকাশ প্রবাসী, ১৩১৭ মাঘ সংখ্যায়। ঐ প্রবন্ধে বের্লেন-এর প্রসঙ্গ ও তাঁর প্রভাব আছে। বের্লেন্-এর মত সত্যেন্দ্রনাথও কলাকৈবল্যবাদী, এবং ছন্দ ও সুরের ভক্ত। উক্ত কবিতার প্রথম চরণ De la musique avant toute chose [অর্থ : 'সবার আগে গান'] সত্যেন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, বের্লেন-এর এই ধরনের বিখ্যাত কবিতা 'শার্স দোতম্'-এর সত্যেন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ 'শিশিরের গান' উৎকৃষ্ট রচনা।

অনুবাদ কিভাবে পরবর্তী প্রভাবের জনক হয়, তা এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। (ক) সত্যেন্দ্রনাথের ওই অনুবাদ এবং তাঁর মৌলিক প্রবন্ধ। (খ) সত্যেন্দ্রনাথের এই অনুবাদ এবং তার উত্তরে অন্যের লেখা ব্যঙ্গকবিতা। দ. কৃষ্ণদাস আচার্য চৌধুরী—'সংক্ষিপ্ত নব্য অলঙ্কার-শাস্ত্র', ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩৩১। (গ) সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদকর্মে, ফলত তাঁর চিন্তায়, তরু দত্ত ও অরু দত্তের অনুবাদের প্রভাব।

৩২ তারাপদ ভট্টাচার্য--ছন্দোবিজ্ঞান, প. ৬১। (কলিকাতা, ১৯৪৮, ১ম সংস্করণ।)

৩৩. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এ রকম দুটি কবিতা লেখেন : 'গাধা' ('প্রবাসী', ১৩১৬ অগ্রহায়ণ) ও 'কোকিল' ('সাহিত্য', ১৩১৬ মাঘ)। লা ফঁতেন থেকে 'অনূদিত' বলে তিনি 'টিয়া' ('সাহিত্য', ১৩১৪ বৈশাখ) নামে একটি মৌলিক কবিতা লেখেন।

৩৪. 'তীর্থসলিল', 'তীর্থরেণু', ও 'মণিমঞ্জুষা' কাব্যের শেষে যথাক্রমে 'রহস্যের চাবি', 'রহস্যকুঞ্চিকা' ও 'ছোড়ান্-কাঠি' নামে কবি অনুসারে সংগৃহীত তথ্যপঞ্জী। বোধহয় তরু দত্তের *A Sheaf* তাঁকে

উত্সাহিত করেছিল। তবে উভয়ের গুণগত পার্থক্য প্রচুর।

৩৫. সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদে দুটি পাঁতুঁ (অর্থাত্ 'অতুলন' ও 'সন্ধ্যার সুর') 'পান্তুম্ কবিতাগুচ্ছ' শিরোনামে প্রবাসী ১৩১৬ পৌষ সঙখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয। সেখানেই এই তথ্য বিবৃত হয়েছিল। অতএব, এই বিশিষ্ট গঠনকৌশল তাঁর আকর্ষণের প্রধান কারণ।

৩৬ Les papillons jouent à l'entour sur les ailes শব্দগুলি দিয়ে আরম্ভ এই মালাই পাঁতুঁ উগো-কৃত একটি অনুবাদ। গ্রন্থশেষে Nourmahal-la-Rousse কবিতায স্বকৃত টীকায় প্রাচ্যদেশের কবিতার গঠনসংক্রান্ত দীর্ঘ আলোচনার শেষে এই কবিতাটি দিয়ে উপসঙহার করা হয়েছে।

অধ্যাপক ড. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ধারণা ছিল, উগো-র কবিতাটি খুঁজে পাওয়ার জন্য 'রীতিমত রিসার্চ' করা দরকার। দ. তাঁর প্রাগুক্ত প্রবন্ধ। আমার মনে হয়, উগো-র কাব্যের সঙ্গে কিছু পরিচয় থাকলে, অল্প সন্ধানেই মূল কবিতাটি পাওয়া যায। সত্যেন্দ্রনাথের এই পরিচয় বা সন্ধানেরও প্রয়োজন হযনি।

৩৭. Prosper Merimée লিখিত Colomba নামে ফরাশি উপন্যাসটির বাঙলা অনুবাদ 'কোলঁবা' ১৩২০ শনে প্রবাসী পত্রে ধারাবাহিক মুদ্রিত এবঙ ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে অন্য নামে গ্রন্থিত হয। গ্রন্থে 'ভূমিকা'র তারিখ ১৫ই ভাদ্র ১৩২১। চারুচন্দ্র একটি ভুল করেছেন। মূল রচনা পদ্যে নয়--প্রাদেশিক ভাষায় লেখা কবিতায়, এবঙ তার নিচেই সাহিত্যিক গদ্যে আঞ্চলিক ভাষা রূপান্তরিত। (সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পন্ডিত ব্যক্তিদের কোনো প্রকাশিত গবেষণা-গ্রন্থে এই রচনার উল্লেখ দেখিনি।)

৩৮. প্রথম প্রকাশ--প্রবাসী, চৈত্র ১৩১৬।

'তাঁহার বঙ্গমঙ্গী চারখানি বিদেশী নাটকের মর্মানুবাদ, adaptions'. দ. সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের প্রাগুক্ত প্রবন্ধ, প. ৪০২। মর্মানুবাদ ও adaption কি এক? অন্য নাটকগুলি যা-ই হোক, 'দৃষ্টিহারা' এ দুয়ের কোনোটি নয়,--মূল নাটকের সঙক্ষিপ্ত দেশীয় রূপ মাত্র।

৩৯. 'কর্মীজনের মনের কথা' নাপোলেঅঁ-র কয়েকটি টুকরো উক্তির অনুবাদ। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গ্রহে অনুবাদে *The Confessions of J. J Rousseau* গ্রন্থটি ছিল। 'ভাবুকের নিবেদন'-এ সেই গ্রন্থের অঙশবিশেষের অনুবাদ আছে।

পুরাতন হিন্দু কলেজের স্মৃতি :: ভোলানাথ চন্দ্র

১

মানুষের স্মৃতির একটি প্রিয় বিচরণভূমি তাহার নিজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (*Alma-Mater*)। আমার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল হিন্দু কলেজ। এখন হইতে বাহান্ন বত্‌সরেরও পূর্বে ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে আমি তাহার সীমানা অতিক্রম করিয়াছি। কিন্তু আমার মনের প্রকোষ্ঠে তাহা চিবনূতন রহিয়াছে। বার্ধক্যের অলস প্রহরগুলিতে অস্পষ্ট কালেজীয় স্মৃতিগুলিকে স্পষ্ট অবয়ব দানের প্রয়াস অপেক্ষা উত্তম আমার কিছু করিবার নাই।

আমাদের শিক্ষাজাগতিক ইতিহাসের সঙক্ষিপ্ত পুনর্বিচার করিয়া বিষয়টির অবতারণা করিতে চাই। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে এমন একটি ভাষায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন যাহা কঠিনতায় হাইরোগ্লিফিকের সঙ্গে তুলনীয়। শাহারজাদীর গল্পের চল্লিশ দস্যুব মত, কেবল তাঁহারাই অমূল্য রত্নভাণ্ডারের দ্বাব উন্মোচন করিবার 'চিচিঙ ফাঁক' মন্ত্র জানিতেন। হেস্পেবিদেসের উদ্যানের মত টোলগুলি অপরের সম্মুখে বন্ধ রাখিয়া তাহার সুবর্ণময় ফলগুলি তাঁহারা আপনাদের জন্য রক্ষা করিতেন। তাঁহাদের শিক্ষাসঙ্কোচনের নীতিতে সুবিধাভোগী মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তি সরস্বতীর আরাধনাকে নিজেদের কুক্ষিগত করিয়াছিলেন, এবঙ অসঙখ্য জনসাধারণ চেরাগ লইয়া, অর্থাত্‌ আলোকবর্তিকা ছাড়া ভয়ঙ্কর মানসিক সাহারার মধ্যে বিচরণ করিত।

মুসলমান আমলেও অবস্থার উন্নতি হয় নাই। পণ্ডিত ও মৌলবিরা জীবনযাত্রার জন্য তাঁহাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞানটুকু একইভাবে হোমিওপ্যাথির দানার আকারে বিক্রয় করিতেন।

বিঙশতি বত্‌সর পূর্বে 'ইলাস্ট্রেটেড্‌ ইন্ডিয়ান নিউজ' পত্রে প্রকাশিত 'বঙ্গদেশে ইঙরাজি শিক্ষার প্রথম যুগ' রচনায় আমি সেই শিক্ষার সর্বপ্রথম সূচনা নির্দেশ করিয়াছি হুগলিতে, যেখানে ১৬৭০ খ্রিস্টাব্দে ইঙরাজের অর্ণবপোত আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। হাটে গ্রাম্য দালাল ও বেনিয়ারা য়ুরোপীয়দের সঙ্গে কথাবার্তার প্রয়োজনে বিদেশি শব্দ আয়ত্ত করেন। তাহা এই যুগের আরম্ভ। পরবর্তী বিদ্যালয় ছিল ফ্যাক্টরি বা কুঠি, যেখানে কেরানিরা ইঙরাজি বর্ণমালা ও সঙখ্যা আয়ত্ত করিয়া চালান ও বিক্রয়ের হিশাবের নকল করিতেন। হাট-ব্যবস্থায় বড় পণ্ডিত ছিলেন রতন সরকার। গোবিন্দরাম মিত্র এবঙ কান্তবাবু ছিলেন কুঠি-ব্যবস্থায় প্রধান বিশারদ। গোবিন্দরাম ছিলেন হলওয়েলের কালা জমিদার। কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন, 'কাশিমবাজার কুঠিতে কান্তবাবু শিক্ষানবিশরূপে প্রবেশ করেন। রেশম ব্যবসায়ের প্রাথমিক জ্ঞান আয়ত্ত করিলেই তিনি মোহরার নিযুক্ত হন। পরিশেষে কেরানিগিরিতে তাঁহার পদোন্নতি হয় ; এই পদে অবস্থানকালে কাশিমবাজারের তদানীন্তন 'রেসিডেন্ট' ওয়ারেন হেস্টিঙসের সহিত তাঁহার প্রায়ই সাক্ষাত্‌ হইত। কান্তবাবু পরে তাঁহার ব্যক্তিগত দেওয়ান নিযুক্ত হন। সেই যুগের বিখ্যাত

দলপতি ছিলেন ক্লাইভের দোভাষী রাজা নবকৃষ্ণ।

পলাশীর যুদ্ধ হইতে দ্বিতীয় যুগের সূত্রপাত। ইঙরাজের জয় ইঙরাজি ভাষাশিক্ষাকে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের স্তরে উন্নীত করে। হাট ও ফ্যাক্টরির অতিরিক্ত বিদ্যালয় ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সুপ্রিম কোর্ট উকিলের কেরানিকুল সৃষ্টি করিল। তাঁহারা দরখাস্ত রচনায় দক্ষ ছিলেন এবঙ স্বদেশবাসীর নিকট তাঁহাদের ভাষ্য আইনের দৈববাণীর সদৃশ ছিল।

শেষ পর্যন্ত কার্যত শিক্ষক ছিলেন বহিরাগত। আমাদের প্রথম মানস-প্রদর্শক রামরাম মিশ্র বিগত শতাব্দীর শেষ দিকে তাঁহার প্রথম অ্যাডভেঞ্চার-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতি ছাত্রের নিকট ১৬ টাকা দক্ষিণার বিনিময়ে জলমিশ্রিত দুগ্ধের ন্যায় ইঙরাজি শিক্ষা দিতেন, যাহা অবশ্য কিছুই না জানা অপেক্ষা ভাল ছিল। স্কুলশিক্ষকের অভ্যুদয়কালে একের পর অন্যান্য সমগোত্রীয় ব্যক্তির আগমন হইতে লাগিল--পুস্তকবিক্রেতা, মুদ্রাকর, প্রকাশক এবঙ ধর্মপ্রচারক--আমাদের শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও সহযোগিবর্গ।

যত্কালে সরকার রাজ্যজয়, অর্থসঙ্গ্রহ এবঙ ব্যবসায়ে ব্যস্ত ছিলেন তত্কালে এইগুলি ঘটিতে লাগিল। সেই সরকার অধীন প্রজাবর্গের শিক্ষার নিমিত্ত কিছুই করেন নাই। বরঙ সরকারি কর্মচারীদের এদেশীয় ভাষা ও আইন শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহারা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তখন সাধারণ্যে প্রচলিত বিশ্বাস এই ছিল, যে স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার নির্বুদ্ধিতার ফলে ইঙলন্ড আমেরিকা হারাইয়াছে, এবঙ একই ভ্রান্তির দ্বারা ভারতবর্ষকে হারানো সমীচীন হইবে না। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টারে ভারতীয়দের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে একটি বিধি সঙস্থাপনের জন্য উইলবারফোর্সের উদ্যম নিষ্ফল হইল। কোর্ট অব ডিরেক্টর্স্ উহা উড়াইয়া দিলেন। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে পার্লামেন্ট আমাদের শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা পৃথকভাবে রাখিবার নির্দেশ দেন নাই। এই ব্যবস্থা প্রচারিত হইবার পর ইহাকে কাজে লাগাইবার উদ্দেশ্যে দুই ব্যক্তির আবির্ভাব হইল--রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ার। মানুষের অবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তন করিবার জন্য ঈশ্বর মধ্যে মধ্যে যে শ্রেণীর মনুষ্য পাঠাইয়া থাকেন, রামমোহন ছিলেন তাঁহাদের একজন। ডেভিড হেয়ার ছিলেন একজন সাধারণ যন্ত্রনির্মাতা যিনি 'লিখিতে বা পড়িতে জানিতেন না।' একই আদর্শের দ্বারা চালিত হইয়া তাঁহারা অজ্ঞতার বিরুদ্ধে জ্ঞানের--অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোকের প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা স্বতন্ত্র কৌশল গ্রহণ করিলেন। রামমোহন রায় ধর্মীয় সঙস্কারের দ্বারা আলোক আনিবার প্রয়াস করিলেন। ডেভিড হেয়ারের পথ ছিল বুদ্ধির চর্চা। এক জন চাহিলেন ব্রাহ্ম সভা—অপর জন ইঙরাজি বিদ্যালয়। তাত্ত্বিক এবঙ ব্যবহারিকের মধ্যে তুলনামূলক উত্কর্ষ ছিল তাঁহাদের প্রশ্ন। প্রকৃতপক্ষে যিনি নূতন অবস্থাকে প্রথম বুঝিতে এবঙ প্রথম পথনির্দেশ করিতে পারেন সেই প্রতিভাশালী ব্যক্তির নয়নগোচর হয় প্রথম আলোকশিখা। কিন্তু ফ্র্যাঙ্কলিন যেমন বিদ্যুতের নিয়ম আবিষ্কার করিয়াও টেলিফোনের উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই, তেমনি বুদ্ধিকুশল ব্যক্তি অনেক সময় নিজের চিন্তাকে কার্যগত করিতে

পারেন না। কর্মকুশল ব্যক্তি ভিন্নশ্রেণীর মনুষ্য, তাঁহার মনের প্রকৃতি বিভিন্ন। তিনি ঠিক জায়গায় আঘাত করিতে পারেন। তিনি সঙগঠন করিতে এবঙ ঘটনাবলীকে সুবিন্যস্ত করিতে পারেন।

তাঁহাদের কর্মের প্রণালীগত বিরোধের মধ্যপথে একটি ঘটনার সঙ্ঘটন এই উদ্যমের সম্মুখস্থ বাধা দূর করিয়া দিল। পার্লামেন্টের আদেশ সত্ত্বেও তাঁহারা ভারতবর্ষে দেশীয়দের শিক্ষাদান না করিবার নীতি বহাল রাখিলেন, কারণ ভারতীয়দের জ্ঞানহীনতা ব্রিটিশ রাজত্বের দীর্ঘ জীবনের পক্ষে সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু লর্ড হেষ্টিঙ্স ঘৃণার সঙ্গে এই বর্বর ধারণা প্রত্যাখ্যান করেন। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে শান্তিপ্রতিষ্ঠার পরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের সম্মুখে বক্তৃতাকালে মহামান্য প্রভু এই মহান অঙ্গীকার করেন : 'দুর্বলকে রক্ষা করা দয়ালুর কাজ, মহতের কর্ম ; ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির দুঃখমোচন প্রশঙসনীয় ; কিন্তু অপরকে জ্ঞানের বিস্তৃতি প্রদান করা, শিলামূর্তিতে প্রমিথিউসের অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দ্বারা মনুষ্যে পরিণত করা ঈশ্বরের উদার দানশীলতার ন্যায়।' সকলের সমক্ষে এই মনোভাবের প্রকাশ একটি সাধারণ উদ্‌ঘোষণার ন্যায় সক্রিয় হইল। ঘোষণা সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িল। বোম্বাইতে মাউন্ট স্টুয়ার্ট এল্‌ফিনস্টোন্ এই বক্তব্য স্বীকার করিয়া মন্তব্য করিলেন 'যদিও ভারতীয়দের শিক্ষাদান আমাদের ইউরোপে প্রত্যাবর্তনের রাজপথ, তবু সকল প্রকার পরিস্থিতিতে আমরা তাহাদের প্রতি কর্তব্যবদ্ধ।'

নূতন জনমতের জোয়ার বহিতে আরম্ভ করিল। হেয়ার একটি বিজ্ঞপ্তি রচনা করিয়া তাহা ইউরোপ ও ভারতীয় সমাজের প্রধান ব্যক্তিবর্গের নিকট পাঠাইলেন। তাহার পর তিনি প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড্ হাইড্ ইস্ট্‌কে বলিবার জন্য তাঁহার সাক্ষাত্প্রার্থী হইলেন। জ্ঞানী বিচারপতি অত্যন্ত আন্তরিকভাবে তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন এবঙ এমন বৈশিষ্ট্যের সহিত তাহার জের টানিয়া গেলেন, যে মনে হইল যেন তিনিই ইহার উদ্ভাবক। ভূতপূর্ব বিচারপতি অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ বাবু বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় তখন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের সহিত প্রায়ই সাক্ষাত্ করিতেন। স্যার এডওয়ার্ড্ তাঁহাকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন এই বিষয়ে তাঁহার স্বদেশবাসিগণের মনোভাব অবধারণ করেন। অনুকূল সঙবাদ আসিতে লাগিল। তাহার পর অনেক প্রাথমিক সভা ও আলোচনা হইতে লাগিল। তাহার পরিণতি ১৪ই মে ১৮১৬ তারিখে ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিটে প্রধান বিচারপতির বাসগৃহে ইউরোপীয় ও দেশীয় ভদ্রলোকদিগের বিরাট সাধারণ সভা। উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিবার পরে একটি হিন্দু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব সর্বসম্মতি লাভ করে এবঙ ঘটনাস্থলেই অনেক চাঁদা উঠে। এই সভায় পন্ডিতগণের মতামতের মতন বিশিষ্ট আর কিছুই ছিল না। পন্ডিতেরা তাঁহাদের সম্মান ও ক্ষমতার উপর ইহার পরবর্তী ভয়াবহ প্রভাব সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ থাকিয়া বলেন : 'আমাদের যুগে আমাদের জাতি উন্নত ছিল, এবঙ এখনও আমাদের মধ্যে কয়েকজন জ্ঞানী ব্যক্তি আছেন ; কিন্তু বর্বর শাসকদের দ্রুত পারম্পর্য বিজ্ঞানকে আচ্ছন্ন

করিয়া ফেলিয়াছে, এবঙ জ্ঞানের আলোক নির্বাণোম্মুখ হইয়াছে। অবশ্য, এখন আমরা বিশ্বাস করি, যে নির্বাণোম্মুখ অগ্নি আবার প্রদীপ্ত হইতেছে, এবঙ আমরা দ্রুত শিক্ষিত জাতিতে পরিণত হইব।'

অন্য একটি তথ্য লক্ষণীয়। এই সৃষ্টির জনক রামমোহন রায় অথবা ডেভিড হেয়ার এই সভায় উপস্থিত ছিলেন না। রামমোহন রায় তাঁহার রক্ষণশীল দেশবাসীর দ্বারা নিন্দিত হইয়াছিলেন, এবঙ তাঁহার উপস্থিতি সভার কার্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে, এই আশঙ্কায় অনুপস্থিত ছিলেন। হেয়ার অন্তরালে থাকিয়া আন্দোলন দেখিতে চাহিয়াছিলেন--সহৃদয় ব্যক্তিটি ছদ্মবেশে কার্যসম্পাদনে আগ্রহী ছিলেন, প্রচারে নহে।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে একটি দ্বিতীয় কার্যকরী সভায় একটি মহাবিদ্যালয় বা হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাঁহারা চাঁদা সঙ্গ্রহ করিয়া একটি নূতন তহবিল নির্মাণ করেন, এবঙ কর্মপদ্ধতি নিরূপণ করিবার জন্য আটজন ইউরোপীয় ও বিশজন দেশীয় ব্যক্তি লইয়া একটি অস্থায়ী কমিটি গঠন করেন। আমাদের শিক্ষার ইতিহাস বর্ণনা করিতে বসিয়া অগ্রবর্তী ব্যক্তিগণের নামোল্লেখ না করা অনুচিত। তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের জন্য এবঙ এতকাল পরে তাহা আগ্রহ সঞ্চার করিতে পারে, এই বিশ্বাসে নিম্নে তাঁহাদের নামগুলি উল্লিখিত হইল :--

স্যার এর্ডওয়ার্ড্ হাইড্ ইস্ট্, [নাইট], সভাপতি

জে. এইচ. হ্যারিঙটন, সহ-সভাপতি

ডব্লু সি. ব্ল্যাকোয়ার	অভয়চরণ বাঁড়ুয্যা
ক্যাপ্টেন জে. ডব্লু. টেলার	রামদুলাল দে
এইচ. এইচ. উইলসন	রাজা রামচাঁদ
এন. ওয়ালিচ	রামগোপাল মল্লিক
লেফ্টন্যাণ্ট ডব্লু প্রাইস	বৈষ্ণবদাস মল্লিক
ডি. ডেমিঙ	চৈতন্যচরণ শেঠ
ক্যাপ্টেন টি. রোবাক	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
লেফ্টন্যাণ্ট ফ্রান্সিস আরভিন	রঘুমণি বিদ্যাভূষণ
চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন	তারাপ্রসাদ ন্যায়ভূষণ
সুভ্রম্ [সুব্রহ্মণ্যম?] মহেশ শাস্ত্রী	গোপীমোহন ঠাকুর
হরিমোহন ঠাকুর	শিবচন্দ্র মুখুর্য্যা
গোপীমোহন দেব	রাধাকান্ত দেব
জয়কিষেণ সিঙহ	রামরতন মল্লিক
রামতনু মল্লিক	কালীশঙ্কর ঘোষাল

পাঁচজন পন্ডিতকে ছাড়িয়া দিলে ওই কমিটির অন্য বাঙ্গালি ভদ্রলোকেরা তত্‌কালীন কলিকাতার প্রথম শ্রেণীর পরিবারগুলির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। দেখা যাইতেছে, যে তাঁহারা তাঁহাদের সঙ্গঠনে কোন আঘাতদায়ক জাতিভেদ করেন নাই—ব্রাহ্মণ,

বেনিয়া, ঠাকুর, কায়স্থ এবঙ তাঁতি সকলেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এক হইয়া মিলিয়াছিলেন। তখন হিন্দুসমাজে কোন বিশিষ্ট খোট্টা বা মাড়োয়ারী ভদ্রলোক ছিলেন না। একমাত্র বিশিষ্ট বহিরাগত ছিলেন বর্ধমানের মহারাজা তেজ চন্দ্র বাহাদুর ; কিন্তু শহরবাসী না হওয়ায় তাঁহার নাম তালিকাভুক্ত হয় নাই।

অল্পদিনের মধ্যে দেশীয় বাবুদের উপর সমস্যা সমাধানের ভার অর্পণ করিয়া ইউরোপীয় ব্যক্তিরা অবসর গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা ছয় মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় বিধি রচনা এবঙ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিলেন। অবশেষে ভারতের ভাগ্যে সেই মহত্ ও গুরুত্বপূর্ণ দিন আসিল। ২০শে জানুয়ারি ১৮১৭ তারিখ সোমবার হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। গরাণহাটায়, আপার চিত্পুর রোডে যেইখানে বর্তমানে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি আছে, সেইখানে গোরাচাঁদ বসাকের গৃহে যথাবিধি অভিষেকের পরে ইহার দ্বার উন্মুক্ত হইল। এই ভাড়াবাটী শহরের দেশীয় বিভাগের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ছিল। তাঁহারা সম্ভ্রান্ত হিন্দুসন্তানদের শিক্ষা দিবার জন্য এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। একটি বিদ্যালয় এবঙ একটি সঙস্কৃতি-পরিষদ ইহার অন্তর্গত ছিল। বিদ্যালয়ে পাঠ্য ছিল ইঙরাজি ও বাঙ্গালা--পঠন, লেখন, ব্যাকরণ এবঙ পাটীগণিত। সঙস্কৃতি-পরিষদে ইতিহাস, ভূগোল, কালনিরূপণবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, অঙ্ক, রসায়ন এবঙ অন্যান্য বিজ্ঞান পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেবল বিশ জন ছাত্র লইয়া ইহার প্রতিষ্ঠা হইল ; তত্সত্ত্বেও অতীতেব অজ্ঞানতার কাল এবঙ ভবিষ্যতের আলোকময় সময়ের মধ্যবর্তী কলেজটি একটি স্মরণীয় যুগসন্ধি হইল। সত্যই, দেশীয় সম্পাদক বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় পরদিবস কলেজে পরিদর্শনে সমাগত তাঁহার সকল দেশবাসীর প্রতি ভবিষ্যত্বাণী করেন 'এই প্রতিষ্ঠান বর্তমানে অঙ্কুরমাত্র হইলেও বহু বত্সর পরে বটবৃক্ষে পরিণত হইবে, এবঙ পূর্ণপরিণত অবস্থায় ভারতবর্ষের বৃহত্তম বৃক্ষরূপে ইহার ছায়াতলে সকলকে শীতল করিবে ও বিশ্রাম দান করিবে।'

এইভাবে কলেজটির প্রতিষ্ঠা ও তাহার জীবনপ্রবাহের সূত্রপাত হইল। ইহার চিন্তা বহিরাগত হইতে পারে, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণভাবে দেশীয় উদ্যোগ,--হিন্দুদের প্রয়াসে সৃষ্ট, এবঙ হিন্দু প্রতিষ্ঠাতাদের সহায়তা, হিন্দু তহবিল ও হিন্দু পরিচালনায় হিন্দু মনের আবেগে উদ্ভূত। একটি মহত্ উত্তেজনা তাহার জন্ম দিয়াছিল। কিন্তু তাহার আদী আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই। তিন মাসে শ্লথগতিতে ইহার ছাত্রসঙখ্যা ৬৯ হইয়াছিল। আয়ের স্বল্পতার জন্য ইহাকে বারঙবার স্থান পরিবর্তন করিতে হইয়াছে--গোরাচাঁদ বসাকের গৃহ হইতে জোড়াসাঁকোতে ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়িতে, যেখানে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে ডাক্তার ডাফ্ তাঁহার জেনারাল এসেমব্লি'জ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। জোড়াসাঁকো হইতে উহা বৌবাজারে এবঙ সেখান হইতে টেরিটি বাজারে স্থানান্তরিত হয়।

কলেজের উন্নতির দুইটি প্রতিবন্ধক ছিল। সুদূর অতীতে দেশ প্রতি বিষয় বিনামূল্যে পাইতে অভ্যস্ত ছিল--বিনামূল্যে শিক্ষা, বিনামূল্যে মহাভারত ও রামায়ণের অভিনয়, টোল ও চতুষ্পাঠী হইতে বিনামূল্যে ব্যবস্থা (আইনগত পরামর্শ), বিবাদের বিষয়ে

বিনামূল্যে সালিস, বিনামূল্যে যাত্রা ও নাচ প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদ। সেইজন্য বিদ্যালয়ে পাঁচ টাকা উচ্চবেতন বিরাট বাধা হইয়া উঠিল। তাহারা এখন যেমন পারে তখন তেমনভাবে শিক্ষার গুণ উপলব্ধি করিতে পারে নাই--বিচারক বা শাসকের চাকুরির সুবিধা দেখিতে পায় নাই, যাহার দ্বারা তাহাদের ঐ টাকা ব্যয় করিতে প্ররোচিত করা যাইত। বর্তমান কাল পর্যন্ত দেশীয়দের মধ্যে শিক্ষার জন্য শিক্ষা জনপ্রিয় হয় নাই।

দ্বিতীয়ত, হিন্দু মনোভাব সমাজ-বিরোধী। ইহা পারস্পরিক বন্ধুত্বের দ্বারা সহানুভূতি ও বিশ্বাসের চর্চা করার প্রয়াস করে না। ইহার ফলে আমাদের জাতি ব্যক্তিগতভাবে কাজ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, যৌথভাবে নহে--ব্যক্তিগত স্বার্থে কাজ করিয়াছে, দেশবাত্সল্যে নহে। হিন্দুধর্ম কখনও এক বোঝা লাঠির সামগ্রিক শক্তির গল্পের নীতি শিখায় নাই। ইহার ফলে এই দেশে কখনও কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠান, সাধারণের জন্য উচ্চ শিক্ষালয় বা সাধারণ প্রমোদ-বিহার গড়িয়া উঠে নাই। হিন্দু কলেজ একটি নূতন বিষয়--এমন একটি অভিজ্ঞতা যা তাহাবা ব্যবহার কবিতে জানিত না। অধিকন্তু বাঙ্গালিদেব অন্তরে শক্তির উত্স নাই। তাহারা অনুকরণ করিয়া কাজ করিতে যত উত্সাহী, নিজস্ব দৃঢ় বিশ্বাস হইতে ততখানি নহে। তাহারা কোন উদ্যোগের সূত্রপাত করিতে পারে, কিন্তু স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া অক্লান্তকর্মে তাহাতে অবিচল থাকিতে পারে না। সিদ্ধিলাভের পূর্বেই তাহাদের উত্সাহে ভাঁটা পড়ে। অর্ধপথে তাহারা পিছাইয়া পড়ে ও ভাঙ্গিয়া যায়। আলোকের ঝলকের ন্যায় আরব্ধ হইয়া তাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

ছয় বত্সর হিন্দু কলেজ নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য সংগ্রাম করিল। অপ্রত্যাশিত ঘটনা তাহাব সৌভাগ্যের সৃষ্টি না করিয়া অত্যন্ত প্রতিকূলতা করিতে লাগিল। জে. বারেট্টো এন্ড সন্স নামক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হওয়ায় তাহাদের কাছে গচ্ছিত কলেজের তহবিলের ভরাডুবি হইল। এক লক্ষেরও বেশি টাকার পরিবর্তে মাত্র ২০,০০০ টাকা ফিরিয়া পাওয়া গেল। কলেজের অবস্থা চরম সঙ্কটপূর্ণ হইল--তাহা ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল। কিন্তু ভারতবর্ষের সৌভাগ্যক্রমে ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট দুইটি ঘটনায় ইহা নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিল। রাজা বৈদ্যনাথ রায়, রাজা হরনাথ রায় এবঙ কালীশঙ্কর ঘোষাল ইহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যথাক্রমে ৫০,০০০ টাকা, ২০,০০০ টাকা এবঙ ২০,০০০ টাকা দান করিলেন। সরকারও ইহাকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন। পার্লামেন্টের ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের যে নির্দেশ এতকাল কার্যকর হয় নাই, তাহাকে সক্রিয় করিবার জন্য সরকার ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে সাধারণ শিক্ষা কমিটি গঠন করিলেন। কলেজের পরিচালকবর্গ এই সঙস্থার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মাসিক ৩০০ টাকা সাহায্য এই সর্তে প্রদত্ত হইল, যে সরকারের প্রতিনিধিরূপে পরিচালকদের মধ্যে ডা. এইচ. এইচ উইলসন থাকিবেন।

এই আর্থিক সাহায্য ছাড়াও কলেজকে বিনা ভাড়ায় গৃহ দেওয়া হইল। ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভারতীয়দের শিক্ষিত করিবার বিপক্ষে সরকারের মনে যে কুসঙস্কার তখনও সঙগুপ্ত এবঙ প্রাচ্যদেশীয় শিক্ষার অনুকূলতার যে মনোভাব ছিল, তাহার ফলে

সরকার কলিকাতায় একটি সঙস্কৃত কলেজ স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। ইহা ঘড়ির কাঁটাকে দুই হাজার বত্সর পিছাইয়া দেওয়া। রামমোহন রায় তাঁহার অকৃত্রিম উদার মনোভাব লইয়া এই কালাতিক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে আগাইয়া আসিলেন। তিনি লর্ড আমহার্স্টের নিকট যে স্মারকলিপি অর্পণ করিলেন, বিশপ হেবারের মতে তাহা 'সুন্দর ইঙরাজি, প্রকৃত বোধশক্তি এবঙ শক্তিশালী যুক্তির জন্য একজন এশিয়াবাসীর হস্ত হইতে নির্গত একটি দুর্লভ বস্তু।' আমাদিগকে সঙস্কৃত শিখাইবার অনুপযোগিতার বিরুদ্ধে এই স্মারকলিপি এমন একজন ব্যক্তি প্রেরণ করিলেন যিনি স্বয়ঙ সঙস্কৃতে সুগভীর পন্ডিত। যে শিক্ষা বিগত এক শত বত্সরে একটিও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের সৃষ্টি করে নাই এবঙ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ব্যতীত একজনও বিশিষ্ট আলোকপ্রাপ্ত জ্ঞানী তৈয়ার করিতে পারে নাই, সঙস্কৃত শিক্ষার পক্ষে সমস্ত ভাবালুতাকে স্তব্ধ করিয়া দিবার পক্ষে ইহা একটি প্রামাণিক উত্তর। লোকান্তরিত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় একটি মহত্ দান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত মূল্যবিচার করিলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহার স্বদেশপ্রীতি ভুল খাতে প্রবাহিত হইয়াছে। রামমোহন রায়ের আবেদন একটি নিরুদ্যম আপস-পরিণতির বেশি আর কিছুই করিতে পারে নাই। ডাক্তার উইলসনের প্ররোচনায় জনশিক্ষা কমিটি সঙস্কৃত কলেজের জন্য যে বাসগৃহ নির্মিত হইবে তাহাতে হিন্দু কলেজকে স্থান দিতে সম্মত হইলেন। সরকাব এই বাসগৃহ নির্মাণের জন্য ১,২৪,০০০ টাকা এবঙ ডেভিড হেয়ার বর্তমান কলেজ স্কোয়ার বা গোলদিঘির উত্তরবর্তী তাঁহার নিজস্ব জমি দিলেন। ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৮২৪ তারিখে স্থাপিত ভিত্তিপ্রস্তরে নিম্নের লিপি ঘোষিত হইল—

In the reign of
His Most Gracious Majesty George the fourth.
under the auspices of
The Right Hon'ble William Pitt Amherst,
Governor-General of the British Possessions in India,
The Foundation Stone of this Edifice,
The Hindoo College of Calcutta,
was laid by
John Pascal Larkins, Esquire.
Provincial Grand Master of the Free Masons
in Bengal.
Amidst the Acclamations
Of all ranks of the Native Population of this City
In the presence of
A Numerous Assembly of the Fraternity
and of the
President and Members of the Committee
of General Instruction

On the 25th day of Februarv 1824,
And era of Masonry 5824,
Which May God prosper.

এই অট্টালিকার নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করিতে এক বত্সর লাগিয়াছিল। মার্জিত ডোরিক সৌন্দর্যময় একটি শোভন অট্টালিকা নির্মিত হইল, যাহা রাস্তার দিকে ইউবৃক্ষে পরিবেষ্টিত এবঙ একটি সুন্দর উপবৃত্তাকার পুষ্করিণীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান--সমস্ত মিলাইয়া দেখিলে আমাদের নগরের একটি দ্রষ্টব্য অলঙ্কার। ১৮২৫ জানুয়ারিতে কলেজ ইহার দেওয়ালগুলির মধ্যে আশ্রয় পাইল এবঙ বর্তমান কাল পর্যন্ত তাহা অটুট রহিয়াছে। এই সাহায্য ও গৃহ লাভ করিবার পরে হিন্দু কলেজ নবযুগে পদার্পণ করিল এবঙ দ্রুতগতিতে উন্নতি লাভ করিল। এই প্রতিষ্ঠানের মঙ্গলের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজনীয় তাহাতেই ডা. উইলসন উদ্দীপনা ও দক্ষতার সঞ্চার করিলেন। সমস্ত বিশৃঙ্খল দেখিয়া তিনি উহাকে সম্পূর্ণভাবে সুবিন্যস্ত এবঙ পরিচালনায় দক্ষতার সঞ্চার করিলেন। প্রাথমিক প্রয়োজন ছিল আর্থিক অবস্থার উন্নতি। তিনি বকেয়া পাওনা আদায় করিয়া একটি বড় তহবিল গঠন করিলেন। কোথাও শৃঙ্খলা ছিল না ; তিনি তাহার প্রবর্তন করিলেন এবঙ শিক্ষাকার্যের সময় দ্বিগুণ বর্ধিত করিলেন। নূতন শিক্ষকদের নিয়োগে শিক্ষকমণ্ডলীতে নবরক্তের সঞ্চার হইল। ইতিপূর্বে মেধার স্বীকৃতি ও পুরস্কার ছিল না ; তিনি বাত্সরিক সাধারণ পরীক্ষা ও পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলেন। কলেজটি জনসাধারণের শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রতিদিন নূতন ছাত্র আসিতে লাগিল। যে মুকুল শুকাইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহা পত্রপুষ্পোদ্গমে পূর্ণবিকশিত হইল।

হিন্দু কলেজের প্রথম যুগের ইতিহাস হইতে বাঙ্গালিরা একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষালাভ করিতে পারে। ইহা শিক্ষা দেয় যে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ব্যতীত উচ্চাশা কেবল ভান, শক্তিহীনের সাহস বাহাদুরি মাত্র, এবঙ অনিশ্চিত কার্যে হস্তক্ষেপের পরিণতি ধ্বঙস। যাঁহারা হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের যুগের প্রধান ব্যক্তি, কিন্তু তাঁহারা যে ঝুঁকি লইয়াছিলেন তাহা নিজেদের সহস্র অক্ষমতা উপেক্ষা করিয়া অজ্ঞাত সমুদ্রে মানচিত্র ছাড়া কর্ণধারহীন জাহাজ চালাইবার ন্যায়। বিষয়টি তাঁহাদের নিজস্ব ধারণা হইতে জন্মায় নাই, তাঁহারা বাহিরের আলোক এক পলকমাত্র দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইহা একটি জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা, এই দেশে পূর্বে যাহার কোন নজির ছিল না এবঙ তাঁহাদের সম্মুখে প্রাসঙ্গিক তথ্য ছিল না। ইহার জন্য যে লোকহিতকর মনোবৃত্তি প্রয়োজনীয়, তাঁহাদের ইতিহাসে তাহার কোন দৃষ্টান্ত ছিল না। ইহাতে প্রকৃত দূরদৃষ্টি প্রয়োজন, কিন্তু স্থৈর্য তাঁহাদের অনধিগত ছিল। ইহাতে স্থায়িত্বের জন্য যে শিক্ষা প্রয়োজন তাহা তাঁহাদের ছিল না। তাঁহারা 'অধিকতম মনুষ্যের প্রভূততম হিতে'র নীতিতে কখনও অভ্যস্ত ছিলেন না বলিয়া জনসাধারণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া একটি বহিরাগত পরিবেশের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিলেন। সামাজিক কর্মে

দেশীয়দিগের প্রথম পরীক্ষা হইল হিন্দু কলেজ। অর্ধশতাব্দী পূর্বে প্রকাশিত অক্ষমতা, দুর্বলতা এবঙ অনীহা বর্তমান কালেও তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য প্রদান করিতেছে। আত্মপ্রত্যয়, আত্মকৃচ্ছ্রতা ও স্বাধীন কর্মসম্পাদনে শিক্ষা না পাইয়া ভারতীয়েরা আবেগের বশে অনেক সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্ম-পরিকল্পনা করে, কিন্তু সেগুলি কেবল অবসর--বিনোদনের মত বুদ্বুদ সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের কলঙ্ক হইয়া উঠে।

২

এই কলেজের প্রথম যুগের একমাত্র যে শিক্ষকের নাম আমাদের নিকট পর্যন্ত আসিয়াছে তিনি দ'অ্যানসেলম্। মনে হয় তিনি ইস্ট ইন্ডিয়ান ছিলেন। দ'অ্যানসেলম্ এই প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত হইতেই শিক্ষকতা করেন. প্রথম দিন হইতেই তিনি ছিলেন প্রধান শিক্ষক--যেই পদে তিনি দক্ষতার সঙ্গে দীর্ঘ প্রায় পনের বত্সর চাকুরি করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ের দুই জন বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবঙ চন্দ্রশেখর দেব। আমি তাঁহাদের দুই জনকেই দেখিয়াছি--তারাচাঁদকে কয়েক বার, চন্দ্রশেখরকে কেবল এক বা দুই বার। গৌরবর্ণ তারাচাঁদ বাহিরের আকৃতিতে লাজুক, কিন্তু ভিতরে মানসিকভাবে তেজস্বী ও মহত্ ছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র 'ইন্ডিয়ান রিভিউ' পত্রে তাঁহার সঙক্ষিপ্ত জীবনচরিতে লিখিয়াছেন, 'তারাচাঁদ ছিলেন ইঙরাজিতে উত্কৃষ্ট পন্ডিত, চিন্তাশীল এবঙ সম্পূর্ণ স্বাধীনচিত্ত। তিনি (ব্যারিস্টার) মি. লঙভিল ক্লাবের সহকারী এবঙ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। ক্লার্ক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'আমার নিকট আপনি অমূল্য।' তারাচাঁদ একটি ইঙরাজি-বাঙ্গালা অভিধান রচনা এবঙ বাঙ্গালায় মনুর অনুবাদ করেন।' দীর্ঘাবয়ব চন্দ্রশেখর দেব 'বিবিধ গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি ইঙরাজি সাহিত্য, বিজ্ঞান, আইন, সঙস্কৃত এবঙ বিশেষভাবে ন্যায়দর্শনে পারদর্শী ছিলেন। তিনি টীকা রচনা করেন (প্রথম লেখ্য-প্রমাণক) মি. থিওবাল্ডের জন্য, যিনি তাঁহার গভীরতা দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে চন্দ্রশেখর বিচারপতি হইবার পক্ষে উপযুক্ত ছিলেন।' তারাচাঁদ বা চন্দ্রশেখর জীবনে উচ্চ পদাধিষ্ঠিত হয়েন নাই। তাঁহাদের কর্মজীবনে কোন লোকহিতকর ধারা ছিল না। তবে তারাচাঁদ একদা ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটির সভাপতি ছিলেন, যাহার জন্য 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'র মি. মার্শম্যান প্রতিষ্ঠানটিকে উপহাস করিয়া 'চক্রবর্তীর দল' বলিতেন। এই আখ্যার পশ্চাতে ঐ প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের তীব্র অভিযোগপূর্ণ বক্তৃতার প্রতি ইঙ্গিত ছিল, বিশেষত জর্জ থম্পসন এম, পি.-র প্রতি, যাঁহাকে কৌতুকচ্ছলে 'দুর্দশা বিক্রেতা' উপনাম দেওয়া হইয়াছিল।

ড. উইলসন আনীত শিক্ষকদের মধ্যে একজন ছিলেন মি. ডিরোজিও। তিনিও ছিলেন একজন ইস্ট ইন্ডিয়ান এবঙ হিন্দু কলেজের পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ মি. ড্রামন্ডের স্কুলে শিক্ষিত। তাঁহার ছাত্রদের তুলনায় তাঁহার বয়স ছয় বত্সরের অধিক ছিল না, কিন্তু ডিরোজিও যে মেধা ও শিক্ষা লইয়া আসিয়াছিলেন তাহা তাঁহার বয়সের তুলনায় অনেক বেশি। এই প্রতিভাশালী ব্যক্তিটি সরস্বতীর প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত

ছিলেন। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে তিনি হিন্দু কলেজের চতুর্থ শিক্ষক নিযুক্ত হন। ডিরোজিও তাঁহার কর্মক্ষেত্রে আসিলেন, যেন ইহা ঈশ্বর-নির্দিষ্ট কর্তব্য। তিনি কেবল ছকে আবদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন না যে ক্লাসের দিকে পিঠ ফিরাইলেই তাঁহার কর্তব্যকে বিদায় জানাইতে পারিতেন। তিনি ছাত্রদের প্রতি গভীর অনুরাগী ছিলেন, এবঙ নিজের ছাত্রদের বিদ্যালয়ে, স্বগৃহে এবঙ তাহাদের বাটীতে গিয়া পড়াইতেন। তিনি তাহাদের ভালবাসিতেন, উত্সাহ দিতেন এবঙ তাহারাও তাঁহাকে ভালবাসিত—'তাহাদের হৃদয়ের মর্মস্থলে তাঁহাকে ধারণ করিত, নিশ্চয়, প্রগাঢ়তম স্নেহে।' যে ছাত্রেরা তাঁহাকে সর্বাধিক মান্য করিতেন এবঙ দিব্যপ্রেরণাপ্রাপ্ত গুরুর ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিতেন তাঁহারা ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, মাধবচন্দ্র মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী, মহেশচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, অমৃতলাল মিত্র এবঙ প্যারীচাঁদ মিত্র। ইঁহারা ছিলেন সর্বাধিক প্রাগ্রসর ছাত্র, যাঁহাদের তিনি শ্রেষ্ঠ কবি, দার্শনিক ও নীতিবেত্তাদিগের রচনাবলী শিক্ষা দিতেন, এবঙ যাঁহাদের উপর তিনি সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সকল বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের কেবল পড়িতে শিখাইতেন না, অধিকন্তু চিন্তা করিতে, বলিতে, লিখিতে—'পার্থেনন' সম্পাদনা করিতে এবঙ ১৮২৮ অথবা ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে' বিতর্ক শিক্ষা দিতেন। স্যর এডওয়ার্ড রায়ান, ডব্লু. ডব্লু বার্ড, লর্ড ডব্লু বেন্টিঙ্কের ব্যক্তিগত সচিব কর্নেল বেন্সন, এবঙ আরও অনেক ইউরোপীয় ভদ্রলোক তাঁহাদের সভায় আসিতেন।

ড. উইলসন যেমন কলেজকে নবজীবন দান করিলেন, ডিরোজিও তেমনি সেখানে নূতন যুগের প্রবর্তন করিলেন। ইহা তখন জনসাধারণের দৃষ্টিতে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হইল। সরকারি সাহায্য মাসিক ৩০০ টাকা হইতে ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে মাসিক ৯০০ টাকায় এবঙ ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ হইতে মাসিক ১২৫০ টাকায় বৃদ্ধি পাইল। 'উইলসনের সিরিজ' নামে পুস্তকগুলি প্রকাশ করিবার জন্য সরকার একটি বড় অনুদান করিলেন এবঙ একটি পুস্তকসঙ্গ্রহের জন্য আরও ৫,০০০ টাকা মঞ্জুর করিলেন। বিদ্যালয়ে বেতন দিতে অনীহাকে এতদিনে হিন্দু অভিভাবকেরা কাটাইয়া উঠিলেন এবঙ তাঁহাদের পুত্রদের পাঠাইতে লাগিলেন। ছাত্রসঙখ্যা প্রতি বত্সর বাড়িতে লাগিল। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে ১১১৫ টাকা হইতে ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষালাভের মাসিক বেতন ১৭০০ টাকায় বর্ধিত হইল। যে ছাত্রেরা ভবিষ্যত্ জীবনে বিখ্যাত হইয়াছিলেন তাঁহাদের কয়েকজন উইলসন ও ডিরোজিও-র যুগে কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ত্র মি. হেয়ারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আরপুলি পাঠশালা এবঙ ইঙরাজি ব্র্যাঞ্চ স্কুলে যথাক্রমে বাঙ্গালা ও ইঙরাজির প্রথম পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজে স্থানান্তরিত হইলেন। রামগোপাল ঘোষও সেই সময়ে আসিলেন। প্রথমে তাঁহার নাম ছিল গোপালচন্দ্র ঘোষ। নাম নিবন্ধভুক্ত করিবার জন্য তিনি দ'অ্যানসেলমে

সম্মুখে আসিলে ভীত হইয়া আপনার নাম গোপাল বলিলেন। দ'অ্যানসেলম্ জিজ্ঞাসা করিলেন যে প্রথম শব্দটি কি ছিল—শব্দটি কি 'রামগোপাল?' তিনি বলিলেন 'হ্যাঁ', এবঙ সেইদিন হইতে রামগোপাল নামে পরিচিত হইলেন। ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে আসিলেন রামতনু লাহিড়ী ও দিগম্বর মিত্র। অন্যান্য ব্যক্তিকেও এই সময় খুঁজিয়া পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, এই সময়ে অধিকাঙশ প্রধান পরিবার হইতেই ছাত্রেরা আসিল। ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮২৯ তারিখের ডিরোজিও-র 'হেস্পেরাস' হইতে একটি উদ্ধৃতি তাঁহার সময়ের হিন্দু কলেজের অবস্থার সুন্দর বর্ণনা করে—'বুধবার প্রভাতে গবর্ণমেন্ট হাউসে যে দৃশ্যের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে তাহা অপেক্ষা সন্তোষজনক প্রদর্শনী আমরা কমই দেখিয়াছি—মহামান্য বড়লাট ও লেডি উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সম্মুখে এই মহত্ প্রতিষ্ঠানের (হিন্দু কলেজের) ছাত্রগণের বার্ষিক পরীক্ষাগ্রহণ।

সপ্তদশ শ্রেণীতে বঙ্গাদেশের প্রধান অধিবাসিগণের পুত্রসহ প্রায় চারি শত ছাত্র উপস্থিত ছিল।

মাননীয় ডব্লু. বি. বেলি তরুণ ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ করিলেন। পুরস্কারের মধ্যে জনপ্রিয় বিষয়ে রচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক ছিল। তাহার পরে মি. উইলসন প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন। গ্রীসের, রোমের, ইঙলন্ডের ও সাধারণ ইতিহাস, ভূগোল, রসায়ন প্রভৃতি বিষয়ে তাহদের পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রশ্ন করা হইল। তাহাদের উত্তর ছিল দ্রুত ও যথাযথ। আমরা বিশেষ আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিয়াছিলাম, কি নিপুণভাবে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক জন হিন্দু যুবক ইঙলন্ডের লাল ও শাদা গোলাপের যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা এবঙ অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

'তখন হুজুর পুরস্কার বিতরণ করিলেন, যে পুরস্কার তাহাদের গুণ দাবী করিত। তাহার পরে এই আবৃত্তি আরম্ভ হয় :—

আলেকজান্ডার	বিনায়ক ঠাকুর
রবার	তারিণীচরণ মুখার্জি
রিভার্স	রাজকৃষ্ণ মিত্র
স্যর হ্যারি	গৗরচাঁদ দে
ব্রুটাস, সিজারের মৃত্যুতে	নরসিঙচন্দ্র বোস
ব্রুটাস	রামতনু লাহিড়ী
ক্যাসিয়াস	দিগম্বর মিত্র
ম্যাকডাফ	কৈলাস দত্ত
ম্যালকম	রামগোপাল ঘোষ
রস	মহেশচন্দ্র সিঙ
বেলারিয়াস	শিবচন্দ্র দত্ত
আভিরাগাস	রসিকচন্দ্র মুখার্জি

গিডেরিয়াস	রাধানাথ শিকদার
রেজার বিক্রেতা	হরিহর মুখার্জি
ক্যাটো-র স্বগতোক্তি	তারকনাথ বোস
হোরাসিও	কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জি
ফ্রান্সিস্কো	যাদবচন্দ্র সেন
বার্নার্ডো	বেণীমাধব ঘোষ
মার্সেলাস	প্যারীমোহন সেন
প্রেত	অমৃতলাল মিত্র
হ্যামলেট	হরচরণ ঘোষ
হোরাসিও	রসিককৃষ্ণ মল্লিক
মার্সেলাস	গোপাল মুখার্জি
বার্নার্ডো	বেণীমাধব ঘোষ
প্রেত	অমৃতলাল মিত্র
হ্যামলেট	কৃষ্ণধন মিত্র
হোরাসিও	কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জি
মার্সেলাস	রামচন্দ্র মিত্র

ফলাফল দিয়া বিচার করিলে, হিন্দু কলেজে যত শিক্ষক ছিলেন ডিরোজিও তাঁহাদের মধ্যে সর্বোত্কৃষ্ট। আমাদের শিক্ষার ঐতিহাসিক বিবরণীতে বোধহয় তাঁহার নাম সর্বাধিক বিশিষ্ট। ডিরোজিও-র শ্রমসাধ্য প্রয়োগের ফলে দেশীয়দের মধ্যে ইয়ঙ বেঙ্গল নামক একটি গোষ্ঠীর সৃষ্টি হইল। কঠোরভাবে নীতির উপরে স্থাপিত এই গোষ্ঠী তাহার উদার আদর্শ ও সহানুভূতি লইয়া 'অতিশয় সীমাবদ্ধ দৃষ্টি ও যথাযথ রীতিনীতি'র প্রাচীন গোষ্ঠীর বিপক্ষে বিশেষভাবে বিরুদ্ধবাদী হইল। ডিরোজিও-র দ্বারা সজ্জিত শিক্ষিত যুবকদের এই গোষ্ঠী সত্যই বিশেষভাবে লক্ষণীয় ছিল। এই গোষ্ঠীর প্রত্যেকেই সম্মান অর্জন করিয়াছেন এবঙ পরবর্তী জীবনে কোন না কোন গুণে বিশিষ্ট হইয়াছেন--যেমন প্রকৃত জ্ঞান, জননায়কত্ব, লোকহিতৈষণা, ন্যায়পরায়ণতা, সচ্চরিত্রতা, অথবা নৈতিক বলিষ্ঠতা। দেশের উন্নতিকল্পে তাঁহাদের উদার আগ্রহ ছিল। কিন্তু লোকহিতকারিতার মনোবৃত্তিতে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিকচন্দ্র মল্লিক এবঙ রামগোপাল ঘোষ। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের হৃদয় অপরের দুঃখে কাতর হইত। হরচন্দ্র ঘোষ নিষ্কলুষ বিচারকরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন। অমৃতলাল মিত্র কর্মজীবনের শেষে যখন সরকারী তোষাখানার প্রলোভন হইতে বাহির হইয়া আসিলেন তখন তিনি পূর্বের তুলনায় দরিদ্র। মাধবচন্দ্র মল্লিককে তাঁহার নিজস্ব গোপন ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে অভিযুক্ত করা হইলে তিনি লোকসমক্ষে হিন্দুধর্মকে অস্বীকার করিবার মানসিক বল হারান নাই। গোবিন্দচন্দ্র বসাকের সাহিত্যরুচি ছিল। সিভিলিয়ান ম্যাজিস্ট্রেট মি. ভ্যান্সিটার্টের সঙ্গে বিবাদে রাধানাথ শিকদার ভীত হন নাই। তিনি বাঙ্গালিদের

শারীরিক উন্নতি কামনা করিতেন এবঙ গোমাঙসকে তাঁহার প্রিয় খাদ্যবস্তু করিয়াছিলেন।

উপরন্তু দেশীয়দিগের মধ্য হইতে প্রথম সাধারণ বক্তা ও লেখক সৃষ্টি করিবার কৃতিত্বও ডিরোজিওর। তাঁহার আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন ছিল সেই কর্মক্ষেত্র যেখানে তাঁহাদের প্রস্তুতি চলিত। কৃষ্ণমোহন ও রসিককৃষ্ণ, যুগপত্ লেখক ও বক্তা ছিলেন। রসিক অলঙ্কারপ্রিয় বক্তা অপেক্ষা নিশ্ছিদ্র যুক্তিবাদী ছিলেন। প্রকৃত বাগ্মী ছিলেন রামগোপাল। তাঁহার সাবলীল বাক্‌পটুতায় মুগ্ধ হইয়া ডব্লু. ডব্লু. বার্ড বক্তার সহিত পরিচিত হইবার বাসনায় অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডিরোজিওকে পরিচয় করাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কথিত হয়, রামগোপাল 'টার্টন, ডিকেন্স ও হিউমের মত তিনজন ব্যারিস্টারকে মঞ্চে উপস্থিত করিতেন।'

কিন্তু ডিরোজিওর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব ছিল বাঙ্গালির সঙস্কারকে পবিবর্তিত করা। কালে তাঁহার শিক্ষা তাঁহার শিষ্যদের মানসচক্ষে বিচারের মানদন্ড পরিবর্তিত করিল। বঙশপরম্পরাক্রমে লব্ধ চক্ষুর ছানি তাঁহারা কাটাইয়া ফেলিলেন। তাঁহাদের মনে নূতন আলোকের সঞ্চারে স্মৃতি হইতে সম্ভাবনা সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গেল। তাঁহারা পশ্চাতে যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিলেন, ততদূর পর্যন্ত সীমাহীন কাল ব্যাপিযা অন্যায় ও ঘৃণ্য কর্মের সারি দেখিতে পাইলেন। স্মৃতির অতীত হইতে যে প্রথাগুলি মহত্ বলিয়া মান্য ছিল, তাঁহাদের জাদুমুক্ত চক্ষুতে তাহারা ঘৃণ্য বলিয়া প্রতিভাত হইল। নূতন চিন্তায় আলোড়িত হইয়া তাঁহাদের মনোভাবে একটি বিরাট বিপ্লব সঙ্ঘটিত হইল। তাঁহারা মনুর নির্দেশ লঙ্ঘন এবঙ লৌহযুগের পরিবর্তে স্বর্ণযুগ প্রবর্তনের জন্য আত্মোত্সর্গ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন—সর্বাধিক অগ্রসর ছাত্রেরা এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইলেন—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক এবঙ রামগোপাল ঘোষ—দলের উদ্যমী ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সাহসী। চিন্তা ও কর্মের পুরাতন অভ্যাস প্রায়ই জোরের সহিত ভাঙ্গা হইত। যৌবন উদ্যমশীল। সঙযমের পরে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকৃতির ধর্ম। দীর্ঘকালবাহিত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যুবক সঙস্কারকদের তেজস্বী দল অত্যন্ত অসঙযমী হইয়া উঠিল। তাঁহারা ডাক দিলেন 'হিন্দুধর্মকে শেষ কর!' ব্রাহ্মণেরা উপবীত পরিত্যাগ করিলেন। অন্যেরা মন্ত্রের প্যারডি রচনা করিলেন। কার্তিকের মূর্তির অতিরঞ্জিত অনুকরণে তাহাকে টেবিলে আহাররত সাহেব বানান হইল, যাহার নিকটে খিদ্‌মদ্‌গার দন্ডায়মান। নবলব্ধ ভাব তাঁহারা এমন আকারে প্রকাশ করিতে আনন্দ পাইতেন যাহাতে গোঁড়ামি আহত হয়,—'শূকরমাঙস ও গোমাঙস কাটিয়া এবঙ সুরাপাত্রের মধ্য দিয়া তাঁহারা উদারনৈতিকতার প্রতি অগ্রসর হইতেন।' একদা সন্ধ্যায় তাঁহারা বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য কৃষ্ণমোহনের গৃহে সমবেত হইয়াছিলেন। আমোদ করিবার জন্য প্রস্তাবিত হইল, যে দোকান হইতে একবাটি ঝলসানো গোমাঙস আনানো হউক। বালসুলভ চপলতায় তাঁহারা প্রতিবেশী ব্রাহ্মণের গৃহসঙলগ্ন উঠানে ভুক্তাবশিষ্ট পুঁতিয়া ফেলিলেন এবঙ উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন 'গোমাঙস! গোমাঙস!' বিক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণ ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া ভৃত্যদের সহিত দ্বার ভাঙ্গিয়া কৃষ্ণমোহনের বাটীতে

প্রবেশ করিয়া বালকদের ভীষণ প্রহার করিলেন। কোলাহলে আকৃষ্ট হইয়া অনেকে ঘটনাস্থলে আসিলেন। তাঁহার কার্যকলাপ নীচ মনে হওয়ায় তাঁহারা তিক্তভাষায় কৃষ্ণমোহনকে গালাগালি করিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণমোহনকে স্বধর্মত্যাগ ও বহিষ্কারের মধ্যে একটি বাছিয়া লইতে বলিলেন। এই বিপদেও কৃষ্ণমোহনের মনের অটল সাহস দূর হয় নাই। তিনি দ্বিতীয় বিকল্প বাছিয়া লইলেন এবঙ গৃহ হইতে পিতা কর্তৃক বিতাড়িত ও আপন সমাজ হইতে স্বদেশবাসী কর্তৃক বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজের দৃঢ় বিশ্বাসের নিকট আপনাকে উত্সর্গ করিলেন।

রসিকচন্দ্র স্বধর্ম ত্যাগ করিবেন, পূর্বাহ্নে ইহা অনুমান করিয়া তাঁহার পরিবার তাঁহাকে ঘুমের ঔষধ খাওয়াইল। তিনি সারারাত্রি অচেতন ছিলেন। [পরদিন] প্রভাতে তাহারা তাঁহাকে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া বন্ধুসঙসর্গের নাগালের বাহিরে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতেছিল। ইতিমধ্যে জ্ঞান ফিরিয়া আসায় তিনি ঐ প্রয়াসকে বলিষ্ঠভাবে প্রতিহত করিলেন এবঙ ইহার ফলে তাঁহাকে স্বপরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চোরবাগানে স্বতন্ত্র গৃহে থাকিতে হইল। কৃষ্ণমোহন ও রসিককৃষ্ণ উভয়েই হিন্দু গোঁড়ামিকে আঘাত করিলেন— এক জন তাঁহার *Persecuted* ['নির্যাতিত'] এবঙ অপর জন 'জ্ঞানান্বেষণ' দ্বারা।

নিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করায় রামগোপালও অনুরূপভাবে পরিত্যক্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে সমান শাস্তি ভোগ করিতে হয় নাই। তাঁহাকে পিতৃগৃহে থাকিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু স্বজাতীয়েরা কুখ্যাতির জন্য তাঁহাকে 'রবার্ট গোপাল' নামে নির্দেশ করিত।

যাঁহারা অপেক্ষাকৃত কম আবেগপ্রবণ ছিলেন, তাঁহারা আপনাদের 'নবলব্ধ মানসিক মুক্তি'কে সতর্ক মধ্যপন্থায় ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা গোপনে পানশালা রেস্তোরাঁয় গিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন—যদিও ইতিপূর্বেই রাধানাথ শিকদার প্রকাশ্যে গোমাঙস খাইতেন এবঙ অনেক বত্সর যাবত্ তাহার গুণ প্রচার করিতেন।

ইয়ঙ বেঙ্গলের জীবন বিকশিত হইবার এই সহজ গল্পটি বর্তমানে নাটকের আগ্রহ সঞ্চার করিয়াছে। হিন্দু কলেজ ছিল রূপান্তরের দৃশ্য—সম্পাদক ছিলেন ডিরোজিও। অগ্নির প্রথম বহিঃপ্রকাশে হিন্দুসমাজে বিপদের আশঙ্কা প্রবল হইল; কিন্তু নবদীক্ষিতদের কলঙ্কজনক স্বধর্মত্যাগ তাহাদের আতঙ্ক বাড়াইয়া তুলিল। হিন্দু কলেজের শিক্ষাদানের বিরুদ্ধে নগরে জনমত উঠিল। বহুকাল যাবত্ অনাহত প্রাচীন ব্যবস্থার সমর্থকদের ঘৃণাপূর্ণ আর্তনাদ ও কলঙ্করটনায় বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল। ভয়াবহ পরিণতিতে পণ্ডিতেরা বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে, এই আশঙ্কায় পিতারা পুত্রদের কলেজ হইতে সরাইয়া লইলেন। কলেজের শঙ্কিত কর্তৃপক্ষ বিক্ষোভ উপশম করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রথমত ছাত্রদের বিশ্বাসকে শিথিল করিতে পারে এমন ধর্মালোচনা নিষিদ্ধ হইল ; কিন্তু দমননীতি বিরোধিতাকে উত্তেজিত করে, এবঙ নবোত্থিত বিশ্বাস বৃহত্তর ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িল।

বিভ্রান্ত পরিচালকেরা তখন 'ভোজের দলের পান্ডা' ডিরোজিওকে বিতাড়িত করিবার আদেশ প্রচার করিলেন। আটলান্টিকের সমুদ্রতরঙ্গগুলির গতি প্রতিহত করিতে শ্রীমতী ম্যালাপ্রপের পাখার বাতাস যেমন বিফল হইয়াছিল, তেমন তাঁহাদের আদেশও নিষ্ফল হইবে, ইহা তাঁহারা পূর্বাহ্নে অনুমান করিতে পারেন নাই। নবজাত দৈত্যের বিরাট কলেবর পূর্বনির্ধারিত ছিল।

নিঃসহায় ডিরোজিওকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া বরখাস্ত করা হইল। হিন্দু কলেজের ইতিহাসে তাঁহার শিক্ষকতার কাল সর্বাধিক আলোকোজ্জ্বল হইয়াছিল, ইহা বিবেচিত হয় নাই। ইহাও বিবেচনা করা হয় নাই, যে তিনি নহেন, ইঙরাজি ভূগোল বালকদের ক্ষীর ও দুগ্ধসমুদ্রের ধারণাকে ঘৃণাসহকারে প্রত্যাখ্যান করিতে শিখাইয়াছে, ইঙরাজি জ্যোতির্বিদ্যা তাহাদের শিখাইয়াছে যে গ্রহগুলি দেবতা নহে জড়বস্তু ; ইঙরাজি ইতিহাস তাহাকে তেজ দিয়াছে, এবঙ ইঙরাজি আইন তাহাকে সাম্যের প্রত্যয় অধিগত করাইয়াছে। এই শিক্ষাগুলি নিজেরাই বিপ্লবের বীজ বহন করিয়াছে এবঙ পূর্বতন ধারণা ধ্বঙস করিয়াছে। কিন্তু অত্যন্ত অন্যায়ভাবে তাঁহার উপর দোষের দায়িত্ব আরোপিত হইল। ডাক্তার উইলসনের নিকট লিখিত [এই প্রবন্ধের শেষে মুদ্রিত] পত্রে, তিনি ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধের সহিত তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি প্রতিহত করিয়াছিলেন, এবঙ মিথ্যাপবাদের ঝড় ধীরভাবে সহ্য করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে তাঁহার গুণাবলীর মূল্য স্বীকার করা হইয়াছে। কলঙ্কচিহ্ন অতিক্রম করিয়া তাঁহার স্মৃতি হৃদয়ে সযত্নে লালিত হয়—কারণ এথেনীয় যুবকদের নিকট সক্রেটিস যেমন তত্ত্ববিদ্যা লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি বাঙ্গালি যুবকদের মনে তেমনিভাবে আলোকবর্তিকা পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন।

ডিরোজিও ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে কলেজ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সর্বাধিক অগ্রসর শিষ্যেরা তাঁহার পরে একে একে কলেজ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহাদের কার্যকলাপ যে আতঙ্কের সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা ক্রমশ অপসারিত হইল। ঘটনাপ্রবাহ সুবিন্যস্ত হইল এবঙ পূর্বের নিজস্ব সুর ফিরিয়া পাইল। একটি আকস্মিক ঘটনার আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠানটির কেবল পূর্বের ক্ষতির সঙস্কার হইল না, ইহার ভবিষ্যত্ প্রত্যাশা বাড়িয়া গেল। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টারে ভারতীয়দের অনেক সুবিধা দেওয়া হইল। কোম্পানির সরকারে যে-কোন চাকুরি করিবার অধিকার ও সুযোগ তাহারা লাভ করিল। কলেজের সর্বাপেক্ষা মেধাবী ছাত্রগণ পুরস্কারের সুযোগ পাইল। চন্দ্রশেখর দেব, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, গোবিন্দচন্দ্র বসাক এবঙ শিবচন্দ্র দেব ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত হইলেন। হরচন্দ্র ঘোষ মুন্সেফ হইলেন। বিদ্যা বেতনের সুযোগ দেয়, ইহা দেখিবামাত্র ইঙরাজি শিক্ষার বিরুদ্ধে সমস্ত প্রতিকূলতা দূর হইল ; বাঙ্গালি অভিভাবকেরা ব্যগ্রভাবে তাঁহাদের সন্তানদিগকে পাঠাইতে লাগিলেন, এবঙ হিন্দু কলেজ ক্ষিপ্রগতিতে এই দেশের সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল।

ইহার পর আর একটি স্মরণীয় পরিবেশ আমাদের শিক্ষার ইতিহাসে স্থায়ী প্রভাব

বিস্তার করিল। যদিও ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করা ছিল কলেজের ঘোষিত উদ্দেশ্য, কিন্তু অনেক কর্মচারী বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় ইহাকে ঘোষিত উদ্দেশ্য হইতে বিযুক্ত করিবার প্রয়াস করিলেন। সংস্কৃত কলেজ ও মুসলমান মাদ্রাসাকে উত্‌সাহিত করিবার প্রাচীন ধারনায় তাঁহারা অবিচল রহিলেন। অপরপক্ষে, হিন্দু কলেজের পরীক্ষার ফলাফল প্রত্যাশাকে যেরূপ অবহেলায় অতিক্রম করিয়াছিল, তাহা দেখিয়া অনেকে এরূপ ধারনা পোষণ করিতে থাকিলেন, যে ইঙরাজি শিক্ষার মাধ্যমে ভারতের পুনর্জন্ম হইবে। দুই দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া অবশেষে তাহা সুনির্দিষ্ট সঙ্গ্রামের রূপ পরিগ্রহ করিল—একটি শিক্ষাজাগতিক ওয়াটার্লু। প্রাচ্যদেশীয় শিক্ষার পক্ষে দাঁড়াইলেন থবি প্রিন্সেপ ও ডাক্তার টাইটলার, এবঙ ইঙরাজি শিক্ষার পক্ষে মেকলে ও ট্রাভেলিয়ান। প্রথমোক্ত দলের অস্ত্র ছিল অক্ষম বিদ্রূপ, অন্যেরা প্রচুর পরিমাণে যুক্তি ও তথ্যের বিন্যাস করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সরকার নিরপেক্ষ বিচারক রহিলেন। সঙ্কীর্ণমনা ও স্বার্থপ্রণোদিত প্রাচ্যপন্থীরা ছত্রভঙ্গ হইলেন। ইঙরাজি শিক্ষার পক্ষে প্রগতিশীল উদারপন্থীদের সেনাপতিত্ব যুদ্ধ জয় করিল ; এবঙ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ইউরোপীয় শিক্ষার আদেশ জারি করিলে এই বহুবিতর্কিত বিষয়টির আলোচনার অবসান হইল। এই সিদ্ধান্তের ফলে হিন্দু কলেজ যে গুরুত্ব লাভ করিল এবঙ জনসাধারণের বিচারে তাহা যেরূপ দ্রুতগতিতে উন্নততর শ্রদ্ধার আসন লাভ করিল তাহা নিঃসন্দেহে দৃষ্টি-আকর্ষক।

৩

ইতিকথার সমাপ্তি হইয়াছে। আমি এখন আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে আলোচনা করিব। ইহা আমার আত্মকথার একটি অধ্যায়ে পরিণত হইলে আশাকরি কেহ আমাকে ভুল বুঝিবেন না। এই বর্ণনায় 'আমি'র ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী।

১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে যখন আমি প্রথম হিন্দু কলেজে গিয়াছিলাম, তখন আমার বয়স সাড়ে নয় বত্‌সর। কলেজে নিয়ম ছিল যে 'আট বত্‌সরের কম বয়স্ক বালকদিগকে ইঙরাজি শিক্ষা দেওয়া হইবে না।'

যখন আমি গিয়াছিলাম তখন আমার ক্ষুদ্রভান্ডারে কেবল এ, বি, সি এবঙ *bla* ব্লে *cla* ক্লে ছিল না, তাহার সঙ্গে latitudinarian and valetudinarian ও Nebuchadnezzar পর্যন্ত বানান, এবঙ অন্যের সাহায্য ছাড়া ব্যঞ্জন ও স্বরের সম্মিলন পড়িবার ক্ষমতা ছিল।

'কলেজের পরিচালকবর্গের উপর ছাত্র ভর্তির ব্যবস্থা অর্পিত ছিল', এবঙ তাঁহারা সঙস্কৃত কলেজের উপরের হলে পূর্বনির্দিষ্ট সাক্ষাত্‌কার দিবসে বসিতেন। আমি চৌকাঠে দাঁড়াইয়া হলের ভিতরে দৃষ্টিপাত করিলাম। সেখানে পূর্বদিকের দেওয়ালে ডা. এইচ এইচ উইলসনের চিত্র আমার বাল্যদৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি কে ছিলেন তাহা তখন জানিতাম না। সেই বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদের উভয় পার্শ্বে প্রায় ছাদ অবধি উচ্চ সঙস্কৃত পুথির পান্ডুলিপি তাকে সজ্জিত ছিল। হলের পশ্চিমে দুই কোণে দুইটি বড়

গ্লোব ছিল—একটি ভূ-গোলক, একটি খ-গোলক। পশ্চিম দেওয়ালে হেয়ারের প্রতিকৃতি তখন উইলসনের মুখোমুখি ছিল না—তাহা পরে আসিয়াছিল।

পরিচালকেরা হলের মাঝখানে বসিয়াছিলেন। তাঁহারা কত জন ছিলেন, আমি মনে করতে পারি না। কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে আছে চন্দ্রকুমার ঠাকুর টেবিলের সম্মুখে বসিয়াছিলেন। ট্রাউজারের জন্য তাঁহাকে আধা-শাহেব এবঙ শাদা পাগড়ির জন্য আধা-—বাবু বলিয়া আমার মনে হইল। তখন ছিল শাদা পাগড়ির যুগ—অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে রামমোহন রায় শামলার প্রবর্তন এবঙ দ্বারকানাথ ঠাকুর তাহা ব্যবহার করেন।

তখন দেশি পরিচালকদের মধ্যে ছিলেন চন্দ্রকুমার ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, এবঙ রসময় দত্ত। চন্দ্রকুমার ঠাকুর ছিলেন অধ্যক্ষ। এইটি ছিল উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পদ, যাহা তিনি তাঁহার পিতা গোপীমোহন ঠাকুরের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। গোপীমোহন ও মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর প্রত্যেকে কলেজে ১০,০০০্ টাকা দান করিয়া তাহার প্রথম পরিচালক হইয়াছিলেন।

পরিচালকদের সম্মুখে আমার যাইবার পালা আসিল। তাঁহারা আমাকে আমার 'নাম, বয়স, পিতৃপরিচয় এবঙ বাসস্থান' সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন, এবঙ কলেজে আমাকে ভর্তি করিয়া লইলেন।

পরদিবস হইতে আমি কলেজে উপস্থিত হইতে লাগিলাম—তখন তাহার সময় ছিল গ্রীষ্মকালে সকাল দশটা হইতে বিকাল পাঁচটা, এবঙ শীতের ক্ষুদ্র দিবসগুলিতে সকাল দশটা হইতে বিকাল চারিটা পর্যন্ত। সঙস্কৃত কলেজের দুইদিকে দ্বিতলের দুইটি প্রকোষ্ঠে ইঙরাজি কলেজ বসিত। তাহার দুইটি বিভাগ ছিল—জুনিয়ার ও সিনিয়ার। পূর্বদিকের গৃহে জুনিয়ার বিভাগে পাঁচটি শ্রেণীর মধ্যে ছিল 'বালির ক্লাস' যেখানে বালকেরা প্রাচীন হিন্দু পদ্ধতি অনুসারে বালির উপরে লিখিত। মালাবারের একটি দেশি বিদ্যালয়ে এই পদ্ধতি দেখিয়া ডাক্তার বেল নামে এক ভদ্রলোক তাহা মাদ্রাজের মিলিটারি অর্ফান স্কুলে প্রবর্তন করেন এবঙ সেখান হইতে ইহার আমদানি হইয়াছিল। প্রতিটি ক্লাসে গড়ে ত্রিশ জন বালক ছিল। তাহা ছাড়া মৌলবির অধীনে একটি ছোট পারশি ক্লাস ছিল। পণ্ডিতেরা এক ঘণ্টা বাঙলা পড়াইতেন। তাঁহাদের শিক্ষাদানের প্রতি কেহ মনোযোগ করিত না—বালকেরা ইঙরাজিকে বিজলি বাতি ও বাঙলাকে নারিকেল তৈলের প্রদীপ মনে করিত।

জুনিয়ার বিভাগের প্রধান শিক্ষক ছিলেন মি. মলিস নামে জনৈক পূর্বভারতীয়। সকাল দশটায় বিদ্যালয় খুলিলে আমাকে তাঁহার কাছে রেজিস্টারি বহিতে নাম তুলিবার জন্য যাইতে হইল। আমার বানান ও ব্যাকরণের জ্ঞান দেখিয়া তিনি আমাকে নবম শ্রেণীতে মি. ড্যাভেনপোর্ট নামক ইউরেশিয়ানের ছাত্র করিয়া লইলেন। তিনি কমিটি অব্ পাব্লিক্ ইনস্ট্রাকশনের অনুমতিতে স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত উইলসন সিরিজের চতুর্থ রিডার ও মারে-র সঙক্ষিপ্ত ব্যাকরণ পড়াইতেন। হিন্দু কলেজের ছেলেরা বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক এবঙ কাগজ, কলম, শ্লেট ও পেন্সিল পাইত। তখন শিক্ষা কত সুলভ ছিল—দুষ্প্রাপ্যতার সময় সুলভ এবঙ প্রাচুর্যে মহার্ঘ—যদিও মান প্রায় সমান।

এক বা দুই মাস যাইতে না যাইতে তখন কলেজে ঠাকুর অধ্যক্ষতা ও শাসনতন্ত্রের অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম। সেই পরিবারের একজন, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ক্লাসে আমার সহপাঠী ছিল। তাহার সহিত কথা কহিতে কহিতে আমি অসতর্কভাবে 'পিরালী' শব্দের ব্যবহার করিয়াছিলাম। ইহাতে যে ত্রুটির কথা আছে তাহা আমি জানিতাম না, কিন্তু বিষয়টি আমার শিক্ষকের নিকট জানানো হইলে তিনি আমাকে হাত পাতিতে বলিলেন, এবঙ করতলে কঠিন বেত্রস্পর্শ অনুভব করিলাম। তখন আমি জানিতাম না, আমি পরেও 'পিরালী' সম্বন্ধে ইহার বেশি জানিতে পারি নাই, যে এই বিষয়ে আমার মাতুল রাজকিশোর সেন ও কালীকুমার ঠাকুরের মধ্যে লাঠিয়ালদের বড় যুদ্ধ হইয়াছিল, হোমার ও বাল্মীকির মহাকাব্যে যেমন যুদ্ধের কাহিনীর বর্ণনা আছে। আমার 'অপরাধের মাথামুন্ড' কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আমি প্রাপ্ত শাস্তিকে অন্যায় বলিয়া মনে করিলাম, এবঙ ইহা আমার মনকে ঠাকুরদের এত প্রতিকূল করিয়াছিল যে এখনো আমার মনে তাহার স্পর্শ আছে। 'পিরালী' শব্দটির সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিতে পারিবার পূর্বে এই বিষয়ে ঠাকুরদের স্পর্শকাতরতা বুঝিতে পারি নাই। ইহা অবশ্য তাহাদের দুর্বলতা। বর্তমানে 'পিরালী'র একের মধ্যে তিন মূর্তি—এক ব্যক্তির মধ্যে মন্দির, মসজিদ ও গির্জার মিশ্রিত খাদ্য। ব্রিটিশ শাসনে অর্থ ও জনপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত অন্য কোন জাতি নাই ; এবঙ বাঙালিরা জ্ঞানী হইলে তাহারা নিশ্চয় বিবেচনা করিবে, যে জগন্নাথের রাজের মত ব্রিটিশ রাজেও সাম্যের একটি স্থির স্তর আছে।

আমার অঙ্কের শ্রেণী ছিল এক ধাপ নিচে। আমি সহজে যোগ, বিয়োগ ও গুণ করিতে পারিতাম। ভাগ আমার পক্ষে কিছু কঠিন ছিল। কিন্তু ফার্দিঙ ও দশমিক আমার পক্ষে অনতিক্রম্য বাধা ছিল। আমার অঙ্কে নৈরাশ্যজনক মাথা লইয়া আমি কেবল লিখিবার শ্রম স্বীকার করিয়া কোনভাবে কাজ চালাইতাম

বার্ষিক পরীক্ষায় আমি ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত হইলাম। তারকনাথ নামে জনৈক বাঙালি ভদ্রলোক আমাদের ষষ্ঠ রিডার, ধাতুরূপ পর্যন্ত ব্যাকরণ, এবঙ ভৌগোলিক সঙজ্ঞা পড়াইতেন। পৃথিবী একটি গোলক এবঙ তাহা সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে—ইহা হিন্দুধর্মের প্রতি কামানের প্রথম গোলা। ইতিপূর্বে ডাক্তার উইলসন অবসর লইয়াছেন এবঙ জে সি সি সাদারল্যান্ড তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন। সঙস্কৃতে পন্ডিত সাদারল্যান্ড ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সঙস্কৃতের অধ্যাপক, তাঁহার খুড়া হেনরি টমাস কোলব্রুকের বিদ্যার উত্তরাধিকার পাইয়াছিলেন। বিদেশি ভাষাশিক্ষার্থী দেশি ছাত্রকে পরীক্ষা করিবার সময় সাদারল্যান্ড 'পার্জিঙ'-এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তিনি সেক্সপিয়ারের উইন্টার্স টেল-এর একটি বাক্যাঙশ আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পার্জ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় অক্ষত থাকিয়া আমি প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছিলাম। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সরকারি ভবনে এই পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। আমি লাটসাহেব ও তাঁহার বাসের জন্য বিরাট প্রাসাদ এই প্রথম দেখিলাম।

১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে আমি সপ্তম শ্রেণীতে পড়িতাম। ভারতবর্ষে এই ধরনের প্রথম প্রতিষ্ঠান বলিয়া সেই যুগে অনেকে হিন্দু কলেজ ও তাহাতে নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিদর্শন করিতে আসিতেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে, এই বত্সর মোহনলাল কলেজ দেখিতে আসিয়াছিলেন। এই দীর্ঘকায়, শ্বেতবর্ণ যুবকের মসলিন-নির্মিত উঁচু পাগড়ি আমার নিকট অভিনব বলিয়া মনে হইয়াছিল। দিল্লী কলেজের প্রাক্তন ছাত্র মোহনলাল স্যার আলেকজান্ডার বার্নেসের মুন্সী হইয়া কাবুলে যান এবঙ পরে ইঙলন্ডে যান ও সেখানে জনৈক আইরিশ মহিলাকে বিবাহ করেন।

পরের বত্সর আমি মি. মরিসের ক্লাসে পড়ি। তিনি আমাদের কবিতা ও ইতিহাস, গে-র নীতিকাহিনী, এবঙ ডাক্তার উইলসন সঙ্কলিত পৃথিবীর ইতিহাস পড়াইতেন। তিনি শেষোক্ত বিষয়টি এত ভালভাবে আমাদের পড়াইয়াছিলেন যে ঐ সামান্য বিদ্যা আমার নিকট কঠিন ভিত্তি নির্মাণ করিয়াছিল, যাহার উপর ভবিষ্যতে রোলিন, হিউম, রবার্টসন ও অন্যান্য লেখকের রচনা হইতে সৌধ নির্মাণ করিতে পারিয়াছিলাম।

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের প্রথমে কলিকাতায় দেশি জনসাধারণ আসন্ন বিদায়ী বড়লাট বেন্টিঙ্ককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে হিন্দু কলেজে সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারা 'জানাইয়াছিলেন যে মহামান্য বড়লাট তাঁহাদের জন্য সমস্ত সদয় কর্ম করিয়াছেন, এবঙ তাঁহার একমাত্র নিষ্ঠুর কর্ম তাহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ।' আমার মনে হয় এই ধন্যবাদ-জ্ঞাপক প্রস্তাবটি রসিককৃষ্ণ মল্লিক পাঠ করিয়াছিলেন।

জুনিয়ার বিভাগকে বিদায় জানাইবার পূর্বে বলা দরকার, যে এই বিভাগের বালকদের মধ্যে ক্রিকেট, ট্রাপ-বল, মার্বেল এবঙ বাঙ্গালি কপাটি ও গুলি-ডান্ডা প্রিয় খেলা ও প্রমোদ ছিল। মুক্ত প্রাঙ্গণে এই খেলা তাহাদের শারীরিক ও মানসিক পুষ্টি সরবরাহ করিত।

পরবর্তী দৃশ্য-পরিবর্তন হইল হেডমাস্টার জেমস্ মিড্ল্টনের সিনিয়ার বিভাগে। মি. মিড্ল্টন্কে আমার ভাল মনে আছে। তিনি আমার বর্ণমালা-শিক্ষক মি. ম্যাকে-র পরিচিত ছিলেন এবঙ মাঝে মাঝে যখন মাতাল হইয়া প্রায় ছন্নছাড়ার মত তাঁহার কাছে আসিতেন, আমি ভীত হইতাম।

তাঁহার স্বদেশীয় একজন স্কটল্যান্ডবাসী হইতে অন্য একজনের প্রতি, তিনি মি. সাদারল্যান্ডের আদেশের জন্য উন্মুখ হইয়া থাকিতেন, এবঙ হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিয়া ভাগ্য ফিরাইলেন। মিড্ল্টন্ অন্তঃসারশূন্য মানুষ ছিলেন, কিন্তু গুণের সমাদর করিতে পারিতেন। উত্তর প্রদেশের কোনো স্থানে প্রাচীন হিন্দুর পরিজ্ঞাত কোনো বস্তু আবিষ্কৃত হইয়া কলিকাতার এশিয়াটিক মিউজিয়ামে স্থান পাইল। মিডলটন ইহার সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না, কিন্তু তিনি ইহার একটি বিবরণ দিতে চেষ্টা করিলেন। ফলে তিনি একজন পুরাতত্ত্ববিদ ও পন্ডিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার শেষ পুরস্কার, তাঁহার টুপির শেষ পালক, আগ্রা কলেজের অধ্যক্ষতা। এইখানে তাঁহার সহিত আমার পরিচয়ের অবসান হইল। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে এই ঘটনা ঘটিল, তাহার পর মি. কার প্রধান শিক্ষক

হইয়া আসিলেন।

তাঁহার ভারতবর্ষ ত্যাগের কয়েকদিন পূর্বে, ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক তাঁহার বিখ্যাত য়ুরোপীয় শিক্ষার সপক্ষতা করিলেন। সেই প্রস্তাব গ্রহণ করিবার পক্ষে মহামান্য বড়লাটের সম্মুখে ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮২৪ তারিখে লেখা কোর্ট অব ডিরেক্টারের ডেসপ্যাচের অনুমতি ছিল। তাঁহাদের চাকুরিরত ঐতিহাসিক জেমস্ মিল রচিত এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছিল, যে 'প্রাচ্য পুস্তকাদিতে বিজ্ঞান যে অবস্থায় পাওয়া যায় কর্মচারী নিয়োগ করিয়া তাহা পড়ানো অযথা কালহরণ অপেক্ষাও খারাপ। আমাদের মহত্ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত হিন্দু জ্ঞান নয়, প্রকৃত জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া।' মেকলের মতামতও যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করিত। তিনি তখন জনশিক্ষা কমিটির প্রধান ছিলেন, এবঙ খুব সম্ভবত প্রস্তাবটি পরীক্ষার জন্য ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসনকে অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। ফলাফল জানিতে উত্সাহী হইয়া ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে তিনি বালকদের ইঙরাজি ও রচনা পরীক্ষার ভার স্বয়ঙ গ্রহণ করিলেন। তাহার পরে ষাট বত্সর চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু মনের রেটিনা তাহাতে প্রতিফলিত চিত্রগুলি কতকাল ধরিয়া রাখে। মেকলের অবয়ব আমার মানসপটে এখনো অঙ্কিত আছে। তিনি হাতে কয়েকটি পুস্তক লইয়া পশ্চিমের বারান্দা দিয়া ধীরগতিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন আমি সিঁড়ির ঘরের চৌকাঠে দাঁড়াইয়াছিলাম। তিনি যখন আমার পাশ দিয়া উপরের তলার ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন, তখন আমি সহজাত বৃত্তিতে সরিয়া দাঁড়াইলাম। উপকারীর মধ্যে কৃত্সাকারীকে বিস্মৃত হইয়া আমি এখন তাঁহার দর্শনলাভকে আমার জীবনের একটি যুগ বলিয়া মনে করি।

মেকলের পরীক্ষাপদ্ধতির বর্ণনায় জনশ্রুতি ও আত্মস্মৃতি হইতে ডি. এল. আর. সম্বন্ধে অনুস্মৃতিতে কয়েকটি বিষয়ে ত্রুটি রহিয়াছে। আমি এখন জনশিক্ষা সঙ্ক্রান্ত সাধারণ কমিটির ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

'আমি তাহাদের পরীক্ষার জন্য সুইফ্টের রচনা হইতে একটি সহজ রচনাঙশ, এবঙ অলিভার ক্রমওয়েল সম্বন্ধে কৌয়েলের অনেক কঠিন ও কৃত্রিম কথোপকথনমূলক রচনাঙশ লইলাম ; সেক্সপিয়ারের কিঙ জন নামক যে গ্রন্থ তাহারা পড়ে নাই তাহা হইতেও একটি অঙশ তাহাদের দিলাম।

'তাহাদের পরীক্ষার শেষে আমি শ্রেষ্ঠ দুই-তিন জন ছাত্রকে ডাকিয়া তাহাদের মেকলের প্রবন্ধাবলী হইতে যথেষ্ট কঠিন রচনাঙশ দিলাম। সকলেই সহজে পাঠ করিল, এবঙ অধিকাঙশই অর্থবোধ ও বুদ্ধিমত্তার সহিত। যে লেখকদের রচনা হইতে তাহাদের পরীক্ষা করিয়াছিলাম তাঁহাদের, এবঙ তাঁহাদের লিখিত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলাম। তাহাদের অবহিতি দেখিলে আমি পরীক্ষা দীর্ঘায়ত করিয়া সাহিত্য ও ইতিহাসে তাহাদের জ্ঞানের তলদেশ দেখিতে চেষ্টা করিলাম।

'তাহাদের প্রবন্ধ রচনার জন্য আমি বিষয়-নির্দেশ করিলাম কবিতাচর্চা ও ইতিহাসচর্চার তুলনামূলক গুরুত্ব।'

বিশপস্ কলেজের অধ্যক্ষ রেভারেন্ড মিল অঙ্কের এবঙ মি. রস ডোনেলি ম্যাঙ্গোলস্ ইতিহাসের পরীক্ষক ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পরীক্ষক ছিলেন মি. সেক্সপিয়ার, এবঙ তৃতীয় শ্রেণীতে মি. (পরে স্যর্) চার্লস ট্রাভেলিয়ান। টাঁকশালের ধাতুপরীক্ষক মি. কারনিন প্রথম তিনটি শ্রেণীতে প্রকৃতিবিজ্ঞানের পরীক্ষক ছিলেন। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর পরীক্ষা লইয়াছিলেন ক্যাপ্টেন বার্চ। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে আমি পঞ্চম শ্রেণীতে ছিলাম। সাহিত্যে আমাদের পাঠ্যপুস্তক ছিল চার নম্বর পোয়েটিকাল রিডার এবঙ প্রোজ রিডার,-- দুইটি অপেক্ষাকৃত কঠিন লেখকের রচনাসঙ্কলন। ক্যাপ্টেন বার্চ বলিয়াছেন, 'সত্যের অনুরোধে আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে পঞ্চম শ্রেণীতে পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত অঙশগুলি কঠিন ছিল; এবঙ আমার প্রশ্নগুলি উদ্দেশ্যমূলকভাবে এমন ছিল যে বালকদের ক্ষমতার উপর চাপ পড়ে এবঙ তাহাদের কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগাইতে হয়।' গদ্য এবঙ ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার প্রশ্নগুলি আমার স্মৃতি হইতে অপসৃত হইয়াছে। কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে আছে, যে কুপারের রচনা হইতে নিম্নোক্ত অঙশ সম্বন্ধে তিনি আমাদের পরীক্ষা করিয়াছিলেন :--

'Tis pleasant through the loopholes of retreat
To keep at such a world : to see the stir
Of the great Babel, and not feel the crowd :
To hear the roar she sends through all her gates
At a safe distance, where the dying sound
Falls a soft murmur on th' uninjured ear.

Babel সম্বন্ধে তাঁহার প্রশ্ন এবঙ 'ভাষার বিশৃঙ্খলা' শব্দগুচ্ছে সমাপ্ত আমার বর্ণনায় তাঁহার সন্তুষ্টি আমার বিশেষভাবে মনে আছে। তিনি ইহার জন্য আমাকে পুরস্কার দিয়াছিলেন এবঙ লিখিয়াছিলেন--'সমস্ত পরীক্ষার ফলে নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও জয়গোপাল সেন দুই জন শ্রেষ্ঠ ছাত্র এবঙ প্রায় সমান স্থানাধিকারী হইল।** শেষে পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত চারি জনের তালিকায় পরবর্তী দুইজন বালক ছিল। ভোলানাথ অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র, এবঙ শশিচন্দ্র দত্ত গুণে উত্কৃষ্টতর হইবার প্রতিশ্রুতি দিতেছে।'

জুনিয়ার বিভাগে একই শিক্ষক ক্লাসে সমস্ত বিষয় পড়াইতেন। সিনিয়ার বিভাগে শ্রমবিভাগ ছিল ; একজন সাহিত্য, অন্যজন ইতিহাস ও ভূগোল, এবঙ তৃতীয় ব্যক্তি জ্যামিতি ও বীজগণিত পড়াইতেন। নীচের তিনটি শ্রেণীতে গৃহশিক্ষকতার ধরনে পড়ানো হইত--প্রতিটি বালককে দাঁড়াইয়া সেইদিনের পাঠ্যবস্তু হইতে একটি রচনাঙশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে হইত। ইহা ছাড়া শ্রমের উদ্দীপক হিসাবে স্থানপরিবর্তন ছিল। জ্যামিতির ক্লাসে প্রতিটি ছাত্রকে বোর্ডে গিয়া তাহার প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিতে হইত।

সিনিয়ার বিভাগের ছাত্রদের অতিরিক্ত বই পড়িবার জন্য অবসরকাল ছিল। পঞ্চম শ্রেণীতে আমার অতিরিক্ত বই ছিল বায়রন। আমি এইভাবে ইহাতে ব্রতী হইয়াছিলাম। রিচার্ডসনের মৃত্যুতে মূলার সপ্তম শ্রেণী হইতে আসিয়া আমাদের সাহিত্য পড়াইতেন। তিনি ডাক্তার উইলসনের ভাগিনেয়, এবঙ ইঙরাজি কাব্যে পারদর্শী ছিলেন। একদিন

অবসরকালে তিনি বায়রনের 'কর্সের'-এর সূচনা তাঁহার পাঠ শুনিবার জন্য আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি আমাকে ইহার অর্থ ব্যাখ্যা করিলেন, এবঙ এই পঙক্তিগুলির ভাবপ্রকাশের সৌন্দর্যের প্রতি আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিলেন--

Gaze where some distant sail a speck supplies
With all thirsting eye of enterprise.

'যে চিন্তাসমূহ নিঃশ্বাসের সহিত প্রবাহিত হইয়াছে, এবঙ যে শব্দগুলি আলোক বিকীর্ণ করিয়াছে' তাহাতে উল্লসিত হইয়া আমি পরদিবস বায়রনের এক খন্ড রচনাবলী ক্রয় করিলাম এবঙ দিনের পর দিন মি. মূলারের সঙ্গে তাঁহার 'কর্সের', 'ব্রাইড অব অ্যাবাইডস' প্রভৃতি পড়িতে থকিলাম, পাটনায় সরকারি কর্মে নিযুক্ত হইবার পূর্বে তিনি যতদিন আমাদের কলেজে ছিলেন ততদিন পর্যন্ত। এই সময় হইতে কেবল সেক্সপিয়ারের পরেই বায়রন আমার প্রিয়তম--একজন অন্তঃপ্রকৃতির, অন্যজন বহিঃপ্রকৃতির মহত্ কবি।

ভাষাতত্ত্বে অনুরাগী মি. হ্যালফোর্ড চতুর্থ শ্রেণীতে ব্যাকরণ অনুসারে ভাষা শিখাইতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি প্রথমে মিরাট কলেজে ছিলেন। তিনি একদিন আমাদের বলিয়াছিলেন, যে সেখানে তিনি তাঁহার ছাত্রদের ল্যাপল্যান্ডের 'মধ্যরাতের সূর্য' বিশ্বাস করাইতে পারেন নাই, যেখানে সূর্য বত্সরে ছয় মাস অস্ত যায় না। মুসলমান ছাত্রেরা বলিল, 'বাজে কথা! সূর্য যদি দিগন্তে অস্ত না যায়, তাহা হইলে তাহারা কিভাবে অর্ধেক বত্সর উপবাস করিয়া 'রমজান' পালন করিবে?' মি. হ্যালফোর্ড হতাশ হইয়া ভূগোল পড়ানো ছাড়িয়া দিলেন। পরবর্তীকালে কলিকাতা মাদ্রাসার মি. ন্যাসো লিজ আমার 'কোন হিন্দুর দেশভ্রমণ' রচনায় উল্লিখিত এই গল্পটিকে মুসলমানদের বুদ্ধি সম্বন্ধে কুত্সা বলিয়া আলোচনা করিয়াছেন। 'ইঙলিশম্যান' সঙবাদপত্রের অফিসে এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাত্কার হয়। অল্পকাল পরে তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় 'টাইমস' সঙবাদপত্র তাঁহাকে মুসলমান-প্রেমিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিল।

হ্যালফোর্ড চলিয়া গেলে তাঁহার স্থলে ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিস পামার আসিলেন। তাঁহার যুগে কলিকাতার ব্যবসায়ীদের শ্রেষ্ঠ জন পামারের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন ক্যাপ্টেন পামার। জন পামার এন্ড কোম্পানি প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে হায়দ্রাবাদের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান পামার ও রাম্সবোল্ডের যোগাযোগ ছিল। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটি নিজামের বিরুদ্ধে বহু টাকার দেনার দাবি করিয়াছিল। চার্লস মেটকাফ এই দেনাপাওনার মিথ্যা কাহিনী প্রকাশ করিয়া দুইটি প্রতিষ্ঠানের ধ্বঙস ডাকিয়া আনিলেন। স্যার রিচার্ড টেম্পল বলিয়াছেন, 'হায়দ্রাবাদের মি. পামার সম্ভ্রান্তবঙশীয় পূর্বভারতীয় ছিলেন।' ক্যাপ্টেন পামারের বর্ণ ছিল পূর্বভারতীয়ের। যাহা হউক, অ্যাডিসকম্ব কলেজের ছাত্রশ্রেণী হইতে তাঁহাকে বহিষ্কার করা হয়। তাঁহাকে 'কামানের মুখে' স্থাপন করা হইয়াছিল এবঙ তাঁহার বাহুতে একটি গভীর ক্ষতচিহ্ন ছিল। পেনশন [বিদায়ভাতা] লইয়া অবসর গ্রহণ করিবার পরে

প্রয়োজনে তিনি শিক্ষকতার বৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ক্যাপ্টেন পামার আমাদিগকে কুপারের 'টাস্ক' পড়াইতেন। কলেজে যোগ দিবার অল্পকাল পরে তিনি 'দি ডেলি নিউজ' নামে সংবাদপত্র বাহির করিলেন। মনে হয় রণদেবতার দুই পুত্র পরস্পরকে প্রীতির চক্ষে সন্দর্শন করিত না। একবার সম্পাদক ক্যাপ্টেন পামার ব্যাকরণের কয়েকটি নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। তত্ক্ষণাত্ সমালোচকরূপে ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন নিন্দাপ্রহার করিলেন। একটি দীর্ঘ অস্ত্রক্রীড়ার পরিণতিতে ক্যাপ্টেন পামার কোণঠাসা হইলেন। কিন্তু বালকদিগের বিচার তাঁহার পক্ষে গেল, কারণ তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে উভয়ের মধ্যে তিনি অধিক জ্ঞানী, তবে ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন যেটুকু জানিতেন, তাহা উত্তমরূপে জানিতেন।

৪

খ্যাতনামা ব্যক্তিরা আমাদের কলেজ পরিদর্শনে আসিলে তাঁহাকে এইরূপ সামান্য অবস্থায় দেখিবেন, এই স্পর্শকাতরতা হইতে ক্যাপ্টেন পামার তখন ক্লাস পরিত্যাগ করিতেন। কিন্তু একদিন বিকালে তিনি আশ্চর্য হইয়া দেখিলেন যে তাঁহার একজন পুরাতন ঘনিষ্ঠ বন্ধু যেন হঠাত্ মেঘ ফুঁড়িয়া আসিয়াছেন। তিনি বেগম সমরু-র শেষ উত্তরাধিকারী মি. ডাইস সম্বর। তাঁহার দীর্ঘ ও সুগঠিত অবয়ব, প্রকৃত ইউরেশীয়ের তুলনায় কৃষ্ণতর বর্ণ এবং বৃহত্ পরিণত চক্ষু আমার মনশ্চক্ষে এখনও ভাসিতেছে। পকেটে ৬০ লক্ষ টাকা লইয়া পত্নীর অন্বেষণে মিরাট হইতে ইংলন্ড যাইবার পথে তিনি তাঁহার প্রাক্তন ক্যাপ্টেন বন্ধুর নিকট বিদায় লইতে আমাদের কলেজে আসিয়াছিলেন। তিনি একজন মহিলাকে পাইয়াছিলেন। কিন্তু শোনা যায় যে তিনি উন্মাদাগারে কাঁদিতেন; মহিলাটি পাঁচ লক্ষ নিজের পকেটে চালান করিয়া 'ভ্রান্তিবিলাসে'র অভিনয় করিয়াছিলেন।

আমার কলেজ পরিত্যাগ করিবার প্রায় পনের বত্সর পরে একদিন ক্যাপ্টেন পামার নিচে নামিবার সময় মেসার্স বিশ্বনাথ ল এন্ড কোম্পানির আসবাবের দোকানে আমাকে চিনিতে পারিলেন এবং পরে একদিন সকালে আমাদের গৃহে আমার সহিত সাক্ষাত্ করিলেন। তাঁহার অত্যন্ত দুর্দশা চলিতেছিল, এবং তখন প্রাক্তন ছাত্র ব্যতীত আর কাহার সহিত তাঁহার সাক্ষাতের সুবিধা ছিল? ইহাই ছিল আমার শেষ সাক্ষাত্কার।

'সেই নির্জনবাসী আহত মৃগের মত
যে বক্ষে তীরবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করছে,
সে শায়িত, অ-দৃষ্ট আলোর কাছে সংগুপ্ত থেকে
ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরিয়ে মৃত্যুবরণ করল।'

প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আমি তৃতীয় শ্রেণী অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রবেশ করিলাম এবং রিচার্ডসনের ছাত্র হইলাম। তখন ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দ। আমাদের বালসুলভ দৃষ্টিতে গ্রন্থকার বলিয়া রিচার্ডসন প্রভূত মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার নিকট পড়িতে পাইলে আমরা গর্ববোধ করিতাম। তাঁহার পড়ানো অর্ধপেশাদারী ছিল।

তিনি ক্লাসের প্রতিটি ছেলেকে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করাইবার পদ্ধতি অনুসরণ করিতেন, তাহাদের স্থানগ্রহণের কথা বিবেচনা করিতেন না। তাঁহার শিক্ষাদানে অধ্যাপনার দিক ছিল তাঁহার বক্তৃতা। সাধারণত এইগুলি ছিল আমাদের ক্লাসের পাঠ্য লেখকদের গুণাগুণ সম্বন্ধে, এলিজাবেথীয় যুগ বা ফরাশি প্রভাবিত গোষ্ঠী সম্পর্কে, লেক-কবিদের বিষয়ে, অ্যাডিসন, সুইফ্‌ট ও জনসনের গদ্য সম্বন্ধে, প্রভৃতি। তাঁহার প্রথম শ্রেণীর কবিরা ছিলেন চসার, স্পেন্সার, সেক্সপিয়ার, এবঙ মিল্টন। তাঁহার সেক্সপিয়ারে প্রীতি ছিল দেবভক্তির মত। তাঁহার দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিদের পুরোভাগে ছিলেন ড্রাইডেন, কিন্তু বেশি মার্জিত ও সঙহত বলিয়া তিনি পোপের রচনা পড়াইতেন। ইঙরাজি কাব্যসাহিত্যে পোপের স্থান-নির্ণয় করিতে তিনি প্রায়ই বাওয়েলস্ ও বায়রনের বিতর্কের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন। মিল্টনের কথা তিনি বিশেষ বলিতেন না, এবঙ আমাদের কখনও পড়াইতেন না। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-প্রীতি ছিল তাঁহার বৈশিষ্ট্য। তাঁহার কয়েকটি সাহিত্যিক অনুশাসনের প্রতি আমি মনে মনে বিদ্রোহী ছিলাম, কারণ তাহারা আমার প্রিয় কবি বায়রনকে উপেক্ষা করিত। টেনিসন তখন সরস্বতীর কোলে দোলা খাইতেছে। লঙফেলোর মুকুল ধরিয়াছে, কিন্তু ব্রাউনিঙ ও অন্যান্যেরা তখনও ভ্রূণাবস্থায়।

অর্ধশতাব্দী পূর্বে জীবিত শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক, গদ্যলেখক ও সমালোচকদের প্রতি রিচার্ডসন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সাহিত্যরাজ্যে তখন মেকলে কেবল পুস্তক সমালোচনা করিতেন। অ্যালিসন, ফ্রুড এবঙ ফ্রিম্যান তখনও ইতিহাসের নক্ষত্রমন্ডলীর অন্তর্গত হন নাই। ডিকুইন্সি, ডিকেন্স, কার্লাইল, স্মাইলস ও কিঙসলে তখনও তাঁহাদের সম্মান লাভ করেন নাই। রিচার্ডসন যে সমালোচকদের রচনা হইতে উদ্ধৃতি দিতেন তাঁহারা ছিলেন কোলরিজ, ল্যাম্ব ও হ্যাজলিট। শেষোক্তজন তাঁহার প্রিয় ছিলেন, এবঙ নিজের গদ্যরচনায় তাঁহার অনুকরণ করিতেন।

যাহা সম্ভবত ডিরোজিও-ও পড়াইতে সাহস করিতেন না, বাঙ্গালি ছেলেরা রিচার্ডসনের নিকট প্রথম সেই নূতন বিষয় পড়িল। তিনি তাহাদের রাষ্ট্রনীতি পড়াইতেন --যে শিক্ষাদান বর্তমানে দণ্ডার্হ অপরাধ না নিন্দনীয় দুর্নীতি বলিয়া বিবেচ্য। প্রথম চার্লস্-এর হত্যা এবঙ দ্বিতীয় জেমস্-এর রাজ্যচুতি—এই দুইটি প্রধান ও কেন্দ্রীয় ঘটনা, যাহা ইঙরাজ জাতির রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব সমাপ্ত করিয়া সম্পূর্ণ পরিবর্তন আনিয়াছিল, তিনি মধ্যে মধ্যে তাহার আলোচনা করিয়া তাহার যাথার্থ্য বা অপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। এই বিষয়ে তত্‌কালীন লেখকদিগের রচনা হইতে যুক্তিসঙ্গ্রহ করিয়া তিনি আমাদের তৈয়ারি করিতেন, এবঙ হুইগ ও টোরিদের লিলিপুট পার্লামেন্টে তপ্ত আদালতি যুদ্ধের মজার কাহিনী শুনাইতেন। হুইগেরা মিল্টন ও মিস্ আইকেনের অস্ত্রে সুসজ্জিত হইতেন, এবঙ হিউম ও ক্লারেন্ডন দ্বারা টোরিরা অনুশীলিত হইতেন। হ্যালামের মত কিছু রাজনৈতিক সুবিধাবাদী ছিলেন যাঁহারা বিরোধ সমর্থন করিলেও হত্যা সমর্থন করিতেন না। রিচার্ডসন কোন পক্ষে ছিলেন আমার স্পষ্ট মনে নাই, কিন্তু তিনি তাঁহার চারিপার্শে রাজপক্ষ ও রাউন্ডহেডদের উপভোগ করিতেন।

এই শিক্ষা তাহার স্বাভাবিক ফল প্রসব করিয়াছিল। পিতা মনু শিখাইয়াছিলেন যে 'রক্ষক দেবতাদিগের অঙশ লইয়া রাজার সৃষ্টি হয়।' 'দেবতারা রাজাকে রক্ষা করেন' এই মত প্রথমে বিস্ফোরিত হইল। ইহার স্থলে প্রজাতান্ত্রিক মনোভাবসম্পন্ন ভাবাদর্শ স্থাপিত হইল। হিন্দু মন এই প্রথমবার রাজা ও প্রজার সম্পর্ক সম্বন্ধে মতামত গঠন করিতে লাগিল। এখন যে ভারতীয় বিরোধ এত প্রবল হইয়াছে, এই সময়ে তাহার সূত্রপাত হইল।

উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত নির্ভুল বিজ্ঞানের চর্চা করিতে লাগিল। কিন্তু শতকরা পাঁচ ভাগ বালক তাহা ঠিকভাবে চর্চা করিলেও অবশিষ্টেরা তাহাকে উপেক্ষা করিল। এই দুঃখজনক ঘটনা প্রতিবিধানের জন্য পরিচালকদের গোচরীভূত করা হইল। মনে করা হইল যে ইহা অঙশত বালকদের নিজেদের প্রবণতা এবঙ অঙশত তাহাদের পিতৃকুলের জন্য, যাঁহারা গাণিতিক বিদ্যার মূল্য বুঝিতে পারেন নাই। ইহার মধ্যে কিছু সত্য ছিল। কিন্তু ইহার প্রকৃত কারণ যে ক্ষমতার অভাব তাহা নির্ণীত হওয়া উচিত ছিল। সঙখ্যা এবঙ আকারের আঘাত অল্প মাথাই সহ্য করিতে পারে বলিয়া যে শিক্ষিতজন ও বৈজ্ঞানিকেরা পৃথিবীতে ভিড় করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে অঙ্কের স্থান ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। অধিকাঙশ ব্যক্তি কেবল নক্ষত্রগুলির সৌন্দর্য ও রহস্যের কথা চিন্তা করিয়াই সন্তুষ্ট হয়, কেবল অন্য কয়েকজন তাহাদের দূরত্ব ও বিশালতা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করে। অধিকাঙশ ক্ষেত্রে যে গাণিতিক ক্ষমতা ঘুমাইয়া আছে তাহাকে চর্চার সাহায্যে উদ্বোধিত করা যায়। কিন্তু কঠোর অনুশীলনের পরিণতি কখনও প্রাকৃতিক বিকাশের মাত্রা লাভ করিতে পারে না। ইঙল্যান্ডের কৃত্রিমভাবে উষ্ণীকৃত আনারস কখনও বাঙ্গালাদেশের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক আনারসের ন্যায় মিষ্ট হয় না। দক্ষতা শব্দটি বহুল-ব্যবহৃত অর্থহীন উক্তি, এবঙ অনেক সময় দক্ষতা অর্থ গঙ্গাকে তাহার নিজস্ব গতিপথ হইতে সরাইয়া সহস্রবিভক্ত খালে প্রবাহিত করানো। মানবসমাজ উচ্চতম শক্তির বিকাশের দিকে তাকাইয়া আছে, এবঙ সাধারণ মাত্রার বহুমুখী কর্মশক্তির বিবর্ধন অপেক্ষা এই দিকে শিক্ষাকে প্রবাহিত করা উচিত। ইউক্লিডের ভারে সেক্সপিয়ারের প্রতিভা ভাঙ্গিয়া পড়িত। যে বালকেরা তাহাদের গাণিতিক পাঠ অবহেলা করিয়াছিল, তাহাদের বিতাড়িত করিবার সিদ্ধান্ত হইতে পরিচালকবর্গ যে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, ইহা ভাল হইয়াছিল ; নতুবা তাঁহারা অনেক কবি, বাগ্মী, সম্পাদক ও রাজনীতিবিশারদকে অঙ্কুরেই বিনাশ করিতেন।

অঙ্কের ক্লাস লইতেন মি. ভি এল রিজ। তিনি সুইজারল্যান্ডের লোক, নেপোলিয়ানের সৈন্যবাহিনীতে ছিলেন। আলপ্‌স্ অতিক্রম করিয়া তিনি রামধনুর পূর্ণ বৃত্ত দেখিতে পান। মি. রিজ ফরাশি হইতে লাক্রোয়া-র বীজগণিতের অনুবাদ করেন। তিনি কলিকাতা মানমন্দিরের দায়িত্বে অনেক বত্‌সর অধিষ্ঠিত ছিলেন। আমাদের সময়ে শ্রেষ্ঠ গাণিতিক ছিলেন রাধামাধব দে। তাঁহার পরে ছিলেন যোগেশচন্দ্র ঘোষ ও আনন্দকৃষ্ণ বসু। যোগেশচন্দ্রের প্রাকৃতিক ক্ষমতা ছিল। আনন্দ পরিশ্রমের জোরে তাঁহার সহিত সমান তালে চলিতেন। তখনকার দিনের প্রথা অনুসারে ছেলেরা কলেজ ত্যাগ

করিয়া তাঁহাদের শিক্ষকদের নিকট হইতে প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করিত। আমি একটি প্রশংসাপত্রের জন্য মি. রিজের নিকট গেলাম। আমার মাথা অঙ্ক বিষয়ে বিখ্যাত উদাসীন জানিয়া তিনি হতবুদ্ধি হইলেন। কিন্তু ভদ্রতা অনুসারে প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া নীতিবোধ অনুসারে যাহা করিতে পারিতেন তাহা অবলম্বনে এই আশ্চর্য প্রশংসাপত্র লিখিলেন :—'ভোলানাথ চন্দ্র Plane Trigonomety ও Conic Sections পর্যন্ত পড়িয়াছে'—স্পার্টাবাসীদের মত বাংসংক্ষিপ্তির ফলে যাহার অর্থ রহস্যাবৃত রহিয়াছে।

আইনজীবী মি. জনসন আমাদের নিকট রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও আইন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন। আমাদের পরীক্ষার পূর্বে তাঁহার শেষ বক্তৃতাটির প্রধান বিষয় ছিল, আমরা কিরূপ মনোভাব লইয়া পরীক্ষা দিতে যাইব। 'ভয় পাইবে না, ভয় পাইবে না, এবং আমি আবার বলিতেছি, ভয় পাইবে না!' এই শব্দগুলি দিয়া তিনি বক্তব্যের উপসংহার করিলেন। কিন্তু আমরা সকলে এত বেশি ভয় পাইয়াছিলাম যে মি. জনসনকে আর আমাদের মুখদর্শন করিতে হয় নাই, আমাদের সকলের ফেল করিবার সঙ্গে আইনের ক্লাস বন্ধ হইয়া গেল। এখনও তাহার নিষ্ফল পরামর্শের কথা মনে হইলে আমি হাসিয়া উঠি।

পঞ্চম শ্রেণী হইতে রসায়ন সম্বন্ধে ডাক্তার ডব্লু বি. ও'শোনেসির পড়ানো ছিল আমাদের প্রিয়তম বক্তৃতামালা। আমার নিকট তাহা একটি সম্পূর্ণ নূতন ও বিস্ময়কর জগত্ উন্মোচিত করিয়াছিল। অতিরিক্ত প্রাচুর্যে শিলাখন্ডের যে বৃষ্টি হইয়াছিল তাহা হইতে আমি ছয় আউন্স পরিমাণ আম্লিক মিশ্রের খন্ড সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বায়ুমন্ডলে ক্লোরিন ও সোডিয়ামের উপস্থিতির ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া আমি ঐ খন্ড লইয়া পরদিবস তাঁহার নিকট ব্যাখ্যার জন্য গেলে তিনি আনন্দে তাহা বুঝাইয়া দিলেন। সেক্সপিয়ার ও পোপ আমার নিকট হইতে গড়াইয়া পড়িল, এবং রসায়নে আমার পুরস্কার আমাকে প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত সহায়তা করিল। অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন, এবং বিদ্যুত্ সম্বন্ধে ডাক্তার ও'শোনেসির বক্তৃতাগুলি বৈদিক আকাশের অগ্নি, পবন, বরুণ এবং ইন্দ্রের কল্পনাকে সরাইয়া দিল।

কলিকাতা পুরসভার প্রাক্তন কর্মচারী মি. রো প্রথম শ্রেণীতে আমাদের জমি জরিপ শিখাইতেন। আমরা মৌলালি দরগা হইতে শ্যামবাজার ব্রিজ, বীরনরসিংহ মল্লিকের মানিকতলার বাগান, দ্বারকানাথ ঠাকুরের বেলগাছিয়া ভিলা, এবং রাজা নরসিংহের বাগান জরিপ করিয়াছিলাম। মি. উলাস্টন আমাদের চিত্রাঙ্কণবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। আমার মনে আছে, তিনি তখন একটি মাহিলার—খুব সম্ভবত ম্যাডোনার—মুখ আঁকিতে নিযুক্ত ছিলেন।

সেই পুরাতন দিনে কিভাবে দুইটি উচ্চ শ্রেণীর পরীক্ষা লওয়া হইত, সেই কথা এখন বলিব। যে কর্মচারীরা আমাদের শিক্ষাদানের বিপক্ষে ছিলেন, তাঁহারা কেবল রাজনৈতিক বিবেচনা হইতে ইহা করিয়াছিলেন। তাঁহারা এখনকার মত ঈর্ষা হইতে বিরুদ্ধবাদী হন নাই। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, শল্যচিকিত্সক, আইনজীবী, বা

অ্যাটর্নিরা ভাবিতে পারেন নাই, যে কালের আবর্তে ভাগ্যপরিবর্তনে আমরা কখনো তাঁহাদের সুখসম্পদে ভাগ বসাইব। এখনকার মত তখন জাতিবৈর এত তিক্ত হয় নাই। ইউরোপীয়েরা এত উদারভাবে শিক্ষা দিতেন যে আমাদের অগ্রগতিতে তাঁহারা প্রকৃতই আনন্দিত হইতেন। স্যর এডওয়ার্ড রায়ানের মত কেহই আনন্দিত হন নাই। তিনি মি. মেকলের পরে জনশিক্ষা কমিটির সভাপতি হইলেন, এবঙ আমাদের শিক্ষায় এরূপ উষ্ণ আগ্রহ লইতেন যে তিনি প্রতি বত্সর আসিতেন। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের পরীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কৌতূহলোদ্দীপক ছিল, এবঙ তাহা আমার স্মৃতিতে স্পষ্ট আছে। স্যর এডওয়ার্ড রায়ানের সঙ্গে আসিয়াছিলেন ছোট জজ স্যর হেনরি সিটন, আইন কমিশনের মি. ক্যামেরন, মি. (পরে স্যর) ফ্রেডারিক হ্যালিডে, চিকিত্সা বোর্ডের ডাক্তার গ্রান্ট এবঙ আরও কয়েকজন যাঁহাদের আমি ভুলিয়া গিয়াছি। তাঁহারা প্রথমে সাহিত্য—গদ্য ও কবিতা—লইলেন, এবঙ একের পর এক বালককে ডাকিয়া তাহাদের মৌখিক পরীক্ষা লইলেন। ইহা তাহাদের পাঠ্যপুস্তক হইতে পূর্বপঠিত নিষ্প্রাণ পাঠ নয়, বরঙ ক্লাসে তাহারা পড়ে নাই এমন লেখকদের রচনা। তাঁহাদের প্রশ্নাবলীর কয়েকটি আমার মনে আছে। বেকন্-এর 'ঈর্ষা' নামক প্রবন্ধের নিম্নোক্ত অঙশ হইতে তাঁহারা প্রশ্ন করিয়াছিলেন :—'নূতন ব্যক্তিদের উন্নতিতে উচ্চবঙশজাত ব্যক্তিরা তাঁহাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হন। কারণ দূরত্বের পরিবর্তন হয় ; এবঙ এইরূপ দৃষ্টিবিভ্রম হয়, যে যখন অপরেরা অগ্রসর হন, তাঁহারা মনে করেন যে নিজেরা পিছাইয়া যাইতেছেন।' ইহা হইতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল প্রকৃত অভিজ্ঞতা হইতে 'দৃষ্টিবিভ্রমে'র ব্যাখ্যা করা।

কবিতায় তাঁহারা মিল্টনের 'প্যারাডাইজ লস্ট' কাব্যের দ্বিতীয় সর্গের নিম্নোক্ত অঙশ হইতে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

Before the gates there sat
On either side a formidable shape;
The one seem'd woman to the waist, and fair,
But ended foul in many a scaly fold
Voluminous and vast : a serpent arm'd
With mortal string : about her middle round
A cry of hell-hounds never ceasing bark'd,
With wide Cerberean mouths, full loud, and rung,
A hideous peal : yet when they list, would creep,
If aught disturb'd their noise, into her womb,
And kennel there : yet there still bark'd and howl'd,
Within unseen. Far less abhorr'd than these
Vexed Scylla, bathing in the sea that parts
Calabria from the hoarse Trinacrian shore :
Nor uglier follow the night hag, when call'd
In secret, riding through the air she comes,
Lured with the smell of infant blood, to dance

With Lapland witches, while the labouring moon
Eclipses at their charms.

রচনাটি ঠিকভাবে পড়িয়া পৌরাণিক কাহিনী ও ভূগোলের প্রসঙ্গে খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করিতে হইত। কিন্তু যে প্রশ্নগুলিতে সর্বাধিক নম্বর ছিল তাহা হইল 'কি অপেক্ষা কম ঘৃণা' এবঙ 'কি অপেক্ষা কম কুত্সিত?'

অধিকন্তু নিম্নোক্ত সনেট সম্বন্ধে আমাদের পরীক্ষা লওয়া হইয়াছিল–

Captain, or colonel, or knight in arms,
Whose chance on these defenceless doors may seize,
If deed of honour did thee ever please,
Guard them, and him within protect from harms.
He can requite thee, for he knows the charms
That call fame on such gentle acts as these,
And he can spread thy name o'er lands and seas,
Whatever clime the suns bright circle warms.
Lift not thy spear against the Muse's bower,
The great Emathian conqueror bid spare
The house of Pindarus, when temple and tower
Went to the ground : and the repeated air
Of sad Electra's poet had the power
To save the Athenian walls fron ruin bare.

যাহারা ছন্দোহীনভাবে কলোনেল্-কে কারমেল পড়িয়াছিল তাহারা কম নম্বর পাইল। সনেটটি রচনার উপলক্ষ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইয়াছিল ; এবঙ কে ছিলেন এমাথিয়ান বিজেতা ও কেন? এবঙ পিন্ডার ও তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে, এবঙ কেন তাঁহার গৃহ অব্যাহতি পাইয়াছিল? এবঙ কে ও কেন ছিলেন 'ইলেকট্রার বিষাদমাখা কবি?' অন্য কোন সময়ে এথেনীয়েরা তাহার পুনরাবৃত্তি হইতে সুবিধা ভোগ করিয়াছিল? এবঙ, পরিশেষে, মিলটনের তথ্যের সূত্র কি? আমি প্লুটার্কের নাম উল্লেখ করায় অতিরিক্ত নম্বর পাইয়াছিলাম। যাহারা ভাল উত্তর দিতে পারিয়াছিল তাহাদের বারম্বার সূক্ষাতিসূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করা হইয়াছিল।

প্রায় সমান স্থানাধিকারী আটজন বালককে পুনর্বার পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত করা হইয়াছিল। পুরাতন সুপ্রিম কোর্টে স্যার এডওয়ার্ডের উপরের ঘরে একটি রবিবার তাহা নির্ধারিত হইয়াছিল। পূর্বোক্ত সমস্ত ভদ্রলোক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন লর্ড জোজলিন, যিনি তখন ভারতবর্ষে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। দুঃখের কথা, এই পরীক্ষা সম্বন্ধে কিছুই আমার মনে নাই এইটুকু ছাড়া যে বেকনের 'নোভুম অর্গানুম্' বা 'অ্যাডভান্সমেন্ট্ অব লার্নিঙ' হইতে গৃহীত একটি কঠিন রচনা হইতে গদ্যের পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। এই পরীক্ষায় গোপালকৃষ্ণ ঘোষ শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন।

তাঁহার অসাধারণ মেধা ছিল। বিনা কারণে ইতস্তত ছুটাছুটি ও খেলা করা–বিশেষত

তাস খেলা ছাড়া তাঁহাকে কেহ কখনও বই পড়িতে দেখে নাই। সকলের নিকট ইহা দুঃখের বিষয় ছিল, যে পুরস্কার বিতরণের পূর্বেই গোপালের মৃত্যু হইল। তাঁহার গুণ এবঙ স্মৃতির প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া প্রাচীন সিনিয়ার ডিপার্টমেন্টের পশ্চিম দেওয়ালে স্যর এডওয়ার্ড রায়ান অনুগ্রহপূর্বক একটি ফলক উত্কীর্ণ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার অব্যবহিত পরবর্তী বলিয়া আমি পুরস্কারটি লাভ করিলাম।

ইতিহাস ও অঙ্কে আমাদের লিখিত প্রশ্নপত্র দেওয়া হইয়াছিল। স্যর এডওয়ার্ড হলে পায়চারি করিয়া আমাদের লক্ষ্য করিতেছিলেন। বোধহয় রানীর সাম্প্রতিক রাজ্যারোহণ উপলক্ষ করিয়া ইতিহাসে একটি প্রশ্ন করা হইয়াছিল 'খ্রিস্টের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিখ্যাত রাজ্ঞীদের নাম লিখ', এবঙ অন্যটিতে, বোধহয় রণজিত্ সিঙহের দরবারে অকল্যান্ডের দৌত্য প্রেরণ উপলক্ষে, প্রশ্ন ছিল 'এশীয় রাজাদের দরবারে ব্রিটিশ দৌত্যগুলির উল্লেখ কর।'

অঙ্কের পরীক্ষায় ছাত্রসঙখ্যা ছিল সামান্য। এক বত্সর স্যার এডওয়ার্ড আট-দশ জনের বেশি বালক না দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। যাহারা চলিয়া গিয়াছিল তিনি তাহাদের ডাকাইয়া আনিতে বাধ্য করিলেন, এবঙ তখন হইতে নিয়ম প্রচলিত করিলেন, যে জুনিয়ার ও সিনিয়ার বৃত্তিগুলি সর্ববিভাগে উচ্চতম নম্বর পাইয়া লাভ করা যাইবে।

সঙস্কৃত কলেজের দ্বিতলের হলঘরে একই পদ্ধতিতে রচনার পরীক্ষা হইয়াছিল। এক বত্সর বিষয় ছিল 'নৈতিক সাহস', এবঙ রামমোহন রায়ের উদাহরণ দিয়া দয়ালচন্দ্র রায় পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। পুরস্কার বিতরণের দিন লর্ড অকল্যান্ডের সম্মুখে তাঁহার রচনা পাঠ করা হইয়াছিল। এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, যে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে স্যর এডওয়ার্ড রায়ান অবসর গ্রহণ করিলে, দেশিয়দিগের শিক্ষায় তাঁহার উষ্ণ অনুরাগ ও মহত্ কর্মপ্রয়াসের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা তাঁহাকে একটি সুদৃশ্য রৌপ্যনির্মিত পাত্র ও রেকাবি উপহার দিয়াছিল। স্যর এডওয়ার্ড একই স্টিমারে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রথম ইঙলন্ড যাত্রার সাক্ষী হইয়াছিলেন।

পরবর্তী আলোচ্য বিষয় কলেজের পাঠাগার সম্বন্ধে আমি মি. ট্রাভেলিয়ানের বিবৃতি হইতে একাঙশ উদ্ধার করিতেছি—'পরিশেষে, এই (তৃতীয়) শ্রেণীর কলেজে অবস্থানে তাহাদের নিকট হইতে যাহা আশা করা যাইত তাহার তুলনায় দ্রুততর উন্নতির কারণ আমার নিকট যাহা বোধ হইয়াছে, তাহা বলা প্রয়োজন। আমি মনে করি, কলেজ-সঙযুক্ত পাঠাগারের ব্যবহারের ফলে এই যুবকেরা এইরূপ ফললাভ করিয়াছে। ইহা আমার নিকট স্পষ্ট ছিল যে, যে যুবকেরা বার্ক-এর একটি কঠিন রচনাঙশ এত সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়াছে, তাহারা গোল্ডস্মিথের 'ইঙলন্ডের ইতিহাস' ও পোপের 'হোমার'-এর অতিরিক্ত পড়াশুনা করিয়াছে, এবঙ ইতিহাসের প্রশ্নগুলির উত্তর এই বিষয়ে সমস্ত সন্দেহ অপসারিত করিয়াছে। ইহাতে এমন অনেক তথ্য ও নিরীক্ষা ছিল যাহা গোল্ডস্মিথের সঙক্ষিপ্ত রচনায় পাওয়া যায় না, এবঙ ইহা স্পষ্ট হইয়াছিল, যে অনেক ছাত্র ক্লাসের

সময়ের বাহিরে হিউম পড়িয়াছিল। আমার মতে, অন্যান্য শিক্ষায়তন হইতে হিন্দু কলেজের শ্রেষ্ঠত্বের একটি প্রধান কারণ এই, যে ইহাতে একটি উত্কৃষ্ট পাঠাগার রহিয়াছে, এবঙ আমি মনে করি, আমাদের তত্ত্বাবধানে স্থিত ছাত্রদের উন্নতির জন্য সাধারণ পাঠে তাহাদের আগ্রহ সঞ্চার করা অপেক্ষা উত্কৃষ্ট পথ নাই। ইহা ব্যতীত তাহাদের জ্ঞানলাভ বিদ্যালয়ের পাঠে সীমিত হইবে এবঙ সর্বাপেক্ষা উন্নত ও সর্বনিম্ন মানের ছাত্রেরা প্রায় সমাবস্থানে থাকিবে। আমি আশা করি, আমাদের সমস্ত প্রতিষ্ঠানে উত্কৃষ্ট পাঠাগার থাকিবে। বিদ্যালয়ের শুষ্ক পাঠে কদাচিত্ অধিকতর জানিবার আগ্রহ জন্মায়, অথবা অন্য কথায় তাহা কদাচিত্ পাঠে আগ্রহ সঞ্চার করে ; এবঙ যদি ইহা ধরিয়া লওয়া যায় যে এইরূপ আগ্রহ বিদ্যমান আছে, তাহা হইলেও দেশের অভ্যন্তরে স্থিত দেশীয় বালকেরা পাঠাগার ব্যতীত তাহা চরিতার্থ করিতে পারিবে না।' সেই যুগে, একই প্রদেশে মাত্র কয়েকজন পুস্তকবিক্রেতা ছিলেন থ্যাকার এন্ড কোঙ, অস্টেল লেপাজ এন্ড কোঙ, এবঙ নূতন চিনাবাজারে দুই-তিনটি দেশীয় প্রতিষ্ঠান। সেই যুগে হিন্দু কলেজ পাঠাগার ছিল সম্ভ্রান্ত। প্রখ্যাত পন্ডিত ডাক্তার উইলসনের পরিচালনায় ইহা গঠিত হইয়াছিল। সেই যুগে ইঙরাজি সাহিত্য সম্বন্ধে যেসব মূল্যবান গ্রন্থ পাওয়া যাইত, তাহাদের অধিকাঙশ তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফ্রয়সার্ট, ক্যামেডন, ফুলার, বার্টন, সেলডেন, ক্লারেন্ডন, বার্নেট প্রভৃতি তত্কালীন অনেক লেখকের রচনা ভারতীয় ছাত্রেরা খুব সম্ভবত কখনও দেখে নাই। সমস্ত কবি, প্রাবন্ধিক, ঐতিহাসিক, 'ক্লাসিক' গ্রন্থগুলির অনুবাদ, ভ্রমণকাহিনী, এবঙ প্রকৃতিবিজ্ঞান সঙ্ক্রান্ত বই পাওয়া যাইত। ভারতীয় বিভাগে ছিল এশিয়াটিক রিসার্চেস, এশিয়াটিক অ্যানুয়াল রেজিস্টার, স্যর উইলিয়াম জোন্স, হ্যামিল্টন, পিঙ্কার্টন, মরিস, অর্ম, এবঙ যে গ্রন্থগুলি অবলম্বনে মিল তাঁহার ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের সব। তাহাদের 'নিজের স্বাধীন ইচ্ছা' অনুসারে বালকেরা এই পাঠাগারের সদ্ব্যবহার করিত, এবঙ এইখানে তাহারা চিন্তা করিবার উপযুক্ত প্রচুর বৈচিত্র্য পাইত। সেইখানে এমন পুস্তক প্রায় থাকিত না, যাহার আস্বাদ তাহারা লয় নাই। "চীন হইতে পেরু' পর্যন্ত পরিবর্তনের ফল ছিল বিরাট। তথ্যগুলি যত শিথিলবদ্ধ হউক এবঙ বাহ্য হউক না কেন, ইহারা তবুও ছিল বিস্তৃত, বিচিত্র ও প্রয়োজনীয় যাহা তাহাদের মানসিক দিগন্ত প্রসারিত করিত, প্রাকৃতিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটাইত, এবঙ ভবিষ্যতের ভিত্তিনির্মাণের উপযুক্ত করিত। প্রকৃতপক্ষে তত্কালীন উন্নতির অনেকাঙশ পাঠাগারের ফলে সম্ভব হইয়াছিল, এবঙ যুবকদের একটি বড় অঙশ ইহার সুবিধা ভোগ করিত। আমি যে গ্রন্থগুলি পড়িয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়ে, তাহার মধ্যে প্রকৃতিবিজ্ঞানের অনেক গ্রন্থ ছিল ; সমস্ত ভ্রমণকাহিনী ; ডন কুইহোতে হইতে ম্যান অব ফিলিঙ ও মিস্ট্রিজ অব উডলফো পর্যন্ত সমস্ত উত্কৃষ্ট উপন্যাস ; পটারের অ্যান্টিকুইটিস এবঙ আস্কাইলাস ও ইউরিপিদিস-এর সমস্ত রচনার অনুবাদ ; মিটফোর্ডের গ্রীস ; ট্যাসিটাস ও ফার্গুসনের রোমান রিপাবলিক। ফুলার, ক্ল্যারেন্ডন এবঙ বার্নেটের রচনা হইতে কিছু কিছু পড়িয়াছিলাম। বার্নেটের অ্যানাটমি অব মেলাঙ্কলি আমার নিকট উপন্যাসের মত মনে

হইয়াছিল। হিউম পড়িবার সময় লিঙগার্ড ও হেনরির 'গ্রেট ব্রিটেন' গ্রন্থের উল্লেখ পাইলাম। কবিদের মধ্যে আমার পাঠ্যতালিকায় ছিল কেবল সেক্সপিয়ার, মিল্টন, পোপ, থমসন এবঙ বায়রন। এইরূপ বিচ্ছিন্ন পাঠের পরে শেষ পর্যন্ত আমি স্বদেশের ইতিহাস সুশৃঙ্খলভাবে পড়িবার জন্য মিল ও অন্যান্য লেখকের রচনা পড়িতে লাগিলাম।

ডেভিড হেয়ারের কথা বাদ দিয়া হিন্দু কলেজের বিবরণ রচনা সাধারণের ভাষায় 'হ্যামলেটের ভূমিকা বাদ দিয়া হ্যামলেট নাটক রচনা'র মত। রামমোহন রায়ের সঙ্গে এই কার্যে প্রথম অগ্রসর হইলে তাঁহার জ্বলন্ত উত্সাহ ও কর্মক্ষমতা হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় প্রধান সাহায্য করিয়াছিল। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের ১২ই জুন পরিদর্শক হিশাবে মনোনীত হইবার পর তিনি প্রতি বত্সর এই প্রতিষ্ঠানের বৃদ্ধি নিয়মিতভাবে দেখা-শুনা করিতেন। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলেজের একজন পরিচালক হিশাবে মনোনীত হইলেন। আমার মনে আছে ডেভিড হেয়ার ছিলেন একজন খর্বকায় বৃদ্ধ, যাহার মাথাজোড়া টাক, ভারি চোয়াল ও মুখ, এবঙ দু'একটি দাঁত ছিল। তাঁহার সাধারণ মুখাবয়বে বিশেষ আকর্ষণীয় কিছুই ছিল না। কিন্তু মার্শম্যানের এই অসৌজন্যমূলক উক্তিও তাঁহার প্রতি কোনভাবে প্রযোজ্য নহে যে 'প্রকৃতি তাঁহার অবয়ব এইরূপ গঠন করে নাই যে মূর্তি নির্মাণ করা যায়।' তাঁহার মুখাবয়বে প্রকৃতি সদাশয়তার যে চিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছিল, তাহা শিল্পকলার ক্ষমতার অতীত। মি. হেয়ার প্রতিদিন বিকালে 'তাঁহার শাদা জ্যাকেট, ও পুরাতন ধরনের পায়ের পটি পরিয়া এবঙ কমিটির বৈঠকের বিশেষ দিনগুলিতে নীল কোট পরিয়া ধীর গতিতে সহজভাবে কলেজে আসিতেন।' ভীরুকে সাহস দেওয়া, জ্ঞানহীনকে পরামর্শ দেওয়া, অলস ও অসত্‌কে তিরস্কার করা, এবঙ পরিষ্কার, স্বাস্থ্যকর, ভদ্র ও সুনীতিপূর্ণ চরিত্রগঠনে তিনি সর্বাপেক্ষা উপযোগী ছিলেন। বালকদিগের প্রতি তাঁহার এই সাহায্য কখন বহির্বিশ্বেও প্রসারিত হইত, এবঙ তিনি অনেককে চাকুরি সঙ্গ্রহ করিতে সাহায্য করিতেন। এই অবিরাম পরিশ্রম শতাব্দীর এক পাদ ব্যাপিয়া ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের ১লা জুন তাঁহার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছিল। এই সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ পরিশ্রমে তিনি কোন পুরস্কার আশা করেন নাই, বরঙ তাঁহার সঞ্চিত শেষ কপর্দক অবধি ব্যয় করেন। এই সময়ে সরকার তাঁহার নিঃস্বার্থ শ্রমের পুরস্কার দিতে তাঁহাকে কলিকাতার কোর্ট অব রিকোয়েস্টের (নিম্ন আদালত) কমিশনার নিযুক্ত করিলেন। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে মি. হেয়ারের ছাত্রেরা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে তাঁহার যে প্রতিকৃতি অঙ্কনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা ১৮৩৩ বা ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে সম্পূর্ণ হইল। তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছাত্রটির নাম তারকনাথ বা গঙ্গাচরণ। নামটি আমার ঠিক মনে পড়িতেছে না।

যে বালকটি তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়াছিল, তাহার নাম দ্বারকানাথ চন্দ্র। সে আহিরিটোলায় বাবুরাম ঘোষের গলিতে পূর্বে আমাদের প্রতিবেশী ছিল। বড়বাজারে রামসেবক মল্লিকের গৃহকার্যে নিযুক্ত হইয়া আপন ভাগ্যকে ফিরাইবার কোন সুযোগ তাহার ছিল না।

জন হাওয়ার্ড ও ডেভিড হেয়ার উভয়েই নিজেদের জীবনে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। ব্রিটিশ লোকহিতৈষণার বিবরণে তাঁহাদের নাম যুগ্মস্থানাধিকারী,—এক জনের কর্মক্ষেত্র ছিল ইউরোপ, অপরের ভারতবর্ষ।

হিন্দু কলেজে অনুসৃত পদ্ধতির ফল প্রদর্শন করিতে আমি মেধা ও সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি হইতে কয়েকজনকে দৃষ্টান্ত দিব। তাঁহাদের মধ্যে এক জন শিবচন্দ্র ঠাকুর বোধহয় কলেজের প্রতিষ্ঠাদিবস হইতেই ছাত্র ছিলেন। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থগুলি এখনও তাঁহার পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট সঙরক্ষিত আছে। শিবচন্দ্রের সমকালবর্তীদিগের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের রিসিভারের অফিসের অবিনাশ গাঙ্গুলি খ্যাতনামা ছিলেন। সুবিখ্যাত প্রসন্নকুমার ঠাকুর এই কলেজের প্রথম যুগের ছাত্র ছিলেন। তিনি 'রিফর্মার' পরিচালনা করিতেন, এবঙ হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রের কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থ অনুবাদ বা সম্পাদনা করিয়াছিলেন। তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেবের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

অতঃপর আমার বর্ণনায় প্রথমেই থাকিবেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি 'হিন্দুধর্মের উপদেশগুলিকে উপেক্ষা এবঙ আচারগুলিকে নিন্দা' করিবার দলের নেতৃত্ব দিয়া ইয়ঙ বেঙ্গালের ব্রাভি গোষ্ঠির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে হেয়ার স্কুলের শিক্ষক হন, পরে বিশপস্ কলেজে যোগদান করেন, এবঙ সঙস্কৃত, হিব্রু, ল্যাটিন ও গ্রিক ভাষা শিক্ষা করিয়া সেখানে অধ্যাপকরূপে উন্নীত হন। প্রথম জীবনে তিনি 'এন্‌কোয়ারার' নামক পত্রের পরিচালনা করিতেন। 'হিন্দু স্ত্রীশিক্ষা' সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ রচনা করিয়া কৃষ্ণমোহন পুরস্কার অর্জন করিয়াছিলেন। 'কলিকাতা রিভিউ'-য়ে ভারতীয়দের লিখিত প্রবন্ধগুলির প্রথমটি ছিল তাঁহার 'বঙ্গাদেশে কৌলীন্যপ্রথা'। তিনি 'এনসাইক্লোপিডিয়া বেঙ্গালেনাসিস' নামে একটি সিরিজ রচনা করিলে লর্ড হার্ডিন্‌জ তাঁহাকে এল্‌ফিন্‌স্টোনের 'ইন্ডিয়া' গ্রন্থের এক খন্ড উপহার দিয়া সেই কার্যের অনুমোদন করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি 'হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে কথোপকথন' প্রকাশ করেন। কৃষ্ণমোহন প্রতিটি জাতীয় সাধারণ আন্দোলনে আগ্রহী এবঙ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সাধারণ বক্তা ছিলেন।

বাগ্মী হিশাবে রসিককৃষ্ণ মল্লিক স্পষ্ট চিন্তা ও সুন্দর বাচনভঙ্গীর চর্চা করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য কলভিন এন্ড কোম্পানির মি. অ্যান্ডারসন প্রায়ই আকাডেমিতে যাইতেন। তিনি 'জ্ঞানান্বেষণ' প্রতিষ্ঠা করিয়া, ইঙরাজি ও বাঙ্গালায় ১৮৩১ হইতে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাহার সম্পাদনা করেন। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে রামমোহনের স্মৃতি-সভায় তিনি একটি বড় বক্তৃতা করেন, এবঙ ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত সঙবাদপত্র ও জনসভা নিয়ন্ত্রণের আইন রহিত করিবার জন্য ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ৫ই জানুয়ারি আর একটি বিশিষ্ট বক্তৃতা করেন। বর্ধমানে ডেপুটি কালেক্টর হিশাবে চাকুরি করিবার সময় জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ে মৃত্যু তাঁহার সম্ভাবনাপূর্ণ জীবনের অবসান ঘটাইল।

রামগোপাল ঘোষের বাগ্মিতার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। জ্ঞানবিস্তারের দ্বারা স্বদেশের উন্নতিসাধন অপেক্ষা তাঁহার নিকট অধিকতর প্রিয় আর কিছুই ছিল না। সংস্কৃত কলেজের হলে ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ই মার্চ তারিখে স্থাপিত সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার তিনি ছিলেন প্রধান প্রতিষ্ঠাতা। তিনি যত বলিতেন তত লিখিতেন না। ঐ সভায় পঠিত আলোচনাগুলির নির্বাচিত সঙ্কলনের মধ্যে তাঁহার রচিত কোন প্রবন্ধ নাই। 'এন্‌কোয়ারার', 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'হিন্দু পাইওনিয়ার'-এর বিলুপ্তির পরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'-এ তাহার রচনার সামান্য চিহ্ন পাওয়া যায়। 'সাধারণ্যে জ্ঞাত কালা কানুনের খসড়ার বিপক্ষে কয়েকটি মন্তব্য' রামগোপাল ঘোষ ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার অসংখ্য বক্তৃতা তাঁহার প্রচুর সাহিত্যিক গুণের পরিচয় বহন করে।

তাঁহার চক্ষে সম্ভাবনাপূর্ণ বলিয়া মনে হওয়ায় ডাক্তার উইলসন অন্যান্য ছাত্রের সঙ্গে কাশীপ্রসাদ ঘোষকে সরকারের পক্ষ হইতে ভাগবতের অনুবাদে নিযুক্ত করেন। তিনি একজন বিশিষ্ট কবি ছিলেন, এবং তাঁহার সাময়িক রচনাগুলি 'লিটারারি গেজেট', 'বেঙ্গল অ্যানুয়াল' ও অন্যান্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার বিখ্যাত কবিতা Shair। ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন তাঁহার ব্রিটিশ কবিতাসঙ্কলনে তাঁহার 'গঙ্গার প্রতি নাবিকের গান' সঙ্কলন করিয়া তাহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে কাশীপ্রসাদ 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহাতে 'তাঁহার দেশের উন্নতির আন্তরিক সমর্থন করেন, এবং কোনও অপব্যবহার ও অত্যাচার প্রকাশ করিতে কখনও সঙ্কুচিত হন নাই। এদেশীয় শিক্ষিত সংগ্রামরত ব্যক্তিদের সাহিত্যিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিষেবায় তিনি আনন্দ অনুভব করিতেন। সাংবাদিক যুদ্ধের শিল্পকলায় বাবু হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষের শিক্ষার হাতে-খড়ি তাঁহার নিকটে হইয়াছিল। তাঁহার পত্রের স্তম্ভে কৃষ্ণদাস পাল ও শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অসিচালনা আয়ত্ত করিয়াছিলেন।' লর্ড ক্যানিঙের গ্যাগিঙ অ্যাক্ট [কণ্ঠরোধ আইন] তাঁহার 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সারে'র মৃত্যু ঘটাইয়াছিল। (বাবু রামগোপাল সান্যালের 'গ্রেট মেন অব ইন্ডিয়া'।)

কর্নেল এভারেস্ট দেরাদুনে গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার [ভারতীয় বৃহত্ ত্রিকোণমিতিক জরিপ বিভাগে] গাণিতিক রাধানাথ শিকদারকে লইয়া গেলেন। অনেক বত্সর পরে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে একজন মহাজ্ঞানী পুরুষ বলিয়া গণ্য করা যাইত, কারণ তিনি স্মৃতি হইতে যে-কোন ইংরাজ কবির রচনা উদ্ধৃত করিতে পারিতেন। এই বিষয়ে আমার কৌতূহল চরিতার্থ করিতে আমি ঘুঘুডাঙ্গার উদ্যানে তাঁহার গৃহে গিয়াছিলাম। রাধানাথ কেবল গণনা-বিভাগের প্রধান ছিলেন না, অধিকন্তু কলিকাতার মানমন্দিরের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'তে লিখিত লেফটন্যান্ট কর্নেল শেরউইলের যে পত্র বাবু রামগোপাল সান্যাল পুনঃপ্রকাশিত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার স্মৃতির প্রতি অবিচারের যে প্রতিবাদ করা হইয়াছে তাহা তাঁহার উত্কর্ষের যথেষ্ট প্রমাণ—'আমার জনৈক বন্ধু আমাকে ২৪শে জুন

তারিখের 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'র এক খন্ড পাঠাইয়াছেন, যাহা জার্মানি হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে পড়িতেছিলাম। স্মিথ অ্যান্ড থুইলিয়ারের 'ম্যানুয়াল অব সার্ভেয়িঙ ইন্ ইন্ডিয়া' গ্রন্থের তৃতীয় সঙস্করণে গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার গণনা-বিভাগের প্রধান—যোগ্য ও বিশিষ্ট রাধানাথ শিকদারের মহাসম্মানিত নাম বাদ পড়িয়াছে, এই 'দুঃখজনক ঘটনা' আমাকে জানানো তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। যিনি 'ম্যানুয়াল'টির পূর্বের সঙস্করণগুলিকে সমৃদ্ধ করিতে এত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, চেতনা বা অচেতনার ফলে শেষ সঙস্করণের ভূমিকা হইতে তাঁহার নাম বর্জিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার সহিত সেই ভদ্রলোকের লিখিত সমস্ত মূল্যবান বিষয় গ্রন্থে রক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার লেখক সম্বন্ধে কিছু জানান হয় নাই। আমি জরিপ বিভাগের একজন পুরাতন নিরীক্ষক, শতাব্দীর এক-চতুর্থাঙশ ব্যাপিয়া ঐ ম্যানুয়ালের ব্যবহার করিয়াছি এবঙ প্রয়াত রাধানাথ শিকদারের একজন পরিচিত ব্যক্তি ছিলাম। আমি ইহা দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জা অনুভব করিতেছি, যে বর্তমান সঙস্করণের সম্পাদকেরা তাঁহার নাম বর্জন করিয়াছেন, যেখানে পূর্বের সঙস্করণগুলির সম্পাদকেরা রাধানাথের সাহায্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের সঙস্করণে তাঁহারা 'সর্বসমক্ষে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন' কেবল বিশেষ কোন রচনার জন্য নহে, বরঙ 'তাঁহার বিভাগ সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ের সম্বন্ধে সাধারণ পরামর্শের জন্য।'

উষ্ণ-হৃদয় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় দেশপ্রেমিক ও জনহিতকর কর্মে সূর্যকুমার ঠাকুরের উত্তরাধিকার ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পরিচালনায় তিনি রামগোপাল ঘোষ ও প্যারীচাঁদ মিত্রের সহযোগিতা করিয়াছিলেন। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিনামূল্যে যে জমি দান করেন তাহার উপরে বেথুন ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জীবনে কখনও মোসাহেবি করিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি নিজামতে দেওয়ানের পদ রক্ষা করিতে পারেন নাই। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে জন ব্রাইট হাউস অব্ কমন্স-এ লর্ড ক্যানিঙের অযোধ্যা নীতিকে বাজেয়াপ্ত করিবার নীতি বলিয়া ত্যাগ করেন। কিন্তু ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে দক্ষিণারঞ্জন তাঁহার নীতিকে এত যোগ্যতার সহিত সমর্থন করিলেন যে তাঁহার অত্যন্ত প্রয়োজনের সময়ে বড়লাট বাহাদুর তাঁহাকে বার্ষিক ৫,০০০ টাকা আয়ের একটি বাজেয়াপ্ত তালুক প্রদান করিলেন। রাজা মান সিঙ ও অন্যান্য ব্যক্তির সহায়তায় তিনি অযোধ্যা তালুকদার সমিতি এবঙ তাহার মুখপত্র হিসাবে 'সমাচার হিন্দুস্থানী' ও 'লখ্নৌ টাইমস্' সঙবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষিণা এই সমিতির স্বার্থ এত সাহসের সহিত রক্ষা করিয়াছিলেন যে কমিশনার স্যর চার্লস উইঙফিল্ডের সহিত তাঁহার সখ্যতা বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্যের একনিষ্ঠতা এবঙ দৃষ্টিভঙ্গির ন্যায়পরায়ণতা তাঁহাকে বুঝাইতে সক্ষম হইলে তাঁহাকে 'রাজা' উপাধির জন্য সুপারিশ করা হইল।

সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় পঠিত 'বাঁকুড়ার ভৌগোলিক ও পরিসঙখ্যানগত পরিচয়' ছাড়া বাবু হরচন্দ্র ঘোষের অন্য কোন রচনার কথা আমি জানি না। ডিরোজিও-

র শিক্ষা তাঁহার মনে ন্যায়পরায়ণতাকে এতখানি উদ্বোধিত করিয়াছিল, যে ছোট আদালতে প্রবেশের মুখে তাঁহার একটি আবক্ষমূর্তি স্থাপিত হইয়া তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

অমৃতলাল মিত্রের সাহিত্যিক সৃষ্টিকর্মের কোন নজির সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না। কিন্তু সরকারি তোষাখানার প্রলোভনের মধ্যে তাঁহার সত্যতা এত বেশি ছিল যে তিনি ওই অস্বস্তিকর স্থান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

কলেজে তাঁহার সতীর্থ ও সমকালবর্তীদিগের মধ্যে যে রামতনু লাহিড়ী এখনও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছেন, তিনি 'যতখানি সত্ তত মেধাবী নহেন। ন্যায়পরায়ণতার গুণ স্বীকার করিতে এবঙ প্রগতিশীল নীতি সমর্থন করিতে তিনি কখনও পশ্চাত্পদ হন নাই।' মানবোচিত স্বাভাবিক দয়া তাঁহাকে বৈশিষ্ট্য দিয়াছে—

'Great Natures Nile, whose stream rises higher
Than Egypt's river'

শিবচন্দ্র দেব 'শান্ত ও নিরহঙ্কার পন্ডিত ছিলেন। ইঙরাজি, বাঙলা ও বালিকা বিদ্যালয় এবঙ একটি পাঠাগার ও সমাজ স্থাপন করিয়া তিনি তাঁহার বাসস্থান কোন্নগরের যে উপকার করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে প্রকৃত শিক্ষা পাইলে এক জন ব্যক্তির কত বেশি ক্ষমতা হয়।' ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টারে যে ডেপুটি কালেক্টরের পদ সৃষ্টি করা হইয়াছিল তিনি যোগ্যতাবলে তাহার প্রথম দিগের এক জন পদাধিকারী হইয়াছিলেন।

গোবিন্দচন্দ্র বসাক ছিলেন 'উন্নত সাহিত্যিক গুণের অধিকারী যুবক। তিনি পালি ও অন্যান্য লেখকের ব্রহ্মবিদ্যাসঙ্ক্রান্ত রচনা পড়িবার ফলে 'রিফর্মার'-এ খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধে অনেক প্রবন্ধ রচনা করেন, এবঙ বর্তমানে ভারতীয় কৌন্সিলের রস ডনেলি ম্যাঙগলস্-এর মত ব্যক্তি 'এন্‌কোয়ারার' পত্রে তাহাদের কয়েকটির প্রতিবাদ করেন। গোবিন্দের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র শিক্ষালাভ করেন।' তিনি সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় 'চট্টগ্রামের বর্ণনামূলক আলোচনা' করেন চারিটি রচনায় ; তিনি সেখানে ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। তাঁহার অপর রচনা 'পার্বত্য ত্রিপুরা'য় তিনি প্রথম আদিম উপজাতি কুকিদের বিবরণ দেন। অপরিণত বয়সে মৃত্যু তাঁহার কর্মধারাকে খন্ডিত করিয়াছে।

হিন্দু কলেজের অন্য পুরাতন ছাত্র নীলমণি বসাক ডেপুটি কালেক্টারের চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর 'নবনারী' নামক নয়জন বিশিষ্ট হিন্দু মহিলার জীবনী রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। নিজের মাতৃভাষাকে উন্নত করিবার জন্য ইহা শিক্ষিত বাঙালিদের প্রথম প্রয়াসগুলির অন্যতম। নীলমণি বসাক আরব্য রজনী ও পারস্য উপকথারও বঙ্গানুবাদ করেন।

প্যারীচাঁদ মিত্র একাধারে লেখক ও বক্তা ছিলেন। তাঁহার সর্বপ্রথম রচনা ছিল সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় পঠিত 'হিন্দু রাজত্বে হিন্দুস্থানের অবস্থা' শীর্ষক পাঁচটি উপাদেয়

প্রবন্ধ। তিনি 'কলিকাতা রিভিউ'তে কয়েকটি প্রবন্ধ এবঙ তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও রামকমল সেনের সঙক্ষিপ্ত জীবনী লিখিয়াছেন। রাধানাথ শিকদারের সঙ্গে যৌথভাবে তিনি 'মাসিক পত্রিকা' নামে একটি সাময়িকপত্র পরিচালনা এবঙ তাহাতে কথ্য বাঙ্গালায় মৌলিক কাহিনী 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনা করিয়াছিলেন তাঁহার 'টেকচাঁদ ঠাকুর' আমাদের মহত্ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমকে 'পথপ্রদর্শন করিয়াছে', এইরূপ কথা প্রচলিত আছে।

গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ বিষয়ে দিগম্বর মিত্র অনেকগুলি কার্যবিবরণী লিখিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যিক প্রয়াসের দুইটি নিদর্শন রহিয়াছে,—'খাজনার মামলায় হাইকোর্টের বিচার সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য', এবঙ 'মহামারী জ্বর'। তাঁহার প্রকাশ্য বক্তৃতাগুলি জন ব্রাইটের সহজ ও কার্যকর আদর্শে গঠিত।

উপরি-উক্ত ছাত্রেরা ডিরোজিও গোষ্ঠির অন্তর্গত। পরবর্তী নামগুলি রিচার্ডসনের দলের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম দিকের যাঁহাদের নাম আমার মনে পড়িতেছে, তাঁহাদের মধ্যে মেকলে ও ম্যাঙগ্ল্সের মতে রাজকৃষ্ণ দে ছিলেন 'নিশ্চিতভাবে শ্রেষ্ঠ' এবঙ 'তাঁহার সহাধ্যায়ীদের তুলনায় অনেক অগ্রবর্তী'। যুবক রাজনারায়ণ দত্ত, গুরুচরণ দত্ত এবঙ কালাচাঁদ দত্তের প্রতেকেই ছিলেন কবি, আমাদের কলেজের 'হিন্দু পাইওনিয়ার'-এ যাঁহাদের কাব্য-নির্ঝর প্রবাহিত হইয়াছিল। সুপরিচিত ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ট্রাভেলিয়ানের পরীক্ষায় সাহিত্য ইতিহাসে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সাহিত্যে তাঁহার প্রবল অনুরক্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া তিনি চিকিত্সাবিদ্যায় মনোযোগী হইয়াছিলেন। তত্সত্ত্বেও একনিষ্ঠ পাঠক হিশাবে তিনি সভ্যতা সম্বন্ধে বাক্লের গ্রন্থ প্রভৃতি নূতন গ্রন্থ পাঠ করিতেন।

বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসুর জীবনের ধারা পান্ডিত্যপূর্ণ বলিয়া বিখ্যাত ছিল। তাঁহার বহুদিগ্দর্শী মন ছিল এবঙ জীবিত বাঙ্গালি ভদ্রলোকদিগের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ পন্ডিত ব্যক্তি। স্বভাবে লাজুক ও সাহিত্যে হারকিউলিসের স্তম্ভ স্থাপনে অনাকাঙক্ষী থাকিয়া তিনি আপনাকে অন্তরালে রাখিয়াছিলেন এবঙ সাধারণের খ্যাতি লাভ করেন নাই। অনেকগুলি অস্বাক্ষরিত রচনার লেখক হইলেও তাঁহার বুদ্ধিগত ঐশ্বর্য অন্যের নির্মাণে ব্যস্ত থাকিত। তিনি তাঁহার অনেক বন্ধুর বুদ্ধিগত পরামর্শদাতা ছিলেন। তাঁহার জীবন ছিল অতীতের বুদ্ধিজীবীদের সহিত দীর্ঘ নীরব কথোপকথন। জীবনের শেষ বত্সরগুলিতে, যখন

'মর্ত্যবন্ধনে আবদ্ধ মানুষ গগনের প্রতি দৃষ্টি উন্নীত করে',

তখন অধ্যাত্মবাদ তাঁহার আলোচনার বিষয় হইয়াছিল।

কিশোরীচাঁদ মিত্র রচনা এবঙ বাগ্মিতা উভয়েরই চর্চা করিতেন। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের পরীক্ষায় তাঁহার রচনা শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। কলেজ ত্যাগ করিবার তিন-চারি বত্সর পরে 'ক্যালকাটা রিভিউ'তে তাঁহার লিখিত রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী প্রকাশিত হইলে তদানীন্তন ছোটলাট স্যর ফ্রেডারিক হ্যালিডে তাঁহার গুণের পুরস্কার দিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে রামপুর বোয়ালিয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবঙ পরে কলিকাতার উত্তর বিভাগের ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন। 'প্রথমাগতকে প্রথম সুযোগ' দিবার নীতিতে সত্ভাবে বিশ্বাস

করিয়া কিশোরীচাঁদ কাজ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু যাঁহারা উচ্চমর্যাদার বিশেষ সুবিধালাভের উপর গুরুত্ব দেন, তাঁহাদের বিরূপতায় তিনি চাকুরি হারাইলেন। সাঙবাদিকের বৃত্তি গ্রহণ করিয়া তিনি অনেক বত্‌সর 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড' পরিচালনা করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর, মতিলাল শীল, রামগোপাল ঘোষ এবঙ আরও অনেকের জীবনীলেখক ছিলেন কিশোরী। তিনি 'ক্যালকাটা রিভিউ'তে 'বঙ্গের অভিজাত ভূস্বামী' সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধের রচয়িতা। অনেক অনুষ্ঠানে তিনি বক্তৃতা করিয়াছেন, কিন্তু কালা কানুন সম্বন্ধে দেশীয়দিগের সভায় তিনি শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

রিচার্ডসনের শিষ্যদিগের মধ্যে রামবাগানের বিখ্যাত দত্তবঙশের শশিচন্দ্র দত্ত ছিলেন উর্বরতম লেখক। তিনি কবিতা ও গদ্যপ্রবন্ধ উভয়ই লিখিতেন, এবঙ সেইগুলি সন্ডার্স ম্যাগাজিন, ওরিয়েন্টাল মিস্‌লেনি, ক্যালকাটা রিভিউ, খ্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার, কর্নহিল ম্যাগাজিন, এবঙ ব্ল্যাকউডস্‌ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হইত। মাঝে মাঝে তিনি তাঁহার রচনাগুলিকে সঙ্গ্রহ করিয়া এদেশ অথবা লন্ডন হইতে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতেন। বঙ্গের মহাকরণ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি 'কেরানির জীবনকাহিনী' প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু 'রায় বাহাদুর' উপাধি দিয়া তাঁহার মুখ বন্ধ করা হইল।

প্যারীচরণ সরকার অধ্যাপকের পদে উন্নীত হইলেও প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকের রচয়িতা হইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন।

বঙ্গদেশের শিক্ষার ইতিহাসে ভূদেব মুখোপাধ্যায় সুখ্যাতির অধিকারী ; কিন্তু সঙস্কৃত ছিল তাঁহার উত্তরাধিকার, এবঙ আরাধনার বিষয়।

রিচার্ডসনের সমস্ত ছাত্রের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন ছিলেন উজ্জ্বলতম। তিনি ছিলেন দিব্য জ্যোতিতে ভাস্বর। স্বদেশের ভাষাকে উন্নত করিতে আবির্ভূত হইয়া তিনি বাঙলা কাব্যে বিজয়ীর যে সম্মান অর্জন করিয়াছেন তাহা অনতিক্রম্য। অন্যত্র আমি তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার সাক্ষ্য দিয়াছি।

কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে অত্যুচ্চ। তাঁহার বিশিষ্ট গুণ ছিল বাগ্মিতা। জনসাধারণ মোহাবিষ্ট হইয়া উত্‌কৃষ্ট ও জোরালো ইঙরাজিতে প্রকাশিত তাঁহার অলঙ্কারপূর্ণ বাক্‌পটুতা শ্রবণ করিত। তবে এইখানে তাঁহার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বা অনেক দেশপ্রেমিক কার্যকলাপের উল্লেখ করা চলে না।

যাঁহাদের নাম মনে পড়িতেছে না, আমরা তাঁহাদের সম্বন্ধে নীরব থাকিব। কিন্তু যে গৌরদাস বসাক শেষ জীবনে ইউলিসিসের ধনুক লইবার জন্য অগ্রসর হইলেন তাঁহাকে ভুলিলে চলিবে না। এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে দীর্ঘকালীন সঙযোগের ফলে তিনি প্রাচীনকালের তথ্যাদির ব্যবসায়ী হইয়া উঠিলেন এবঙ প্রাগৈতিহাসিক তথ্যের একটি 'মণিহারী দোকান' খুলিয়া বসিলেন। কিন্তু প্রাচীন ইতিহাসে তাঁহার বিদ্যাবত্তা পাতালশিলা পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারে নাই। তাঁহার 'কালীঘাট ও কলিকাতা' এবঙ 'ভোটবাগানের মঠ' রচনায় উপরের স্তর হইতে বহির্গত প্রতিটি ক্ষুদ্র প্রস্তরখন্ড, নুড়ি ও খোলাকে জোর করিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে, কিন্তু ইউরোপের বিচারকমন্ডলীর সম্মুখে

তাহার যথোচিত কারণ প্রদর্শন করিতে হইত।' তিনি শেঠ ও বসাকদের দুর্ধর্ষ সমর্থকরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, এবঙ সেরভেন্তেসের উপন্যাসের নাইট দূরবর্তী বাতচক্রে কল্পিত দৈত্য দেখিয়া যেরূপ করিয়াছিল, সেইরূপ ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বীকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়াছেন। যে বঙ্কিম অক্ষরগুলির দ্বারা তাঁহার রচনাকে চেনা যায়, সেগুলি পরোক্ষ উল্লেখমাত্র—'ভালামব্রোসার ক্ষুদ্র নদীতীরে বিস্তীর্ণ গভীর পত্রাবলী' তাঁহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য। সঙক্ষেপে, তাঁহার 'বরিশাল বন্দুকে'র ন্যায় তাঁহার বন্দুক হইতে গুলিবর্ষণ ব্যাখ্যার অতীত।

পরিশেষে উল্লেখ্য, অপর এক ব্যক্তি তাঁহার নির্জন বাস হইতে পৃথিবীকে দেখিয়াছেন, কখনও উচ্চাবাসের আন্দোলনের অঙশিদার ছিলেন না। সুগ্রীব ও নলের হনুমান ও জাম্বুবানদের মধ্যে তিনি ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালির ন্যায় 'ট্রাভেলস্ অব এ হিন্দু' [হিন্দুর ভ্রমণ-কাহিনী] লিখিয়াছেন।

এইখানে যে বর্ণনা সমাপ্ত করিতেছি, তাহাতে প্রথাগত বর্ণনাকারী কিরূপে তাঁহার অনুসন্ধানকে পরিচালিত করিবেন কেবল তাহাই নির্দেশ করিলাম। এই বিবরণে আগ্রহ প্রাচীন তথ্যানুসন্ধিত্সার ন্যায়। কিন্তু বঙ্গদেশের মনোরাজ্যের ইতিহাসে পুরাতন হিন্দু কলেজ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, যাহাকে মানসিক উত্কর্ষ ও সামাজিক অগ্রগতি উভয় দিক হইতে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। হিন্দু কলেজ যেমন ব্যক্তির বুদ্ধির সম্বন্ধে, তেমনই তাহার সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির আকাঙক্ষা সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক ছিল। ইহা যেমন তত্ক্ষণাত্ তাহার কল্পনা ও উত্সাহকে সঞ্জীবিত করিয়াছিল, তেমনই আন্তরিক প্রচেষ্টার দ্বারা সত্য আবিষ্কারের যে ক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব তাহার সৃষ্টি করিয়াছিল। সেখানে যেসব নূতন নূতন চিন্তা ও তত্ত্বের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, প্রাচীরের বহির্দেশে সেগুলি সঙ্গে সঙ্গে প্রচার করিবার প্রয়াস করা হইয়াছিল। ইহার বক্ষে অপরের তুলনায় দূরবর্তীকে নিরীক্ষণ করিবার এবঙ পরিবেশকে নূতন চক্ষে দেখিবার যে উত্সাহ লালিত হইয়াছিল তাহা ভ্রান্তি ও তাহার আনুষঙ্গিকের বিরুদ্ধে জ্ঞান ও আলোকের প্রথম সঙঘাত সৃষ্টি করিয়াছিল এবঙ পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুমোদনসাপেক্ষে সর্বদা তাহা অনুসারে কর্মোদ্যম করিয়াছিল। হিন্দু কলেজ কেবল আমাদের বুদ্ধিগত ক্রিয়াকলাপের প্রথম বিশিষ্ট দৃশ্যরূপে স্মরণীয় নহে, অধিকন্তু ইহা আমাদের জাতীয় উন্নতি ঘটাইবার পক্ষে সর্বাধিক ফলপ্রসূ ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মানুষ্ঠানের দাবি ও সম্মানের অধিকারী। আমি যখন ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে এই কলেজ পরিত্যাগ করিলাম, তখন ইহা বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভবিষ্যদ্বাণীকে সার্থক করিয়া একটি বিরাট বটবৃক্ষের আকারে জ্ঞান ও বুদ্ধির ফল প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করিতেছিল। বর্তমানে ইহা মনে করা যাইতে পারে, যে ওই প্রতিষ্ঠান অতীতের কালগর্ভে নিহিত। আমার মনে হয়, সেইখানে অনুসৃত যে ব্যবস্থার চরিত্র আমি বর্তমান আলোচনায় নির্দেশ করিয়াছি, তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। উহার মহত্তম উত্তরাধিকারীরা বর্তমানে মৃত, এবঙ সামান্য যে কয়েকজন অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছেন, তাঁহাদের স্মৃতিতে ইহা এখনও জীবিত রহিয়াছে।

পরিশিষ্ট

'স্মৃতিকথা'য় ভ্রান্তি

মহাশয়,

আপনাদের শিক্ষামূলক সাময়িকপত্রের মার্চ সঙখ্যায় বাবু ভোলানাথ চন্দ্র 'পুরাতন হিন্দু কলেজের স্মৃতিকথা' নামক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহার কয়েকটি বিষয়ে আমার সামান্য বক্তব্য আছে। আপনি সম্পূর্ণভাবে অবগত আছেন, যে আমি বর্তমানে এইচ. এল. ভি. ডিরোজিও-র একটি সঙক্ষিপ্ত জীবনী লিখিতেছি, এবঙ ইতিমধ্যে তাহার অঙশবিশেষ আপনার নিকট প্রকাশ করিবার জন্য পাঠাইয়াছি। উক্ত প্রবন্ধে বাবু ভোলানাথ চন্দ্র লিখিয়াছেন—'তিনি (মি. দ'অ্যানসেল্ম্) বোধহয় পূর্বভারতীয় ছিলেন।'

হিন্দু কলেজেব প্রধান শিক্ষক মি. দ'অ্যানসেলম্ পূর্বভারতীয় নহেন পর্তুগিজ ছিলেন। 'মি. হ্যালিফ্যাক্সের নিকট মি. দ'অ্যানসেল্মের পত্র হইতে প্রতীয়মান হইবে, যে তিনি ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন।' (অন্যত্র মুদ্রিত) আমার প্রবন্ধে সেই পত্রটি পাওয়া যাইবে। অন্যান্য নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র সম্বন্ধেও তাহা দেখা যাইতে পারে।

(দ্বিতীয়ত) তিনি লিখিয়াছেন—'১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে তিনি (ডিরোজিও) চতুর্থ শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন, ইত্যাদি।'

মি. ডিরোজিও ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে নয় ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই তথ্যের সত্যতা সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য মিত্র লিখিত 'ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত', 'বেঙ্গল সেলেব্রিটিজ্' [বঙ্গাদেশের বিখ্যাত ব্যক্তিগণ], 'দি ইস্ট ইন্ডিয়ান ওয়ার্দিজ্' [পূর্ব ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ] ইত্যাদি ইত্যাদি, (অন্যত্র প্রকাশিত) আমার প্রবন্ধে উদ্ধৃত।

(তৃতীয়ত) তিনি লিখিয়াছেন—'হতভাগ্য ডিরোজিও-কে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ না দিয়া বিতাড়িত করা হইয়াছিল।'

হিন্দু কলেজের পরিচালক সমিতির সভায় গৃহীত (আমার প্রবন্ধে মুদ্রিত) সিদ্ধান্তের কথা শুনিয়া ডাক্তার উইলসনের পরামর্শ অনুসারে ডিরোজিও স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিয়াছিলেন। মি. ডিরোজিও-কে লিখিত ডাক্তার উইলসনের এবঙ তদুত্তরে ডাক্তার উইলসনের লিখিত ডিরোজিও-র (অন্যত্র মুদ্রিত) পত্রাবলী হইতে ইহা স্পষ্ট হইবে।

আশা করি যে এই তুচ্ছ বিষয়গুলি জ্ঞানী লেখকের বিরক্তি উত্পাদন করিবে না।

আমি ইত্যাদি ইত্যাদি

এপ্রিল ১৮৯৫ এস. সি. সান্যাল

বাবু ভোলানাথ চন্দ্রের 'পুরাতন হিন্দু কলেজের স্মৃতি' সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

মহাশয়,

ইহা এখন সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত যে পুরাতন হিন্দু কলেজ হইতে বহির্গত ইঙরাজি-শিক্ষিত বাঙ্গালিদের প্রথম দিকের যে দল প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় যুগের মানুষ বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা একটি মহত্ গোষ্ঠিবদ্ধ এবঙ বর্তমান ও নবোদিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তুলনায় অনেক উন্নত ছিলেন। হিন্দু কলেজীয়দের অধিকাঙশই বর্তমানে প্রয়াত এবঙ যে সামান্য কয়েকজন জীবিত রহিয়াছেন, তাঁহারাও কর্মময় জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। বাবু ভোলানাথ চন্দ্র এই সুযোগ্য ব্যক্তিদের একজন। বঙ্গদেশে ইঙরাজি শিক্ষার অলিখিত ইতিহাসের প্রতিটি অনুসন্ধিত্সু ছাত্র এই সাময়িকপত্রে মাসিক কিস্তিতে কিছুদিন যাবত্ প্রকাশিত তাঁহার 'পুরাতন হিন্দু কলেজের স্মৃতি' নামক উল্লেখযোগ্য রচনা নিশ্চয় সাগ্রহে পাঠ করিয়াছেন। হিন্দু কলেজের পুরাতন ছাত্রের কলমে হিন্দু কলেজ ও তাহার প্রাচীনকালের উজ্জ্বল ও বিশিষ্ট ছাত্রবর্গের কাহিনী শিক্ষিত পাঠকদের নিকট দীর্ঘকাল যাবত্ আকাঙিক্ষত ছিল। তাঁহার বার্ধক্যে এই 'স্মৃতিকথা' রচনা করিবার শ্রম স্বীকার করিবার জন্য মি. চন্দ্র আমাদের ধন্যবাদভাজন।

এই বিষয়ে মি. চন্দ্রের রচনার মূল্য ও সৌন্দর্য মহত্ ও প্রশ্নাতীত হইলেও ইহাতে কয়েকটি ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। প্রথমত, লেখক সুপরিচিত এমন কয়েকজন হিন্দু কলেজীয়ের নামোল্লেখ করিতে ভুলিতে 'গিয়াছেন, বা কেবল উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত রহিয়াছেন, যাঁহাদের মহত্ বৈশিষ্ট্য ছিল। দ্বিতীয়ত, তাঁহার পরিবেশিত তথ্যের কয়েকটি সত্য হইতে দূরবর্তী। তৃতীয়ত, তাঁহার আলোচিত কয়েকজন ব্যক্তি সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল নহেন, স্পষ্টত ঘৃণা ও নিন্দার মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন।

মি. চন্দ্রের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগগুলি যে একেবারেই ভিত্তিহীন নহে, তাহা আমরা এখন প্রদর্শন করিব।

হিন্দু কলেজের বিশিষ্ট ছাত্রবর্গের মধ্যে যাঁহাদের নাম মি. চন্দ্র উল্লেখ করেন নাই, তাঁহাদের মধ্যে গোবিন্দচন্দ্র দত্তের কথা আমাদের প্রথমে মনে পড়িতেছে। মি. জি. সি. দত্ত হিন্দু কলেজের একজন বিশিষ্ট প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন। আমাদের বিশ্বাস, তিনি ছিলেন বাবু ভোলানাথ চন্দ্রের একজন সহপাঠী, সাহিত্যের উত্কৃষ্ট ছাত্র এবঙ বিশিষ্ট কবিখ্যাতির অধিকারী। এই বিশিষ্ট সরকারী কর্মচারী ভারত সরকারের অর্থ বিভাগে দীর্ঘকাল সসম্মানে চাকুরি করিয়াছেন। মি. দত্ত ছিলেন একনিষ্ঠ খ্রিস্টান এবঙ উচ্চ চারিত্রিক গুণসম্পন্ন। বাঙ্গালিদের মধ্যে যাঁহারা ইউরোপে গিয়াছিলেন তিনি তাহাদের প্রথম যুগের একজন ছিলেন। মহিলাদের মধ্যে প্রকৃত ও দুর্লভ কবিপ্রতিভার অধিকারী তরু দত্তের পিতা হিশাবে তিনি সুপরিচিত। তাহা ছাড়া যে বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র বঙ্গীয় সাবর্ডিনেট এক্সিকিউটিভ সার্ভিসে চাকুরি করিয়া সুনাম অর্জন করিয়াছেন, সেই হিন্দু কলেজীয় ছাত্রেরও কোন উল্লেখ নাই। অন্যান্যদের মধ্যে সম্ভবত আরও উল্লেখযোগ্য বর্জনের তালিকায় আছেন

গোপাললাল রায় এবঙ রাজনারায়ণ বসু। উজ্জ্বল ছাত্র গোপাললাল সম্বন্ধে কলেজের অধ্যক্ষ মি. কার অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। গোপাললালকে তিনি 'দ্বিতীয় গোপাল' বলিয়া ডাকিতেন, কারণ একই নামে আর এক জন বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন যাঁহার উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তরফলক স্থাপিত হইয়াছিল। পরবর্তী জীবনে যেমন, তেমনি কলেজ--জীবনেও রাজনারায়ণ বসু বিশিষ্ট উচ্চস্থান অধিকার করিয়ছেন। তিনি সিনিয়র স্কলারশিপ অর্জন এবঙ নীতিশাস্ত্রে দক্ষতার জন্য একটি রৌপ্যপদক লাভ করিয়াছিলেন। ইতিহাস ছিল তাঁহার স্বক্ষেত্র। এই বিষয়ে তাঁহার রচনাগুলি এত উন্নতমানের ছিল, যে সেগুলি শিক্ষাবিভাগের রিপোর্টে প্রকাশিত হইলে সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাসের বিখ্যাত লেখক লেফ্‌টন্যান্ট (পরে স্যর) জন কে তখন কলিকাতাবাসী হইয়া 'হরকরা' সম্পাদন করিবার সময় তাহার অত্যন্ত প্রশঙসা করিয়াছিলেন। পরবর্তী জীবনে বাঙ্গালা ও ইঙরাজি রচনা এবঙ সামাজিক ও ধর্মীয় সঙস্কারক হিশাবে রাজনারায়ণ যশোলাভ করিয়াছিলেন। বাবু ভোলানাথ চন্দ্র প্রদত্ত হিন্দু কলেজীয় ছাত্রদের তালিকায় বাবু হেমচন্দ্র করের নামও অনুপস্থিত। বাবু হেমচন্দ্র কর যেমন বঙ্গাদেশের সাবর্ডিনেট এক্সিকিউটিভ সার্ভিসের কর্মচারী হিশাবে কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন, তেমনি কলিকাতার সমাজের সুপরিচিত সদস্য হিশাবে দেশীয় ও ইউরোপিয়দিগের নিকট সম্মানিত ছিলেন। মাত্র একটি লাইনে সামান্য প্রশঙসা করিয়া যোগেশচন্দ্র ঘোষকে উপেক্ষা করা হইয়াছে, দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি। যোগেশচন্দ্রের গাণিতিক প্রতিভা ছিল, এবঙ কলেজের অধ্যক্ষ মি. কার তাঁহাকে 'কলেজের র‍্যাঙলার' বলিয়া নির্দেশ করিতেন।

তথ্যগত ভ্রান্তিগুলির মধ্যে আমি কেবল একটি শোচনীয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। মি. চন্দ্র হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে কেশবচন্দ্র সেনের নামোল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি প্রয়াত বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র অপেক্ষা বেশি হিন্দু কলেজিয় ছিলেন না। কেশবচন্দ্র সেন প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রয়াত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহপাঠী ছিলেন।

বাবু ভোলানাথের বিরুদ্ধে আমাদের তৃতীয় অভিযোগের প্রমাণস্থলে তিনি কিরূপে বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাবু গৌরদাস বসাকের মতো হিন্দু কলেজিয় ছাত্রের আলোচনা করিয়াছেন তাহা নির্দেশ করিব। তিনি প্রথমোক্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে মাত্র সোয়া দুই লাইন লিখিয়া সারিয়াছেন, অথচ দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে স্তম্ভের এক তৃতীয়াঙশ ব্যাপিয়া একটি দীর্ঘ অনুচ্ছেদ লিখিয়াছেন, যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য তাঁহাকে নিন্দা ও বিদ্রূপ করা। বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় একজন প্রধান বাঙ্গালি লেখক ছিলেন, এবঙ বঙ্গাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য প্রভূত প্রয়াস করিয়াছেন। পাণ্ডিত্য ও চিন্তার গভীরতায় তাঁহার প্রধান রচনাগুলি এখনও বঙ্গাভাষায় অনতিক্রম্য, এবঙ সেইগুলি বঙ্গাদেশে বঙশপরম্পরাক্রমে দীর্ঘকাল পঠিত ও মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইবে। ভূদেববাবুর জীবনের এই প্রধান ঘটনাগুলির আলোচনা করিবার মত দাক্ষিণ্য বাবু ভোলানাথ প্রদর্শন করেন নাই, কেবল অস্পষ্ট এবঙ দ্ব্যর্থবোধক উক্তি করা ছাড়া যে 'বঙ্গাদেশের শিক্ষার ইতিহাসে ভূদেব মুখোপাধ্যায়

সুখ্যাতির অধিকারী।' ভূদেব ছিলেন সঙস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ ছাত্র ও তাহার প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাবান। স্বদেশবাসীর সঙস্কৃতচর্চাকে উত্সাহিত করিবার জন্য তিনি উইল করিয়া দেড়লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু নিজের পিতৃভূমির প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম প্রীতি এবঙ এই প্রবুদ্ধ বদান্যতার কর্মে তাঁহার মহত্ সদাশয়তা বাবু ভোলানাথের নিকট এই ব্যঙ্গ ও নিন্দালাভ করিয়াছে 'সঙস্কৃত ছিল তাহার উত্তরাধিকার, এবঙ আরাধনার বিষয়।' যখন আমরা স্মরণ করি, যে লেখক এবঙ বাবু গৌরদাস বসাক তাঁহাদের কলেজজীবন হইতে, অর্থাত্ বিগত চল্লিশ বত্সরের অধিক কাল যাবত্ ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তখন বাবু গৌরদাস বসাক সম্বন্ধে রচিত অনুচ্ছেদের অত্যন্ত আক্রমণাত্মক ভঙ্গী এবঙ নিন্দাসূচক স্বর আমরা ব্যাখ্যা করিতে পারি না। তাঁহার বন্ধু ভোলানাথবাবুকে কখনও মর্মপীড়া দিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। তাহা হইলে এই অকারণ দুর্ব্যবহার কেন? কলিকাতার সম্ভ্রান্ত কায়স্থদেব পূর্বপুরুষেরা নহে, বরঙ শেঠ ও বসাক পরিবারেরাই সূতানুটি ও গোবিন্দপুর গ্রামগুলির পত্তন করিয়াছিলেন, যাহা বর্তমানে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী হইয়াছে। এই বক্তব্য তাঁহার 'কালীঘাট ও কলিকাতা' নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সাহসের সহিত প্রতিপাদন করিয়া বাবু গৌরদাস বসাক কলিকাতার সম্ভ্রান্ত কায়স্থদের যে গভীর শত্রুতা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ভোলানাথ বাবু কি তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতিশীল? তাহা হইলে বাবু গৌরদাস বসাকের অপরাধের সার কথা বোধ হয় এই, তিনি প্রথম হইতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল পর্যন্ত কলিকাতার ইতিহাসের কতকগুলি অখন্ডনীয় কথা আবিষ্কার করিয়াছেন। যাঁহাদের নিকট এই ঐতিহাসিক সত্য বিরক্তিকর মনে হইয়াছে, তাঁহারা জনৈক ইউরোপীয় কর্মচারীর সম্পাদনায় আশু প্রকাশ্য 'রেকর্ডস্ অব ওল্ড ক্যালকাটা' [পুরাতন কলিকাতার বিবরণ] গ্রন্থে প্রতিকার হিশাবে দেখিতে পাইবেন, উহা বাবু গৌরদাসের বক্তব্যকে সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছে। বাবু গৌরদাস সম্বন্ধে বাবু ভোলানাথ সঙক্ষিপ্ত আলোচনায় এই ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছেন, যে মি. বসাক বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার সাহিত্যিক পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহা একটি বিদ্বেষপূর্ণ মিথ্যাবাদ। ইহা সত্য যে বহু পূর্বে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে 'জার্নাল অব দি ক্যালকাটা এশিয়াটিক সোসাইটি'তে প্রকাশিত বাবু গৌরদাসের 'অ্যান্টিকুইটিজ্ অব বাগিরহাট' [বাগিরহাটের প্রাচীন কথা] ঐ স্থান সম্বন্ধে বহু মৌলিক তথ্য প্রথম প্রকাশ করিয়া যথেষ্ট সাড়া জাগাইয়াছিল, এবঙ বাবু ভোলানাথের 'ভ্রমণকাহিনী' তাহার পূর্বে রচিত নহে।

আমরা প্রথমেই স্বীকার করিয়াছি যে বাবু ভোলানাথ চন্দ্রের 'পুরাতন হিন্দু কলেজের স্মৃতিকথা' বঙ্গদেশে ইঙরাজি শিক্ষার ইতিহাসে একটি মূল্যবান রচনা এবঙ এই দিক হইতে ইহার একটি স্থায়ী মূল্য আছে। কিন্তু আমরা ইহাও বলিতে বাধ্য যে গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটিগুলি সঙশোধন না করিলে ইহার গুরুত্ব ও মূল্য অনেক কমিয়া যাইবে। আমরা আশা করি যে মি. চন্দ্র তাঁহার 'স্মৃতিকথা' পুনঃপ্রকাশ করিবেন, এবঙ তাহা করিবার পূর্বে সত্সাহসের সহিত আমাদের নির্দেশিত ত্রুটিগুলি স্বীকার ও তাহার সঙশোধন করিবেন।

পুরাতন হিন্দু কলেজিয়দিগের জনৈক অনুরাগী